এক শো বছরের

সেরা রম্য রচনা

সম্পাদনা ■ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একশো বছরের সেরা রম্য রচনা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সাহিত্য তীর্থ

একশো বছরের সেরা রম্যরচনা

সম্পাদনা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

PATHAGAR.NET

সাহিত্য তীর্থ : কলকাতা—৭৩

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৪১৩, জানুয়ারী ২০০৭

প্রকাশক : তীর্থপতি দত্ত ।। সাহিত্য তীর্থ ।। ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩

লেজার কম্পোজ : এস. টি. লেজার ইউনিট, কলকাতা-৭৩

সহকারী সম্পাদক : উজ্জ্বলকুমার দাস

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ দেব ।। অলংকরণ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান : তুলি-কলম ।। ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

PATHAGAR.NET

সূচিপত্র

অতি অল্প হইল ❦ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ❦ ১৩

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ❦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ❦ ১৬

পালামৌ ❦ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❦ ২৩

বিড়াল ❦ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❦ ২৬

নাক-কাটা বঙ্ক ❦ কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা) ❦ ৩০

নয়নচাঁদের ব্যবসা ❦ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ❦ ৩৫

বিলি ব্যবস্থা ❦ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর) ❦ ৫৫

দ্বন্দ্বে মাতরম্ ❦ অমৃতলাল বসু ❦ ৫৯

বিনি পয়সার ভোজ ❦ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❦ ৬৩

আমাদের সনডে সভা ❦ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ❦ ৭২

আমরা ও তোমরা ❦ প্রমথ চৌধুরী ❦ ৭৮

ক্যাবলের পত্র ❦ সুকুমার রায় ❦ ৮০

বিবাহের বিজ্ঞাপন ❦ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ❦ ৮৪

দক্ষিণ রায় ❦ রাজশেখর বসু ❦ ৯৩

PATHAGAR.NET

অবশেষে — প্রতিভা বসু — ২৮৫

নাম — নরেন্দ্রনাথ মিত্র — ২৯৩

গুণী সম্বর্ধনা — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় — ৩০১

ইদু মিঞার মোরগা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — ৩১১

বউ ধার — আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — ৩২০

আমি — বিমল কর — ৩২৯

এক সের বেগুন — রমাপদ চৌধুরী — ৩৪০

চতুর্থ গুল্প — গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) — ৩৪৬

অনবরত-র অবিশ্বাস্য — মহাশ্বেতা দেবী — ৩৫২

ওয়াটসনের বোকামি — হিমানীশ গোস্বামী — ৩৫৭

ছেলের ম্যাও বাবার হ্যাপা — সমরেশ বসু — ৩৬৫

অষ্টাবক্র এবং প্রিন্স অ্যালবার্ট — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — ৩৭৭

বাবা যখন রাউণ্ডুলে — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৮৩

বিরুদ্ধ পক্ষ — প্রফুল্ল রায় — ৩৯২

কেষ্টপুরের জামাইবাবু — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ৪০০

বত্রিশ পাটি দাঁত — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — ৪১৫

চেয়ার — বুদ্ধদেব গুহ — ৪৩৬

গয়াপতির বিপদ — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — ৪৫০

গেঞ্জি — তারাপদ রায় — ৪৫৯

মেসোমশায়ের কন্যাদায় — নবনীতা দেবসেন — ৪৬৪

মর্নিংওয়াক — উজ্জ্বলকুমার দাস — ৪৮১

ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১০৫
দেশের মেয়ে — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় — ১০৯
ছড়াছড়ি — পরিমল গোস্বামী — ১২২
বেয়াই পরিচয় — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — ১২৫
দোলের দিন — বনফুল — ১৩১
ঝি — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৩৫
পান্নালাল — সজনীকান্ত দাস — ১৪০
ভেজালের উৎপত্তি — মনোজ বসু — ১৫২
এলার্জি — প্রমথনাথ বিশী — ১৫৯
একটুকু বাসা — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — ১৬৩
সুমিতাকে সামলানো — শিবরাম চক্রবর্তী — ১৭১
বেঁচে থাকো সর্দিকাশি — সৈয়দ মুজতবা আলি — ১৭৯
রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন? — প্রেমেন্দ্র মিত্র — ১৯১
[illegible]ড় — বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র — ২০১
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না — অন্নদাশঙ্কর রায় — ২০৭
পত্রলেখার বাবা — সতীনাথ ভাদুড়ী — ২১৯
চিঠি — বুদ্ধদেব বসু — ২৩১
কালোবাজারে প্রেমের দর — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৩৭
জামাই চাই — গজেন্দ্রকুমার মিত্র — ২৪২
সোনা-পিসিমা — লীলা মজুমদার — ২৫২
আসল বেনারসী ল্যাংড়া — আশাপূর্ণা দেবী — ২৫৬
নকলদানা — সুমথনাথ ঘোষ — ২৬৭
মহেশ্বরবাবু — বিমল মিত্র — ২৭৬

PATHAGAR.NET

ভূমিকা

'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।'

রবিঠাকুরের এই অভিব্যক্তিই হল আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনবেদ। এই গানের ডালা বহন করাই মানব জীবনের সত্য। যেখানে নিত্যই ঘটে চলেছে 'পৌষ ফাগুনের পালা'। আমাদের জীবনে কখনও কান্না, কখনও হাসি এই নিয়েই চলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। ঠিক যেন নীল আকাশে কখনও মেঘের ভেলা, আবার কখনও সোনালি রোদের মুচকি হাসি।

আমাদের জীবনের প্রতিবিম্ব হল সাহিত্য। সাহিত্য থেকে যা কিছু আমরা পাই, তা যখন রসে উত্তীর্ণ হয় তখন সেই হাসি হয়ে ওঠে হাস্যরস। এই হাস্যরসকে পণ্ডিতেরা বলেছেন Cosmic aspect of life.

যে কোনো সাহিত্যে হাস্যরসের বিস্তৃতি ব্যাপক। কারণ এর মধ্যে থাকে স্রষ্টার অপরিসীম সহানুভূতি—যা হাসিকে রসে পরিণত করে এবং স্রষ্টার কল্পনায় অভিষিক্ত হয়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও হাসির গল্পর কোনো অভাব নেই। নেই শুধু মানুষের জীবনে হাস্যরসের উপাদান। কেননা বাঙালির জীবন আজ বড় নীরস। এই নীরস জীবনে সামান্য একটু হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার সম্পাদনায় 'একশো বছরের সেরা রম্যরচনা' বইটি পড়ে এই ভোটযুগের মানুষের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা যদি ফুটে ওঠে তাহলেই আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

PATHAGAR.NET

অতি অল্প হইল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

'অত্যুচ্চৈঃ পতনায়'

এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর॥ ১॥
সকলের বড় আমি মম সম নাই।
কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহি পাই॥ ২॥
অতি দর্পে লঙ্কাপতি সবংশে নিপাত।
অতি দর্পে বাচস্পতি তব অধঃপাত॥ ৩॥
দর্পে ফেটে পড় সবে কর তৃণজ্ঞান।
অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান॥ ৪॥
তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন॥ ৫॥

PATHAGAR.NET

এত দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজ কাল শুনিতেছি, তাঁর যত বড় নাম ও যত ধুম ধাম, তত বিদ্যা ও তত জ্ঞান নাই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া, একখান বহি লিখিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি খুড়, তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় একখান বহি বাহির করেন। বিদ্যাসাগর, তাহার জবাব লিখিয়া, আবার একখান বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া, সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফা রফা হয়েছে। সকল লোকই অবাক হইয়াছে ও কহিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি। কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে; আমি বই সংস্কৃত আর কে জানে? যাহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত; তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়। শুনিয়াছি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি তর্কবাচস্পতি খুড়র মত, আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায়, তাঁর শরীরে সে রোগ ছিল না।

'অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে'॥

রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাঁহার বিকার নাই। পুঁঠি মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফর্‌ফর্ করিয়া বেড়ায়।

আমি নিজে যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে যে আপন মুখে আপনার বড়াই করে; সে অতিবড় মূর্খ। যাহ হউক, বিদ্যাসাগরের বহি পড়িবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। তদানুসারে, তাঁর কাছে গিয়া, একখান বহি চাহিয়া আনিলাম। যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল ব্রাহ্মণ খেপেছে; মিছামিছি কতকগুলো টাকা খরচ করিয়া বহি ছাপাইয়া, দোচোখো বিতরণ করিতেছে। আড়াআড়ি বড় মজার জিনিস! মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া, কতক দূর পড়িয়া দেখিলাম, লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত নয়। সত্য সত্যই খুড়র দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন, তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড় আমার বড় নির্বোধ; অকারণে, আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা। প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিয়াছি, খুড় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা লিখিয়াছি, তাহা অকাট্য; বিদ্যাসাগর দন্তস্ফুট করিতে পারিবেক না। খুড় আমার অহঙ্কারেই মারা গেলেন;—

'নাহঙ্কারা পরো রিপুঃ।'

অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।

PATHAGAR.NET

যাহা হউক, খুড় কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য, তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম; পড়িয়া খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণবিদ্যা, খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্তিমন্ত। যদি আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তার উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মতো বেহুদা পণ্ডিত নই। তবে, আমার ব্যাকরণবোধ ও সংস্কৃততে কতকটা দখল আছে। নিজে সংস্কৃত লিখতে পারি না; কিন্তু অন্যের লেখা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিতে পারি। খুড়র লেখা দেখিয়া, বোধ হইল, বাবাজী যত জারি করেন, লেখাপড়ায় তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া, বিলক্ষণ ছরকট করিয়াছেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগর বাবু এ ছরকট টের পান নাই; টের পেলে, এ আড়াআড়ির মুখে; খুড়কে সহজে ছাড়িতেন না। যাহা হউক, সংস্কৃতয় যার ভাল দখল নাই, তার সংস্কৃত লেখা ঝকমারি।

খুড়, মনের সাধে, দেদার ভুল লিখিয়াছেন। যদি কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, সাহস করিয়া, অর্থাৎ বিদায়ের আশায় বিসর্জন দিয়া, খুড়র ভুলের বিচার করিতে বসেন, এবং লিখিয়া, আর্যাবর্তরীতিসংস্থাপনী সভার সাহায্য লইয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন; পুস্তকখানি, খুড়র পুস্তক অপেক্ষা, অনেক বৃহৎকায় হয়, সন্দেহ নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, সকল ভুলগুলি তুলিয়া, চোখে আঙ্গুল দিয়া, খুড়কে দেখাইয়া দিব। কিন্তু, বড় পুস্তক ছাপাইতে পারি, আমার সেরূপ পয়সার যোগাড় নাই। এজন্য, একদেশমাত্র দর্শিত হইল। বোধ করি, খুড় আমার ইহাতেই তুষ্ট হইবেন, "অতি অল্প হইল" বলিয়া, রুষ্ট হইবেন না। আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া, বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়র লজ্জা শরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে, আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়! তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না; এবং, "শতং বদ, মা লিখ", এই অমূল্য উপদেশবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও না। ইত্যস্তু কিং বিস্তরেণ, অর্থাৎ এবার এই পর্যন্ত।

(অংশ বিশেষ)

PATHAGAR.NET

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পুরুষ চরিত্র : ভক্তপ্রসাদবাবু। পঞ্চানন বাচস্পতি। আনন্দবাবু। গদাধর। হানিফ গাজি। রাম।

স্ত্রী চরিত্র : পুঁটি। ফতেমা (হানিফের পত্নী)। ভগী। পঞ্চী।

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা

গদাধর এবং হানিফ গাজির প্রবেশ

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)—এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠল না। দশ ছালা ধানও বাড়ি আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদাতালার মর্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়্‌বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো! এখন মল্লিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্-দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হল!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই-এক কথা বল্‌তে কসুর করব না। দেখ্ কি হয়!

(ভক্তবাবুর প্রবেশ)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে, বল্ তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন—কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

PATHAGAR.NET

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখন আর যাব কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমিদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দু-এট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়িকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

PATHAGAR.NET

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস কিরে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্‌ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্‌ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটা কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হল তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্‌, এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্‌ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌-জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্‌। (প্রকাশ্যে) সালাম কত্তা। (প্রস্থান)

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়িকে তো হাত কত্যে পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্‌ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু—ড়ি টা—কা! বলিস্‌ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ি বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্‌, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

PATHAGAR.NET

(বাচস্পতির প্রবেশ)

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। (রোদন)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হল?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কিনা বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—'গতস্য শোচনা নাস্তি'—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মতো সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোনো মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম। (বাচস্পতির প্রস্থান)

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ি দেখতে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

PATHAGAR.NET

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চায্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়িটে দেখতে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফের মাগ তার চাইতেও দেখ্‌তে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক্‌ঠাক্ কত্যে পারবি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হল শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) 'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।' আহা! 'কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।'

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখচি। বুড়ো হলে লোভান্তি হয়; কোনো ভালমন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে-টত্যে পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

কলসি লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ি।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

PATHAGAR.NET

ভগী। (সগর্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর বছর এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ির নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্তে পারি তবে কিসে পারবো। (প্রকাশ্যে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

PATHAGAR.NET

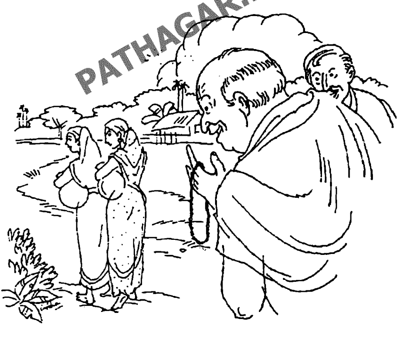

ভক্ত। (স্বগত) 'শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।' আহাহা।

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়! বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে?

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন, আমি কি আর এক মাসে একটা তেলির মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু, আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্য কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয় মা, আয়। (ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান)

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে আসতে এ কর্মটা সার্‌তে পারলে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ি কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশ্যে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্?

গদা। কত্তামশায়। এ আমার কর্ম নয়। তবে যদি আমার পিসি পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসিকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে। (প্রস্থান)

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হল। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো। তুমিই যা কর। আঃ এ ছুঁড়িকে যদি হাত কত্যে পারি।

(অংশ বিশেষ)

PATHAGAR.NET

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পূর্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাংলোয় বসিয়া পাইপ টানিতেছে, সম্মুখে একজন চাপরাসী গৌরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী একরূপ তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে, তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটোছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বাসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। 'সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা' এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, 'আমি সাহেব নহি।' একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, 'হাঁ, তুমি সাহেব।' আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে তুমি কি?' আমি বলিলাম, 'আমি বাঙ্গালী।' সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, 'না, তুমি সাহেব।' তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ি চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল। অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষত একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চুনকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিযা যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি-পাঁচখানি ইষ্টক

গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত, নানা বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য ফণাটি কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটি কলিয়াদমনের কালিয়; কাজেই যে পর্বতের উপর কালিয় উঠিয়াছে সে পর্বতের চূড়া তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে, ইহার আর আশ্চর্য কি? বৈরাগীর এই গিরিবর্দ্ধন দেখিয়াই বাল্যকালে পর্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্ণে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা যাইবেন?' আমি বলিলাম, 'একবার এই পর্বতে যাইব।' সে হাসিয়া বলিল, 'পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌছিতে পারিবেন না।' আমি এ কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথায় যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়োয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস

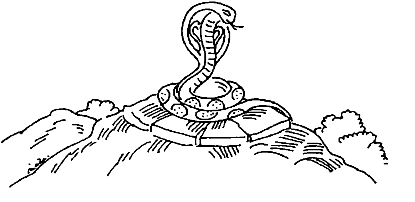

PATHAGAR.NET

আহার হয় নাই। অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমন-বার্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ি লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াই, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রেই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিনে প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক; যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ি প্রবেশ করিলে, তাহা কোনো ধনবান ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকতক বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা। তিনি শতলোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ অতি অল্পই দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রমে বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়েসে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

(অংশ বিশেষ)

PATHAGAR.NET

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও!'

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথমে উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও!'

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষে করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও!' বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।' বুঝি সে 'মেও!' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব 'তোমার দুধ তো খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?'

বলি কি? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

PATHAGAR.NET

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল 'মেও!' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া, যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, 'মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোনো শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

'দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য। ধর্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

'দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

'দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপড়ে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

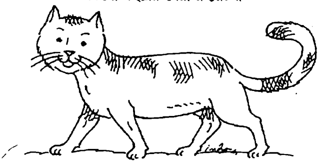

'দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া, তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর কি একটু আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

'দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

'আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—' আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে। নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।'

PATHAGAR.NET

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, 'থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।'

মার্জার বলিল, 'না হইল তো আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?'

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।' বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, 'আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?'

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, 'সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।'

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, 'চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।'

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, 'এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।'

মার্জার বলিল, 'আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।'

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

PATHAGAR.NET

নাক-কাটা বঙ্ক

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)

হরিভদ্দর খুড়োর কথামত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে গেলুম। বেহারিবাবু উকিলের বাড়ির হেড কেরাণী—আপনার বুদ্ধি কৌশলবলেই বাড়ি-ঘর-দোর ও বিষয়-আশ্রয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘাঁতে ঘোঁতে ফেরেন—যে রকম হোক কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারিবাবু ছেলেবেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলতি হয়। একদিন মামার বাড়ি খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভিতরে পড়ে যান,—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে 'নাক্‌কাটা বঙ্কবেহারি' বলেই তাঁরে ডাকতো; শেষে উকীল-বাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারিবাবুরা তিন ভাই, তিনি মাধ্যম; তাঁর দাদা সেলারদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভায়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারী বটে! সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাকবে, বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারিবাবু সিমলের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠলেন। হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে, লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝতে পারেন; (বিশেষত আমাদের মধ্যে কোনো দুই একজন বঙ্কবেহারিবাবুর অবস্থার লোক না হবেন)। ক্রমে বঙ্কবেহারিবাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত সকলেই আইনবাজ হয়ে থাকে; সুতরাং বঙ্কবেহারিবাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন, তা পূর্বেই জানা গিয়েছিলো। আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিমে, ইকুটীর খোচ ও কমনলার প্যাঁচে—বঙ্কবেহারিবাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন! ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হত; তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন; এমনকি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পর বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই। রাস্তা হতে একজন ঝাঁকামুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই, তাতে গাড়ির চেয়েও কিছু বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু ঝাঁকামুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায়

PATHAGAR.NET

আরাম আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময় ঘটে না। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় একবার সোয়ার হন, তা হলে জন্মে আর গাড়ি-পাল্কী চড়তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন স্প্রীংওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়িতে আরো অনেকগুলো ভদ্রলোককে দেখতে পেলেম, তাঁরাও 'সোনা করার' বুজরুকি দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হল। সেই ঘরটি বঙ্কুবাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুধু পায়েই ঢুকলেম। ঘরটি চারকোণা সমান; মধ্যে সন্ন্যাসী বাঘছাল বিছিয়ে বসেছেন; সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামনে শোভা পাচ্চেন; পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মালসা। সন্ন্যাসীর পেছন দু'জন চেলা বসে গাঁজা খাচ্ছে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামান্‌দিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোনা তৈরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে, সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন; অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মতো গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সার দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য। এই কন্ধকাটা। এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—শেতলা। ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে দেয়। সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা-সজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দু-সন্তান মাত্রকেই শেওরাতে হয়েছিল! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অন্যনগতি জেনে ভক্তি করেছে, আজ তার পৌত্তর সেই পাথরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না। রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম নাই। যার দাস হয়ে একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আশ্চর্য কি! কোন্ ধর্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পূর্বে যার ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরের ঈশ্বর বলে পূজা করে গেচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টাখানেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে, যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হল, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্বুদ্ধির কর্ম! ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোছলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল

PATHAGAR.NET

যেখানে যে ধর্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্তন হচ্চে, ধর্ম, সমাজ, রীতি ও নিয়মও এড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের শরীর নির্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যেরা সেটি অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'আকাশকুসুমের' দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং একদিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকতে পারি।

সন্ন্যাসী অমাদের বসতে বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময়ে বঙ্কবেহারিবাবু এসে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারিবাবু মাথায় একটি জরীর কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, 'বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর

চিরজীবী হয়ে' পেড়ে শান্তিপুরের ধুতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, আর হাতে একখানি লাল রঙের রুমাল ছিল—তাতে রিংসমেত গুটিকতক চাবি ঝুলছিল।

বঙ্কবেহারিবাবু ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেকহ্যান্ড চুকলে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দীতে বুঝিয়ে বল্লেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকি ও ক্যারামত দেখতে এসেছেন; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটি জাহীর করেন, তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজি হলেন। ক্রমে বুজরুকির উপক্রমণিকা আরম্ভ হল, বঙ্কবেহারিবাবু প্রোগ্রাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে প্রথমে ঘটের উপর থেকে একটি জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কটো ব্যাঙের মতো থপাস্ করে লাফিয়ে উঠলো, সন্ন্যাসী তার দু'হাত তফাতে বসে রয়েছেন—এ দেখলে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়। সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন, সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুখখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠতে লাগলো। এমন সময় একজন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুধ হয়ে যাবে। পাছে ডবল বোতল বা অন্য জিনিস বলে দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একখানি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদয় মদটুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে তর্‌র্ হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হল, এ মদ বটে।

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁতকে উঠলো, বুড়োদের বুক গুড় গুড় করতে লাগলো, একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?' সন্ন্যাসী, 'দুধ হো বেটা!' বলে তাতে এক কুশী জল ফেলবামাত্র সরার মদ দুধের মতো সাদা হয়ে গেল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম। এইরকম নানা প্রকার বুজরুকি ও কার্দানী প্রকাশ হতে হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল; সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মতো বেদব্যাসের বিশ্রাম হল; আমরা রামরকমের একটা প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম। একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকামুটেটি যে রাতকাণা, তা পূর্বে বলে নাই; সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে আধ ক্রোশ পথ উজোন ঠেলে তাতে কাঠের দোকানে পৌঁছে রেখে, তবে বাড়ি যাই। দুঃখের বিষয়, আবার সে রাত্রে বেড়ালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল; দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে। সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভম্ব হয়ে, সে রাত্রি অতিবাহিত করি!

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি, 'দশ দিন চোরের এক দিন সেধের'। ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা অন্দোলন কত্তে লাগলেন, শেষে একদিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলেম।

পূর্বদিনের মতো জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময় মেডিকেল

PATHAGAR.NET

কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসের একজন বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন। শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি ঘোড়ার বালুঞ্চি দিয়ে, তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।

সংসারের গতি এই! একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র বেরুলে, ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে। বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই, সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া তুবড়ি খানাতল্লাসী কত্তে লাগলেন; একজন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোণ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দেন, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেজে নয়) পুঁতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই; পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিল—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই অনুসন্ধানে বেরুলো; সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুধ করেছিলেন, সেদিন তারও জাঁক ভেঙ্গে গেল, সেই মজলিসের একজন সব অ্যাসিস্টান্ট সার্জ্জন বল্লেন যে, আমেরিকান (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুধের মতো হয়ে যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবেহারিবাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করেন। আমরা রৈ রৈ শব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রি করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেইদিন থেকে এইরকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের উপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশ আধগুণও নাই। আমরা শহরে কদিন কটা ঊর্দ্ধবাহু, কটা অবধূত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চরীরও লাঘব হয়ে আসচে; ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন ভিন্ন কোনো ব্যবসায়ী স্থায়ী হয় না; সুতরাং উৎসাহদাতা-বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুসঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে। কিন্তু কল্‌কেতা শহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়েসী চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে সহস্র সৎকার্য পায়ের নীচে ফেলে তার জন্যই শশব্যস্ত! একজনেরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল; একদিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে, 'মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ!' সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা শহরকে 'রত্নগর্ভা' বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কাতার কি বড় মানুষ, কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

PATHAGAR.NET

নয়নচাঁদের ব্যবসা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

আঠারো

নয়নচাঁদের বাড়ি ফরাশডাঙা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই। তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নয়ন! আজকাল তোমার কিছু সুখ সওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর তোমার সে সোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চাট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে। শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়েছে, গায়ে তোমার তেল মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ নাকি?'

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন, 'সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বলো দেখি নয়ন? গুলিরেখার বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ন। কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বলো।'

PATHAGAR.NET

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে বাজখাঁই স্বরে বলিলেন, 'আড্ডাধারী মহাশয়। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?'

গগন বলিলেন, 'ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কাকে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে ফট করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ন! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড্ খারাপ হইয়া গিয়াছে।'

নয়ন উত্তর করিলেন, 'চটো কেন ছাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মনে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয়তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভালো। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতি গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু-পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না, আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।'

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল এ

[illegible] শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়োই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিল, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন, 'আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করো, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী; আর কি নাম করিতে বাকি রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?'

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'আর কি বাকি আছে? বাকি আর কিছুই নাই। সেই যে ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন, "ওরে আটকুঁড়ের বেটারা। যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?" ছেলেরা কেবল সতেরো পর্যন্ত বলিয়াছিলেন; তা নয়ন তুমি সতেরো ছাড়িয়া উনিশ পর্যন্ত উঠিয়াছ; বাকি আর কিছু রাখো নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতেরো আঠারোর মানে কি?'

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন, 'এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি আঠারো বলিলে ক্ষেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া ক্ষেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল যা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুঁড়িয়া সেই ব্রাহ্মণ-দেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলেদের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মতো চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়োই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপে উগ্রশর্মা মূর্তি। অনেক করিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'ভাই। এ পুকুরপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে?' এ কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক দুই ৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭।—এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতেরো বলিল আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'তবে রে আটকুঁড়োর বেটারা! আর বাকি রইল কি? যদি সতেরো পর্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে দিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ন! তুমি আমাদিগকে খ্রীষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে,

PATHAGAR.NET

বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ বিশ পর্যন্ত হইয়া গেল।'

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন, 'না না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।'

PATHAGAR.NET

দ্বিতীয় পর্ব

কপাৎ

নয়ন বলিলেন, 'মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও আমিও তাই। মুসলমান হও আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?'

সকলেই বলিলেন, 'ঠিক! ঠিক! নয়ন বলিতেছে ভালো। আমাদেরও ঐ মত।'

নয়ন বলিলেন, 'আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়েছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মতো এখন আর হাবড় হাটি ব্রাহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটি দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই-চারিটি মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে

হইবে। পূজা দিতে হয় সেই দুই-চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকুন। ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।'

সকলেই বলিলেন, 'ঠিক! ঠিক কথা! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল-কলা যোগায় কে হে বাপু! পূজা না পাইলে মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকে, থাক। বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ সেটি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু'-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।'

নয়ন বলিলেন, 'আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কটিগঙ্গা আর এক হইলেন ফণীমনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।'

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটিতে কথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন, 'হে মা কটিগঙ্গা, হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।'

নয়ন পুনরায় বলিলেন, 'কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব তাই মনে করিয়া সেটি বাকি রাখিয়াছি। সে দেবতাটি মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ সম্পত্তি আর আমার ঐশ্বর্য। সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!'

সকলেই বলিলেন, 'সাবধান কাঁচা খাওয়া দেবতা!'

নয়ন বলিলেন, 'এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মানিকপীর নয়। এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্যন্ত মা-র নাম বাহির হইয়াছে। মা-র বরে আমার সব।'

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সেই কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিয়া হইল ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে সোলা ফেলিয়া সেই সোলাটি চুষিয়া চাট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ-রসগোল্লা কি করিয়া হইল ভাই?'

নয়ন বলিলেন, 'হাঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়াই বলি তা না হইলে নয়ন এই চুপ।'

এই কথা বলিয়া নয়ন কপাৎ করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

PATHAGAR.NET

তৃতীয় পর্ব
এই কিল তো এই কিল

নয়ন বলিতেছেন, 'এবার আমার বড়ই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনো দিন হয়, কোনো দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া এমন কিছু কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটু চাবড়া করিয়া লইলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানা টানা লম্বা লম্বা দুটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট-বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া একস্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল, বসন্ত রোগে তাহার ছেলে তিনটি মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়িওয়ালী ও আশেপাশের লোককে বলিলাম যে, মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভালো করিয়া মায়ের পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে, আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তাহার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে, 'মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনো ভয় নাই।'

পাড়ায় আমাদের বিলক্ষণ পসার-প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম থাকিতে থাকিতে দু'পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ারবক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টেকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশকর্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন—

PATHAGAR.NET

শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কালো বসন্তের পাল।
পাটা ছাড়া করে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাতাল মুখো বসন্ত বলে নিচে করে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥
হাড়ভাঙা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধরে খাই॥
শীতলা বলেন, আমি চাল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চাল পয়সা অনেক হবে পূজার বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার॥

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা। ধামা ধামা চাল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সার বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,—'নয়ন, হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।' আমি তাতে রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,—'গিন্নী! একবার বাহির হইতে দেখো দেখি বাপধন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপধন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?

কিন্তু দেখো লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদা চোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না সে কথা বলাবাহুল্য। সাদা চোখোদের মনটি সর্বদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণ করিয়া দিই। এই দেখো, ছিঁচকে চোর বলিয়া তাহারা আমাদের

PATHAGAR.NET

মিথ্যে অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক, কবে কার ছিঁচকে কোনো গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনি বলুন, ছিটের জন্য কবে কোনো গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বলো, বাটি চোর বলো, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচকে কে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা চোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্য কথা বলিতে শিখিবে না?'

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ। সাদা চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা চোখোদের ছাওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।'

নয়ন বলিলেন, 'আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগান করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয়তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পালা-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি তা নয়। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খইয়া তর হইয়া থাকিবে। মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর-দেবতা লইয়া তোমার বাড়িতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! একে কি ভালো কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ! ছিঃ!'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এইরূপ কোনো একটা মাতলের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?'

নয়ন উত্তর করিলেন, 'হাঁ ভাই। তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলাফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।'

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারটা কি বলো দেখি?'

নয়ন বলিলেন 'ভাই! একদিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ি? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়িতে গিয়া, মন্দিরাটি বাজাইয়া সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—'শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই'—আর মিনসে করিল কি জানো ভাই! এক কম্বল মুড়ি দিয়া, আঁ আঁ শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট আঁ আঁ শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চমকিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পালাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই!

PATHAGAR.NET

পলাইতে না পলাইতে বেটা ঠিক কেঁদো বাঘের মতো আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তারপর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল, তো এই কিল। এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জয়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন সে সখের প্রাণটি আজ হারাইলাম।

চতুর্থ পর্ব

বসিয়া আছে দুইটি ভূত

'যাহ্য হউক মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—'মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চাল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা করো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।'

গগন বলিলেন, 'ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সুবল ঘোষের কথা।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুবলের কি হইয়াছিল?'

গগন বলিলেন, 'দুধ বেচিয়া সুবলের পিসি কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসি মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুর গড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড়, এইসব দেখিয়া সুবলের মনে বড়ো আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে হাতে ক্রমাগত শাঁখ বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুরে শাঁখে ফুঁ দিলেন। কোঁত পড়িয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তারপর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় সুবল গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,

ধন চাই না মা! মান চাই না মা!
চাই না পুত্তুর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে
গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর।।

নয়নেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চাল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি জোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ন! ঠিক নয়?'

নয়ন বলিলেন, 'হ্যাঁ ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ-সাত দিন পরে আমার নামে একখানা চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল তার চিঠি। ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার

PATHAGAR.NET

এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড়ো বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোনো ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, 'যাও—ই—না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জানো না! মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুনে-হলুদে বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বলো, যাও—ই—না ছাই। এঁটেল মাটি দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটি দিয়া গড়িতে পারিব না!'

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটির ভিতর প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপু রে! বলিতে এখনও সর্বশরীর শিহরিয়া ওঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত।'

লম্বোদর বলিলেন, 'মাইরি!'

নয়ন বলিলেন, 'মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছে দুইটি ভূত।

সর্বশরীর ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটিতে পুঁতিয়া গেল। টাকরা পর্যন্ত ধূলি মারিয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভম্ব হইয়া আমি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুইজনের মধ্যে যিনি কর্তা ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড়সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের একপাশে বসিলাম।

কর্তা ভূত বলিলেন, 'আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিস্তিরজা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলা জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আটকে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটি ফিরিয়া লও, আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।'

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন, 'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভরে ইহার পূজা দিবে। ইহার দু'পয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

PATHAGAR.NET

কর্তা ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?' ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা ভূত হাসিয়া বলিলেন, 'না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে কথা সকল কথা শুন।'

আড্ড়াধারী মহাশয় ও লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন, 'নয়ন! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?'

নয়ন উত্তর করিলেন, 'বেঁধে মারে তো সয় ভালো। করি কি? ভূতেদের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না। কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে; এসো দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া হাত নিশপিশ করিতেছে, এসো ভাঙিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোনো বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভালো মানুষ ভূত। সেই কর্তা ভূতের এখন আশ্চর্য কাহিনী শুন।'

PATHAGAR.NET

পঞ্চম পর্ব

কর্তা ভূত বলিতেছেন

কর্তা ভূত বলিতেছেন, তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনো কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা; মরা শীতলা নয়। ভালো এঁটেল মাটি, ভালো সিন্দুর, ভালো রাংতা দিয়ে গড়া। বেলে মাটি নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাংতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা হইতে পায়ের কড়ে আঙুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড়ো ভালো নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকট মূর্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিট খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিট ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির

কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে, রোগের বেগতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনো একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম, সকলই করিয়াছি। ভালো কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম! গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তিরজা! আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়ে লও। এক ফোঁটা দুধ থাকতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা-র দুধ কাড়ে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া-দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্মসার হইয়াছিল। মর মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ির বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চন্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক বোম্বাই ওলের মতো

PATHAGAR.NET

হইয়াছিল। যমদূতের টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ি লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নেই। যমদূতেরা ফাঁপরে পড়িল। কি করিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পাটিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তাপোশের উপর, কখনও তক্তপোশের নিচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলাপিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীবন্ত অবস্থায় যে শরীর আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙুলের মতো। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের শান-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিনজন মাঠে-ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে, আমাকে বলিল—'খুব মজার লোক তো তুমি। এত লোককে আমরা লইয়া যাই—কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা ভালো, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়োই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞসা করি এই যে, এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে থাবড়া মারে?'

আমি উত্তর করিলাম, 'চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?'

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কি জন্যে? আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?'

আমি উত্তর করিলাম, 'তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। যেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।'

যমদূত বলিলেন, 'ওঃ বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।'

PATHAGAR.NET

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন, 'তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?'

আমি বলিলাম, 'জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইয়াছেন।'

যমদূত বলিলেন, 'হাঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।'

আমি বলিলাম, 'এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুরে যে রাঘব গাঙ্গুলীর।'

যমদূত বলিলেন, 'হ্যাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গঙ্গুলীর বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হইয়াছিল বলিবেন?'

যমদূত বলিলেন, 'বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মতো পেছলাপিছলি করো! সে জন্যে তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাহা হউক, শুন।'

ষষ্ঠ পর্ব

নেই-আঁকুড়ে দাদা

PATHAGAR.NET

যমদূত বলিতেছিলেন, নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ির নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলা গাছে দিব্য একখানি আঙট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কাল এই আঙট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে যাইলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে, বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল! অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গশ মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গশের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে, 'হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত?' যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাগী কি বলিতেছে?' আমরা বলিলাম, 'বিধবা বলিতেছে যে, যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত তাহা

হইলে দেখিতাম যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত।' যমের রাগ হইল। যম বলিলেন, 'নিয়ে আয় তো রে ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি, কি করিয়া সে আপনার বোনকে বাঁচায়?' নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহার কিছুই তিনি জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম, 'চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার কি সময় হইয়াছে?' আমরা বলিলাম, 'আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ি যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।' নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কথাটি কি? শুনিতে পাই না?' যমের বাড়ি গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছেন, আমরা সে-সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন, 'বটে! আচ্ছা, চলো যাই।' পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন, 'দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।' আবার খানিক দূর গিয়া,—'এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।' আবার খানিক দূর গিয়া,—'সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।' এইরূপ ইস্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন, 'নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙশ মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়াছি। কি করিয়া বোনকে বাঁচাইবি বাঁচা।' নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন, 'আমার পুণ্যের অর্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।' নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার জন্য যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ দিলেন। খাতাপত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন, 'শুন্‌লি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই। বোনকে তার আবার ভাগ দিবি কি?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন, 'পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।' যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম, 'হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে; এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।' যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন, 'আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না মানস করিয়াছিলেন?' যম বলিলেন, 'মানস করিয়াছিল।' নেই-

আঁকুড়ে বলিলেন, 'তবে?' যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনী করিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের ওপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব

এঁড়ে গরু

কর্তা ভূত অর্থাৎ মিত্তিরজা বলিতেছেন—যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতাপত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গশ, কাহারও হাতে সাঁড়াশি। আমার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতাপত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন, 'মহাশয়! ইহার পুণ্য কিছুই পাই না, সকলই পাপ! অতি অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মতো মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে একজন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণকে ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল, আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।'

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন, 'কেমন হে মিত্তিরজা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনিলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইন-কানুন তা তো আমি জানি না। আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোনটি চাই।'

যম উত্তর করিলেন, 'সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সেজন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে

PATHAGAR.NET

হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূতেরা তোমার মাথায় ডাঙ্গশ মারিবে। সাঁড়াশি দিয়া যমদূতেরা তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমতো তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চিৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নামমাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্বে সেই যে মর-মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে কেবলমাত্র একদিনের জন্য সেই পুণ্যটুকু ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গোরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। একদিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।'

আমি বলিলাম, 'পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।'

যম আজ্ঞা করিলেন, 'ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গোরুটা আন্ তো।'

এঁড়ে গোরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গোরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম সার এঁড়ে বাছুর নাই। আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না। যমপুরীতে অনেক খোল-ভুষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্যয় দুই শিং। দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটি চষিয়া ফেলিতেছে। কারে গুঁতোই, কারে মারি, সদাই এই মন। দুই দিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারিজন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন, 'মিত্তিরজা! এই তোমার সেই এঁড়ে গোরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গোরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।'

এঁড়ে গোরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, শিং নিচে করিয়া, এঁড়ে গোরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন হে এঁড়ে গোরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?'

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।'

আমি বলিলাম, 'এঁড়ে গোরু। তবে তুমি এক কাজ করো। তোমার একটি শিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি শিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকির পাক খাওয়াও।'

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, 'বাহবা! বাহবা! মিত্তিরজা! তুমি একজন লোক বটে। কিন্তু নয়ন, মিত্তিরজা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তিরজা যে শিং দিতে

PATHAGAR.NET

বলিবেন, মিত্তিরজা তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে শিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধহয় মিত্তিরজা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।'

নয়ন উত্তর করিলেন, 'আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডের কথাটি বলেন, তখন মিত্তিরজা ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক মিত্তিরজা ভূত কি বলিতেছেন তাহা শুন।'

মিত্তিরজা ভূত বলিয়াছিলেন, 'আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতাপত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? এঁড়ে গোরু নাছোড়বান্দা। যেখানে দৌড়িয়া পালান, শিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার সেই এঁড়ে গোরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব

মিত্তিরজার পুণ্য

PATHAGAR.NET

কর্তা ভূত বলিতেছেন, 'যমপুরীর ভিতর কোনো স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্ত ঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গোরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও এঁড়ে গোরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গোরু। ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদ্ঘর্ম মুমূর্ষু প্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গোরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। শিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে শিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহার আদ্যপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন, 'এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মানুষ নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মাত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকির হইয়া বেড়াইতে হইবে। চলো, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটির কাছে যাই।'

যম বলিলেন, 'দ্বারে সেই এঁড়ে গোরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের

সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তিরজাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।'

নারায়ণ বলিলেন, 'তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এসো। আমি এঁড়ে গোরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিবে না।'

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গোরু শিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গোরু বলিল, 'মহাশয়! আপনার বাটিতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে শিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তিরজা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।'

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন, 'এঁড়ে গোরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখো, আমার পশ্চাতে আসিতেছে। তাহাদিগকে শিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তিরজা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তিরজা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?'

এঁড়ে গোরু উত্তর করিল, 'মিত্তিরজা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তিরজা যদি পুনরায় বলেন না, ইহাদিগকে শিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।'

নারায়ণ বলিলেন, 'তবে আমার সঙ্গে এসো। সকলে চলো, মিত্তিরজার কাছে যাই।'

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গোরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত ; এইরূপে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গোরু দুই-চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তিরজা ভূত বলিলেন, 'আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি মিত্তিরজা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতকে হুকুম দিলাম, 'যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাস করে দাও।' যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ পাপী খালাস পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পুতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপীগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্তপদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি

বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া জোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল, 'ধন্য মিত্তিরজা। শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যম-যন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম যে আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।'

সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাপীগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গোরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিত্তিরজা! এ কি বলো দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদের উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তারপর, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?'

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'না মিত্তিরজা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠ চলো। এঁড়ে গোরুকে মানা করিয়া লও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনোরূপ অত্যাচার না করে।'

এঁড়ে গোরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গোরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠ চলিলাম। যাইবার পূর্বে জোড়হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠ চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক লোক দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁস করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতর যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?'

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম।'

নারায়ণ বলিলেন, 'ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারী জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও

করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু শীতলা কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়নচাঁদের শীতলাটি ফিরাইয়া দাও। আবার সকলকে গিয়া বলো, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।'

কি করিবে? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও। পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এই বলিয়া মিত্তিরজা ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব
পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা নয়ন। সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?'

নয়ন উত্তর করিলেন, 'হাঁ করিয়াছিলাম! শুনি যে সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্যে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তিরজা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।'

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহার পর কি হইল?'

নয়ন বলিলেন, 'শীতলাটি হতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মতো লম্বা হইল। তাহার পর হ্যায়ুই মতো একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।'

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহার পর তুমি কি করিলে?'

নয়ন বলিলেন, 'আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশগুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম এ পাস দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি চড়ানো বন্ধ করিয়া খই কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকাকড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটি কমিয়া গেল। সাহেবরা গনিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয় এসো, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।' সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন, 'হে মা কাটিভাঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।'

PATHAGAR.NET

বিলি ব্যবস্থা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর)

একদিন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরেই, এখন তো আর সে সাবেক শিবদুর্গা নাই, এখন সকলেই সভ্যভব্য হয়েছেন—চুলোর মুখে, সন্ধ্যেবেলায় সপরিবারে বসিয়া খোশগল্প হইতেছে। চুলোর মুখে বসা, সভ্যতার একটা বাঁধা ব্যবস্থা; বিলেতে সবাই বসে। শিব বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণ চরিত্র' পড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন, ক্ষণে বা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। দুর্গা শিবের একপাটি ছেঁড়া মোজার মুড়ি সেলাই করিতেছেন। 'গুরুমা' হার্মোনিয়ামে সুর দিয়া কাশ্মীরি খেমটা তালে তালে 'মনে করো শেষে রো সে দিনো ভয়ঙ্কর' ধরিয়াছেন। গণেশ একপাশে জয়ার গালের কাছে শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুস ফুসঃ করিয়া কি বল্‌তেছেন, আর জয়া মুখে রুমাল দিয়ে হাস্‌চে। কার্তিক যেন বিজয়ার সঙ্গে একটু বেলেল্লাগিরি করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ফলে মজলিশ পুরা। সভা, নির্দোষ, গার্হস্থ্য আমোদ যেমন হইতে পারে, তাহাই হইতেছে।

এমন সময়ে দুর্গা হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলেন, 'নন্দী?'

দরজার বাহিরেই পর্দার ঠিক ওপিঠেই বসিয়া নন্দী কি একটা সেলাই করিতেছিল। তলবমাত্র প্রবেশ করিয়া মাথাটি নোয়াইয়া যোড় হাতে বলিল—'হুজুর।'

দুর্গা একটু হিন্দী করিয়া—কেন না, খানসামাদের কাছে বাঙ্গালা কথাটা সভ্যতার রীতিবিরুদ্ধ—নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হেঁ রে, এই সময় আমরা একবার বাঙ্গালায় যেতাম না?'

হিন্দী আমাদের আসে না, বাঙ্গালাতেই বলিয়া যাই।

'খোদাবন্দ! সে তো সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে, এখন নয়।'

দুর্গা বলিলেন, 'বহুৎ আচ্ছা।' নন্দী সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে গিয়া সূচ সূতা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিল।

শিব একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সে যে পূজার ছুটিতে।'

দুর্গা। তাই বটে, সময়টা আমার ঠিক মনে আসছিল না। বর্ষার কাছাকাছি, তাই মনে হচ্ছিল।

গুরুমা। পৌত্তলিক কাণ্ডে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। এবার কোনো মতেই যাওয়া হোতে পারে না।

দুর্গা। আমি প্রায় যাচ্ছি!

গণেশ। আমার তো যাবার ইচ্ছা থাকলেও ফুরসৎ নেই। সেই সময়েই আমাদের সোশ্যাল কনফারেন্স বোসবে।

কার্তিক। আমি ত টেঁক্যে রেখেছি, কুকেরা অর্থদক্ষ হিন্দু টুরিষ্ট পার্টি অর্গেনাইজ কোচ্চে, আমি এবার ছুটিতে বিলেত ঘুরে আসব।

শিব। ভাল কথা, তোমাদের কনফারেন্সে সহবাসের বয়স কি কোচ্চো বলো দেখি?

গণেশ। আমি তো বোধ করি যে, নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে সহবাসের সম্মতি দিতে পার্বো না, এই নিয়ম হওয়া উচিত। বারো চোদ্দ কি ষোল বছরেও আমি নিরাপদ মনে করি না। তবে কি না ভোটের কাজ, ভোট যা হবে, তাই তো হবে।

শিব। তুমিই তো গণপতি হে। তোমার দলেই তো যারা মানুষের মতন, তারা সকলেই আছে?

গুরুমা। লেডীদের সামনে, নয় ও কথাটা এখন নাই হল।

ঝাঁ করিয়া অমনিই গল্পটা ফিরিয়া গেল। আবার পূজার কথা; পূজার কথা হইতে পথের কথা, যাতায়াতের অসুবিধার কথা, আলোচালের নৈবেদ্যের কথা,—নানান কথা আরম্ভ হয়ে গেল। স্থির হইল যে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যাওয়া হইতেই পারে না। কার্তিক মাসেই যাওয়াই স্থির।

শিব এখন যে সওদাগর হইয়াছেন, সে কথাটা পূর্বে বলা হয় নাই। বড় গোছের

PATHAGAR.NET

একটা ডিস্‌পেন্সারি করিয়াই শিবের কিছু সংস্থান হইয়াছে, ব্যবসাবুদ্ধিটাও খুব পাকিয়া উঠিয়াছে। শিব প্রস্তাব করিলেন যে, বুড়া ষাঁড়ে তো কোনো কাজ হয় না, ওটাকে কসাইদের কাছে বেচিলে হয় না? দুর্গার তাহাতে আপত্তি নাই, তিনি এখন পাকা গৃহিণী। সিংহটা এখন কোথাও বিক্রি হয় কি না তাই ভাবিতে লাগিলেন। কার্তিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের ঘরে ঘরেই একটা 'জু' হইতে পারে,—এত জানোয়ার আমাদের আছে।'

কথোপকথন এইরূপ হইতেছে, ষাঁড়টা, কুঠির হাতাতেই চরিয়া বেড়াইতেছিল, পরামর্শটা শুনিতে পাইল। তবু শিবের ষাঁড়, বুদ্ধিশুদ্ধি এক রকম আছে। রাত্রিটা কোনো রকমে কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই মিউনিসিপাল অফিসে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গেই ময়লার গাড়িতে অনররী বাহাল্ হইয়া গেল। ষাঁড় ঠিক ঠাওরাইয়াছিল যে, এক তো অনররী পদটা ভাল, তা যাই কেন হউক না। তাহার উপর নির্বাচনী প্রণালী যখন প্রচলিত আছে, কালে মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান হইয়া অনররী রাজাগিরির ভরসা পর্যন্ত থাকিতে পারে। শিবের পাল্লায় থেকে শেষে কসাইয়ের হাতে প্রাণটা কেন যায়?

ষাঁড় তো সটান সটকান দিল। সিংহও বুঝিল বেগতিক, সেও প্রস্থান করিল। কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে মহিষাসুরের কাছে গিয়া উপস্থিত।

সিংহকে দেখিয়াই তো মহিষাসুরের চক্ষুস্থির। ভাবিল—'বেটা এবার এত সকাল সকল ধোর্তে এল কেন?'

মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মহিষাসুর সিংহকে সমাদরপূর্বক বসিতে দিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর মহিষ বলিল—'দেখুন সিংহ মশাই! অনেকদিন থেকে একটা কথা আপনাকে বোলবো বোলবো মনে করি, তা বলার সুযোগটা হৈয়েই ওঠে না।'

সিংহ অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'হান্‌কি! বলই না!'

মহিষ। বলি, তাই বোলচি যে আপনার তো দেখা পাবার যো নাই। যা দেখা পুজোর কটা দিন।

সিংহ। তা বৈ কি? ফুরসৎ তো নেই।

মহিষ। আপনারা বড় লোক, বড় লোকের কাছে থাকা। আপনাদের কি ফুরসৎ হয়? তা সে পুজোর কদিনও না-দেখারই মধ্যে। আমায় কামড়ে আপনারও সে কদিন মুখ জোড়া থাকে, আর আমার তো কথাই নেই।

সিংহ। তা বটে হে। তোমার তো অসুখ বটেই, আমারও তো সুখ নেই।

মহিষ। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অসুখ! অসুখ যা তা আপনারই। দেখুন কত নৈবিদ্দি, ভোগ-রাগ, লুচি, সন্দেশ, পাঁটা, মোষ,—তা আপনার তো কিছু করবার যো নেই। সেই আমার হাতে কামড় মেরেই মুখ জুড়ে বসে থাকতে হয়,

গিলতেও পান না, ওগ্‌লাতেও পান না। সত্যি বলছি সিংহমশাই আপনার জন্যে আমার কান্না পায়।

সিংহ। হ্যাঁ হে, তুমি তো বড় ভাল লোক দেখচি। এমনতরো লোক তুমি জানলে যে তোমার একটা—তা আমায় দিয়ে তোমার কি উপকার হোতে পারে বল দেখি?

মহিষ। দেখুন দেখি আপনি মনে কল্লে কি না হোতে পারে? আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্বত।

সিংহ। বলই না, কি কত্তে হবে? তাই করা যাবে এখন।

মহিষ। তা কি কর্বেন?

সিংহ। কর্বো না কেন? বলো।

মহিষ। বোল্‌চি কি, আপনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন।

সিংহ। তা কেমন করে হোতে পারে?

মহিষ। আজ্ঞে আমিও তো তাই বোলছিলাম, তা কেমন কোরে হবে? তা হবে না কেন, হয়; আপনি মনে কোল্লেই হয়।

সিংহ। মনের কথাটাই ছাই ভেঙে বলো না?

মহিষ। বোল্‌ছিলাম কি, বলি, ওদের কাকেও না যেতে দিয়ে আপনি আর আমি পুজোর বাড়িতে যাই, সে কেমন হয়?

সিংহ। তাঁরা তা শুন্‌বেন কেন?

মহিষ। তাঁদের শোনাশুনির ভার আমার। আপনি রাজি হলেই হোলো।

সিংহ দেখিল শাপে বর। পরামর্শটা সর্বাংশে ভাল। আরও একটু সুবিধার চেষ্টায় বলিল, 'ভাল আমি যদি রাজি হই, পুজোর ব্যাপারটা কি রকম হবে?'

মহিষ। পুজো যা হবে, তো আপনারই ; আমি বোসে বোসে আপনার লেজে তেল দিতে থাক্‌ব তখন। ভোগ রাগ নৈবিদ্দি যা হয়, সবই আপনার, প্রসাদটা আস্‌টা দেন ভালই, না দেন, নেই। পুজোর কদিন কামড় খোস্‌বে, সেই যে আমার পরম লাভ। আর আবার অমনতরো কোরে আপনার কাছে ঘেঁসে বোস্‌তে পাবো, আমার মান বৃদ্ধি হবে কত!

সিংহ। ভাল, দুর্গাকে যেন মানালে। লক্ষ্মী সরস্বতী, তারা অন্য জায়গা দেখতে আসে, তারা ছাড়বে কেন?

মহিষ। আপনি মাত্রে রাজি থাকুন, ছাড়বে সবাই। আমার আসুরী বুদ্ধিখানাই দেখুন না। আপনি যেখানে সহায়, সেখানে আমি লাগ্‌লে লক্ষ্মীকেও ছাড়াবো, সরস্বতীকেও তাড়াবো। সব ভার আমায় দিন, আপনি কেবল যথাকালে অনুগ্রহ করে লেজটি দিবেন, আর কিছুই ভাবতে হবে না।

সিংহ বলিল—'তথাস্তু'। সন্ধি হইয়া গেল। সিংহের পোয়াবারো। ষোল আনাই লাভ। লেজে তেল দিতে পারিয়াই অসুর পরিতুষ্ট।

PATHAGAR.NET

দ্বন্দ্বে মাতরম্

অমৃতলাল বসু

স্বস্তি-বাচন

(ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে উপাসক-উপাসিকাগণ)

গীত

নারীগণ। তেত্রিশ কোটির ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেশ্বরী।
নারদ ঋষির মানস-কন্যা দন্তে লম্বোদরী।।
আত্ম-বন্ধু প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,
তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা করে দলাদলি,
মদ না খেয়ে পদের তরে ঢলাঢলি ঘরাঘরি।
পুরুষগণ। আমরা দলের পাণ্ডা, মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রতে
ডাণ্ডা ধরি।
কোথা-ও পাঠাই দৈত্য দানা
কোথা-ও পাঠাই পরী।।
নারীগণ। ভোটেতে যে একটি দিন ছোটোর বাড়ে গর্ব,
মুটের দোরে রাজা লুটে বলে আমি খর্ব,
বিলাত থেকে খেলাৎ বলে পর্ব এল শুভঙ্করী।
পুরুষগণ। ভোটে ইষ্ট নেতা তুষ্ট, দল পুষ্ট কষ্টে কাতরং।
দ্বন্দ্ব গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতরং'।।
সকলে। বরদে এ বিরোধে পরিয়েছ মা সাদা গরদ,
দ্বেষাদ্বেষীর নাম দে'ছ গো দেশের দরদ,
পূজে তোমার পদ, করে গুরুবধ,
নাম কিনেছি মস্ত মরদ্।
অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান,
গেছে হিন্দু-পরিচয়;—
অজাত বলিয়া বিখ্যাত জগতে
শুধু কুড়াইয়া ভোট হব সব লোট্
কোট বজায়ে বর ভিক্ষা করি;

PATHAGAR.NET

সুহৃদ-মর্দিনী বিরোধ-বর্দ্ধিনী,
ব্রিটিশ-তোষিণী দেবী ভয়ঙ্করী

বোধন

কলিকাতা। একটি বস্তী-পল্লী

[নিত্য প্রত্যক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই দৃশ্যে নাটোক্ত ব্যক্তি ব্যতিত অপর পাত্র-পাত্রীর পয়সা-গমন ও আঙ্গিক-ক্রিয়াদি দ্বারা যথার্থ সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত।]

(গোবরার মা ঘুঁটে গুনিয়া ঝুড়িতে ভরিতেছে)

গোব-মা। নাচ গণ্ডা-নাচ গণ্ডা-ছ'গণ্ডা, ছ'গণ্ডা-ছ'গণ্ডা—সাত গণ্ডা;—সাত গণ্ডা—আট গণ্ডা;—আট—আট—

(চমনিয়ার প্রবেশ)

চমনিয়া। এ গোবর-কি-মাতারি—এ গোবর-কি-মাতারি—

গোব-মা। এই ল'গণ্ডা;—ল'গণ্ডা ল'গণ্ডা—

চমনিয়া। আরে শুন্তি নেহি গোবর্‌কা মাতারি, টুঁড়াৎ টুঁড়াৎ—

PATHAGAR.NET

গোব-মা। আরে মর আঁটকুড়ী ভুলিয়ে দিলে, আট না ল'গণ্ডা—কি ছাই গুননু।

চমনিয়া। আরে কয়ঠো বাব্‌নে তুহার দর্ওয়াজা পর খাড়া হোকে তুকে বোনাতে।

গোব-মা। তোর সাতানির সাতপুরুষকে বন কেটে বাস এ পাড়ায়, কেউ কখন-ও কোনো কুচ্ছু কথা বলিতে পরে না; আমায় বাবুতে বোলাচ্ছে!

চমনিয়া। আরে চিড়তে হো কাহে মায়ী? গালি জিন্ দেও; ভালা ভালা বাবু হাওয়াগাড়িসে উতরকে খাড়ে হ্যায়।

(গোববার মা উঠিয়া কোমর বাঁধিয়া)

গোব-মা। তবে রে ছুঁচোর বেটী পাজিনি, আমাদের গয়লার বংশকে বাবু দেখাতে এয়েছিস্? আ মর খোট্টানি, তেড়ীওলাকী, ছোলা-ভাজানি, ছাতু কোটানী, তোর দর্জার হাওয়াগাড়ি দাঁড়াক, জুড়ী গাড়ি দাঁড়াক, ময়লাফেলা গাড়ি দাঁড়ক—

চমনিয়া। ভালা! বাঙালিন্‌কো ভালা বাৎ কহে তো চোটী বান্‌কে মার্‌নে ধাওয়ে! বাবালোক আয়ে ভোট মাঙনেকে লিয়ে, তুহার একঠো ভোট বাট্‌ন্—

গোব-মা। কি-হয়েছে?

চমনিয়া। আরে তুহার এক্‌ঠো ভোট আছো ভোটে আছো।

গোব-মা। আর মর মাগী! নগদ নগদ ট্যাকা দিয়ে কেনা আমার সব গরু-বাছুর, আর বলে কিনা আমার ঘরে ভোট আছে; যত চোরাই মালের আড্ডা তোর ওই ভূনোওলা মিন্‌সের ঘরে, আমি জানিনি বট!

চমনিয়া। চোরি কা বাৎ কোন্ কহল? গোয়ালকা লাইসেনী তুহার নাম্‌মো আছো? ন মেরি নামমে আছা?

গোব-মা। আমার গোয়ালের লাইসিনী আমার নামে থাক্‌বে না তো তোর শাউড়ীর নামে থাকবে?

(নীরদ ও ক্ষীরোদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে গোবরবাবুর মা এখানে!

গোব-মা। (মাথায় কাপড় টানিতে চেষ্টা করিয়া) ওমা! এ কারা গো! (প্রকাশ্যে) তা বাবা আছে কটা গরু বটে, লাইসিনী তে দিই; দুধে জল, তা বাবা এক গলা গঙ্গা দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি।

ক্ষীরোদ। না—না—নুঁ—ও দুধে জল-টলের জন্য আমরা আসিনি। এই খড়-খোলের বাজার চড়া, তা একটু আজ কলের জল যদি না দুধে দেবে তো চল্‌বে কেন? আমরা আসছি নির্বাণবাবুর তরফ থেকে।

গোব-মা। না বাবু না, নিবারণবাবু আমার দুধ বন্ধ করে দিয়েছেন।

নীরদ। তা দিন গে। তোমার ভোটটা কিন্তু তাঁকে দিতে হবে; আমরা এসে সঙ্গে করে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার সুখের শরীর, রিক্স চড়তে পারবে না, জুড়ি চাও, মোটের চাও, যা বল আনবো।

PATHAGAR.NET

গোব-মা। হ্যাঁ বাছারা, আমার কি বাগান যাবার বয়স আছে! ছিঃ আমায় ঠাট্টা করতে নেই।

ক্ষীরোদ। ঠাট্টা! সে কি? আপনার মুখ ঠিক আমার ন'পিসিমার মতন; তা পিসিমা গোবরবাবুর কাছেই আসতুম—,

গোব-মা। ও মা, গোব্‌রা অবার বাবু হল কবে গো? দুধের মস্ত টিনের ওই গুলো হয়েছে, সে গুলো বাঁকে করে বইতে পারে না তাই একখানা ভাঙাচোরা গাড়ি রেখেছে। তা'বলে বাবু-ফাবু বলে তাকে অপমান্যি করবেন না মশাই।

নীরদ। অপমান! আপনি বোধ হয় পরশুকার 'বুকের পাটা' পড়েননি? গোপ-মাহাত্ম্য বলে তা'তে একটা দেড় কলম আর্টিকেল বেরিয়েছে, গোবরবাবুর নাম তিন তিনবার উল্লেখ আছে, আমি নিজে লিখেছি। তা এই কথা রইলো আপনি তৈরি থাকবেন লাল নিশেন গাড়ি এইটে মনে রাখবেন। (চমনিয়ার প্রতি) মক্কা-পোড়ানি ভগ্নি! তোমার স্বামিকো—আদ্‌মিকো খসম্‌কো।

চমনিয়া। ও নীলবাবু পকাড় লে গিয়া। পাঁচ পাঁচ বাবু অ কর উন্‌কো লে গিয়া ; ও নীলবাবুকা ওয়াস্তে ভোটাইয়ে গা।

ক্ষীরোদ। তবে সর্বনাশ হোগা। শুনুন গোবরচন্দ্রবাবুর মা, আপনি নির্বাণবাবুকে ভোট দিলে দুধের লাইসেনী অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। ফুকো দেবার ব্যবস্থা—যা বেদে আছে, তা'জার্মাণী থেকে বই আনিয়ে প্রমাণ করে দেবেন আর কসাইকে গরু বেচ্‌লে যে তোমাদের গাল দেবে, তার মেয়াদ হবে।

চমনিয়া। আরে মেরি দেওর পান বেচ্‌তা উসকো চোর কহ্‌ল্‌।

PATHAGAR.NET

বিনি পয়সার ভোজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আপিসের বেশে অক্ষয়বাবু)

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনা-মূল্যে বিনা-মাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান আর লম্বা চওড়া কথা কন। মশাই, আজ বছরখানেক ধরে রোজ বলে 'আজ খাওয়াব' 'কাল খাওয়াব'—খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা হলে এত দিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত। যাহোক, আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে আছি। এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে, কী তোর নাম, ভূতো না মেধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু, তাই সই। তা ভালো, চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আসবে বলো দেখি।

কী বললি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন। বলিস কী রে! আজ তবে তো রীতিমত খানা। খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটন চপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষি কাঠির মতো চকচকে করে রেখে দেব। একট মুরগির কারি অবশ্যই থাকবে—কিন্তু কতক্ষণই বা থাকবে। আর দু' রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তাহলে চেঁচেপুঁচে চীনে বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে করে ডজন-দুত্তিন অয়স্টার প্যাটি আনে তাহলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধ হয় অয়স্টার প্যাটি আসবে। ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বলো দেখি।

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক দাও-না। অনেকক্ষণ ধরে বলছি, কিন্তু তোমার কোনো গা দেখছি নে।

তামাক বাইরে নেই। বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। এমন তো কখনো শুনিনি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়। আমি একটু আধটু আফিম খাই, তামাক না হলে তো আর বাঁচি নে। ওহে মেধো, না না, চন্দ্রকান্ত, কোনোমতে মালীদের কাছ থেকে হোক, এক ছিলিম জোগাড় করে দিতে পারো না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে। পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু, তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এসো।

এক পয়সায় তামাক হবে না। কেন হবে না? বাপু, আমাকে কি মুচিমোলার নবাব

PATHAGAR.NET

বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে? ষোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো-কলকেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে গেছেন নাকি! বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ ডিপজিট করে আসেননি কেন! ওরে বাস্ রে! এ তো ভাল জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও, এই ছটি পয়সা ট্রামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নিতে হবে।—এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা হলে এঁর ভদ্রাসন বাড়ি কিরকম হবে না জানি। কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর তো পারিনে—এই মাটিতে বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া
উপবেশন ও গুন্‌গুন্‌ স্বরে গান—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সার ভোজ।
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়েল ভোজ।
পরের তহবিল
ঢোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্য মুখে, কে কার রাখে খোঁজ!

কই রে? তামাক এল? ও কী-রে! শুধু কলকে! হুঁকো কই? এখানে ছ-পয়সার হুঁকো পাওয়া যায় না। কলকেটার দাম দু' আনা। হ্যাঁ—দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা বোকা নই। শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রন্‌চেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মতো রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধ হয় বেশিদিন বাইরে থাকতেও হবে না, কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে। (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা! এ কোথাকার তামাক? এ যে উইল করে টানতে হয়। এর-দু' টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভির্মি লাগে। কাজ নেই বাপু, থাক। বাবু আগে আসুন। কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে তো কোনোরকম তাড়া দেখছি নে। সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে। এদিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এমনি কোঁচায় আগুন ধরে যাবে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন, গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটু কাজ করতে পারো? বাগান থেকে চট করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পারো? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম। সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে। তা হোক-না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই। পয়সা তো আর নেই। তবে যাক, বাবু আসুন, তার পরে দেখা যাবে।—সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখানে কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না।

যাই হোক এখন উদয় এলে যে বাঁচি।

ঐ বুঝি আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি। আঃ বাঁচা গেল। ওহে উদয়, ওহে উদয়! কই না তো। তুমি কে হে?

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভাল করতেন। খিদেয় যে মারা গেলুম।

হোটেলের বাবু? কেরানিবাবু? কই, তার সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পারো? অয়স্টার প্যাটি?

পাঠাননি? বিল পাঠিয়েছেন? কৃতার্থ করছেন আর কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম। আরে, মাইরি না। কী গেরো, তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপু! আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি—তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভালো মুশকিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো! আমার নাম আমি জানি নে তুমি জানো! অত গোলে কাজ কী বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয়বাবু এখুনি আসবেন।

বিধাতা, সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিল? হোটেল থেকে ডিনার না এসে, বিল এসে উপস্থিত!

সখি, কী মোর করম ভেল!
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্র মন্থনে একজন পেলে সুধা, আর একজন পেলে বিষ। হোটেলে মন্থনেও কি একজন পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল? বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে। বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হবে?

তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে!

কী বললে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে?

তোমার তো বিবেচনা শক্তি বেশ দেখছি।

সত্যি নাকি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু? কপালে কি সাইন বোর্ড টাঙিয়ে রেখেছি? আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হোল না।

নাম বদলেছি? আচ্ছা বাপু। শরীরটা তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে, বলো দেখি।

PATHAGAR.NET

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখনি? আচ্ছা একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন বলে।

আরে মোলো! আবার কে আসে! মশায়ের কোত্থেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি? বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির। ভাড়াটা কত হিসেবে? মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়।

ঠাট্টা করছি নে মশায়—মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি। আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেননি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এরকম সামান্য ভুলে অনেক সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাড়িভাড়া আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন? মাপ করবেন, ঐটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি এইখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান। আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

PATHAGAR.NET

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ঐ-যে পায়ের শব্দ। ওহে উদয়, আমার অন্ধের নাড়ি, আমার সাগরসেঁচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পরম বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন—তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই, আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনোকালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কী? আচ্ছা মহাশয়, হরিবাবু-নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎই এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি?

কী! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনা স্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল,

কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে—আমি কারো কাছ থেকে কোনো গহনা আনিনি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন—গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার; ইস্টুপিড—ওরে, পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে—ওরে নরাধম। কুলাঙ্গার!

আরে না মশাই—আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল। কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলছেন এগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বলছেন। খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্য আমি মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনো রকম অসদ্ভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দু' বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের যে মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার! ফের! দেখো বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো, আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম। ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে। খালিপেটে খিদের উপর মারটা সয় না দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বসো। তোমাদের কার কত পাওনা আছে বলো। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে একপেট খিদে সুদ্ধ দৌড় মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তারপর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওনা নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু—এই নাও তোমার টাকা।

PATHAGAR.NET

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণে রেখো।

তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিও। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোল আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দেই নি তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাছেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর একটু না দেখে যেতে পারছি নে।

উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র। এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি-সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই যে, এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেনো, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন?

PATHAGAR.NET

বোধ হয় ফিরবেন না। এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক বড্ড খিদে পেয়েছে। এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট্‌ করে কিছু খাবার কিনে আন, তা হলে প্রাণ রক্ষা হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম করে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরী পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আসে।

কী হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে! কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেছে?

না। আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও। (আহার)

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা বলে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু এমন সুখ পাইনি। চন্দ্র তুমিই সুধাকর বটে, কিন্তু আজকের কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ভারও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি।

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না। তবে তো বড় বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম। কী করব! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না, ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ তোমাকেও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু যেরকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ্‌ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে—আগে থেকে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমার কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম, বহুকাল আমার খিদে থাকবে না। আরো কী চাও।

ও! বকশিশ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ঐ খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো আনা আমি গাড়ি ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তা হলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই। (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু! তোমার বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ'।

PATHAGAR.NET

কিন্তু এই যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়! একটা দামী জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামী জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ঐ চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যেরকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটি তো দিব্যি। তা হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র এত ব্যস্ত কেন!

পুলিশ? পুলিশ আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি? কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো, সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল? হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে। সবাই পালিয়েছে।

দেখো বাপু, গায়ে হাত দিও না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই।

উঃ। কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা ভালো লাগছে না।

পেয়াদা-বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায়, একটিও পয়সা নেই। দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এতবড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা যায়নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিলটনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্ করে এত বড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষ কালে যদি চেন-মেন ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী! এই সেই হ্যামিলটনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও,—নিয়ে যাও। কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টানো কেন? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পারো তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি—এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সার ভোজ।

PATHAGAR.NET

আমাদের সন্‌ডে সভা

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের Sunday (সন্‌ডে) সভার কয়েকজন প্রবল সাহিত্যিক সভ্য আছেন, তাঁরা সাহিত্য নিয়ে বহু অনর্থও ঘটান। যে-সব বিষয় চাগানো যায় না—সে সব তাঁরা অনায়াসেই বাগিয়ে থাকেন।

এই সাহিত্য-সভা প্রতি রবিবারে বিডন স্কোয়ারের সতীনাথের বৈঠকখানায় বসে। কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন বেদাগ কুলীন, উৎকট বর্ণাশ্রমী এবং স্কলার (Scholar)—বিদ্যা-ধুরন্ধর।

কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন কর্মকাণ্ডী লোক—অগ্নি-হোত্রী, তাঁর পেটে সর্বক্ষণই আগুন জ্বলছে। পত্নী বিনা এঁদের ধর্মকর্ম অচল, তাই বয়সটা তৃতীয়াশ্রমের দিন ঘেঁসে এলেও, তৃতীয় পক্ষে ফেঁসে গেছেন। তবে বুদ্ধিমানের সুবিধে এই—তাঁরা সব দিক বজায় রাখবার রাস্তা বানাতে পারেন। খুড়োও বিবাহ আর বাণপ্রস্থ কোনোটাই বেহাত হতে দেননি,—বিবাহটা বনগাঁয়ে করে শ্বশুরালয়ে বনং ব্রজেৎ হিসেবে বাস করছেন। সম্প্রতি পরিবারের অরুচিরোগ ধরায়, কলকাতায় বাসা নিতে হয়েছে,—কারণ এখানে অসময়ের জিনিসটিও মিলবে—ধানিলঙ্কার আচার, চন্দনের মোরব্বা, চরণামৃতের কুল্‌পী, মায় মহাপ্রসাদের চপ। এ ক্ষেত্রেও তিনি বাণপ্রস্থ বজায় রেখেছেন—হাতিবাগানেই থাকেন। শক্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারেন বলেই—তিনি Sunday সভার স্থায়ী সভাপতি। সতীনাথ আর ঘরজামাই বিলাসবন্ধু এই দুই সাহিত্যিক গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন, অধুনা নূতন plot (প্লট) পাচ্ছেন না—ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছেন, স্বস্তি নেই। গত সভায় তাঁরা সভার সাহায্য প্রার্থনা করে বলেন, plot (প্লট) পেলে তাঁরা চট্‌পূজার পূর্বেই সচিত্র, সুদৃশ্য বুকফাটা বই বাজারে হাজির করে সাহিত্য ভাণ্ডার ভরে দিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিক সফরীদের দৌরাত্ম্যে plot (প্লট) তলাতে পায় না।

খুড়ো সেবার দয়া করে পতিতাদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন; তাতে উপন্যাস বেশ ঘোরালো হয়ে আসছিল। এমন সময় দেখি, বছর না ঘুরতে হঠাৎ পতিতারা Promotion (প্রোমোশন্) পেয়ে কেউ পুলোমা কেউ লুক্রেশিয়া দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘরজামাই বললেন, 'সাহিত্যিকদের খরচের খাঁক্‌তিতেই খেয়েছে। Brother দের (ব্রাদারদের) দোষ দিতে পারি না—গবেষণার ল্যাবরেটারী তো সোজা নয়। যাক্ এখন আমাদের উপায় নিবেদন করুন—যত ব্যানার্জি মুখার্জি, ভট্টাচার্জিদের উৎপাতে এনার্জি (Energy) আর থাকছে না।'

PATHAGAR.NET

অন্যতম সভ্য মাষ্টার বললেন—'আমি বলি কি, তোমরা 'স্বরাজ' সাব্‌জেক্ট শুরু কর না তা হলে নতুন—

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বিরক্তভাবে বললেন, 'মাষ্টার থামো—মিছে Vex কোরো না, এ তোমার Alegebra নয় যে X লাগালেই ফতে। এসব কঠিন মনস্তত্ত্বের কথা।'

যাক্ প্রশ্নটা শেষে সভাপতি খুড়োর কাছেই পৌঁছে গেল। তিনি বললেন, 'পতিতা—সমস্যা এখনও যথোচিত ঘাঁটা হয়নি। তাঁদের সতীত্ব দেখবার সকল দিক এখনও ফুরিয়ে ফেলাও হয়নি। তবে ঐ যে স্বরাজের কথা বললে, ওতে আমি নারাজ; তার কারণ, আমাদের রাজের অভাব নেই, বরং 'স্বরাজ' হলে গড়বার পথ পাওয়া যায়। সিরাজ ছিলেন, ইংরেজ রয়েছেন, কবিরাজ বৃহুৎ, বাতরাজ গায়ে গায়ে, ধিরাজ, অধিরাজ, দেবরাজ, গন্ধরাজ, সরফরাজ, হংসরাজ, পশুরাজ এ সব আছেনই। পক্ষীরাজ যথেষ্ট, ভোজরাজ আছে বিস্তর। রাজের ফর্দ আমাদের দরাজ রয়েছে। এরওপর আবার স্বরাজ সামলায় কে বল!

'তবে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সাহিত্যক্ষেত্রটি ছোট নয়, এর দায়িত্ব বছর বছর বেড়ে চলেছে। মাসিকগুলির পাতা ওলটালেই পাত্তা পাবে, পতিতারা না ফুরাতে 'অন্ধেরা' দেখা দিয়েছে। এরা এতদিন পোলের মুখের আপ গির্জের ফটকেই থাকতো। মাসিকে ঢুকে মনুষ্যত্ব আর মনস্তত্ত্ব দুই বেশ ফলাও করবার field পেয়েছে। এখন অন্ধের জায়গায় 'খঞ্জ' খাড়া করে দেখ দিকি বাবাজীরা, ফলটা কেমন দাঁড়ায়! আমার বিশ্বাস—খঞ্জরা না দাঁড়াতে পারলেও ফলটা ভালই দাঁড়াবে। অন্ধদের হাত ধরে নে যেতে হয়। খঞ্জদের কাঁধে করতেই হবে, সুতরাং অন্ধর চেয়ে খঞ্জ উঁচু চলবেই। আমার দৃঢ় ধারণা—উতরে যাবে, আপ উপহারেই উঠে যাবে। 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' লিখতে ভুল না বাবাজি!

মাষ্টার বললেন, 'খঞ্জরা যদি দেড় মণের বেশি ভারি হয়—চাগাবে কে?'

বিলাসবন্ধু মুখভঙ্গী করে বললে, 'বোঝ না—সোজ না, রেমক্কা বাধা দিও না। চাগাবার জন্য তোমাকে তো কেউ ডাকতে যাবে না। যে চাগাবে, আর যারে চাগাবে, তাদের গড়ন তো আমাদের কলমের মুখে।'

কালাচাঁদ খুড়ো বললেন, 'থাক ও সব। তবে সত্যিই দুর্ভাবনার দিন এসেছে দেখছি। তোমাদের মান রাখতে আর মডেল্ বন্‌তে 'বৌদি'দের ছেলেপুলে মানুষ করা, রাঁধাবাড়া, সংসার ধর্ম ছাড়াতে হচ্ছে। খাঁটি দিশি মশলার মধ্যে ওই মাত্র ভরসা। আর যা চলছে তা চলে কেবল পাঠক-পাঠিকাদের গল্প না হলে চলে না বলে। তবে—মুড়ো মারবার জায়গাও জুটেছে মন্দ নয়—মুক্তিক্ষেত্রে কাশী! যা নিয়ে গিয়ে ফেলবো—একটা গতি হবেই। এখন ঘোমটা ঘসিয়ে পর্দা ফেঁড়ে ফর্দা ফিল্ড্ না বানাতে পারলে—আওতা কাটবে না বাবাজি! যাক্—ক্রমে হবে আপাতক উপোসটাকে উদ্দেশ্য করতে পারলে, লেখার কাজটা চলবে ভালো—এটা আমার

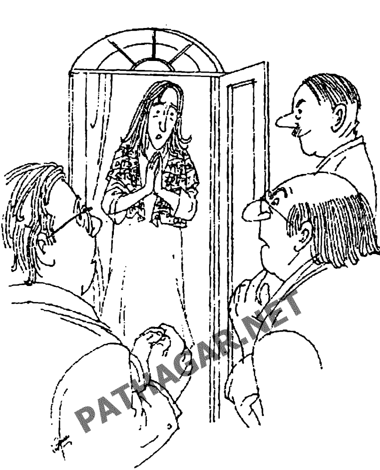

PATHAGAR.NET

পরীক্ষা করা আছে। পেটই নব নব ভাবে পৌঁছে দেবে; ভরা পেটের কাজ নয় বাবাজী! দেখে নিও—এখন হাজার কপি কাটতে পাবলিশারদের বাজার ধরবে না।'

মাষ্টার বলে উঠলেন, 'বিক্রিটাই কি তবে বই লেখার উদ্দেশ্য?'

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বেজায় চটে বললেন, 'নাঃ—তা কেন! ভিটেয় যে দেড়খানা ঘর এখনও ঝুঁকে আছে, তাদের কেতাব দিয়ে ঠেশে আ-কড়ি ভরাট করে রাখাই বই লেখার উদ্দেশ্য, কড়িতে আর বাঁশের চড়া দিতে হবে না। আর নিজেরা উঠোনে Openair-এ (খোলা হাওয়ায়) লাউমাচার নিচে দিব্যি আরামসে শোয়া!'

মাষ্টার চুপ করে থাকতে পারে না, সকল বিষয়েই তাঁর কিছু বলা অভ্যাস। তিনি দু'বার কেশে হাঁটা বাগাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে চৌকাঠে এক অদ্ভুত চেহারার আবির্ভাব হল।

বয়সটা হবে ২২।২৩, বড় বড় চুলগুলি রুক্ষ উসকো-খুসকো হলেও টেরি-টেড়া মারেনি! চোখে সোনার চশমা, পরনে হাঁটু-বহরের খদ্দর, আদুড় পা, গলায় অর্থাৎ বুকে পিঠে ট্যাড়চ্যা ধরনে—সাত রংয়ের সিল্কের চৌখুপি উত্তরীয়! কোন খোপে সোনার জলে লেখা—'পতিতার পরিণয়,' কোনো খোপে 'সতিসৌধ,' কোনোটায় 'ফুটপাথে পাওয়া', কোনোটায় 'ঘরে না পথে', 'নির্জলা প্রেম' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোকরা সবিনয়ে হাত জোড় করে বললে, 'আমি ভাগ্যহীন, পিতৃদায়-গ্রস্ত, তাঁর ঊর্দ্ধদৈহিক উপায়ার্থে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, সভ্য গররাজি ভায়া বললেন, 'যাঁরা মরতে হবে বলে একদিনও ভাবেননি আমাদের এখানে এমন বড় বড় রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর—সকালে, বিকালে, অকালে, রাত্রিকালে মরেছেন, তাঁদের যোগ্য, অযোগ্য, সুযোগ্য কোনো ছেলেকেই তো কিংখাপের কাছা চড়াতে দেখিনি। তুমি দেখছি তাদের উঁচিয়ে উঠেছ,—আবার সাহায্যভিক্ষা কি রকম?'

আগন্তুক ছোকরা বল্‌লে, 'সনাতন নিয়মমত আমি দ্বারস্থ হয়েছি, এই কথাটা জানিয়েছি—'

গররাজি ভায়া ছিলেন তিরিক্ষি মেজাজের সভ্য একটি জীবন্ত negative Plate (কানা গরু) তিনি বললেন 'ভাগ্যহীন অবস্থায় লোক আত্মীয়-স্বজন আর জাতি-কুটুম্বেরই দ্বারস্থ হয়।'

আগন্তুক বললে, 'আজ্ঞে বাঙ্গলা দেশের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে আমার আপনার জন—'

কালাচাঁদ খুড়ো চুপটি করে শুনেছিলেন; বললেন, 'উনি ভাগ্যহীন হলেও বাক্যহীন তো নন; আমাদের সাড়ে-তিন নম্বরের নিয়মটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবাজি! আগে পরিচয় নিয়ে তবে কথা কইবে, সময়টা সোজা নয়! শুনিয়ে দাও তো ছোকরা।'

আগন্তুক বল্‌লে, 'আমাদের বাস্তু ভিটে এই কলকাতাতেই। আমার নাম 'টল্প'। পিতার নাম 'গল্প'।

মাষ্টার চমকে উঠে বসলেন, 'অ্যাঁ—তিনি গত হলেন কবে? আ হাঃ—হাঃ! কি হয়েছিল?'

টল্প। আজ্ঞে বয়স হয়েছিল, তার ওপর ও-সব কড়া মশলা সইবে কেন! আগাগোড়া জোড়া দীর্ঘশ্বাস, চোখ পড়লেই প্রণয়, আবার সতীসাধ্বী—পতিতারা জুটলো। সইবে কেন? ছিল আমানি—খাওয়া ধাত, কিন্তু যখন তখন সব চা খাওয়াতে শুরু করালে। সেই যেটুকু ছিল, মোটরে ঘুরিয়েই ফুরিয়ে দিলে। এত উপদ্রব

এক জনের ওপর—গরীব দেশে গাড়ি-বারান্দা বানাতে আর এলবম্ গোছাতে গোছাতে একদম সাবাড়—'

মাষ্টার। আহা তাঁর একপ্রকার অপঘাতই হল।

আগন্তুক। আজ্ঞে, তা না তো আর কি! প্রমাণও তো পাচ্ছি। নইলে আজকাল মাসিক গল্প দেখলে মেয়ে-পুরুষ ভয় পাবেন কেন? অনেকেই বলেছেন, নামধাম বদলানো সেই এক মূর্তি, একই সুর। কারুর দেখা প্ল্যাটফরমে, কেউ দেখেছেন বোটানিকেলে, কেউ দ্বিতলের দক্ষিণ বাতায়নে, কেউ চলন্ত মোটরে, কেহ বা থিয়েটার কি বায়স্কোপের বাক্সে। বিভিন্ন পোশাকে সেই মূর্তি! ভূত না হলে একা এত জায়গায় কি কেউ একই সময়ে দেখা দিতে পারে, না কেউ দেখতে পায়!

মাষ্টার। তা তো বটেই, তা হলে গল্পের গয়া—

আগন্তুক। আজ্ঞে, তাই তো শেষ দাঁড়ালো—

অন্য সভ্য বেকার বেণী সরকার বল্লেন, 'এটা কি আগে বুঝতে পারনি, বাবাজি!'

টল্প। ও বয়েসে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে খুব ঝোঁকটা পড়েছিল বটে। ভেতরটা যত খেলো মারছিল, ওপরটায় ততই কিংখাপ চড়াচ্ছিলেন। তাতে বাবা বেগড়াচ্ছেন বলে একটু সন্দেহ যে আসেনি তা নয়। তবে বাহ্য সম্ভ্রম টাকাটা বেশ টানতে লাগলেন দেখে চোখ বুজেই ছিলুম।'

মাষ্টার একটা বড়-কিছু বলবার ফাঁক খুঁজছিলেন। চট গলা বাড়িয়ে শুরু করলেন, এতে তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়, Moral একটু বেগড়ায় বটে। ইংলন্ডের একজন নামজাদা author (লেখক) বলেন, 'A theif in fustain is Vulgar Character, searcely be thought of by persons of refinement, but dress him in green velvet with a high-crowned hat * * * and you shall find in him the very soul of poetry and adventure.'

টল্প। উত্তম কয়েছেন, কিন্তু বেশি দিন চলে না। তা ললাটলিপি হঠাৎ মলাট ফুঁড়ে দেখা দিলে। আমি কাঁদতে লাগলুম। বাবা বললেন, 'আজ কাঁদছিস কি, মরেছি কি আমি আজ! কেবল ভূত হয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এই মহালয়ায় শ্রদ্ধাটা সেরে গয়ায় যা, রেলে Concession (কন্সেসন) পাবি!'

বললুম—'তা হলে যে গল্পের দফা গয়া হয়ে যাবে!'

বাবা বললেন, 'তা কি হয় রে পাগল, কারবার যেমন চলছিল তেমনই চলবে। লোকে চাইবে গল্প মালে মিলবে টল্প। এই যা। বিষের ব্যবসাও চলে রে!'

সতীনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—'আচ্ছা, এর সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক নেই তো?'

ঘরজামাই মুষড়ে আসছিল, উত্তরটা শোনবার জন্যে গলা বাড়ালে।

PATHAGAR.NET

টল্প বললে, 'বাবাই বলে গেলেন, দাদারও আর বেশি দিন নয়, তাঁকেও রোগে ধরেছে—বৈদ্যদের ব্যবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা যা আভাস দিচ্ছেন, তাতে বুঝতে হয়—তিনি শ্বাস টানছেন; টুপন্যাস বাবাজিই তাঁর কাজ চালাচ্ছে। দাদাকে বিলিতি রোগে ধরেছে—'

'যাক্ আমার যে কাজের জন্যে আসা—বাঙ্গালা দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলেই বাবাকে চাইতেন, এই ভাগ্যহীনও যেন আপনাদের সেই ভালবাসা হতে বঞ্চিত না হয় এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি অনেক রকম দেখাবো।—'

'আমার দ্বিতীয় আর অদ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, শ্রাদ্ধদিবসে আপনারা নিজে নিজের ম্যানস্ক্রিপ্ট (পাণ্ডুলিপি) নিয়ে মদীয় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে—পিতার প্রেতত্ব মোচনকল্পে সেই সব বিরাট পাঠ করেন। এইটি আমার একান্ত অনুরোধ। তা হলেই তাঁর দ্রুত ঊর্দ্ধগতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ—বাঙ্গালার বিখ্যাত রোজা গঙ্গা ময়রা বলে গেছেন—যে কোনো ভূত তাড়াবার অমন অমোঘ উপায় আর নাই। খসড়ার তাড়া দেখলে আর তা শুনলে এমন জবর ভূত জন্মাননি যিনি ছুটে পালান না।'

ঘরজামাই একটু সুর নামিয়ে বললেন, 'সেখানে তোমার টুপন্যাস ভায়ার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে তো? তাঁর সঙ্গে অনেক কাজের কথা আছে।'

টল্প বললে, 'উত্তম কথা, আমি নিজেই introduce (পরিচয়) করে দেব, ভারী আনন্দ হবে—তিনি আবার থাকবেন না! ওঃ এমন ওমন প্লট শোনাবেন, তাক্ হয়ে থাকবেন। আজ সকালে মুরারীবাবু এসেছিলেন, প্লট প্লট করে পাগল। প্লট তো বলে দিলেনই আবার উপন্যাসের নাম রাখতে বললেন, 'হাওদা।' আহা যেমন Sweet (মধুর), তেমনিই শ্রুতিসুখকর। নামেই লেখক উদ্ধার হয়ে যায়।'

ঘরজামাই বলে উঠলেন, উঃ এমন নামটা হাতছাড়া হয়ে গেল! ও রকম আরও অনেক আছে বোধ হয়?'

'ঢের—'

'তবে জেনেই রাখ আমি আর সতীনাথ তো যাবই—'

'শুনে বড় খুশি হলুম। যাবেন বই কি'—

খুড়ো ধীরভাবে বললেন, 'বৃষোৎসর্গ-টর্গ নেই তো?'

'স্থানাভাব বলে সে সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েছি—'

খুড়ো তখন ঢালাও ভাবে বললেন, 'তা হলে Sunday (সান্‌ডে) সভ্যরা নির্ভয়ে যেতে পারে এবং যাবেও।'

টল্প খুশি হয়ে গেল! সেদিনকার সভাও ভঙ্গ হল।

PATHAGAR.NET

আমরা ও তোমরা

প্রমথ চৌধুরী

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত তা হলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই, দুই হত না—এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ্ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রঙ কালো, তোমাদের রঙ সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখ, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

PATHAGAR.NET

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারী, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাত, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল—এত স্থূল যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য তোমাদের কাছে তা কল্পনা; আর তোমাদের কাছে যা সত্য আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর,

তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল, তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

৬

তোমাদের মেয়ে প্রায়-পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায়-মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহ-প্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

৭

তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ হয়, তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে।

৮

অর্থাৎ এক কথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পাও আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য।

তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ির বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতর। আমাদের গান আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়—তার শেষ নির্বাণ। পূর্বেই বলেছি প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক। আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো—শুধু তোমাদের ভালো আমাদের মন্দ ও আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে—তাও অসম্ভব।

PATHAGAR.NET

ক্যাবলের পত্র

সুকুমার রায়

শ্রীমান বাঞ্ছারাম উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোনো চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কিনা, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ বলে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে, ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের লোক। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্‌-ধাতুর তফাত, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। 'আমি আছি' এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে, সে আপনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয়। কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না, কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কর না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্ছ যে বিজ্ঞান, পলিটিক্‌স বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি-ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। 'উপসর্গস্য যোগেন' ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার উপর ওরা মোচড় দেয় কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া, অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এককথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটা হচ্ছে আর্ট অর্থাৎ ব্যর্গসঁ যাকে বলেছেন ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন।

PATHAGAR.NET

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাংলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোশখেয়ালের আস্ত একটি তোশাখানা। সকলেই জানি ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাত হচ্ছে আকারের তফাত। অর্থাৎ তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাকা মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণের ও আচরণে ফার্স্ট পারসন হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরমার্থতত্ত্বের কোনো অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনো রকম হীনতা নেই, কারণ আমি ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তম-পুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক কিউম্‌রে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরো বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টিছাড়া সেইটেকে

PATHAGAR.NET

সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোনো সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোনো বালাই নেই, কেননা, সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝাপড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম 'সাহিত্যের অনাসক্তি'। দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেননা, তাঁরা কেবল লেখাপড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি, অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশি কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে চালিয়ে অর্থাৎ একসারসাইজ করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু এ কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে তার গুরুত্ব থাকে না, কেননা তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেননা সে 'কিঞ্চিন্ন ভাষতে'। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেননা কথাটা সত্যি।

আমার একটা প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না, তাতে সাহিত্যের বিস্তার হতে পারে কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। 'পল্লী সাহিত্য' বলে একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনে আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল

PATHAGAR.NET

যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লীসাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল, কেননা, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাই বেশি।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে 'সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন' অর্থাৎ তাকে ঘন-ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠানো দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, 'আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।' প্রস্তাবের মাঝখানে 'আমি মনে করি' বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে এরকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থামতে চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে গ্রাম-ফেড করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা 'গ্রামার' নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যর্গসঁ বলেছেন, মানুষের হাত-পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজি পড়া মাথাকে বামলা সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যাহোক, প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কি না বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি 'সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।' বোঝা যে যায় না এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না, তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন, তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এ-বিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে, ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

PATHAGAR.NET

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালা জাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত এক জোড়া খড়ম পায়ে দিয়া নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ির বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, 'চতুরী, ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।'

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরী ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রুপোর গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়িটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশি নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই-একখানা এক্কা ঝম ঝম শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরিষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধ পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—'গুলাব-ছড়ি—'

গুলাবছড়ি—ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোকসহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি!
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ্ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ী!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, 'ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।'

PATHAGAR.NET

একথা শুনিবামাত্র ফেরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, 'গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, মোহন হালুয়া,—কি লইবে বলো?'

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশি পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাব-ছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া পূর্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে 'গুলাব-ছড়ি' হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, 'দেখো ভাইয়া, একটা হাঁথির তসবীর।'

রাম অওতার কাগজখানা হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বে যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—'বিবাহের বিজ্ঞাপন'।

বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল—

PATHAGAR.NET

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদার ঘাট
বেনারস সিটি

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা তো বড়ো মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম। 'প্রার্থনাসমাজী'র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে 'বরম্‌সমাজীরা' আছে—'প্রার্থনাসমাজী'রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং

গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, 'একটা কাজ করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ি যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন। তাহার পর সট্‌কাইলেও হইবে।'

সিদ্ধির নেশায় এই মজার মতলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনই লিখিতে হইবে। রাম অওতার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোশে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—'শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ।' তাহার পর মনে হইল, ইহারা 'প্রার্থনাসমাজের' লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে তো চটিয়া যাইতে পারে। তাহাকে তো নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে। সুতরাং আর একখানা কাগজে 'শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি' বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহার যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল যে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভালো করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া ওঠে।

PATHAGAR.NET

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদার ঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি মেঝেতে সতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছে। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গে দৃশ্যমান। এই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ির অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নইয়ালাল—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, 'চিঠি আসিয়াছে।'

PATHAGAR.NET

কাহ্নইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—'লাল মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদার ঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর তো দুই-তিন বছর হইল এ বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছে।'

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, 'লালা মুরলীধর তো নক্‌লৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।'

কাহ্নাইয়া বলিল, 'মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?'

মহাদেও বললি, 'আরে—কি সমাচার সে তো আগে দেখিতে হইবে। খোল, পড়্।'

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমতো পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস

করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফটোগ্রাফ থাকে তো পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

লালা রাম অওতার লাল
মহল্লা গোরাবাজার, শহর গাজীপুর

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, 'এ তো বড়ো তামাশা! সে মেয়ের তো কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।'

'বলিতেছে যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?'

মহাদেও বলিল, 'জানো না? লালী মুরলীধর আখবারে নুটিস ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে তো ভালো কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল!'

'আমি তো শুনিয়াছি, কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।'

'হাঁ, হাঁ,—কায়েথ বটে, কিন্তু বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিয়াছিল— কায়েথ বটে, বড়ো ঘরানাও বটে। নুটিস্ পাড়িয়া সে আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বারিস্টারী পাস করা জামাই পাইতেছি, তখন আর কাহাকেও দিব না। এ বাড়িতেই তো বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।'

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, 'ঠিক ঠিক!' কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ওই যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাফ পাঠাইতে, সে কি?'

মিশ্র বলিল, 'জানো না? ঐ যে তস্‌বীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তস্‌বীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাফ বলে।'

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, 'ও হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভালো শিকার জুটিয়াছে। উহাকে একটা চিঠি লিখিয়া আনানো হউক।'

মহাদেও মিশ্র বলিল, 'তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই-চার-দশ টাকা মিলিবে কিনা সন্দেহ।'

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, 'না, সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোনার ঘড়ি, চেন, আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকেও আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাফটার কি করি?'

মহাদেও বলিল, 'সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাফ বাজারে অনেক মিলিবে।

চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকানে আছে কিনা, সেখানে পার্সী থিয়েটার দলের অনেক খাপসুরৎ আউরতের তস্‌বীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।'

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়িতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিশে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ি সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানিতে অর্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধুমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আর আসিবার বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তাপোশের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরনে শাড়িখানি পরিহিত। বরম্‌সমাজীদের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপে ধরনেই শাড়ি পরিধান করে বটে—তাহাদের সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কী সুন্দর। রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—'বাহবা কি বাহবা। বাহ রে বাহ।'

PATHAGAR.NET

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছে। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ি বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদার ঘাটের বাড়িতে আসিবেন না। আমি স্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐদিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফটোগ্রাফিখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্ধোত্থিতভাবে শাড়িখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কী মজাদারই হইবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুইদিনে ভালো করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়িতে বলিল— 'একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।' বলিয়া, নিজের বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ ভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভালো রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরীর কাজ করা সুন্দর মখমলের টুপি লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙিন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভালো করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোনার ঘড়ি, সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরিয় পরিধান করিয়া, স্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়িতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকারে সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরেজি ধরণে একপ্রকার 'কোর্টশিপ' হয় তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে 'লাল-হীরকী কথা' 'লায়লা মজনু' 'গুল-ই-বকাওলী' প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানোই ভালো। প্রথমে আদরের 'তু' না বলিয়া সম্মানের 'আপ' বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনো সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই-চারিদিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জনে 'পিয়ারী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্যালোচনা ও ভবিষ্যসুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ি আসিয়া রাজঘাট স্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পাঞ্জাবী কামিজ আবীরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, 'আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?'

'হ্যাঁ, আপনার নাম কি?'

'কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।'—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। গাড়িতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল,

'জানলাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না, আমার এই পোশাকে আসিবার সময় দুষ্ট লোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।'

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন!' তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোশাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটি সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরনের হইবে। দেখিল, তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, 'চাচাজী, এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।' 'চাচাজী' আর কেহই নহেন—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, 'কিষুন,—তবে আমি বাড়ির ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইহাকে জলযোগ করাও।'

PATHAGAR.NET

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, 'আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড়ো ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মতো পানীয় আর নাই।'

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি আটটা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, 'আপনি গীতবাদ্য জানেন কি? আমাদের বাড়ির মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়।'

রাম অওতার বলিল, 'গীত? গীত?—জানি বৈকি। শুনিবে একটা?'

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চন্‌ চন্‌ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বালিয়ে উঠিয়াছে; বহুলোক যেন তাহাকে

চতুর্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গীত? শুনিবে একটা?'—বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

'বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।

গোকুল ঢুঁড়ি—'

বৃন্দাবন ঢুঁ—'

আর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, 'কি রে কাহ্নাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?'

কাহ্নাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, 'ধরিয়াছে বৈকি। যায় কোথা?'

মহাদেও বলিল, 'দেখ তো কি আছে?'

কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল।

মহাদেও টাকাগুলা গুনিতে গুনিতে বলিল, 'পোশাক খোল, দামী পোশাক।'

গুরুজীর আদেশমতো কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোশাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, 'না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপিন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।'

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল,— 'দে,—এই পয়সা কটা ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পর অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মানমন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভালো। নেশাও রাত্রি পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।'

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্বক সংসার বিবাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশত তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদাবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

PATHAGAR.NET

দক্ষিণ রায়

রাজশেখর বসু

চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন, 'বাঘের কথা যদি বল তো, রুদ্রপ্রয়াগের বাঘ। ইয়া কেঁদো কেঁদো। সোঁদরবন থেকে সেখানে গ্রীষ্মকালে হাওয়া বদলাতে যায়। কিন্তু এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে কাউকে কিছু বলে না, সব তীর্থ-যাত্রী কিনা। কেবল সায়েব ধরে ধরে খায়।'

বিনোদ উকিল বলিলেন, 'খাসা বাঘ তো। এখানে গোটাকতক আনা যায় না? চটপট স্বরাজ হয়ে যেত—স্বদেশী বোমা, চরকা, কাউন্সিল ভাঙা, কিছুই দরকার হত না।'

সন্ধ্যাবেলা বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তিনি নিবিষ্ট হইয়া একটি ইরাজি বই পড়িতেছেন How to be happy though married. তাঁর শালা নগেন এবং ভাগনে উদয়, এরাও আছে।

চাটুজ্যে হুঁকায় এক মিনিটব্যাপী একটি টান মারিয়া বলিলেন, 'তুমি কি মনে কর সে চেষ্টা হয়নি?'

—'হয়েছিল নাকি? কই রাউলাট-রিপোর্টে তো সে কথা কিছু লেখেনি।'

—'ভারী এক রিপোর্ট পড়েছ। আর গভরমেন্ট কি সবজান্তা? There are more things, কি বলে গিয়ে।'

—'ব্যাপারটা কি হয়েছিল খুলেই বলুন না।'

চাটুজ্যে ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন, 'হুঁ।'

নগেন বলিল—'বলুন না চাটুজ্যেমশায়।'

চাটুজ্যে উঠিয়া দরজা ও জানলায় উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তারপর যথা স্থানে আসিয়া পুনরায় বলিলেন, 'হুঁ।'

বিনোদ। দেখছিলেন কি?

চাটুজ্যে। দেখছিলুম হরেন ঘোষালটা আবার হঠাৎ এসে না পড়ে। পুলিশের গোয়েন্দা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

বংশলোচন বই রাখিয়া কহিলেন, 'ওসব ব্যাপার নাই বা আলোচনা করিলেন। হাকিমের বাড়ি ওরকম গল্প না হওয়াই ভাল।'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটা বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, যাক ও কথা। তারপর, উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?'

PATHAGAR.NET

বিনোদ উদয়কে বাধা দিয়ে বলিলেন, 'ব্যাপারটা শুনতেই বা দোষ কি। চলুন আমার বাসায়, সেখানে হাকিম নেই।'

বংশলোচন বলিলেন, 'আরে না না। এখানেই হোক। তবে চাটুজ্যেমশায়, বেশি সিডিশস কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।'

চাটুজ্যেমশাই বলিলেন—'মা ভৈঃ। আমি খুব বাদ-সাদ দিয়েই বলছি—বেশি দিনের কথা নয়, বকু দত্তর নাম শুনেছ বোধহয়, আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো—'

বিনোদ। বকুলাল দত্ত? কপালীটোলায় যার মস্ত বাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভাঙছে? তিনি তো মারা গেছেন, শুনেছি কাউনসিলে ঢুকতে পারেননি বলে মনের দুঃখে।

চাটুজ্যে। ছাই শুনেছ। বকুবাবু আছেন, তবে এখন চেনা দুষ্কর। এক আনা খরচ করলেই দেখে আসতে পার, কেবল রবিবার বিকেলে একটাকা।

বিনোদ। কি রকম?

চাটুজ্যে। বুদ্ধির দোষে বেচারা সব নষ্ট করলে—অমন মান, ঐশ্বর্য। বাবার কৃপায় হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বকুর মতিচ্ছন্ন হল।

বিনোদ। কোন্ বাবা?

চাটুজ্যে। বাবা দক্ষিণরায়।

উদয় বলিল—'আমার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণামোহন রায়।'

চাটুজ্যে। উদো, তুই হাসালি, হাসালি। পিসশ্বশুর নয় রে উদো—দেবতা, কাঁচা-খেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।

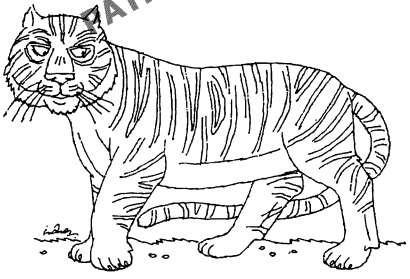

PATHAGAR.NET

চাটুজ্যে হাতজোড় করিয়া তিনবার কপালে ঠেকালেন। তারপর সুর করিয়া কহিতে লাগিলেন,

'নমামি দক্ষিশরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর,
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যতদূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পূবে বাকলা পরগণা—
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।
গোবাঘা শার্দূল চিতে লক্কর হুড়ার
গেছো-বাঘ কেলে-বাঘ আর
ডোরা-কাটা ফোঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—
তিনশ তেষট্টি ঘর প্রভুর জ্ঞাতি।
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,
যত প্রজা ভেট হয় মহিষ বরাহ।
ধূমধাম নৃত্যগীতে হয় সারা নিশি,
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশদিশি।
কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেওটতালে হালুম্ব রাগিণী।
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিশ রায়,
হরষিতে হঞা সবে কামড়িয়া খায়।
প্রভুর সেবায় হয়ে জীবহিংসা নিত্য,
পহরে পহরে তাঁর জ্বলে উঠে পিত্ত।
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জলদি,
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হল হলদি।
ছাগল শুয়োর গরু হিন্দু মুছলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি,
সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঁঞি।
দোহাই দক্ষিশরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাই যেন চরণের থাপা।'

বিনোদ বলিলেন, 'ও পাঁচালি কোত্থেকে পেলেন?'

চাটুজ্যে। রায়মঙ্গল। আমার পুঁথি আছে, তিনশো বছরের পুরনো। সেটা নেবার জন্য চিমেশ মিত্তির ঝুলোঝুলি। ছোকরা তাঁর ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভারসিটি থেকে

PATHAGAR.NET

ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড়শো অবধি দিতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়েসের একটা সম্বল হবে।

বিনোদ। যাক্, তারপর?

চাটুজ্যে। বকুবাবুর কথা বলছিলুম। পনের বৎসর পূর্বে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। পরিবার দেশে থাকত, তিনি কলকাতায় একটা মেসে থেকে রামজাদু অ্যাটর্নির অফিসে আশি টাকার মাইনের চাকরি করতেন। রামজাদুবাবু তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড, সেই সূত্রে চাকরি। তখন বকুবাবুর একটু হাতটান ছিল। বিপক্ষের ঘুষ খেয়ে একটা সমন ধরাতে দেরি করিয়ে দেন। রামজাদুবাবু কড়া লোক, ছেলেবেলার বন্ধু বলে রেয়াত করলেন না। ব্যাপার জানতে পেরে বকুলালকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। বকুবাবুও তেরিয়া হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাসায় চলে এলেন। মন খারাপ, মেসের বামুনকে বললেন রাত্রে কিচ্ছু খাবেন না। তারপর হেদোর ধারে গেলেন মাথা ঠাণ্ডা করতে। রাগের মাথায় চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু সংসার চলে কিসে? পুঁজি তো সামান্য। রামজাদুর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হল। আরে উকিলবাড়ি অমন একটু-আধটু উপরি অনেকে নিয়ে থাকে, তা বলে কি পুরনো বন্ধুকে অপমান করতে হয়? আচ্ছা, এর শোধ একদিন বকুলাল নেবেনই।

রাত নটায় মেসে ফিরে এলেন; মেস খাঁ খাঁ, সেদিন শনিবার, সব মেম্বার থিয়েটার দেখতে গেছে। বকুলাল নিঃশব্দে বাসায় ঢুকে দেখতে পেলেন রান্নাঘরের ভেতর—

নগেন বলিল—'দক্ষিণ রায়?'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'রান্নাঘরের ভেতর মেসের ঝি বকুবাবুর পশমী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নী বুনে দিয়েছিলেন, তাইতে বসে তাঁরই থালায় লুচি খাচ্ছে, মেসের ঠাকুর তাকে বাতাস করছে। ঝি আধ হাত জিভ কেটে দেড় হাত ঘোমটা টানলে। অন্যদিন হলে বকুবাবু কুরুক্ষেত্রে বাধাতেন, কিন্তু আজ দেখেও দেখলেন না। চুপটি করে ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তারপর অগাধ চিন্তা! কি করা যায়? কোত্থেকে টাকা আসবে? তাঁর এক বিধবা পিসী হুগলিতে থাকেন, বিপুল সম্পত্তি, ওয়ারিশ একটিমাত্র ছেলে ভুতো। ভুতো ছোঁড়া অতি হতভাগা, অল্প বয়সেই অধঃপাতে গেছে। কিন্তু পিসী তাকে নিয়েই ব্যস্ত, অমন উপযুক্ত ভাইপো বকুলালের দিকে ফিরেও তাকান না। বুড়ির কাছে কোনো প্রত্যাশা নাই।

বকুলাল ভাবলেন, ভগবানের কি বিচার! লক্ষ্মীছাড়া ভুতো হল দশ লাখের মালিক, আর তারই মামাতো ভাই বকুর অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণ। তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড—ঐ বজ্জাত রামজাদুটা—মক্কেল ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছে, আর তিনি একটি সামান্য চাকরির জন্য লালায়িত—দুত্তোর ভগবান।

PATHAGAR.NET

কিন্তু বকুলাল তাঁর এক ভক্ত বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন ভগবানকে যদি একমনে ভক্তি ভরে ডাকা যায় তা হলে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আচ্ছা, তাই একবার করে দেখলে হয় না? যে কথা সেই কাজ। বকুলাল তড়াক করে উঠে পড়লেন, স্টোভ জ্বাললেন, চা করে তিনি এক পেয়ালা খেলেন। আজ তিনি ভররাত ভগবানকে ডাকবেন।

বকুলাল আলো নিভিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে তপস্যা শুরু করলেন।—'হে ভক্তবৎসল হরি, হে ব্রহ্মা, হে মহাদেব দয়া কর। সেকালে তোমরা ভক্তের আবদার শুনতে, আজ কেন এই গরীবের প্রতি বিমুখ হবে? হে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, তোমাদেরই যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার। বর দাও—বেশি নয়। মাত্র এক লাখ। উঁহু, এক লাখে কিছুই হবে না,—গিন্নীই গয়না গড়িয়ে অর্ধেক সাবাড় করবেন। রামজেদোটার কিছু কম করে তো দশ লাখ আছে। আমার অন্তত পাঁচ লাখ চাই, না না, দশ লাখ। দোহাই দেবতারা, তোমাদের কাছে এক লাখও যা দশ লাখও তা, তাতে এই বিশ্বসংসারে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনেককে তো কোটি কোটি দিয়ে থাক, আমায় না হয় মাত্র দশ লাখ দিলে। লাখ টাকায় একটা বাড়ি, হাজার পঞ্চাশ যাবে ফার্নিচার করতে, তারপর আরও পঞ্চাশ যাবে এটা-সেটায়। এই ধর একটা ভাল মোটরকার। উঁহু, একটায় হবে না, গিন্নীই সেটা আঁকড়ে ধরে থাকবেন, হরদম থিয়েটার আর গঙ্গাস্নান। আচ্ছা তাঁর জন্যে না হয় একটা ফোর্ড গাড়ি মোতায়েন করে দেওয়া যাবে, সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ড,—মেয়েছেলের বেশি বাড় ভাল নয়। আর ঐ রামজাদুটা—রাসকেলকে কেউ যদি বেঁধে নিয়ে আসে তো ফুটপাতের ওপর হামদো মুখখানা ঘষি। ঘষি আর দেখি, যতক্ষণ না চোখ-মুখ খয়ে গিয়ে তেলপানা হয়ে যায়। হে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, আজকের দিন তোমরা আমায় মাপ কর, তোমরা, এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবা সকল, আজ আমার এই তপস্যায় তোমরা বাগড়া দিও না, এরপর তোমাদের একদিন খুশি করে দেব। হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পয়গম্বর, হে ব্রাহ্মের ব্রহ্ম, ইহুদীদের যেহোভা, পার্সীর অহুর, দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ, শয়তান—অ্যাঁ। রামো। তা শয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব। যাক্ অত বাছলে চলে না। হে তেত্রিশ কোটির যে-কেউ, দয়া কর—দয়া কর। আমি একান্তঃকরণে ভক্তিভরে ডাকছি—ধনং দেহি, ধনং দেহি।'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি করে?'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু'-চারটি এখনও আছেন। গরীব বটে, কিন্তু কশ্যপ গোত্র পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির

PATHAGAR.NET

খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার। তারপর বকুলালবাবু ঐরকম একমনে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর দু' চোখ বেয়ে ধারা বইতে লাগল, বাহ্য জ্ঞান নেই, কেবল ধনং দেহি। এমন সময় নীচে থেকে একটি আওয়াজ এল টিং টিং। বকুলাল লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বাললেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঠোনে আলো ফেলে দেখলেন—

নগেন রোমাঞ্চিত হইয়া আবার বলিয়া ফেলিল—'দক্ষিণ রায়?'

চাটুজ্যেমশাই মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন, 'দক্ষিণ রায়! তোমার ম্যাথা। গ্যাপ্পোটা তুমিই ব্যালো না, আমি বকে মরি কেন।'

উদয় খুশি হইয়া বলিল,—'নগেন-মামার ঐ মস্ত দোষ, মানুষকে কথা কইতে দেয় না। আমার শালীর পাকাদেখার দিন—'

চাটুজ্যে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'আরে গ্যালো যা! একজন থামলেন তো আর একজন পোঁ ধরলেন! যা—আমি আর বলব না।'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'আহা কেন তোমরা রসভঙ্গ কর! ব্রাহ্মণকে বলতেই দাও না।'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন, 'বকুলবাবু উঠোনে দেখলেন, ব্রহ্মার হাঁস, শিবের ষাঁড় বিষ্ণুর গড়ুর কেউ-ই নেই, শুধু এক কোণে একটি লাল বাইসাইকেল ঠেসানো রয়েছে! হেঁকে বললেন, কোন্ হ্যায়? টেলিগ্রাফ পিয়ন সিঁড়ির ধাক্কা দিতে গিয়েছিল এখন সামনে এসে বললে, তার হ্যায়।

কিসের তার? বকুবাবুর বুক দুরদুর করে উঠল। কই তিনি তো লটারির টিকিট কেনেননি। তবে কি গিন্নীর কি ছেলেপিলের অসুখ? আজ বিকেলেই তো চিঠি পেয়েছেন সব ভাল। বকুলাল হুড়মুড় করে নেমে এলেন।

তারের খবর—ভুতো হঠাৎ মারা গেছে, পিসীও এখন তখন, শিগগির চলে এস। বকুবাবু ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর মানিব্যাগটি পকেট থেকে বার করে পিয়নের হাতে উবুড় করে দিলেন। পিয়ন বেচারা আসবার আগেই জেনে নিয়েছিল যে খারাপ খবর, বকশিশ চাওয়া চলবে না। এখন অযাচিত তিন টাকা ছ'আনা পেয়ে ভাবলে শোকে বাবুর মাথা বিগড়ে গেছে। সে সই নিয়েই পালাল।

ভুতো তা হলে মরেছে? সত্যিই মরেছে? বা রে ভুতো, বেড়ে ছোকরা! নিশ্চয় মদ খেয়ে লিভার পচিয়েছিল। জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হবে। বকুবাবু সেই রাত্রেই হুগলি রওনা হলেন।

বকুবাবুর বরাত ফিরে গেল। তবে দশ লাখ নয়, মাত্র পাঁচ লাখ। টাকাটা কম হওয়ায় প্রথমটা একটু মন খুঁতখুঁত করেছিল, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল। বাড়ি হল, সব হল। বকুলাল নানারকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল। টাকার আর

PATHAGAR.NET

অবধি নেই, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বকুর বুদ্ধিটা মোটা হয়ে পড়ল। এই রকমে বছর চোদ্দ কেটে গেল।...

এই পর্যন্ত বলিয়া চাটুজ্যে মশায় তামাক টানিয়া দম লইতে লাগিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন, 'কই চাটুজ্যে মশায়, আপনার রাঘ কই?'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'আসবে, আসবে, ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে।

বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাঁকে বললেন, বৎস বকু, বয়স তো ঢের হল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে? বকুলাল জবাব দিলেন, মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না—সুখের শরীর—দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক, একটা ভুঁই-পটকা ছোড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়েসে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই বলে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন, কাউনসিলে ঢুকে পড়।

মা তো বলে খালাস, কিন্তু ঢোকা যায় কি করে? বকুলাল মহাফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন মাতব্বর সায়েবকে ধরে বললেন, তিনি হাজার টাকা ড্রংকেন সেলার্স হোমে দিতে রাজি আছেন যদি গভরমেন্ট তাঁকে কাউনসিলে নমিনেট করে।

PATHAGAR.NET

সাহেব বলিলেন, টাকা তিনি গ্রাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গভরমেন্ট যার তার কাছে ঘুষ নেয় না! বকুবাবু মুখ চুন করে ফিরে এলেন।

তারপর একজন রাজনীতিক চাঁইকে বললেন, আমি ইলেকশনে দাঁড়াতে চাই, আমায় দলে ভরতি করে নিন, ক্রীড কি আছে দিন, সই করে দিচ্ছি।

চাঁইমশাই বললেন, দুত্তোর ক্রীড, আগে লাখ টাকা বার করুন দেখি আমাদের নিখিল বঙ্গীয় সর্পনাশক ফান্ডের জন্যে,—সাপ না মারলে পাড়াগাঁয়ের লোক সাপোর্ট করবে কেন? বকুবাবু বললেন, ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্য টাকা? ঘুষ আমি দিই না। ফিরে এসে স্থির করলেন, সব ব্যাটা চোর। খরচ যদি করতেই হয়, তিনি নিজে বুঝেসুজে করবেন।

কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন সাউথ সুন্দরবন কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারি কিনেছিলেন, সেজন্য ভোট আদায় করা সোজা হবে। ইলেকশনের দু'-তিন মাস আগে থেকেই তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরনো শত্রু রামজাদুবাবু রাতারাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। তিনিও ঐ সোঁদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল—তিনি টেরিটি বাজার থেকে

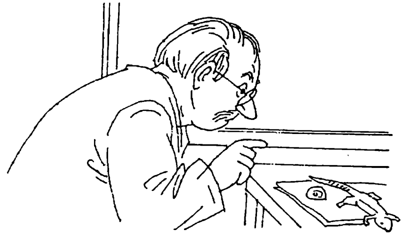

একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউরিতে গোটা দুই ষাঁড় বাঁধলেন, আর বাড়ির রেলিং-এর উপর ঘুঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

খবরের কাগজে নানা রকম কেচ্ছা বার হতে লাগল। বকুলাল দত্ত—সেটাকে কে চেনে? চোদ্দ বছর আগে কার কাছে চাকরি করত? সে চাকরি গেল কেন? কেরানির অত পয়সা কি করে হল? হে দেশবাসিগণ, বকুলাল অত সোডাওয়াটার কেনে কেন? কিসের সঙ্গে মিশিয়ে খায়? বকুর বাগান বাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে কেন? বকুলাল কালো, কিন্তু তার ছোট ছেলে ফরসা হল কেন? সাবধান বকুলাল! তুমি শ্রীযুক্ত রামজাদুর সঙ্গে পাল্লা দিতে যেয়ো না, তা হলে আরও অনেক কথা ফাঁস করে দেব। বকুবাবুও পাল্টা জবাব ছাপতে লাগলেন, কিন্তু তত জুতসই হল না, কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক—গুণ্ডা ছিল না।

বকুবাবু ক্রমে বুঝলেন যে তিনি হটে যাচ্ছেন, ভোটররা সব বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। একদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মনে পড়ল যে চোদ্দ বৎসর আগে দেবতার দয়ায় তাঁর অদৃষ্ট ফিরে যায়। এবারেও কি তা হবে না? বকুলাল ঠিক করলেন আর একবার তেমনি করে কায়মনোবাক্যে তিনি তেত্রিশ কোটিকে ডাকবেন। শুধু বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি তো আর সত্যিকার দেবতা নন—বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনো যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে ক্ষেপিয়ে দিতে পারেন।

রাত্রি দশটার সময় বকুবাবু তাঁর অফিসঘরে ঢুকে দারোয়ানকে বলে দিলেন যে তাঁর অনেক কাজ। কেউ যেন বিরক্ত না করে। এবার আর শোবার ঘরে নয়, কারণ গিন্নী থাকলে তপস্যায় বিঘ্ন হতে পারে। বকুলাল ইজিচেয়ারে শুয়ে এই মর্মে একটি প্রার্থনা রুজু করলেন।—'হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্বে তোমরা

PATHAGAR.NET

একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথাযোগ্য পুজো দিয়েছি। তারপর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খোঁজখবর নিতে পারিনি, কিছু মনে করো না বাবারা। কিন্তু গিন্নী বরাবরই তোমাদের কলাটা মূলোটা যুগিয়ে আসছেন, সোনা-রুপোও কিছু কিছু দিয়েছেন। ঐ যে তাঁর রুপোর তাম্রকুণ্ড, কোষাকুষি, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন সে তো আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও দেখ, এখন একটু ফুরসত পেয়েই ধম্ম-কম্মে মন দিয়েছি, টিকি রেখেছি, গো-সেবা করছি। এখন আমার এই নিবেদন, রামজাদু ব্যাটাকে মাল কর। ওকে ভোটে হারাবার কোনো আশা দেখছি না। দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুণি নয়, নমিনেশন-পেপার দেবার দু' দিন পরে—নয়তো আর একটা ভুঁইফোঁড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত, বেরিবেরি, হার্টফেল গাড়িচাপা যা হয়। আমি আর বেশি কি বলব, তোমরা তো হরেক রকম জান। দাও বাবারা, বজ্জাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত দাও—রক্তং দেহি, রক্তং দেহি।'...বকুলবাবু নিবিষ্ট হয়ে এই রকম সাধনা করছেন, এমন সময় সেই ঘরে দপ করে একটি শব্দ হল।

নগেনের ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল—দ—

চাটুজ্যে গর্জন করিয়া বলিলেন, চোপ রও। বকুবাবুর আপিসের কড়িকাঠে একটি টিকটিকি আটকে ছিল। সে যেমনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙবে অমনি খসে গিয়ে দপ করে বকুলালের টেবিলে পড়ল। বকুলাল চমকে উঠে দেখলেন, টেবিলের ওপর একটি টিকটিকি আর তার নীচেই একখানা পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ডটি পূর্বে নজর পড়েনি, এখন বকুবাবু পড়ে দেখলেন তাতে লিখেছে—মহাশয়, শুনেছি আপনি ইলেকশনে সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। যদি আমার সাহায্য নেন আর উপদেশ মতো চলেন তবে জয় অবশ্যম্ভাবী। কাল সন্ধ্যায় আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। ইতি—শ্রীরামধিগড় শর্মা।

PATHAGAR.NET

বকুলালবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন, জয় মা কালী, জয় বাবা তারকনাথ, ব্রহ্মা বিষ্ণু পীর পয়গম্বর। এই পোস্টাকার্ডটি তোমাদেরই লীলা, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কাল তোমাদেরই ঘটা করে পুজো দেব, নিশ্চিন্ত থাক। তারপর খুব মনে মনে বললেন, যাতে দেবতারাও টের না পান—উহুঁ বিশ্বাস নাই, আগে কাজ উদ্ধার হক তখন দেখা যাবে।

সমস্ত রাত, তারপর সমস্ত দিন বকুবাবু ছটফট করে কাটালেন। যথাকালে রামধিগড় শর্মা দেখা দিলেন। ছোট্ট মানুষটি, মেটে মেটে রং, ছুঁচলো মুখ, খাড়া খাড়া কান। পরনে পাটকিলে রঙের ধুতি, মেরজাই গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কথা কন কখনও হিন্দী, কখনও বাংলা। বকুলাল খুব খাতির করে বললেন, বইঠিয়ে। আপনি আর্যসমাজী? রামধিগড় বললেন, নহি নহি। বকু জিজ্ঞাসা করলেন,

মহাবীর দল? প্যাক্টওয়ালা? কৌসিলতোড়? চরখাবাজ? রামধিগড় ওসব কিছুই নন, তিনি একজন পলিটিক্যাল পরিব্রাজক। বকুবাবু ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিলেন। রামধিগড় বললেন, 'বস হুয়া হুয়া।'

তারপর কাজের কথা শুরু হল। রামধিগড় জানতে চাইলেন বকুবাবুর রাজনীতিক মতামত কি, তিনি স্বরাজী; না অরাজী, না নিমরাজী, না গররাজী। বকু বললেন—তিনি কোনোটাই নন, তবে দরকার হলে সব তাতেই রাজী আছেন। তিনি চান দেশের একটু সেবা করতে, কিন্তু রামজাদু থাকতে তা হবার জো নেই। রামধিগড় বললেন, কোনো চিন্তা নেই, তুমি ব্যাঘ্রপার্টিতে জয়েন কর।

বকুবাবু আঁতকে উঠলেন। রামধিগড় বললেন, আমি অতি গুহ্য কথা প্রকাশ করে বলছি শোন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা একেবারে গোণাগুণিতে তিনশো তেষট্টি। আমি এর সেক্রেটারী। একটিমাত্র ভেকান্সি আছে, তাতে ইচ্ছা করলে তুমি আসতে পার। কাউনসিলের সমস্ত সীট আমরাই দখল করব।

বকুর ভরসা হল না। বললেন, তা পেরে উঠবেন কি করে? শত্রু অতি প্রবল, হটাতে পারবেন না। নিখিল বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফান্ডের সমস্ত টাকা ওরা হাত করেছে।

রামধিগড় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন, আমরা সর্প নই।

ফান্ড না থাক, দাঁত আছে, নখ আছে। বাবা দক্ষিণ রায় আমাদের সহায়। তার কৃপায় সমস্ত শত্রু নিপাত হবে।

তিনি কে?

চেন না? তেত্রিশ কোটির মধ্যে তিনিই এখন জাগ্রত, আর সবাই ঘুমোচ্ছেন। বাবা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছেন। নাও, এখন ক্রীডে সই কর। অতি সোজা ক্রীড—কেবল নিত্যিকার খোরাক যোগাতে হবে—তার বদলে পাবে শত্রু মারবার ক্ষমতা আর কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ।

কিন্তু গভরমেন্ট?

গবরমেন্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন।

বংশলোচন বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওকি চাটুজ্যেমশায়!'

চাটুজ্যে কহিলেন, 'হাঁ হাঁ মনে আছে। আচ্ছা, খুব ইশারায় বলছি। রামধিগড় বুঝিয়ে দিলেন, একেবারে রামরাজ্য হবে। শত্রুর বংশ লোপাট, সবাই ভাই—ব্রাদার। দিব্যি ভাগ-বাটোয়ারা করে খাবে। সকলেই মন্ত্রী, সকলেই লাট।

কিন্তু ঐ রামজাদুটা টিট হবে তো?

টিট বলে টিট! একেবারে ট—য় দীর্ঘ—ঈ টীট! তাকে তুমি নিজেই বধ করো।

বকুবাবুর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। এইবার তাঁর কৃত্রিম দন্তে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠলো। ক্রীড সই করে দিয়ে বললেন, বাবা দক্ষিণরায় কি জয়!

রামধিগড় বলিলেন, হুয়া হুয়া, আর সব ঠিক হুয়া।

PATHAGAR.NET

এই স্থির হল যে কাল ফাইভ-আপ প্যাসেঞ্জারে বকুবাবু তাঁর সুন্দরবনের জমিদারিতে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছলে রামধিগড় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে বাবার আশীর্বাদ পাইয়ে দেবেন।

বকুবাবুর মাথা বিগড়ে গেল! সমস্ত রাত তিনি খেয়াল দেখলেন। রামধিগড় হুয়া হুয়া করছে। রামরাজ্য, কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ, লাট, মন্ত্রী—এসব বড় বড় কথা তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি। রামজাদু মরবে আর তিনি কাউনসিলে ঢুকবেন—এইটেই আসল কথা। তারপর রামরাজ্যই হোক, আর রাক্ষসরাজ্যই হোক, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

তারপর সোঁদরবনে গভীর অমাবস্যার রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।

বিনোদ বলিলেন, 'চাটুজ্যেমশায় আপনি বড় ফাঁকি দিচ্ছেন। বাবার মূর্তিটা কি রকম তা বলুন?'

চাটুজ্যে। বলব না, ভয় পাবে। বিশেষ করে এই উদোটা।

উদয় বলিল—'মোটেই না। হাজারিবাগে থাকতে কতবার আমি রাত্তিরে একলা উঠেছি! বউ বলত—'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'বউ বলুকগে। বাবা প্রথমটা সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন। বকুলকে বললেন, বৎস, আমি তোমার প্রার্থনায় খুশি হয়েছি। এখন কি বর নেবে বল।

বকুবাবু বললেন, বাবা, আগে রামজাদুটাকে মার, ও আমার চিরকালের শত্রু।

বাবা বললেন, দেশের হিত?

বকু উত্তর দিলেন, হিতটিত এখন থাক বাবা। আগে রামজাদু।

বাবা বললেন, তাই হোক। ক্রীড সই করেছ, এখন তোমায় জাতে তুলে দি—

এতেক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়,
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।
পর্বত প্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।
হলুদ বরণ তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঙ্কন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা,
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরি গুহা রক্তবর্ণ তালু,
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।
দু' চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা গেঞ্জ,
আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশ হাত লেঞ্জ।

PATHAGAR.NET

ছাড়েন হুংকার প্রভু দন্ত কড়মড়ি,
জীবজন্তু যে যেখানে ভাগে দড়াদড়ি।
ভয় পাএগ্র দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা,
কহে—দেবরাজ হান বজ্র এই বেলা।
ইন্দ্র বলে, ওরে বাবা কিবা বুদ্ধি দিলে,
রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে।
চক্ষে বান্ধ ফেটা বাপা কানে দাও রুই,
কপাট ভেজাএগ্র সুখা খাও ঢোঁক দুই।

বাবা দক্ষিণ রায় তার ল্যাজটি চট্ করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।

বাবা বললেন, যাও বৎস, এখন চরে খাওগে।'

চাটুজ্যে হুঁকায় মনোনিবেশ করিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন, 'তারপর?'

'তারপর আবার কি? বকুলাল কেঁদেই আকুল। ও বাবা, একি করলে? আমি ভাত খাব কি? শোব কোথায়? সিল্কের চেগো-চাপকান পরব কি করে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো।'

বাবা অন্তর্ধান। রামধিগড় বললে, আবার ক্যা হুয়া? গোল মাত কর। এখন ভাগো, শত্রু পকড়-পকড়কে খাও গে। বকুলাল নড়ে না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামধিগড় ঘ্যাঁক করে তার গায়ে কামড় দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।

পরদিন সকালে ক-জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন, এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মতো রং।

আহা, শেয়াল কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিই। এখন চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেয়ো; বকশিশ মিলবে।

বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখাসাক্ষাৎ করিলে—ভদ্দরলোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।

বিনোদবাবু বললেন, 'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণ রায় কখনও গুলি খেয়েছেন?'

'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খাননি কি?'

'দেখ বিনোদ, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে তামাশা করো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা বস তোমরা—আমি উঠি।'

PATHAGAR.NET

ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই? আপনার দুটো মনিঅর্ডার আছে, ভাবলাম আগে বলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসত পাবেন না হয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশ টাকা আর আটাশ টাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবশ্য। কোর্টের খরচা। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—দ্যাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজী বিবাদী। কেসের তারিখটা কত?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিনের মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা রামলাল চক্রবর্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরী ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধূলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব হুঁশিয়ার লোক।

PATHAGAR.NET

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২ শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরত দিন মানিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দু' টাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা—

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজড'। অন্যটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু, বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ি নেই। বেরিয়ে ফেরেননি এখনো। মা ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ? আঃ, বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড় সংসারে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা? আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে। আপনারা খাবেন না? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দু'জন চাষীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎবাবু উকিলের বাড়ি কি এডা?

—হ্যাঁ, কেন?

—একটা মকদ্দমা আচে বাবু। আরজি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস? কোথায় বাড়ি?

—বাবু, আমার বাড়ি রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ি—ন-হাটা আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখিনি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে?

—হ্যাঁ বাবু।

—কত টাকা?

—আরজি করার ফি ছ' টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু ঝা লাগে—আমাদের শুনুন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্তি বোধ হইল, চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার জন্য তোমরা যে দু'টাকা এগারো আনা প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখমহাটির বাজারে আট-দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়ো মহাশয় রামধন চক্রবর্তী সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ জানাইবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি নিত্যশীর্বাদক

বর্ধমান জেলা শ্রী হরিসাধন দেবশর্মা

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়োবাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন, কি রে?

—এই দেখো হরি ভটচাজ্ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে, ছ' টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপুজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও! ঠাকুরপুজোতে ব্ল্যাকমার্কেট! দয়া করে তো টাকা দিচ্চি। নামই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়িতে আছে। ও টাকা তো স্টাইপেন্ডের সমান দিচ্ছি আমরা। বেশ, না পুজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দু'মাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু'মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাবাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্য যে দু'টাকা এগারো আনা করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা পাঠাইতেছিল না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। পত্রপাঠ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্বাদ দিবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি — নিত্যশীর্বাদক

বর্ধমান জেলা — শ্রী হরিসাধন দেবশর্মা

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন, দাও পাঠিয়ে। বদমাইশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েচে। ব্ল্যাকমার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপুজোয়!

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে? কত নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ শৌখিন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ-ছ' টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যার পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরির আঁজি দ্যাখো—

এই সময় দাদাও আসিলেন। দু'জনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর ক্রয়নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

PATHAGAR.NET

দেশের মেয়ে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, 'দু'বছর ধরে ছেলে চাকরি করছে—যেমন তেমন চাকরি নয়, দারোগা-গিরি—লোকে জজিয়তি ছেড়ে যা কামনা করে,—পাড়াগেঁয়ে থাকা, তাও আবার এ-দেশের পাড়াগাঁ;—ছেলের তোমার কিন্তু শরীর ফিরছে কই বৌদি?'

কথাটা সত্য নয় ; বসন্তের শরীর বেশ ফিরিয়াছে; স্বাস্থ্যহীনদের শরীর ফিরাইবার জন্যই যে গবর্নমেন্ট দারোগাগিরির প্রবর্তন করিয়াছে এমন নয়,—হাড়াভাঙা খাটুনি আছে, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, সুনিদ্রার ব্যাঘাত—তবুও বিহারের পাড়াগাঁয়ের দুধ-ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবারের জোরে এবং অগাধ একাধিপত্যের আনন্দে বসন্তের শরীর বেশ ভাল ভাবেই স্থূলত্ব লাভ করিয়াছে—বাঙালীর শরীরের যা চরম উৎকর্ষ। মিত্র-গৃহিণীরও যে সম্প্রতি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়াছে এমন নয়। প্রকৃত কথাটা এই যে, তিনি আজ বসন্তের সেজ ভাইয়ের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের কথাটা পাড়িতে আসিয়াছেন। মনে মনে একটা যুৎসই গৌরচন্দ্রিকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা লইয়া বসন্ত বাহির হইতে আসিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিল।

বসন্তের মা বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'সে কথা কে বলবে বল ঠাকুরঝি? বললেই একরাশ জামা বের করে বলবে, 'এইটে ছোট হয়ে গেছে, এইটে সেলাই খুলে পড়ছে, সাত সের ওজন বেড়েছে'...দাঁড়িপাল্লা ধরে মানুষ ওজন করা! আমি হার মেনে বলা ছেড়ে দিয়েছি বাপু...কই গো বউমা, তোমার পিসশাশুড়িকে পান-জর্দা দিয়ে যাও।'

'আসছে, ব্যস্ত কিসের?...হ্যাঁ, আজকাল ঐ এক ওজন ওজন বাই হয়েছে। সেদিন নন্তে এসে বললে, 'মা, কাকার তিন টাকার মাংস বেড়েছে'... 'সে কি রে?' হ্যাঁ গো, ছ-আন্টে আটচল্লিশ, তিন ষোলং আটচল্লিশ'...বুঝতে কি পারি? শেষে টের পেলাম হাসপাতালের কলে তৌল করে দেখা গেচে খুড়োর নাকি আট সের ওজন বেড়েছে; গুণধর ভাইপো ছ' আনা তার হিসেব করে লাভ দেখাচ্ছেন—বাজারে পাঁঠার যা দর আর কি!...

একটা হাসির রোল উঠিল। সেটা থামিলে দম লইয়া মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, 'জ্বালার কথা আর বলো না। বসুর আমাদের কিন্তু তদারকের দরকার হয়ে পড়েছে বৌদি। বেটাছেলে যদি নিজের শরীরের হেফাজৎ করতে পারত তো আর ভাবনা ছিল না। বৌমাকে সঙ্গে দিচ্ছ না কেন?'

'এই প্রথম ঘর করতে আসা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, একটা সংসার ঘাড়ে করতে কি পারবে এর মধ্যে?'

PATHAGAR.NET

'ওমা, পারবে না, ...আর সংসার করা তো তোমার আশীর্বাদে ঝি-চাকর-ঠাকুর ওপর নজর রাখা; কিসের অভাব গা বসন্তর আমার? আর অন্য দিকেও তো দেখতে হবে বাপু। বৌদি আমার সেই নিজের প্রথম ঘর করতে আসার কথা ধরে বসে আছেন—এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এলেন, নাকে নোলকটি দুলদুল করছে—লক্ষ্মী—প্রতিমের মতন; এখনও চোখের ওপর যেন ছবিটি লেগে রয়েছে আমার...'

বসন্তের মা একটু লজ্জিতভাবে মিত্র-গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আর উনি তখন পাকা গিন্নী! ... একাল-সেকালের তফাত বুঝি ঠাকুরঝি, মনে করেছিলাম মাস দু'তিনের জন্যে না হয় দিই সঙ্গে করে; আবার ভাবছি...'

বধূ পান-জর্দা আনিয়া মিত্র-গৃহিণীর হাতে দিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। চিবুক স্পর্শে চুম্বন করিয়া পাশে বসাইয়া মিত্র-গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁগো, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে কষ্ট হবে নাকি নবাবের ঝির? আমি তো বাছা তখন থেকে তোমার শাশুড়ির কাছে তোমার বাপের যশ গাইছি—ও সোজা লাঙলঠেলা চাষার মেয়ে নয়, খুব পারবে—না গো বৌদি, কোনো ভয় নেই, ছেলেমানুষ হলে কি হয়, কাজকর্মে বুদ্ধিতে মা আমার ঠিক আমার পঁটুর মতন চৌখস মেয়ে, ভাবও তেমনি দুটিতে, যেন ঠিক মায়ের পেটের বোন। সেদিন পঁটু এসেছিল, ঠায় চেয়ে দেখছিলাম কিনা—দুটিতে এঘর-ওঘর করে বেড়াচ্ছিল, এমন মানাচ্ছিল।...এ তো তোমার এখানকার জর্দা নয় বৌদি!'

জর্দাটা এখানকারই ; মিত্র-গৃহিণীর রসনায় যে অপরিচিত এমন নয়। বসন্তের মা বলিলেন, 'লক্ষ্ণৌয়ের; তোমার পিসশাশুড়িকে একটু এনে দাও না বৌমা।'

'তা দাও, একটু মুখ বদলানো হবে মাঝে মাঝে...তুমি ঐ কর বৌদি; না বাপু, ছেলেটার দিকে যেন চাইতে পারা যায় না, আর সত্যিই তো গা...'

'বলব ওঁকে আজ; সত্যি ক'দিন থেকে দোমানা হয়ে রয়েছি ছেলেটার শরীর দেখে...'

'শোন কথা বৌদির! উনি দাদার রায় নেবেন! কার রায়ে এত বড় সংসারটা চলছে সেকথা যেন আমার কাছেও লুকানো আছে!'

বধূর পিঠে একটা সস্নেহে স্পর্শ দিয়া বলিলেন, 'এই সোনার প্রতিমাই কে পছন্দ করে ঘরে এনেছিল গা?'

২

এই অধ্যায়টি বসন্তের সহধর্মিণী শ্রীমতি হিরণ্ময়ীর একটু পরিচয় দিয়া আরম্ভ কর ভাল। সে নতুন ঘর করিতে আসিয়াছে এবং জন্মতারিখের হিসাবে বোধ হয় অপ্রাপ্তবয়স্কাও বলা চলে, তাই বলিয়া তাহাকে কাঁচা মেয়ে মনে করিলে বেজায় ভুল করা হইবে। তাহার বিবাহ হইয়াছে পশ্চিমের এক দারোগার সহিত—তাহার মা, খুড়ী

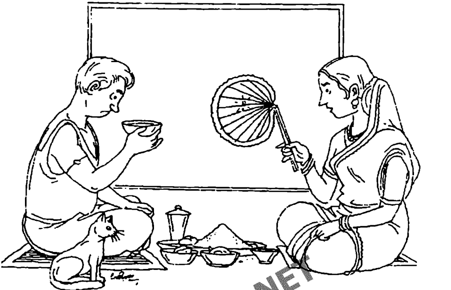

পিসি এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন এবং সাধ্যমতে তাহাতে এইরূপ রুক্ষ দেশ এবং উগ্র স্বামীর জন্য,—তালিম দিয়া পাঠাইয়াছেন। মেয়েটি বাহ্যত বেশ ধীর, নম্র এবং হাস্যময়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় গম্ভীর, সন্দিগ্ধ, সতর্ক এবং গাম্ভীর্য, সন্দিগ্ধতা ও সতর্কতা বিশেষ করিয়া দুইটি বিষয়ে পরিস্ফুট—প্রথমত এদেশের লোকের সম্বন্ধে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে; দ্বিতীয়ত স্বামীর সম্বন্ধে। অনেক মাস্টার আছে যাহারা টেবিলে বেঞ্চে, এমন কি দু'-একটা নিরীহ পৃষ্ঠেও বেত আছড়াইয়া তবে সেদিনের কার্য আরম্ভ করে, তাহাতে নাকি ভাল ফল হয়। বসন্তের নবীন দাম্পত্য-জীবনের সব খুঁটিনাটি হিসাব রাখা সহজ নয়; মোটামুটি এই কথা বলা চলে, হিরণ স্বামী সম্বন্ধে মূলত মাস্টারের নীতি অবলম্বন করিয়াই সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বসন্ত-দারোগার অমন কুলোপানা চক্র এবং ফোঁসফোঁসানি এক জায়গায় আসিয়া যে কিরূপ নিষ্ক্রিয়, তাহা পরে দেখা যাইবে। আগে বসন্ত ছিল অখণ্ড,—দারোগাবাবু বলিয়া তাহার পরিচয় পূর্ণ হইয়া যাইত; এখন তাহার দুইটা সত্তা আছে,—দারোগা-বসন্ত এবং স্বামী-বসন্ত।

PATHAGAR.NET

দারোগা এবং স্বামী এই পদবী দুইটি বাঙালির অভিধানে তুল্যার্থক হইলেও এ ক্ষেত্রে কোনো মিল নাই—দারোগা বসন্ত যে পরিমাণ উগ্র, স্বামী বসন্তটি ঠিক সেই পরিমাণে নিরীহ হইয়া আসিতেছে। কথাটা যে নিতান্ত মনগড়া নয় পরবর্তী কাহিনীতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মিত্র-গৃহিণীর পরামর্শে বসন্ত হিরণ্ময়ীর অভিভাবকত্বে যখন কর্মস্থলে আসিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। স্টেশন হইতে ষোল মাইল পথ, সওয়ারি বলদের পাল্কি-গাড়ি, স্থানীয় শাম্পেনি বলে।

বসন্ত যতক্ষণ একবার থানাটা তদারক করিয়া আসিতে গেল ততক্ষণ হিরণ একবার সমস্ত বাড়িটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দক্ষিণ ও পশ্চিমে দু'সারি ঘর, মাঝখানে পাঁচিল দিয়া ঘেরা উঠান, উঠানের এক কোণে একটি পাতকুয়া, পাশেই একটা জেয়ল গাছে আড়াআড়িভাবে একটি ধনুকাকার বাঁশ বাঁধা, তার এক দিকে ছিপের আগায় বঁড়শির মতো একটা বড় অর্ধডিম্বাকার বালতি ঝুলিতেছে, অন্য দিকে ভারসাম্যের জন্য একটা ঢেঁকির আধখানা বাঁধা। সব মিলিয়া যেন একটা চড়কগাছের মতো দেখিতে হইয়াছে।

নিশ্চয় বেশ ভাল করিয়া বাঁধাছাদা আছে, তবুও কেমন মনে হয় বাঁশ বালতি ঢেঁকি তিনটেই যেন ঘাড়ে পড়িবার চক্রান্ত করিয়া মাথার উপর আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে। এ-জাতীয় জিনিস হিরণ এর পূর্বে দেখে নাই—বাংলাদেশে তো নয়ই, শ্বশুড়বাড়ি আসিয়াও নয়। মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। মনটা একটু খিঁচড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের দিকে গেল। রসুইয়া-ঠাকুর মনিব আসিতেই একবার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিজের এলাকার মধ্যে আসিয়া চা আর হালুয়ার বন্দোবস্ত করিতেছিল। নবাগত কর্ত্রীকে তাহার ঘরের দুয়ারে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল এবং তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

লোকটা দুর্বল প্রকৃতির, বোধ হয় দারোগার আওতায় এই রকম হইয়া পড়িয়াছে। এই দৌর্বল্যের জন্যেই প্রতি কথাই একটু হাসিয়া বলিতে অভ্যস্ত—খোশামুদি গোছের একটু মলিন হাসি। হিরণকে ঠায় গম্ভীর-ভাবে দাঁড়াইয়া ঘরটা পর্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি টানিয়া বলিল, 'চা আর জল-খৈ রান্না করছি।'

কালো লিকলিকে-গোছের চেহারা। পরনে মাসখানেক ধুলোময়লার উপর হলুদ-লঙ্কার ছোপধরা একটা কাপড়। কাঁধে তদনুরূপ একখানি গামছা। শুচিতার পাওনা মিটাইবার মতো করিয়া পায়ের পাতা দুইটি ধোওয়া, তাহার পর হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় সাদা হইয়া গিয়াছে।

প্রণাম করিতে হিরণ নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে

যাইতেছিল, সেটা কুশলসূচক হইবে না বুঝিতে পারিয়া লোকটা পূর্বাহ্নেই নিজের পরিচয়ে যতটা সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিল, 'দো বরস্ রংপুরে থাকছিলাম, শুকতুনি রাঁধতে জানি।'

নাসিকা আরও কুঞ্চিত করিয়া হিরণ বলিল, 'তবে আর কি, মাথা কিনেছিস। এত নোংরা, তোর হাতে বাবু খায়?'

লোকটা একটু অপ্রতিভ হইয়া একবার নিজের চেহারার পানে চাহিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, 'বরাহ্মন্ আছি; দোষ লাগে না।'

হিরণ অল্প কথার লোক, কিছু বলিল না। তাহার নাসিকাটা কুঞ্চিত থাকায় বোঝা গেল সে এতটা নোংরামিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারে এ-পরিমাণ ব্রহ্মতেজের কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঝি আসিয়া খবর দিল গা ধুইবার জল তৈয়ার।

হিরণ আসিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তুই দিয়েছিস নাকি জল তুলে?'

প্রশ্নের দোষ দেওয়া যায় না। কালো কুচকুচে রং, আঁটোসাটো, জাঁদরেল গোছের চেহারা; পরণে চৌদ্দ হাতের একটা পালের মতো মোটা কাপড়। সামনেই একটা সুপুষ্ট কোঁচা, ময়লা যেন তাহার পরতে পরতে অন্ধকারের মতো জমাট হইয়া আছে। কাপড়ের যে-টুকু মাথায় সে-টুকু তেলে-ময়লায় তারপলিন কাপড়ের মতো হইয়া গিয়াছে।

ঝিয়েরা কখনও দুর্বল প্রকৃতির হয় না, দারোগার ঝিয়েরা তো নয়ই। প্রশ্নটা বুঝিতে না পারায়—মুখে কাপড় দিয়া অনেকটা বেয়াদপির সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'দুলহীন্ বাঙলা বলাইছতিন্!'—অর্থাৎ কনেবৌ বাঙলায় কথা বলছেন আমার সঙ্গে।

PATHAGAR.NET

ঠাকুর বুঝিয়াছিল প্রশ্নটা, তাহার রংপুরে প্রবাসের কল্যাণে; বলিল, 'চাকর পানি ভরিয়ে দিয়েছে; তাকে বোলাইয়ে দিই?'

যেমন নমুনা দেখা যাইতেছে, চাকরের চেহারা দেখিলেই যে স্নানের প্রবৃত্তি বাড়িবে এমন ভরসা হয় না, অথচ স্নান না করিলেও নয়।... 'না থাক; কোথায় জল দেখিয়ে দে, চল্'—বলিয়া হিরণ কাপড়-গামছা বাহির করিতে গেল।

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল দেখিল, বসন্ত চা-হালুয়া লইয়া বসিয়া গিয়াছে। বধূকে প্রশ্ন করিল, 'কেমন দেখলে সব?'

বধূ মুখটা অতিমাত্র গম্ভীর করিয়া উত্তর করিল, 'চমৎকার! সাধে কি শরীর ও-রকম হয়ে গেছে! খেতে প্রবৃত্তি হয় তোমার ঐ ভূতের হাতে? যেমন ঝি, তেমনি ঠাকুর! থাক কি করে?'

'বেশ কাজ করে সব কিন্তু, নিজের সাজগোজের দিকে লক্ষ্য নেই, অসুখ-বিসুখ নেই, কামাই নেই, আমার বেশ একটানা চলে যায়। আর বামুনটা নোংরা আর দেখতে

কাঁকলাসের মতন হলেও রাঁধে ভাল, এ তল্লাটে বাংলা-রান্না-জানা লোক আর নেইও। তাই নিয়েই আমার দরকার; ওর রান্নাই খাব, ওকে তো আর খাব না।'

শেষের এই রসিকতাটুকুর উদ্দেশ্য হিরণের এই গাম্ভীর্যে একটু আঘাত দেওয়া। অকৃতকার্য হইয়া বসন্ত আর কথা না বাড়াইয়া জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল। শেষ হইলে বলিল, 'তোমাকেও এনে দিক?'

ঘিয়ে জব্‌জবে সোনার রঙের মতো হালুয়া, প্রচুর দুধ দেওয়া ঈষৎ গৈরিক রঙের ঢলঢলে চা, দীর্ঘ আট ক্রোশের যাত্রায় পরিশ্রান্ত মনকে টানে; কিন্তু তাহাদের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়া হিরণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, 'মা গো!—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে! আগে ওর একটা ব্যবস্থা করি,—তারপর ওর হাতে খাব—যদি প্রবৃত্তি থাকে। ওকে ডেকে বলে দাও আজ ও যাক, কাল যেন নেয়ে-ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে তবে বাড়িতে ঢোকে।...রাত্তিরটা আমি চালিয়ে নেব'খন। ঝিটাকে ডেকে দাও, একটা ফরসা কাপড় দিই।'

বসন্ত আশ্চর্য হইয়া বলি, 'তুমি চালিয়া নেবে মানে? এই আট ক্রোশ পথ শাম্পেনিতে এসে রান্না করবে নাকি? শরীর তো?—না, কি?'

হিরণ স্বামীকে চোখের উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া বলিল, 'আমি নিজের শরীর দেখবার জন্যে এখানে আসিনি। আমার শরীরের ওপর যদি মশাইয়ের এত দরদ থাকতো তো ঐ ভূতপ্রেতদের হাতে যা-তা খেয়ে নিজের দেহ কালি করতেন না।... আট ক্রোশ ঐ বিদ্‌ঘুটে গাড়িতে গতর চুর করে সত্যি কারোর মেজাজ ভাল থাকে না; সেটি মনে রেখে যা ভাল বুঝেছি করতে দাও।...এই দাই!...চাকরটার নাম কি?'

বেশ বোঝা গেল হিরণ আসিয়া গৃহস্থলির রাশ কড়া হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছে। স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী প্রভৃতি এই শকট-সংলগ্ন কোনো অশ্বই খাতির পাইবে না তাহার কাছে। বসন্ত খানিকটা এদিক-ওদিক করিল, তাহার পর বধূর উপরকার রাগটা চাকর-দাসীদের উপর ঝাড়িয়া অফিসে কাজের ছুতো করিয়া সরিয়া পড়িল এবং সেখানেও কণ্ঠস্বরকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া একটা তুমুল রকমের হৈচৈ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। হিরণ বুঝুক সে নেহাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়; একটা গোটা থানা পুলিশ কতোয়াল তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

তারপর প্রায় রাত্রি বারোটার সময়—হিরণের হাতের আলুনি তরকারি, পোড়া লুচি এবং ধরা দুধ অজস্র প্রশংসার সহিত আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

৩

পরের দিন সকালেই বসন্তকে একটা তদারকে বাহিরে যাইতে হইল। হিরণ বাড়ি-ঘর-দুয়ার তিনটা লোকের সাহায্যে ধুইয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া লইল। চাকরটা স্নান করিয়া বাবুর একটা ধোপদুরস্ত কাপড় পরিল এবং ভৃত্যোচিত নোংরা

কাজ যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঝি মাইজীর ফুলকাটা চওড়াপেড়ে শাড়ি পাইয়াছে, নিজেকে এবম্বিধ দুর্লভ সম্পদের উপোযোগী করিয়া লইবার জন্য প্রায় পো-খানেক মাইল দূরে নদীতে গিয়া চুলে খার আর এঁটেল মাটি ঘষিতে লাগিল। কাজের অসুবিধা হওয়ায় অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া থানার লোকে তাহাকে ধরিয়া আনিল।

ঠাকুরটা সত্যই রাঁধে ভাল, কিন্তু একজোড়া নতুন কাপড় এবং একটা নূতন গামছা পাইয়া কোনো কারণে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া, সব রান্না এমন কি তাহার সবচেয়ে বড় শিল্প শুকতুনি পর্যন্ত বরবাদ করিয়া রন্ধন পর্ব শেষ করিল। এদিককার দেখাশোনা সারিয়া হিরণ যখন স্নান করিতে যাইবে, দেখিল সাবানের বাক্সয় সাবান নাই। আজ সকালেই নূতন সাবান বাহির করিয়া দিয়াছে, বসন্ত মাত্র একবার ব্যবহার করিয়া বাহিরে গিয়াছে। ঝিয়ের কাছে পাওয়া গেল না, চাকরের কাছেও নয়। তখন ঠাকুরের খোঁজ পড়িল। থানার হাতায় তাহাকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে লোক ছুটিল, সেখানেও নাই। রিপোর্ট পাওয়া গেল, তাহাকে নদীর ঘাটে, দু'-একজন দেখিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, জলের ধারে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া, পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সাবানের গাঢ় ফেনায় আবৃত করিয়া ঠাকুর অসীম পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে গাত্রচর্ম সংস্করণে ব্যস্ত, পাশে বালির উপর হলদে রঙে ছোবানো দুইখানা নূতন কাপড় শুকাইতেছে।

বসন্ত কোনো অনিবার্য কারণে দিনমনে আর আসিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া বধূর নিকট গৃহস্থালির সুবোন্দস্তের কথা শুনিয়া এবং কিছু প্রমাণ চাক্ষুষ করিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, 'সর্বনাশ করেছ যে! সে ব্যাটাকে নতুন কাপড় দিতে গেলে কেন?'

হিরণ কতকটা অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কেন বল তো?'

বসন্ত উত্তর না দিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিল, 'কাপড় দুটো ছুবিয়েছিল কিনা বলতে পার?'

হিরণ বিস্মিতভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, হলদে রঙে।'

বসন্ত হতাশভাবে এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'ব্যাস, তাহলে যা ভয় করেছি তাই হয়ে বসে আছে নিশ্চয়। নতুন কাপড় পেলেই সে তাড়াতাড়ি ছুবিয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পালায়। কত কাণ্ড করে তাকে আটকে রাখি, দোকানে পর্যন্ত তাকে কাপড় বেচা মানা। এখন করা যায় কি? তাও কি সেখানে লোক পাঠিয়েই তাকে পাওয়া যাবে? দুটো জেলার মধ্যে শ্বশুরবাড়ি সংক্রান্ত যে যেখানে আছে লুকিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়াবে,—দু'মাসের ধাক্কা। ওর চেয়ে দাগী চোরকে টেনে বার করা ঢের সহজ। আমি তিনবার ঘা খেয়ে খেয়ে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে কোনো রকমে এই বছরখানেক আটকে রেখেছিলাম। আর—তুমি?'

PATHAGAR.NET

হিরণ প্রথমটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী তাহার ত্রুটিটুকু লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া এবং একবার আস্কারা পাইলে আরও বাড়াবাড়ি করিবে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'ঠাকুর গেলে কি জলে পড়বে? আমি না হয় নেহাৎ অকর্মণ্য; তোমরা রান্নাঘরে মাড়াবার যুগ্যিও নই; কিন্তু একমুঠো চালও ফুটিয়ে দিতে পারব না? তাতে দুটো আলুভাতে ফেলে দিতে পারব না? আমি পাড়াগেঁয়ে জংলী; ভাল তরকারিটা-আসটা না হয় নাই রাঁধতে পারলাম, কিন্তু...'

কথাবার্তা উল্টা দিকে যায় দেখিয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, 'বাঃ তাই কি বললাম?—ভাল রাঁধতে পার না? কাল রাত্রে ডালনা যা রেঁধেছিলে! একটু নুন কম হওয়া সত্ত্বেও সে কী সুন্দর হয়েছিল। যদি নুনটা ঠিক একটু মাপসই হত তো না জানি...'

হিরণকে একভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।

হিরণ শান্তকণ্ঠে বলিল, 'নুন কম হয়েছিল, কই কাল তো বলনি। ঐটেরই তো বেশি প্রশংসা করলে।'

বসন্ত আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'প্রশংসা না করে উপায় ছিল? জিনিস যা দাঁড়িয়েছিল, অতিবড় শত্রুও প্রশংসা না করে...আর নুন কম মানে—নেহাৎ যেন একটু—মনের সন্দেহ হতে পারে...'

হিরণ সেইরূপেই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কি অপরাধটা করেছি যে শুধু সন্দেহের ওপর রান্নার এই অপবাদটা দেওয়া হল?'

বসন্ত আরও ঘাবড়াইয়া গেল। কি বললে সামলানো যায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, 'এই দেখ! অপবাদ দোব কেন? আর অপরাধের কথা যে বলছ, অপরাধ তো আমারই, আমি যে একটু বেশি নুন খাই—একটা রোগ আমার...'

'বলেছ আমায় সে-কথা এর আগে? নুন একটু বেশি দেওয়া খুব শক্ত—না, জিনিসটা বড় মাগ্যি?'

বসন্ত অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া যেন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বলিল, 'মনে হল একবার বলি, কিন্তু আবার ভাবলাম রোগটা যদি এইভাবে একটু একটু করে সেরে আসে তো...'

হিরণ একটু নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'থামো বাপু, একে আমার মাথার ঠিক নেই!'

ঠাকুর সত্য সত্যই নূতন কাপড়ের জয়পতাকা উড়াইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে। হিরণ নূতন পাচক আনিতে দিল না। রান্নাঘরে অসপত্ন চার্জ গ্রহণ করিয়া স্বামীর দেহচর্যায় পূর্ণ উৎসাহে লাগিয়া গেল।

বিশেষজ্ঞরা যাহাই বলুন না কেন গবর্নমেন্ট নুন জিনিসটাকে এখনও

PATHAGAR.NET

প্রয়োজনমতো মহার্ঘ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোনো বিশেষ আইন করিয়া যদি একেবারেই জিনিসটাকে দেশছাড়া করিয়া লওয়া হয়—অন্তত কিছুদিনের জন্য, তো বসন্ত খুব কৃতজ্ঞ হয়। একবার নুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিয়া সে আর কথাটা ফিরাইতে পারিল না এবং উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে নুন খাইয়া বধূর রান্নার অপ্রশংসা করিয়া নিমকহারামিও করিত পারিল না। যাহোক পাড়াগেঁয়ে প্রচুর টাটকা মাছ আর খাঁটি ঘি-দুধের জোরে দারোগাগিরির হাড়ভাঙা খাটুনি ও হিরণের প্রাণান্তকর পরিচর্যার মধ্যেও শরীরটা কোনো রকমে খাড়া করিয়া রাখিল। কিন্তু রহস্যপ্রিয় বিধাতার বোধ হয় সেইটুকুও সহ্য হইল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিরণের মনটা সাধারণভাবে এ দেশের লোকের উপর সন্দিগ্ধ—তাহার বাপের বাড়ির লোকের তরফ হইতে ট্রেনিং-ই ঐ ধরনের। বসন্তের শরীর যে ভাঙিয়াছে এটা অবশ্য হিন্দু স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইল না। তখন সে একটু চিন্তিত হইল। রান্নার তো কোনো রকমই ত্রুটি নাই, স্বামী রোজ উচ্ছ্বাসিত প্রশংসার সঙ্গে পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিতেছে, অথচ এ-রকমটি হইতেছে কেন? হিরণ একদিন সমস্ত-রাত গভীরভাবে ব্যাপারটা অনুধাবন করিল, তাহার পর তাহার মনে হইল যেন রহস্যটা ধরা পড়িয়াছে।

পরের দিন মাছওয়ালী মাছ দিতে আসিতে হিরণ নিজেই গিয়া সামনে দাঁড়াইল। মাছের কান্‌কো আঁশ সব উল্টাইয়া দেখিয়া পরম বিজ্ঞের মতো মাথা দুলাইয়া বলিল, 'হুঁ বুঝেছি, তুই হারামজাদি রোজ পচা মাছ দিয়ে যাস, তাই বাবু মুখে দিতে পারেন না, রোস।'

মেছুনি যেন আকাশ হইতে পড়িল, তাহার ভোরের ধরা মাছ, তাড়াতাড়ি দারোগাবাবুর বাড়ি যোগান দিতে আসিয়াছে। দুই হাত তুলিয়া, বুক চাপড়াইয়া, আঁখকে কিরা, গঙ্গাজীকে শপথ খাইয়া সহস্রভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। শেষে মাছের কান্‌কোর মধ্যে হাতটা চালাইয়া দিয়া খানিকটা টাটকা রক্ত বাহির করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া বলিল, 'এই দেখুন মাইজী, একেবারে টাটকা খুন, পচার কথা ছেড়ে দিন, একটু বাসি হলেও কি এ জিনিস পাওয়া যেত?'

হিরণ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, তাহার পর তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, 'দেখ, আমি খাস বাংলাদেশের মেয়ে, তোদের কারচুপিতে তোদের দারোগাবাবু ভুললেও আমি ভোলবার পাত্রী নই, তোদের জাতকে আমাদের দেশে ঢের দেখছি, কি করে গেরস্তর চোখে তোরা ধুলো দিস তা যদি আমার জানা না থাকত তো আর এখানে আসতাম না। বলি, ওটা তোর মাছের রক্ত, না?—এইটে আমায় বিশ্বাস করতে হবে?'

মেছুনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটু সংবিৎ হইলে বলিল, 'মাছের রক্ত নয় তো কি মাইজী?'

PATHAGAR.NET

'মাছের রক্ত?—বাসি পচা মাছ সব ফেলে দিয়ে, টাটকা মাছ বেচবি সেই রকম বোকা জাত কিনা তোরা! এখানকার বাজারে লাল খুনখারাবি রং আসে না? কিছু জানি না আমি, না?'

মাগীটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হিরণ বলিল, 'তুই বল্ দিকিন আমার পা ছুঁয়ে, রং গুলে, আর হড়হড়ে করবার জন্য একরত্তি ফেনের সঙ্গে মিশিয়ে কান্‌কোর মধ্যে দিয়ে বাসি মাছ নিয়ে আসিসনি? বল, যে মাছটা সন্ধ্যে পর্যন্ত বিকোয় না, সেটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাস,—সেই লোকসানটা গা পেতে নিস? বল্ না? আ মর্! মাছ না হলে দারোগাবাবুর চলে না, বেশি নুন-ঝাল দিয়ে রেঁধে দিচ্ছি আজ, কিন্তু ফের যদি কখনও কান্‌কোর মধ্যে রং ঢেলে আমায় ভোলাতে আসিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।'

মেছুনি আবার হাজার রকম ভাবে শপথ করিল, কিন্তু কেহ যদি লক্ষ্য করিবার থাকিত তো স্পষ্টই বুঝিতে পারিত—মাছ দিয়া যাইবার সময় সে একটু চিন্তিত ভাবে যাইতেছে, মাথার মধ্যে একটা নূতন ধারণা খেলিতেছে যেন।

দু'-চারদিন ভাল অর্থাৎ পূর্বের মতোই মাছ পৌঁছিল, তাহার পর বসন্ত একদিন খাইবার সময় হাতটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, মাছটা একটু দোরসা বলে বোধ হচ্ছে যেন।'

হিরণ পাখা করিতেছিল, হাতটা থামাইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'ঠিক এই কথাই এবার শুনব তা জানতাম। যদ্দিন পচা দোরসা মাছ মাগী দিয়ে গেছে তদ্দিন তো মুখে একটি কথা ছিল না, আমি যেই তার বজ্জাতি হাতেনাতে ধরে টাটকা মাছের বন্দোবস্ত করলাম, অমনি তুমি দোরসা মাছের গন্ধ পেলে। দেখ, আমারও নাক আছে চোখ আছে, নিজে কিনে, নিজের সামনে কুটিয়ে নিজের হাতে রেঁধেছি, দোরসা হলে ধরা পড়তই, পাতেও দিতাম না; শত্রু নয় তো। আর যদি এতই অপদার্থ মনে কর, এতই অবিশ্বাস, আনিয়ে নাও না বাপু তোমার ঠাকুরকে। মাকে লিখে দিই, নিয়ে যাক আমায়। কেন মিছিমিছি একটা অপযশ ...'

বসন্ত তাড়াতাড়ি সস্নেহে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল, 'না, আমার যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল—সামান্য একটু, তা সন্দেহের উপর তো একটা অপবাদ দেওয়া যায় না! আর ঠাকুর?—তোমার হাতের রান্নার পর আর সে ব্যাটার সে পোড়া-ধরা রান্না কি খাওয়া যাবে? তাকে তো সরিয়েই দেব ভাবছি এবার...'

রান্না কোনোদিন আলুনি হয় না, মাছও শোধরাইয়াছে, স্বামীর শরীরের কিন্তু উন্নতি দেখা যায় না, বরং উত্তরোত্তর যেন খারাপই হইতেছে। দুশ্চিন্তায় আবার হিরণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দোষটা যে কাঁচা আহার্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা এদিকে তো পান হইতে চুনটি খসিতে দেয় না সে।

PATHAGAR.NET

গয়লানী আসিয়াছে, উঠোনে বসিয়া ঝিয়ের সামনে দুধ মাপিয়া দিতেছে। কেঁড়ে হইতে গাইয়ের দুধের ইষৎ হরিদ্রাভ টাটকা ধারা পিতলের মেছলিতে জমা হইতেছে।

হিরণের চোখটা একবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া গিয়া বলিল, 'দাঁড়া, ঠিক গাইয়ের দুধ দিচ্ছিস তো?'

গয়লানী কেঁড়েটা মাটিতে রাখিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'দারোগাবাবু গাইদুধের কম রেটে দুধ নিচ্চেন আর আমি মহিষের দুধ দিয়ে অধর্ম করব মাইজী? বেটাপুৎ স্বামী নিয়ে ঘর করছি...'

হিরণ বিরক্তভাবে মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, 'নে বাপু, আমায় আর তোদের জাতের ধর্ম দেখাসনি,—কথায় বলে গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে। ফেল্ তো মাটিতে দু' ফোঁটা দুধ, দেখি।'

দুটা আঙুল দুধে ডুবাইয়া গয়লানী মাটির উপরে ধরিল। গাঢ় স্নিগ্ধ গুটিকতক দুধের ফোঁটা উঠানের শানের উপর টলটল করিতে লাগিল।

হিরণ একটু ঝাঁকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'কখনও গবুর দুধ নয় তোর, তা ভিন্ন খাঁটিও নয়, টাটকাও নয়। এতদিনে ঠিক ধরেছি, চিরকাল গাই-দুধ খাওয়া অভ্যেস, তার জায়গায় মোষের মাঠা-তোলা তে-বাষ্টে দুধ খেয়েই দিন দিন দারোগাবাবুর শরীরপাত হয়ে যাচ্ছে।'

একে দুধটা খাঁটি বলিয়া অপবাদ যথার্থই গায়ে লাগে, তাহার উপর দারোগাবাবুর ভয়। গয়লানী বুক চাপড়াইয়া, কপাল পিটিয়া স্বামী-পুত্র, গঙ্গামাই, সলেশবাবা, শীৎলামাই-এর শপথ খাইয়া নানাভাবে নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সব বৃথা। হিরণ এই সমস্তর মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিল, 'দেখ, আমি দেশের মেয়ে; বাড়ির পাশে গয়লাপাড়া, আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই। না হয় যা বলছি মিলিয়ে দেখ্।'

হিরণ অভিজ্ঞতার গর্বের সহিত হাতের তর্জনীটা তুলিয়া বলিল, 'সেরে এক পো জল, গেরস্তর বাবারও সাধ্যি নেই—এক ল্যাকটোমিটার ছাড়া...'

গয়লানী শিহরিয়া উঠিয়া চোখ দুইটা হাতে চাপিয়া শপথ করিল, 'হে মাইজী, আঁখ গল্ যায়।'

'রাত্তিরে জ্বাল দিয়ে সরটা তুলে নিস। মোষের দুধ গবুর দুধের মতো পাৎলা হল, তারপর একটু কাঁচা মাখন আবার মিশিয়ে আর একবার জ্বাল দিয়ে ...'

'হে মাইজী, এ সব কিছু জানিও না সাত জন্মে। দোহাই ধর্মের, গবুর বাঁটের টাটকা দোহা দুধ—রং দেখুন—মোষের দুধ তো সাদা হবে?'

হিরণ অনেকটা ভেংচাইয়া বলিল, 'সাদা হবে! এতই বোকা দারোগাবাবুর বউ, না? তোদের দেশে হলুদ নেই তো! হলুট বেটে, পুরু কাপড়ে তার রস নিংড়ে তোমরা দও না তো দুধে? মাইজী তো কিছু জানে না! চালাকি করতে আর জায়গা পাওনি!

গাইয়ের দুধের ডবল দাম, উনি সেই দুধে ঘি না করে বাবুকে নিত্যি যোগান দিচ্ছেন! বড় সোহাগ কিনা...। বাবুকে এতদিন যা ঠকিয়েছিস ঠকিয়েছিস, মনে রাখিস এবার শক্ত লোকের পাল্লা...'

আর দুই-তিন দিন দুধটা ভালই অর্থাৎ পূর্ববৎই আসিল। খুব সম্ভব গয়লাবাড়িতে হিরণের ফরমূলা লইয়া গবেষণা চলিল এ-কটা দিন। তাহার পর একদিন দুধের বাটিতে একটু চুমুক দিয়াই ধীরে ধীরে বাটিটা নামাইয়া বসন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, 'হ্যাঁ গা, যেন হলুদ গন্ধ বেরুচ্ছে দুধটাতে।'

হিরণ ইহার জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল, কিছু না বলিয়া পাখা নামাইয়া ডাকিল, 'দাই।'

ঝি আসিলে বলিল, 'তোদের দারোগাবাবু দুধে হলুদের গন্ধ পাচ্ছেন।'

ঝি স্বভাবতই একটু সাহসিকা, তাহার উপর ক্রমাগতই পরিষ্কার থাকিবার নানা রকম দ্রব্যসম্ভার পাইয়া একেবারেই কর্ত্রীর অন্তরঙ্গ এবং তাহার ফলে আরও বেশি রকম সাহসিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টপ করিয়া দুয়ারের আড়াল হইয়া হাসিতে লুটপুট হইয়া বলিল, 'গে মাই! আইকাল আর কাঁহা হরদি ফোঁটাইছেই?' (মা!—আজকাল আর হলুদ কৈ মশাই?)

'নে থাম্, তোকে আর হাসতে হবে না হারামজাদী, আমার এদিকে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে রোজ রোজ কচি ছেলের মতো বায়নাক্কা দেখে দেখে'—ঝিয়ের ঔদ্ধত্যের জন্য এইটুকু মৌখিক ধমক দিয়া হিরণ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ঐ দেখ, দাইও বলছে আজকাল আর তোমার দুধে হলুদ মেশায় না, তার মানে আগে মেশাত। ছোটলোক হলেও মেয়েমানুষ হলেও, ওর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে। যদ্দিন ছিল দুধে হলুদের গন্ধ, তদ্দিন পেলে না; যেই একটু বুদ্ধি করে সেটা বন্ধ করলাম, বলছ...না হয় দেব'খন মাগীকে আর একবার চুমড়ে, কিন্তু তোমার সেই চিরকেলে হাড়-জ্বালানো সন্দেহ নয় তো?'

নিজের মুখেই এতবার মনের সন্দেহের দোহাই দিয়াছে যে সেটাকে আর অস্বীকার করা যায় না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসন্ত ধীরে ধীরে দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিল। তাহার পর আটকানো নিঃশ্বাসটা খুব জোরে নামিয়া পড়ায়, ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে একটা তৃপ্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, 'নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, মনের সন্দেহই ছিল দেখছি,—ঠাউরে ঠাউরে খেয়ে দেখলাম কিনা। যাক্, মিটে গেল।'

মাছ গেল, দুধ গেল, দু'দিন পরে ঘি-ও নষ্ট হইল। ঘিয়ের গয়লানী মাইজীর গালমন্দর ভিতর দিয়া টের পাইল শহরে ভেজিটেবল ঘি বলিয়া ঘিয়ের এক স্বজাতি দেখা দিয়েছে, ভেজাল দিলে দুনো লাভ বাঁধা। তাহার 'পুরুষ'-কে দিয়া দশ ক্রোশ দূর হইতে এক টিন সংগ্রহ করিল এবং অল্পে অল্পে যোগান দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির মস্তিষ্ককে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

PATHAGAR.NET

ওদিকে মেছুনির কাঁসার চুড়ির মাঝে এক এক জোড়া করিয়া রূপার চুড়ি উঠিয়াছে, দুধের গয়লানীর গা হইতে কাঁসার বালা একবারেই নির্বাসিত হইয়াছে; এখন বেসাতি করিবার সময় তাহারা বাংলাদেশের মেছুনি-গয়লানীর মতোই হাতমুখ খেলাইয়া, গয়না চমকাইয়া বেসাতি করে। সমস্ত গ্রামটা ভেজালে ভরিয়া গিয়াছে, আশেপাশের গ্রামেও শুরু হইয়াছে। বসন্ত গৃহে নিরীহ হইলেও বাহিরে উগ্র, এদিকে উগ্রতাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে বরং। জরিমানা করিল, বেটাছেলেদের ডাকিয়া মারধোর করিল, শেষে ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। কিছু ফল হইল না। হিরণের শিষ্যেরা মাইজীর কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।

হিরণ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'হ্যাঁগা, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি? যদ্দিন ঠকিয়ে এসেছে তদ্দিন তো মুখ বুজে সয়ে গেলে। এখন নিরীহ বেচারীদের উস্তুম-ফুস্তুম করছ কেন বল দিকিনি? একে তো যত আঁকুপাঁকু বাড়ছে ততই শরীর কালি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে, তার উপর নির্দোষীদের শাপমণ্যি খেয়ে একটা কাণ্ড ঘটুক; কথায় কথায় হাত উঁচু করে—দক্ষিণ মুখো হয়ে যেমন সব গঙ্গার দিব্যি, সলেশ ঠাকুরের দিব্যি খায়—আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। রোজ পুরুৎ জ্যোৎষীজীর হাত দিয়ে পাঁচসিকে করে পুজো পাঠিয়ে কোনো রকমে কাটিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে আছে অদৃষ্টে...' হাতে করিয়া আঁচল ধরিয়া তুলিল।

বসন্ত বুদ্ধি করিয়া কিছুদিন ছুটির দরখাস্ত দিয়া দিয়াছিল; দুই মাস পরে বাড়ি আসিয়াছে।

মিত্র-গৃহিণী ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের কথাবার্তা অনেকটা আগাইয়া আনিয়াছেন; এখন হিরণের সাহায্যটাও কাজে লাগাইতে হইবে, কেননা, পয়মন্ত বলিয়া সে শ্বশুর-শাশুড়ির বড় প্রিয় পাত্রী।

সবাই বসিয়া ছিলেন, এমন সময় বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া সদরের দিকে চলিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণী হিরণের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন 'তা বলতে নেই,—এ ক'টা দিনেই বসন্তর আমাদের শরীরটা যেন একটু...তা হবে না গা? বৌদিদির নিজের পছন্দ করা মেয়ে...'

বসন্তর মা বসন্ত মোটা হইয়াছে এটা ধরিয়া লইয়াছেন। মায়ের নজর নাকি বড় খারাপ, সেইজন্য অকল্যাণের ভয়ে এখনও পুত্রকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। মিত্র-গৃহিণীর উভয়স্পর্শী প্রশংসায় সম্প্রীতির সহিত বলিলেন, 'তা সেয়ানা আছে বাপু তোমাদের বৌ, বলছিল কিনা—বলে—মা, কী ভেজ্জালের দেশ! মাছ, দুধ, ঘি, তেল—সব তাতেই কী ভেজালের ছিষ্টি!—শোধরাতে কি কম কাণ্ডটা করতে হয়েছে!...না, বলতে নেই, সেয়ানা আছে...কৈ গো, কাশী থেকে যে জর্দাটা এসেছে, তোমার পিসশাশুড়িকে একটু দাও না বৌমা—'

PATHAGAR.NET

ছড়াছড়ি

পরিমল গোস্বামী

বিয়ের প্রীতি উপহার আর অটোগ্রাফের দাবীতে মাঝে মাঝে ছন্দ ও মিলের আশ্রয় নিয়েছি। মন প্রফুল্ল থাকলে কদাচিৎ কৌতুক রসও দু'-একটির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। 'যষ্টি মধুর' চাপে পড়ে তারই দু'-একটি প্রকাশ্যে বার করা গেল।

অটোগ্রাফ দেবার সময় আগের জনের লেখার কখনো বিপরীত কথা বলতে উৎসাহিত হয়েছি। যেমন বনফুলের একটি অটোগ্রাফ ছিল যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে চেনার চেষ্টা কর, তা হলেই পরকে চিনতে পারবে। আমি তার পরের পাতায় লিখলাম—

'নিজেরে চেনা সহজ নয় পরকে চেনা সোজা,
পরকে ছাড়ি নিজেরে তাই সহজ নয় খোঁজা।
নিজেরে যদি করিতে পার সেবার মাঝে লয়
তবেই তুমি পাইবে জেনো আত্মপরিচয়।'

একখানা পাতায় মনোজ বসুর একটি অটোগ্রাফ দেখলাম—মনোজ মৃত্যুর পর তারা হয়ে আকাশে ঝিকমিক করতে চায়, তার এই বাসনার বিপরীত পাতায় বিপরীত বাসনা প্রকাশ করলাম—

'তারা হবার সাধ নেই ভাই মৃত্যু হলে পরে
অন্ধকারেই মিলিয়ে যাব চিরদিনের তরে;
শ্মশানঘাটের সীমায় হবে সকল অবসান,
তোমার আমার জীবনে ভাই, এটাই হল 'ফান'।'

একখানা খাতায় (কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মনে আছে) দেখলাম নন্দগোপাল সেনগুপ্তর লেখা তারুণ্যের জয়গান। কল্যাণাক্ষ তরুণ, অতএব—। আমি তার বিপরীত পৃষ্ঠায় লিখলাম—

'জিতে যাবে ছোট-সেজ-মেজরা
বুড়োদের জয় নাহি হবে?
ব্রাউনিং 'র‍্যাবি বেন এজরা'
কেন হায়, লিখলেন তবে?
আমি বলি জয় হোক সবারি,
অনুমতি কর যদি নন্দ,
নইলে যে এক-চোখো 'স্নবারি'
অকারণ বাড়াইবে দ্বন্দ্ব।'

PATHAGAR.NET

একখানা খাতায় ভগবানের আহ্বান ছিল, কার লেখা মনে নেই, সেটি যুদ্ধের সময়, বঞ্চনার যুগ। আমি তার বিপরীত পাতায় লিখলাম ভগবানের দৃষ্টি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে আকৃষ্ট করি। এরপর সেদিনের বাজার দর ও কোন কোন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না তার একটি তালিকা লিখে দিয়েছিলাম।

একখানা খাতায় লিখলাম—

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'
বলিতাম বটে আগে
সেদিনের সেই কামনা আজিকে
ভাবিতে অবাক লাগে।
আজও বলি আমি আলোক হইতে
লও আঁধারের তীরে,
আজ তমিস্রা নামুক আমার
সকল চেতনা ঘিরে।
হইয়াছে ভাই ইনসমনিয়া
আজ জানিয়াছি তাই
সবার উপরে আঁধার সত্য।
তাহার উপরে নাই।'

ভোটের সময় এক তরুণ (সরোজকুমার রায়চৌধুরীর পুত্র) অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এলে, আমি লিখলাম—

'মন চায় যাহারে
ভোট দিস তাহারে,
ভুলিস না প্রচারে
তুলিস না ওঁচারে,
ডরিস না খোঁচারে,
নাকওয়ালা বা বোঁচারে,
সার কথা এই—
আর পথ নেই।'

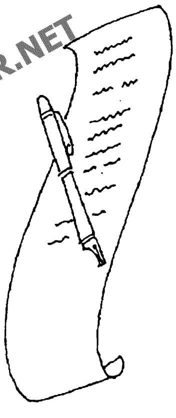

PATHAGAR.NET

বছর পাঁচেক আগে শ্রীমান গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'কথাসাহিত্যের' জন্য একটি লেখার পূর্ব প্রতিশ্রুতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য একখানা পোস্টকার্ড পাঠায়, তাতে শুধু একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই লেখা ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই ন্যূনতম প্রতীক চিহ্নটি দেখে কৌতুক বোধ হওয়াতে তার উত্তরে এই ধাঁধাটি পাঠিয়েছিলাম—

'রাম যোগে হয় সেই মহা রসরাজ,
অন্ত্য অস্তে লোক যোগে শিরে হানে বাজ।
হৃদয়হীন ধরে সেই সোজা পশুবেশ,
তিন অক্ষরে দিনু আমি দিনের নির্দেশ।'

অর্থাৎ পরশু দিন। গজেন্দ্রকুমার ঠিক দিনে লোক পাঠিয়ে লেখাটি সংগ্রহ করেছিল।

অল্পদিন আগে বনফুলের সঙ্গে ছন্দে পত্রালাপ ঘটেছে। ইতিপূর্বেও একাধিকবার ঘটেছে। শেষেরটি দিয়েই শেষ করি :

বনফুলের চিঠি—

He-fill She-fill ছিলে
হালফিল হয়েছ ডি-ফিল।
স্বাস্থ্য কেমন আছে?
কটা রোজ গিলিতেছ পিল?
বর্ধিত রক্তের চাপে
আমি ভাই কিঞ্চিৎ কাবু
মাত্র একটি মুরগি খাই
ধরিনি এখনো ভাই সাবু।

PATHAGAR.NET

আমার উত্তর—

টেম্পোরারি, উপাধি ডি-ফিল।
আছি ভাল, খাইব কি পিল?
প্রেশারের বাড়াবাড়ি হলে
স্মরণে রাখিব রাখি বলে,
উদরের উদ্ঘাটিয়া খিল
মুরগিতে করিব রি-ফিল।

এ চিঠিপত্র আমার 'এককলমী' নামীয় সত্তার সঙ্গে, তাই হয় তো বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। ডি-ফিল আমি পাইনি বলা বাহুল্য।

বেয়াই পরিচয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবেশ্বরবাবু অকস্মাৎ গর্জন করে উঠলেন, আশা—আশা—এই আশা!

রাগে তিনি যেন ফুলছিলেন। কন্যা আশার বয়স হয়েছে, সে সন্তানের জননী। সে আর বাপের ক্রোধকে তেমন ভয় করে না। আর অভ্যাসেও ভয় কেটে যায়। আশা বললে, কি বাবা—দাদা এলো না এখনও?

শিবেশ্বরবাবু বললেন, সেই তো বলছি। তোদের আমি সহ্য করতে পারি না ঠিক এই জন্যে। প্রকাণ্ড মাথাটা এদিকে একবার ওদিকে একবার ঘুরে আবার সোজা হয়ে স্থির হল। আশা বললে, তা আমি কি করব বাবা?

—তবে করব আমি? জুতো মারব সে হারামজাদাকে। সে শুয়ার আমাকে বলে গেল চারটের সময় মোটর নিয়ে আসবে—কোথায় কি? রাস্কেল—ইডিয়ট।

অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল ছেলে সুধীরের উপর। সুধীরের শ্বশুরবাড়ি শ্যামবাজার। সেখানে শিবেশ্বরবাবুর আজ যাওয়ার কথা ছিল। সুধীরের উপর আদেশ ছিল চারটের সময় সে মোটর নিয়ে ফিরবে এবং একসঙ্গে সেখানে যাওয়া হবে। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে তবু সে ফেরেনি। সুধীর ইঞ্জিনিয়ার, সে স্বাধীন ভাবে কন্ট্রাকটারের কাজ করে। আশা বললে, একটু দেরি হলই বা বাবা!

—দেরি হলই বা? চালাকি নাকি? দেরি হবে কেন? কেন হবে?

শিবেশ্বরবাবুর চোখ দুটো হয়ে উঠল যেন গোল ভাটা, ঠোঁট দৃঢ় চাপে উঁচু হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাকম্পন এবং তৎসঙ্গে বিপুল গোঁফজোড়াটাও ফুলে উঠল। তারপর তাঁর কথা ছিল হয় গম্ভীরভাবে হুম, নয় অ্যাও!

আগে বাড়িতে তাঁর শুধু 'অ্যাও' চলত। কিন্তু আশার ছেলে রমু দেখেশুনে একদিন বলেছিল, ঠিক যেন হুলো বেড়াল।

তার উত্তরে লাউড স্পিকারের আওয়াজের মতো এমন এক ধমক তিনি মেরেছিলেন যে রমু কেঁদে উঠেছিল। সেই অবধি লজ্জিত হয়ে শিবেশ্বরবাবু বাড়িতে অভ্যেস করেছেন—হুম!

যাক্—এর পরই হুকুম হল—নিয়ে আয় আমার কাপড়-জামা। আমি বেরুব।

—দাদা—

—অ্যাও—

এমন একটা গর্জনে আশাকে তিনি সম্বোধন করলেন যে আশা আর প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

PATHAGAR.NET

কাপড়-জামা হাতে দিয়ে আশা অনেক সাহস করে বললে, চিনে যেতে পারবে তো? চোখ গোল হয়ে উঠল, ঠোঁট-নাক উঁচু হয়ে গেল।—সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ, তারপর—দুম্। যেতে পারব না? মীরাটের গলির চেয়ে বেশি গোলমাল কলকাতার রাস্তা? খাইবার পাসের চেয়ে দুর্গম? ইডিয়ট কোথাকার।

আশা সরে পড়ল।

বাইরের সিঁড়িতে লাঠির ও জুতোর সদম্ভ আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সে বললে, মাগো গোরা সেপাই ঘেঁটে ঘেঁটে বাবার মেজাজ ঠিক লড়াইয়ে গোরার মতোই হয়েছে।

মা বললেন, গোরা নয় মা, তোমার বাবা লড়াই-এ মেড়া। গুঁতো খেয়ে খেয়ে আমার প্রাণ গেল।

শিবেশ্বরবাবু কলকাতায় একরকম নতুন লোক। তাঁর এতটা বয়স কেটেছে বাংলার বাইরে। যুদ্ধ বিভাগের কমিসরিয়েটে তিনি কাজ করতেন। যৌবনে বলতেন—হ্যাঁ, কাজ করতে হয়তো এই কাজ! বেটাছেলের কাজ। কামান গোলা বন্দুক আর সেপাইদের মধ্যে বাস না করলে উত্তেজনা কোথা? অন্য যে সব কাজ—সে হল মেয়েমানুষের কাজ। ছিঃ—

ছেলে সুধীরকে তিনি রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাকেও যুদ্ধ বিভাগে ঢোকাবেন। কিন্তু শেষে—বদলে গেল মতটা। সুধীরের বিয়ে ঠিক হল কলকাতায় শ্যামবাজারে। ঘটকালি করেছিলেন শিবেশ্বরবাবুর সম্বন্ধী সুরেন্দ্রবাবু। মেয়ে দেখা থেকে সমস্ত পাকা কথাবার্তা প্রায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শিববাবুর স্ত্রী এসেছিলেন বাপের বাড়ি ভাইপোর বিয়েতে। সেইখানেই প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান; সঙ্গে সঙ্গে কতাবার্তাও স্থির হয়ে গেল। শিববাবু অমত করলেন না, ছুটির দরখাস্ত করলেন, ছুটিও মঞ্জুর হল। তাঁর ইচ্ছে একমাত্র ছেলের বিবাহ বেশ খরচ করেই দেবেন। দিন স্থির হল ১৮ই মাঘ। পৌষ মাসের শেষে সপরিবারে কলকাতায় আসবাব কথা। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো সীমান্ত প্রদেশে গোল বেধে উঠল। ওদিকে বাচ্চাইসাকো আফগানিস্থানে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে। যুদ্ধ বিভাগ থেকে পরোয়ানা জারি হয়ে গেল—সর্বদা প্রস্তুত থাক, কখন রওনা হতে হবে তার কোনো স্থিরতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে শিববাবুর ছুটিও নামাঞ্জুর হয়ে গেল। উপায় নাই। কিন্তু শিববাবু একটা ভীষণ দিব্য দিয়ে বললেন, আমার বংশে যদি কেউ এ মিলিটারিতে কাজ করে সে শুয়ার, সে গাধা। তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করব, সে ছেলেই হোক—আর নাতিই হোক।

যাক বিবাহ হয়ে গেল। ছেলের মামাই বরকর্তার কাজ করলেন। বিবাহের পর বৌ নিয়ে শিববাবুর পরিবার মীরাটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন, বাড়ি-ঘর তৈরি কর আর সুধীর সেখানে কন্ট্রাক্টারের ব্যবসা করুক। এ ঝঞ্ঝাট মিটলেই আমি রিটায়ার করব।

PATHAGAR.NET

বালিগঞ্জে বাড়ি হল। সুধীর আপিস খুললে। তার শ্বশুর ধনপতিবাবু সত্যিই ধনপতি। মহাজনী কারবার ছিল। বৃদ্ধ বয়েসে জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলেন। তিনি দেখতেন হিসেব, সুধীর আঁকত প্ল্যান, তিনি খাটাতেন মজুর, সুধীর গাঁথুনিতে মারত লাথি।

যাক্ শিবেশ্বরবাবু পরশু সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে। ইতিমধ্যে মাসখানেক হল সুধীরের একটি খোকা হয়েছে। শিববাবু পৌত্র দেখবার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সুধীরকে বললেন, শ্যামবাজার যাব বৌমাকে দেখতে। শ্বশুরকে বলবি তোর—তাঁর ওখানে আজ আমার নেমন্তন্ন।

সেই নিমন্ত্রণ নিয়ে এত ব্যাপার।

শিববাবু রাস্তায় ভাবলেন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। কিন্তু আবার মনে হল এখানকার ড্রাইভাররা শোনা যায় অনেকে গুণ্ডা। তার চেয়ে 'বাস' অনেক ভাল—শ্যামবাজারে যাবেই সে—এ পথ ভোলা তার চলবে না। অন্তত যাত্রীরা পথ ভুলতে দেবে না। কাজেই বাস স্ট্যান্ডে এসে দু'বার তিনবার 'শ্যামবাজার' লেখাটা পড়ে, তিনি উঠলেন বাসে, কন্ডাক্টার হাঁকছিল—ধরমতলা—ডালহৌসি—শ্যামবাজার। বাস ছাড়ল।

যাত্রী কম, এক এক সিটে এক একজন বসেছিলেন। বাসখানা ধীরে ধীরে কিছুদূরে যায় আর থামে। থামল যদি তো আর যেতেই চায় না। শিবেশ্বরবাবু চটে উঠলেন। চৌরঙ্গী পর্যন্ত যেতেই আধঘণ্টা লেগে গেল। তিনি চটে বললেন, কি করছ তোমরা? আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কন্ডাক্টার উত্তরই দিল না।

তিনি বললেন, এই।

কন্ডাক্টার বললে, কি এই এই বলছেন মশাই? আমরা এমনি ভাবেই যাই। ভারী!

শিববাবুর ঠোঁট, নাক, গোঁফ ফুলে উঠল,—তারপর শোনা গেল—'অ্যাও'। কন্ডাক্টার চমকে উঠল।

একজন সহযাত্রী বললে, আপনি ট্রামে চড়লেন না কেন? ওদের সঙ্গে মারামারি করে কি করবেন?

—ও। আচ্ছা তাই যাব আমি! এই রোখো,—ম্যায় উতার যাউঙ্গা। গাড়ি ডালহৌসি স্কোয়ারের কোণে এসে পড়েছিল, তিনি সেইখানে নেমে পড়লেন। ট্রাম আসে যায়, শিববাবু ঘাড় উঁচু করে পড়েন 'শ্যামবাজার' লেখা আছে কিনা। অবশেষে শ্যামবাজার এল। অফিস-আদালতের ছুটির সময়—কণ্ঠায় কণ্ঠায় যাত্রী ঠাসা। শিববাবু উঠে পড়লেন। ভিতরে স্থানাভাব! একটু এগিয়ে গিয়েই একটা সিট খালি হল, একজন উঠে গেলেন। একপাশে ডিসপেপসিয়ার রোগীর মতো খিট্‌খিটে এক বৃদ্ধ বসে রইলেন।

শিববাবু টাল খেতে খেতে গিয়ে সেই সিটে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে

PATHAGAR.NET

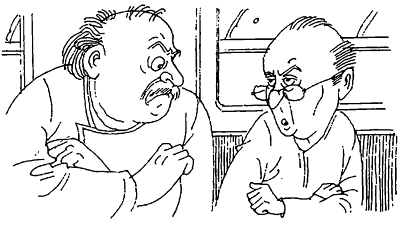

বিশাল ভুঁড়িতে কাতুকুতুর মতো একটা কনুই-এর গুঁতো খেতে দেখলেন সেই খিটখিটে বৃদ্ধের কনুইটা, তাঁর ভুঁড়িতে বিদ্ধ হয়ে গেছে! তাঁর চোখ দুটো পাকিয়ে উঠল—নাক, ঠোঁট, গোঁফ ফুলে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর—হুম্!

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ চশমাসুদ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর ফেলে, মুখটা বিকৃত করে উঠলেন। শিববাবুর মাথাটা ক্রোধে বার কয়েক এদিক-ওদিক ঘুরে গম্ভীর ভাবে সোজা হল। তারপর তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে সহযাত্রীর প্যাকাটির মতো হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, হটাও।

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টি হানে।

উত্তরে শিববাবু চোখ পাকিয়ে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে নাক, ঠোঁট, গোঁফ।

ওপাশের বৃদ্ধ বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, কি বিশ্রী চেহারা!

শিববাবু অগ্নিদৃষ্টি হানলেন। মাথাটা বার দুয়েক ঘুরল। তিনি একটু চেপে বসলেন।

রোগা ভদ্রলোককে শিববাবু জাঁতিকলে ইঁদুরের মতো ট্রামের দেওয়ালের সঙ্গে চেপ্টে ধরেছিলেন। তিনি কনুইয়ের গুঁতো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, সরে বসুন না মশাই! শিববাবু আরও একটু চেপে বসলেন।

—শুনতে পাচ্ছেন না?

উত্তর নাই। আরও চেপে গম্ভীরভাবে শিববাবু সম্মুখের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

—ওই ঢাউস—পেট মোটা—কালা বেলুন—

—অ্যাও।

চোখ পাকিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে শিববাবু কঠোরভাবে সহযাত্রীর দিকে চাইলেন।

PATHAGAR.NET

খিটখিটে বৃদ্ধ রোষে দাঁত খিঁচিয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন।

শিববাবু ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, খেঁকি কুকুর!

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ রাগে পাগল হয়ে উঠলেন, বললেন, খবরদার!

আরও একটু চাপ দিয়ে শিববাবু বললেন, ছুঁচোর মতো ছুঁচোল মুখ।

সহযাত্রীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। নইলে নিশ্চয়ই নিজের অবস্থা ভুলে শিববাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করতেন। উপস্থিত শুধু অতি কষ্টে বললেন, আর তুই?—তুই তো হুমো বেড়াল—

—অ্যাও!

—কি!

সেটা কিন্তু পিষ্ট অবস্থার জন্য অনুনাসিক হয়ে 'চিঁ'র মতো শোনাল।

শিববাবু বললেন, চেপ্টে চিঁড়ে বানিয়ে ফেলব তোকে।

—বটে!—আমি তোকে পুলিশে দেব। সাক্ষী থাকুন আপনারা—বলে চেঁচিয়ে উঠল রোগা লোকটি। অন্যান্য সহযাত্রীরা সকলেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তাতে এতক্ষণ আশঙ্কার চেয়ে আনন্দই পেয়েছিলেন বেশি। সকলেই মুখ টিপে হাসছিলেন। এখন রোগা বৃদ্ধের অবস্থা দেখে তাঁরা শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন।

একজন তিরস্কার করে বললে, একি মশাই—দু'জনেই আপনারা বয়স্ক লোক—একি আপনাদের আচরণ?

কন্ডাক্টার এসে শিববাবুকে বললে, আপনি এদিকে এসে বসুন বাবু।

ওদিকে একটা সিট এতক্ষণে খালি হয়েছিল।

শিববাবু হুঙ্কার দিলেন, কভি নেহি! দরকার হয় উনি যেতে পারেন।

উনি বললেন, আমিই বা যাব কেন? আমারও right আছে এ সিটে বসতে।

সহযাত্রীরা অনুরোধ করলে—তাহলে কিন্তু মশাইরা মারামারি করবেন না আর! কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ওপাশের বৃদ্ধ পেষণের কষ্ট ভুলতে পারেননি। নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন, ইডিয়ট!

—অ্যাও!—

শিববাবুর নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

—চোপ!

রোগা বৃদ্ধ রুখে উঠল।

সকলে আবার বলে উঠল—একি মশায়, আবার?

আবার চুপচাপ। কিন্তু মনের রোষে দু'জনেই ফুলছিলেন।

শীর্ণ বৃদ্ধ প্রায় মনে মনেই বললেন, হুতোম পেঁচা! শিববাবুর কান বড় তীক্ষ্ণ—বার দুই ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন, তুই চামচিকে।

—তুই হাতি।

—তুই টিংটিঙে ফড়িং।

PATHAGAR.NET

—নন্‌সেন্স।

—রাস্কেল।

—ড্যাম।

—স্টুপিড্‌!

বেড়ালের ইঁদুর ধরার মতো শিববাবু খপ করে দুই হাতে বৃদ্ধকে ধরে ফেললেন।

হাঁ-হাঁ করে সকলে এসে পড়তে না পড়তে রোগা বৃদ্ধকে দুটো প্রবল ঝাঁকি তিনি দিয়ে ফেলেন।

কন্ডাক্টার এসে বলল—নেবে যান আপনারা বাবু। গাড়ির ভিতর এরকম—

শিববাবু গর্জে উঠলেন, কভি নেই। সঙ্গে সঙ্গে নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

রোগা বৃদ্ধের কিন্তু আর সে গাড়িতে থাকতে সাহস হচ্ছিল না; তিনি স্বেচ্ছায় নেমে গেলেন।

অনেক প্রশ্ন করে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে বেয়াই-এর বাড়ির রাস্তা শিববাবু খুঁজে পেলেন। মনে মনে তিনি সুধীরের বাপান্ত করছিলেন। কুড়ি নম্বর বাড়িতে যেতে হবে তাঁকে। আঠারো নম্বরের কাছাকাছি, আর একটা গলি ঐ রাস্তাটাকে কেটে চলে গেছে। সেখানে আসতেই ও-মোড় থেকে এগিয়ে আসা সেই রোগা বুড়োর সঙ্গে দেখা।

PATHAGAR.NET

রোগা বুড়ো তাঁকে দেখেই একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, লাফিয়ে উঠে বললেন, এইবার কি হয় শালা—

—অ্যাও!

গর্জন করে শিববাবু কাপড় সাঁটতে প্রবৃত্ত হলেন।

পিছন থেকে একখানা মোটরের হর্নে দু'জনকেই রাস্তার একপাশে সরতে হল। মোটরটা থেমে গেল।

সুধীর মোটর থেকে নেমে বললে, এই যে! আপনাদের পরিচয় তাহলে হয়ে গেছে?

দুই বৃদ্ধই দু'জনের মুখপানে চেয়ে রইলেন।

সুধীর রোগা বৃদ্ধকে বললে, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে আপিসে দেখি আপনি চিঠি লিখে রেখে ট্রামে চলে এসেছেন। শিববাবুকে বললে, বাড়ি গিয়ে দেখি আপনিও বেরিয়ে পড়েছেন।

শিববাবু মোটা হলেও বুদ্ধিমান লোক। দুই বাহু বিস্তার করে ধনপতিবাবুকে জাপ্‌টে ধরে বললেন, আরে বেয়াই যে? সুধীরের একটু ধাঁধা লাগল—সে বললে, সে কি আপনাদের পরিচয়—

শিববাবু বললেন, হয়ে গেছে।

ধনপতিবাবু তখন আলিঙ্গনের চাপে কোঁক-কোঁক করছিলেন।

দোলের দিন

বনফুল

সত্যই তো, দোলের দিন। অখিলবাবুরা যে পাড়ায় বাস করেন সে পাড়ায় সুজতা দেবীর স্বস্তি না পাবারই কথা। আশেপাশে যত কুলি মুটে মিস্ত্রী মারোয়াড়ি। ছোটলোকের পাড়া। অখিলবাবুরা এসে পর্যন্ত খুঁতখুঁত করেছেন সবাই। অখিলবাবুর দুই মেয়ে অনিমা-তনিমা তো বটে, ছোট খোকা ওস্তাদ পর্যন্ত। সুজাতা দেবীর তো কথাই নেই, তিনি বিলেত ঘরের মেয়ে। ফিরপো, লেডল্, হ্যামিলটন্, আরমি-নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। অখিলবাবুর হাতে পড়ে তাঁর অধঃপতনই হয়েছে, একথা তিনি এবং তাঁর স্বজনবর্গ সবাই জানেন, বলেনও। কিন্তু নিয়তির ওপর তো আর কথা চলে না। অখিলবাবু সাবডেপুটি। সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর ওপর বাড়ি ভাড়া করবার ভার ছিল। জিতেনবাবু অখিলবাবুর অধঃস্তন কর্মচারী, তিনি আলো, হাওয়া, সস্তা এইসব দেখে বাড়িটা পছন্দ করেছিলেন। পাড়াটাও খুব খারাপ বলে তাঁর মনে হয়নি। কিন্তু তাঁর মন আর সুজাতার মন আকাশ-পাতাল তফাত যে, সে কথা সুজাতা মুখ ফুটে বলেও দিয়েছেন তাঁকে একদিন। জিতেনবাবু ভদ্রতর পাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এসব করতেই হবে, উপায় কি!

কোনোক্রমে তবু চলছিল, দোল এসে পড়াতে ব্যাপারটা কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠল। অনিমা-তনিমার বয়স হয়েছে, তাদের নিয়েই আরও বেশি মুশকিল হল। পাড়ায় যত সব অসভ্য লোকেদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাঁহাতক চলতে পারে মানুষ! দোলের হিড়িকে আরও বেয়াদপ হয়ে উঠেছে যেন সবাই। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে পড়েছে সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশে খানিকটা মাঠ আছে। সন্ধের পর সেখানে এসে লোকগুলো গান-বাজনার নামে যে হল্লা হৈ হৈটো করেছে এ ক'দিন তা বলবার নয়। গান-বাজনারই বা কি বাহার—খচ—খচ—খচ আর তার সঙ্গে বেসুরো চিৎকার তাড়ির ভাঁড় সামনে রেখে। এ ক'দিন এতটুকু স্বস্তি ছিল না বাড়িতে। অনিমা সন্ধের পর সেতার বাজায়, তনিমা স্বরলিপি দেখে গান শেখে, কিন্তু কানের কাছে এই তাণ্ডব হতে থাকলে কি আর কিছু করা যায়? ওস্তাদের পড়াও শিকেয় উঠেছে, পাড়ার যত সব অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে এরই মধ্যে দুটো-একটা খারাপ কথা শিখেছেন ছেলে। এ পাড়ায় থাকলে জংলী বুনো হয়ে যাবে ও। অখিলবাবু সকালে খেয়ে কোর্টে বেরিয়ে যান, ফেরেন পাঁচটায়, জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান,

PATHAGAR.NET

'হ্যাঁ, সেইটেই।'

'সে তো চমৎকার বাড়ি। এখনই যাওয়া যায়?'

'এখনই?'

'এখনই যাব তাহলে। এখানে চতুর্দিকে যা কাণ্ড ঘটেছে—'

'কেন কি হল—'

'কপাট বন্ধ করে বসে আছি সকাল থেকে—'

জিতেনবাবু সুজাতা দেবীর শুভ্র কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখলেন। সুতির হলেও দামী কাপড়। রঙ লেগে নষ্ট হয়ে গেলে সত্যিই কষ্টের কারণ ঘটবে।

'আচ্ছা দেখি তাহলে—'

জিতেনবাবু চলে গেলেন।

সুজাতা দেবী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করলেন! একটু পরে এক ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে অখিলবাবু এলেন। গাড়োয়ান লালে লাল, ঘোড়া দুটোর গায়েও রঙ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় অখিলবাবুও নিস্তার পাননি।

'রাস্তায় দিলে বুঝি কেউ—'

'না, রাস্তায় দেয়নি। দিলেন স্বয়ং এস. ডি. ও ভদ্রলোক। সেকেলে গোঁড়া লোক কি আর করি বলি—'

'সোফাটায় বসো না যেন ধপ করে। কাপড়-চোপড় ছাড় আগে, ছি ছি, পাঞ্জাবিটা নষ্ট করে দিয়েছে একেবারে, এমন দামী সিল্কটা—'

সন্ধ্যা আসন্ন।

উন্মত্ত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। তাদের আনন্দ কলরব এখনও থামেনি। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস মদির হয়ে উঠেছে, অশোক পলাশ কিংশুকের পল্লবে জীবনবহ্নি লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন, স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার-পুষ্পভারে শাখা প্রশাখা অবনত, শুভ্রকুন্দকু সুমগুচ্ছ ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রিয়াদন্তপংক্তিশোভা, কালিদাসের কালে যেমন দিত। কোকিল ডাকছে, ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত যে উঠেছে কান্নকান্তর প্রকৃতজনতা সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রঙে-রসে আনন্দ-নেশায় বিভোর হয়ে উন্মত্তের মতো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও।

ছ্যাকড়া গাড়ির দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ করে সুজাতা দেবী চলেছেন সভ্য পাড়ায়।

PATHAGAR.NET

ঝি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশে সাত পুরুষে কেহ চাকরি করে নাই, তাই প্রথম চাকরি পাইয়া ভয় হইয়াছিল, না জানি কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভাগ্যে আছে।

মার্চেন্ট আপিসে কেরানির চাকরি। যাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরি পাইয়াছিলাম তিনি আপিসের বড়বাবু, আমার পিতৃবন্ধু—নাম গণপতি সরকার। ভেলকি-টেলকি দেখাইতে পারিতেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সহজেই চাকরি জুটিয়াছিল। এমন কি আমাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিতে হয় নাই।

গণপতিবাবুর চেহারাটি ছিল তাঁহার পাকানো উড়নি চাদরের মতোই ধোপদুরস্ত এবং শীর্ণ নমনীয়তায় বঙ্কিম; তাঁহাকে নিংড়াইলে এক বিন্দু রস বাহির হইবে এমন সন্দেহ কাহারও হইত না। ক্রমশ জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি বিলক্ষণ রসিক লোক, কিন্তু তাঁহার সরসতা ছিঁচকে চোরের মতো এমন অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত যে সহসা ধরা পড়িত না।

তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিবার পর তিনি মাঝে মাঝে মুখের বামভাগে একপ্রকার ভঙ্গী করিতেন; তাহাতে তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোণ পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত। এই ভঙ্গীটাকে হাসিও বলা যায় না, মুখ-বিকৃতি বলিলেও ঠিক হয় না—

যেদিন প্রথম আপিস করিতে গেলাম, গণপতিবাবু আমার সাজ-পোশাক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আর সব ঠিক আছে, কিন্তু লপেটা চলবে না; কাল থেকে শু পরে আসবে। চলো, তোমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। সাহেবের সামনে বেশি কথা কইবে না; তিনি যদি রসিকতা করেন, বিনীতভাবে মুচকি হাসবে।'

বলিয়া তিনি গালের ভঙ্গী করিলেন।

বেশ ভয়ে ভয়েই সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া কিন্তু একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সাহেব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নরমূর্তিতে কল্পনা করিলে ইঁহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; বেঁটে, মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দুটি কুঁচের মতো লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে! বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের নিচেই। প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একমুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলায়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।

PATHAGAR.NET

পরে জানিতে পারিয়াছিলাম মিস্টার ঘনশ্যাম ঘোষ একজন অতি তুখোড় ও কর্মনিপুণ ব্যবসায়ী, বছরে বার দুই বিলাত যান; সেখানে কোম্পানির বিলাতী কর্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় ওঠে বসে। বস্তুত, বিলাতী সওদাগরী আপিসে একজন বাঙালীর এমন অখণ্ড প্রতাপ আর কখনও দেখা যায় নাই।

আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ব্যবহার করিলেন যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভয় তো দূর হইলই, ইনি যে একজন অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তি একথাও আর মনে রহিল না! কথার অমায়িকতায় মুহূর্ত মধ্যে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

'এই যে বড়বাবু, এটি বুঝি আপনার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট? বেশ বেশ।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?—বসো।...বড়বাবু, আপনি আপনার কাজে যান না... বিয়ে করেছ? বেশ বেশ, আরে, তোমাদেরই তো বয়েস। এখন চাকরি হল, আর কি! মন লাগিয়ে কাজ করবে—ব্যাস, দেখতে দেখতে উন্নতি; আমার আপিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না...নাও, পান খাও...আরে, লজ্জা কিসের? তোমরা হলে ইয়াং ব্লাড, নতুন বিয়ে করেছ, পান খাও তা কি আর আমি জানি না? আমার আপিসে ডিসিপ্লিনের অত কড়াকড়ি নেই...নাও নাও—হে হে...'

তারপর সুখস্বপ্নের মতো দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোনোদিন কল্পনা করি নাই। কাজকর্ম এমন কিছু নয়, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দু'ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারে। তারপর অখণ্ড অবসর, সমবয়স্ক সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প-গুজব, বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানা। কর্তা প্রায়ই ডাকিয়া পাঠান, তাঁহার সামনে চেয়ারে গিয়া বসি, তিনি পান দেন, খাই, কখনও বাড়ি হইতে ভাল পান সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিই। তিনি খুশি হইয়া খুব রঙ্গতামাশা করেন, কখনও বা রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার হাসি-তামাশা একটু আদিরস-ঘেঁষা হইলেও ভারি উপাদেয়। বস্তুত, তিনি যে অত্যন্ত নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না।

গণপতিবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন, 'ও হে বাবাজী, একটু সামলে চলো। কর্তা তোমাকে ভাল নজরে দেখেছেন খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু যতটা রয়-সয় ততটাই ভাল। আস্কারা পেয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলো না—নিজের পোজিশন বুঝে চলো। কর্তা লোক খারাপ নয়, কিন্তু কথায় বলে—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...'

লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কর্তার সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে খাঁটি রাখিয়াছিলেন! কর্তা তাঁহার সহিতও হাস্য-পরিহাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে মুচকি মুচকি হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তরই দিতেন না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একদিন দুপুরবেলা অবকাশের সময় কর্তার ঘরে গিয়াছি; ঘরে পা দিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলাম। কর্তা নিজের চেয়ারে

PATHAGAR.NET

ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন, আমার সাড়া পাইয়া চোখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। জবাফুলের মতো লাল চোখে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি চাও? এ ঘরে তোমার কি দরকার?'

তাঁহার এ-রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনি নাই, থতমত খাইয়া গেলাম, 'আজ্ঞে-আমি...'

তিনি লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিলেন, 'পান চিবুতে চিবুতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে আপিস করতে এসেছ ছোকরা? এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি পেয়েছ বটে! গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও টুলে বসে কাজ করোগে। তোমার মতো পুঁচকে কেরানি খবর না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন সাহসে? ফের যদি এ-রকম বেচাল দেখি, দূর করে দেব...'

হোঁচট খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।—এ কি হইল?

নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় গিয়া বসিলাম। অভিভূতের মতো আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

আমি নূতন লোক, তাই বড়বাবুর পাশেই আমার আসন। চোখ তুলিয়া দেখিলাম তিনি গভীর মনঃসংযোগে খস্‌খস্‌ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, আর সকলে নিজ নিজ কাজে মগ্ন, কেহ মাথা তুলিতেছে না। আমি কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কি হয়েছে, কাকাবাবু?'

তিনি লেখা হইতে চোখ না তুলিয়াই চাপা গলায় বলিলেন, 'কাজ করো—কাজ করো...'

সেদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর বাসায় গেলাম। তক্তাপোশের উপর বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, সদয়কণ্ঠে বলিলেন, 'এসো বাবাজী।'

PATHAGAR.NET

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শেষে অতি কষ্টে বলিলাম, 'কি হয়েছে আমায় বলুন। আমার কি কোনো দোষ হয়েছে?'

তিনি বলিলেন, 'না—তোমার আর দোষ কি? তবে বলেছিলুম, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...'

'এর মধ্যে কোনো কথা আছে। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কাকাবাবু।'

তিনি কিছুক্ষণ একমনে ধূমপান করিলেন।

'খুলে বলবার মতো কথা নয়, বাবাজী।'

'না, আপনাকে বলতে হবে। কেন উনি আজ আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন?'

তিনি দীর্ঘকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল তাঁহার গালে মাঝে মাঝে খাঁজ পড়িতে লাগিল।

'বলুন কাকাবাবু!'

'তুমি ছেলের মতো, তোমার কাছে বলতে সংকোচ হয়। আসল কথা—ঝি।' বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; তাঁহার গালে একটা বড় রকমের খাঁজ পড়িল।

কিন্তু—ঝি! কথাটা ঠিক শুনিয়াছি কি না বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বললেন, ঝি?'

গণপতিবাবু উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ ক'দিন থেকে বড় সাহেবের মন ভাল যাচ্ছে না...আয়া জানো—আয়া? যে-সব ঝি সাহেবদের ছেলে মানুষ করে? আমাদের বড় সাহেবের ছেলেদের আয়া হপ্তাখানেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মাথা গুলাইয়া গেল; গণপতিবাবু এসব আবোল-তাবোল কি বলিতেছেন? বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো বলিলাম, 'কিন্তু—কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

গণপতিবাবু তখন বুঝাইয়া দিলেন। স্পষ্ট কথায় অবশ্য কিছুই বলিলেন না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে, অর্থপূর্ণ ভ্রূ-বিলাসে, সময়োচিত নীরবতায় এবং গালের বিচিত্র ভঙ্গী-দ্বারা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে ব্যাপার এই—আমাদের বড় সাহেব বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হন; তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই মারা যান। তারপর হইতে শিশুকে লালনপালন করিবার জন্য ঝি— অর্থাৎ আয়া রাখা হয়। সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঘনশ্যামবাবু অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝি নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো কারণে ঝি মনের মতো না হইলে, কিংবা ছাড়িয়া গেলে সাহেবের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, এমন কি তাঁহার স্বভাবই একেবারে বদলাইয়া যায়। গত কয়েক মাস একটি ক্রিশ্চান যুবতী কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ বিবাহ করিবার অজুহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ মনের মতো নূতন ঝি পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই অনর্থ।

PATHAGAR.NET

থ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এও কি সম্ভব! এই কারণে মানুষের চরিত্রে এমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু গণপতিবাবু তো গুল মারিবার লোক নহেন। তবু এক সংশয় মনে জাগিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিন্তু উনি আবার বিয়ে করেন না কেন?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর গণপতিবাবু দিলেন।—ঘনশ্যামবাবুর শ্বশুর অদ্যাপি জীবিত; তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহার সন্তানসন্ততি কেহ জীবিত নাই, এই দৌহিত্রই—অর্থাৎ ঘনশ্যামবাবুর পুত্রই তাঁহার উত্তরাধিকারী। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জামাতা বাবাজী যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া এক দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়কে সেবায়েত নিযুক্ত করিবেন।

সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তবু একটা গোলচোখো বুদ্ধশ্বাস বিস্ময় মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল। এমন সব ব্যাপার যে দুনিয়ায় ঘটিয়া থাকে তাহার অভিজ্ঞতা তখন একেবারেই ছিল না।

তারপর পাঁচ-ছয় দিন কাটিল। আপিসে যতক্ষণ থাকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! ইতিমধ্যে দু'-তিনজন সহকর্মীর সামান্য ত্রুটির জন্য অশেষ লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। চাকরি যে কী বস্তু তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেদিন আপিসে গিয়ে সবেমাত্র নিজের আসনে বসিয়াছি, আর্দালি আসিয়া খবর দিল বড় সাহেব তলব করিয়াছেন। প্রীহা চমকাইয়া উঠিল। এই রে, না জানি কোথায় কি ভুল করিয়া বসিয়াছি, আজ আর রক্ষা নাই!

ফাঁসির আসামীর মতো কর্তার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া হেঁটমুখে দেরাজ হইতে কি একটা বাহির করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়াছি—দেখ দেখি খেয়ে; মুক্তো-ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস!—হে হে হে...'

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া এইভাবে চলিল—যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়। ইনি যে কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ! তিনি আবার আমাকে তাঁহার সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিতে বসিতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিলাম, 'কাকাবাবু, ব্যাপার কি?'

গণপতিবাবু কলমে একগাছি চুল জড়াইয়া গিয়াছিল; সেটিকে নিব্ হইতে সন্তর্পণে মুক্ত করিয়া তিনি অবিচলিতভাবে আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়া ঘষা গলায় বলিলেন, 'ঝি পাওয়া গেছে।'

বলিয়া গালের ভঙ্গী করিলেন।

পান্নালাল

সজনীকান্ত দাস

যাঁহারা তরুণ বলিতে নরুণপাড় ধুতি-পরিহিত, অতিরিক্ত কাব্যপাঠের দরুণ চশমারূপ যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে যে কোনো চওড়া-পাড় চলিষ্ণু শাড়িকে তরুণী কল্পনা করিয়া করুণভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া বরুণ দেবতার কোলে দেহরক্ষা করিতে দ্বিধা করে না—এরূপ এক সম্প্রদায়ের বাঙালী ছোকরার কথাই মনে করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পান্নালাল হাজরাকে দেখেন নাই। পান্নালাল তরুণ বইকি। যে বৎসর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, পান্নালাল সে বৎসর হামাগুড়ি দিয়া দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গাইতে শুরু করিয়াছে, অভিধানে পাওয়া যায় এমন দুই-চারিটি শব্দও উচ্চারণ করিতেছে এবং মায়ের কোমর ধরিয়া প্রায় উদয়শঙ্করী ভঙ্গিতে নাচিতেও আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং পান্নালালকে পোস্ট-ওয়ার তরুণও বলা চলে। তাহা ছাড়া সে যখন এম. এ পড়িতেছে এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে গত বৎসর বি. এ ডিগ্রী লইয়াছে তখন একই অধ্যাপকের নাকের সম্মুখে আধুনিক তরুণীদের পাশে বসিয়া ক্লাস করিয়াছে নিশ্চয়ই, একই গেট দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে সদর রাস্তা পর্যন্ত যে যায় নাই, অথবা একই ট্রামে বা বাসে কচিৎ কখনও ভ্রমণ করে নাই, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। চোখাচোখি বা ছোঁওয়াছুঁয়ি নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে, তবে তাহাতে সাধারণত যে রোমান্সের কল্পনা করিয়া আমাদের মনে পুলক-সঞ্চার হয়, পান্নালালের ক্ষেত্রে তাহা দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; সে কটমট করিয়া চাহিয়াছে এবং ধাক্কা দিয়া নিজের পথ করিয়া লইয়াছে মাত্র।

PATHAGAR.NET

পান্নালালের চেহারা ভাল, শরীর রীতিমত মজবুত, চুল ব্যাকব্রাশ করা, চওড়া কপাল, চশমাহীন চোখ, মানানসই নাক, গোঁফের রেখামাত্র আছে, শ্যামবর্ণ, হাফ হাতা শার্ট, মালকোঁচা-মারা ধুতি। মুখে-চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি, সমস্ত দেহে চপল তারুণ্য পাঞ্জা কষিয়া, ঘুষি ছুঁড়িয়া ও নানাবিধ দুষ্টামি করিয়া তাঁহার প্রকাশ; কবিতা লিখিয়া, প্রেমপত্র ছাড়িয়া চোরা ছাউনি ছুঁড়িয়া নহে। কলেজে স্পোর্টসে সর্বাগ্রে তাহার নাম; প্রফেসার জব্দ করার পাণ্ডা সে। এক কথায়, পান্নালাল তরুণ হউক আর নাই হউক অত্যন্ত মডার্ন।

কলেজে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে তথাকথিত তরুণের অভাব নাই! তাহারা জটলা করিয়া দেখে, একলা একলা মজে। বারোয়ারী বউদিদির কাছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; বায়রন অনুবাদ করিয়া প্রেমপত্র লেখে, কলেজ হইতে লুকাইয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড

PATHAGAR.NET

াহ করে এবং মাঝে মাঝে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে টাকা খানেকের রজনীগন্ধা বা গোলাপফুল কিনিয়া শয্যায় বিছাইয়া মরিয়াও বসে; তাহারা অতি আধুনিক কবিতা পড়িয়া সহপাঠিনীদের পড়াইতে চায়, ঠিকানা ভুল করিয়া তাহাদের দুই-খানা উদগ্র সাইকলজিকাল উপন্যাস সহপাঠিনীদের বইয়ের বোঝার মধ্যে চলিয়া , ছবিও যে দুই-চারিখানা এদিক-ওদিক গিয়া না পড়ে তাহা নয়; কোন বান্ধবী । কোন সিনেমায় যাইবে, তাহার হিসাব তাহারা রাখিয়া থাকে এবং মাসিক াহিকে দুই-একটা উদ্দেশ্যমূলক কবিতাও ছাপাইয়া থাকে। পান্নালাল এই সব টিমার্কা ছেলেদের সুনজরে দেখে না।

পান্নালাল যখন ফোর্থ ইয়ার আর্টসে, মিস করুণা মিত্রের সে বছর থার্ড ইয়ার! কবারে যাহাকে বলে অপরূপ, সে ছিল তাহাই। বাপ বড়লোক, ভবানীপুর হইতে টরে কলেজে আসিত। সে যে দেখিবার মতো একটা বস্তু —এ কথা কলেজের ড়া দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়ো প্রফেসরগুলো পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার তেন; ছেলেদের তো কথাই নেই। এক পিরিয়ড হইতে অন্য পিরিয়ডে ঘর

বদলের সময় পথে বারান্দায় একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত—করুণা ঘামিয়া চুমিয়া একেবারে লাল হইয়া তবে ক্লাসে ঢুকিতে পারিত।

এ হেন করুণা মিত্র পান্নালাল হাজরার প্রেমে পড়িয়া গেল। সহপাঠিনীদের নিষ্কাম দূতীগিরির চোটে পান্নালালের গায়েও একদিন আচমকা ইহার আঁচ আসিয়া লাগিল। সে প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ক্রিকেট মাঠের ফিল্ডিঙের চোখে একবার আপাদমস্তক করুণাকে দেখিয়া তাহার মন্দ লাগিল না। ব্যাস, সেই এক সেকেন্ডে। তারপর গুজগুজ ফুসফুস না করিয়া সে একেবারে স্ট্রেট করুণার গাড়ির কাছে গিয়া বলিল, সোজা বাড়ি যাবেন তো? আমি আপনার সঙ্গে রসা রোড পর্যন্ত-যাব! দেবেন একটা লিফ্‌ট?

বিষম অবাক হইলেও করুণা খুশি হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করা উচিত প্রথমটা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, তা বেশ তো, আসুন না। কলেজের গেটের সামনে তখন অর্ধোদয় স্নানের ভিড়।

গাড়ি ছাড়িতেই পান্নালাল ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, শুনলাম, আপনি নাকি আমাকে ভালবেসেছেন?

ড্রাইভারের সামনে লটকানো আয়নাটায় করুণার লজ্জিত মুখখানা মন্দ দেখাইল না। সে যেন একটা ধাক্কা খাইল। এই অপ্রত্যাশিত অভদ্র প্রশ্নের জবাবই বা সে কি দিবে? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ঠেস-দিয়াই বলিল, আপনার আত্মপ্রত্যয় তো দেখছি অসাধারণ!

আনডন্টেড পান্নালাল এবার অবাক। এক মিনিট মাথা চুলকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, তা হলে গুজবটা মিথ্যে। ধন্যবাদ। এই ড্রাইভার রেখো।

লজ্জায় নিজের গাড়ির তলায় পড়িয়া করুণার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার সময় ছিল না। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়াই সে পান্নালালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যা শুনেছেন সত্যি কিন্তু...

চট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পান্নালাল বলিল, এসব কিন্তু-টিন্তু আমি বুঝি না! প্রেম পড়ে থাকা ভাল। তবে আরও দু' বছর সবুর করতে হবে। এম. এ.-টা পাস করে নিই। এর মধ্যে এক ছত্র চিঠি লিখবে না বা কখনও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইবে না। রাজী?

করুণার হাসি পাইল, ভাল লোককে সে বাছিয়া লইয়াছে! গম্ভীর হইয়া বলিল, রাজী, কিন্তু...

আবার কিন্তু?

বাবা-মা যদি এর মধ্যে অন্য কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেন?

খুন হয়ে যাবেন, খুন হয়ে যাবেন। বলিতে বলিতে পান্নালাল চলন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল, গাড়ি তখন পোড়াবাজারের মোড় ফিরিতেছে।

PATHAGAR.NET

বি. এ. পাস করিয়া পান্নালাল যখন ইউনিভার্সিটির পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইল, তখন দুইজনে প্রথম ছাড়াছাড়ি। তথাপি ছাত্রছাত্রী মহলে সকলেই জানিত, রামের যেমন সীতা, সত্যবানের যেমন সাবিত্রী, পান্নালালের তেমনই করুণা; দুইজনের সম্পর্ক জ্যামিতির যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু করুণার বাপ-মায়ের তাহা জানিবার কথা নয়। অমন চেহারা এবং এমন গুণসম্পন্ন মেয়েকে যে কোনো আই. সি. এস লুফিয়া লইবে; নিদেনপক্ষে একজন ব্যারিস্টার। মোদ্দা কথা, পয়সাওয়ালা বিলেতফেরত একজন চাইই।

পান্নালালের সেদিকে হুঁশ নাই। সে কলেজে বরাবর রাইট অ্যাবাউট টার্ন করিয়াছে, করুণাদের বাড়ির দরজা কখনও মাড়ায় নাই। সে জানিত, যেদিন দরজা মাড়াইবে, সেদিন একেবারে শ্বশুর-শাশুড়িকে করণীয় প্রণামটাও সারিয়া লইবে; তৎপূর্বে যাতায়াত লেগ বিফোর উইকেটের মতো, ভাল নয়। করুণা নিজের স্বার্থ ভাবিয়া বাবা-মার সহিত পান্নালালের আলাপ করাইতে ব্যস্ত হইত, কিন্তু পান্নালালের ধমকে চুপ করিয়া যাইত। তাহার ব্যস্ততার আরও একটা কারণ ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছিল। ব্যারিস্টার বারিদবরণ রায় সম্প্রতি বড় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করিয়াছে। মায়ের তাহাকে ভারী পছন্দ, এবং মায়ের পছন্দই বাবার পছন্দ।

করুণার শাড়ি ও ব্লাউজের রঙমিল বা রঙছুট লইয়া ব্যারিস্টার বারিদবরণ আজকাল মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছে, কলেজ হইতে ফিরিতে দেরি হইলে এক্সপ্লানেশন চায়। করুণা ভিতরে রাগে গরগর করিতে থাকিলেও ভয়ে পান্নালালকে কিছু বলে না। টাকার উপর আবার পান্নালালের টাক বেশি।

পান্নালালের এম. এ. পরীক্ষার আর বছরখানেক বাকি, করুণা বি. এ. পাস করিয়া ঘরে বসিয়া আছে; ভারতীয় বাছাই টিমের সঙ্গে পান্নালালের সাউথ আফ্রিকা যাইবার কথা উঠিয়াছে। করুণা প্রমাদ গণিল। নানাদিক বিবেচনা করিয়া একদিন ইউনিভার্সিটির দরজায় পান্নালালকে ধরিয়া বলিল, আমার খিদে পেয়েছে।

পান্নালাল তখন বেলেঘাটায় ভিজিয়ানাগ্রামের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে স্থির করিয়াছে, ভয়ানক ব্যস্ত, চ্যালারা সব তাহার পিছনে। চটিয়া উঠিয়া বাঁ হাতের বুড়া আঙুল দিয়া পুঁটিরামের দোকানটা দেখাইয়া বলিল, ওইখানে যাও, এটা ইউনিভার্সিটি।

করুণাও চটিল, বলিল, তা জানি। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে, কথা আছে।

পান্নালাল রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু করুণার মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, ব্যাপারটা গুরুতর। চ্যালাদের হাতের ইশারায় কি বলিল বুঝা গেল না, করুণাকে বলিল, চল।

রয়াল হোটেলে চায়ের অর্ডার দিয়া একটা পার্টিশন করা খোপে ঢুকিয়া পান্নালাল বলিল, ব্যাপার কি বল তো?

PATHAGAR.NET

করুণা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ব্যারিস্টার বারিদবরণ।

চড়াৎ করিয়া পান্নালালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, বলিল, গড ব্লেস হিম। করুণা তাহাকে আরও চটাইবার জন্য বলিল, গড নয়, পুরুত...আসছে অঘ্রাণে।

বটে! বলিয়া রাগে পান্নালাল একটা আট আনা দামের আস্ত কেক মুখে পুরিল।

করুণা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, কর কি? অসুখ করবে যে!

করুক অসুখ। আমি যাব না সাউথ আফ্রিকা। বয়!

করুণা বলিল, বয় নয়, এবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হুঁ, তোমার বাবা নয়, একেবারে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। চড় মেরে দেব একেবারে। বয়!

করুণা ভয় পাইয়া বলিল, আবার বয়! পালিয়ে বিয়ে করবে নাকি আমাকে?

পান্নালাল এবার ভীষণ চটিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, আই অ্যাম নট এ কাওয়ার্ড। তোমার বাবা সম্প্রদান করবেন, তবে বিয়ে করব।

করুণা বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, আরও ক্রিকেট খেলে বেড়াও। মেয়ে না হয়ে ক্রিকেটার বল হলেও...

ফাজলামি করো না। বয়!

করুণাকে পান্নালাল যখন বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হইবে। ব্যারিস্টার বারিদবরণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহিরের ঘরে করুণার মায়ের সহিত গল্প করিতেছে, দেখা গেল। করুণা অনুভব করিল, পান্নালালের হাতের মাসল ক্রমশ শক্ত হইতেছে। ভয় পাইয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর, বিশ মিনিটের মধ্যে হ্যারিসন রোড পৌঁছবে, নইলে আমি ঘরে ঢুকব না। বল।

পান্নালাল প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, চাপিয়া গিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা...আচ্ছা।

PATHAGAR.NET

বক্সিঙের চ্যালা হরেকৃষ্ণ শীল হইল স্পাই। সে যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বর...রাত্রি ৭ টা হইতে ৯টা...করুণার গান, পাঁপর ভাজা, চা।

৫ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টা মা, বারিদরণ, করুণা লেক জলে ঢিল ছোঁড়া।

১৯এ সেপ্টেম্বর ঐ তিনজন মার্কেট, গিয়াসুদ্দীন কেক।

২৩এ সেপ্টেম্বর...বাড়ির ছাদ...করুণা, মা, পরে বারিদবরণ। মা নিচে, পরে করুণাও।

২৪ সেপ্টেম্বর...বারিদবরণ...ডিনার রাত্রি ১২ টা।

১লা অক্টোবর রাত্রি আটটায় রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল. সি. মিত্র মহাশয়ের 'হার্মিটেজ' নামক বাড়ির দরজায় কোলপাসিকল্ গেটের সামনে একজন লম্বা জোয়ান পুরুষ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সহিত তর্ক করিতেছে, দেখা গেল। তাহার

বাম বগলে বালিশ মোড়া একটি শতরঞ্জি এবং ডান হাতে একটি প্রমাণ সাইজ সুটকেস। দারোয়ান যত বলিতেছে, ই বাড়ি নেহি হ্যায় বাবু, সে ব্যক্তি ততই জিদ চড়াইয়া বলিতেছে, আরে বাবা, এহি বাড়ি, ই'তো বিশ নম্বর হ্যায়? শেষ পর্যন্ত কোলাপসিকল গেট ফাঁক হইতে লাগিল, দারোয়ান আর রাখিতে পারে না। দারোয়ান হাঁকিল...সাব।

বারিদবরণ তখন ড্রয়িং রুমের সোফায় বসিয়া করুণার ছেলেবেলার ফেটোর অ্যালবাম দেখিতেছিল, করুণার মা চোখে চশমা আঁটিয়া কি একটা পত্রিকা পড়ার ফাঁকে ভাবি জামাতা বারিদবরণের সহিত বার্তালাপ করিতেছিলেন। 'সাবু' অর্থাৎ মিঃ মিত্র কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকিবেন।

দারোয়ানের চিৎকার শুনিয়া বারিদবরণ ছুটিয়া আসিল, বলিল, কোন হ্যায়?

দারোয়ান তখন প্রায় ঘায়েল হইয়াছে, ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, হুজুর বোলতেঁহে সাবকা দামত, বাকি...

আগন্তুক চিৎকার করিয়া বলিল, বাকি কিরে ব্যাটা? নগদ জামাই। মিসেস মিত্র এতক্ষণ ড্রয়িং রুমের পর্দার ফাঁক দিয়ে ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন, তাঁহার পিছনে করুণা উঁকি মারিতেছিল। পান্নালাল ইহার মধ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া করুণাকে চুপ করিয়া থকিতে ইঙ্গিত করিল। করুণা ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার ছুটিয়া মিসেস মিত্রের কাছে আসিল, বলিল, আপনাদের কোনো জামাই হবে।

মিসেস মিত্র আকাশ হইতে পড়িলেন, অমন একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে বোঁচকা-সম্বলিত লোকের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইবার কথা। বলিলেন, জামাই? তা হবেও বা, মিত্তির গুষ্টির সবাইকে আমি আবার চিনিও না। ডালপালা নিয়ে বংশটি তো সোজা নয়। তা বাপু, উনি আসা পর্যন্ত ঐ ঘরে বসতে বল, ও চোয়াড়ে চেহারার সামনে আমি বেরুতে পারব না।

মায়ের কথা শুনিয়া করুণা মনে মনে গজরাইতে লাগিল, চোয়াড়ে চেহারাই বটে!

বিপদ বুঝিয়ে ব্যারিস্টার বারিদবরণ সেদিন বিদায় লইল।

যে ঘরে পান্নালালকে বসতে দেওয়া হইল, সেটা চাকরবাকরদের ঘর, একরকম খালিই থাকে। একটা তক্তাপোশ পাতা আছে, তাতে অনেককালের বাসি ধুলো। পান্নালাল তাহারই উপরে শতরঞ্জিটা পরিপাটি করিয়া পাতিয়া লইল। দুই দিকের দেওয়ালে দুইটা তাক, ধূলিমলিন জীর্ণ বই দিয়া ঠাসা, তাহারই একটা টানিয়া লইয়া ধূলি ঝারিয়া পড়িতে বসিবে—পিছনের দরজা দিয়া করুণা পা টিপিয়া টিপিয়া উপস্থিত। বলিল, এ করছ কি? তোমার জ্বালায় কি শেষে আত্মহত্যা করব?

পান্নালাল গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাইতে বলিল, তার দরকার হবে না। তুমি শুধু কালা-বোবা সেজে বসে থাক।

PATHAGAR.NET

করুণা রাগিয়া বলিল, সোজা কথা কিনা! তোমাকে যা-তা সব বলবে...

বলুকগে।

করুণা আর থাকিতে পারিল না, পান্নালালের হাত হইতে জীর্ণ বইখানা কাড়িয় লইয়া বলিল, আর ভালছেলেগিরি ফলাতে হবে না। ওঠ, তক্তাপোশটা ঝেড়ে দিই

দারোয়ানটা যেখানে বসে, সেখান হইতে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, দিদিমণি-আগন্তুক বাবুকে উঠাইয়া তক্তাপোশের ধুলো ঝাড়িতেছে। সে সুর করিয়া তুলসীদাস পড়িতে লাগিল।

ব্রিজ খেলায় হারিয়া উত্তেজিত ভাবে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিঃ মিত্র বাড়ি ফিরিলেন। গৃহিণীর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, সর্বনাশ করেছ, জামাই, না, আমার মুণ্ডু! ও নিশ্চয়ই স্বদেশী ডাকাত, ফেরারী, আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে। চল, কোথায় দেখি।

আমি বাপু পারব না, তুমি একলাই যাও।

মিঃ মিত্র অগত্যা শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া পান্নালালের হাতকাটা গেঞ্জি চড়ানো শক্ত-সামর্থ চেহারাটা দেখিয়াই যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, তা বাবাজি, মুখ-হাত ধুয়েছে তো, জল-টল—

পান্নালাল দ্রুত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, সে হবে'খন।

তা বাবা তুমি বুঝি—

পান্নালাল মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহার লজ্জাটা মিঃ মিত্র নিজেই যেন অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি আমাদের সুরেশের জামাই? অনেকদিন তো তোমার সঙ্গে—

মরিয়া হইয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য পান্নালাল বলিল, আপনার শরীর ভাল আছে তো? আর বুবি? তাকে সেই...

বুবি করুণার ডাকনাম।

মিত্র মহাশয় হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, অন্যায় হইতেছে, ছোকরা স্বদেশী ডাকাত নয়, নিকট আত্মীয়ই কেহ হইবে। নেহাৎ চাকরদের ঘরটায় তাহাকে...

তা বাবা, মুখ-হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর। ওরে হরে!

হরি আসিতেই বলিলেন, দেখ দক্ষিণের কুঠুরিটা...

খুড়তুতো ভাই সুরেশের কাছে পাছে অপ্রস্তুত হইতে হয়—এই ভাবিয়া তিনি শঙ্কিতই হইয়া পড়িলেন।

প্রথম রাত্রের ফাঁড়া নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। করুণা কিন্তু সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই পান্নালাল হরিকে ডাকিয়া পোয়াটাক ছোলা ভিজাইতে

বলিয়া ঘটা করিয়া ডন বৈঠক শুরু করিল। ছোলা ভিজার কথা শুনিয়া সদ্য-ঘুমভাঙা মিত্র গৃহিণী চটিয়াই আগুন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, করুণা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, তুমি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে না মা?

দায় পড়েছে আমার!—বলিয়াই তিনি একেবার দক্ষিণের কুঠুরির বারান্দায় ঘুরিয়ে আসিলেন, খালি গায়ে মাস্‌ল-ঘোলা পান্নালাল তখন দরদর করিয়া ঘামিতেছে ও গুনগুন করিয়া একটা ভজন গাহিতেছে।

দৃশ্যটা মিত্র গৃহিণীর মন্দ লাগিল না। চমৎকার শরীর! নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন স্নেহসিক্ত হইতে লাগিল। মিঃ মিত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যাও একবার, ভাল করে জামাইয়ের সঙ্গে—

এই ফাঁকে করুণা চট করিয়া একবার ঘরে ঢুকিল, বলিল, খুব রঙ্গটাই শুরু করেছ যা হোক। শেষরক্ষে কিসে হবে শুনি?

পান্নালাল যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনভাবে বলিল, আদা আছে? নুন আর আদা?

কি বুদ্ধি তোমার! আমি আনব কি করে? হরিকে ডেকে বল।

ছোলা-ভিজে, নুন, আদা, মধু, দাঁতন—সাহেব আখ্যাত রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে যেন সত্যই ডাকাত পড়িয়াছে। যে কোনো মুহূর্তে অগ্নুৎপাত আশঙ্কা করিয়া করুণা ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। পান্নালাল নির্বিকার চিত্তে হুকুম দিল, খাঁটি সরষের তেল আধ পোয়া।

হরি অনেককাল এ বাড়িতে কাজ করিতেছে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখে নাই। ফিরিঙ্গি বারিদবরণকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার মেদিনীপুরে মার্কা প্রাণে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিত। আগন্তুকের ধরনাটা নতুন হইলেও সে দেশী খাঁটি সরিষার তেল আনিতে ছুটিল।

গতরাত্রে জামাই আসার ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল, তাহা দেখিবার জন্য বারিদবরণ সকালেই আসিয়াছিল। তেল মাখিয়া স্নান সারিয়া পান্নালাল তখন চা খাইতে ড্রয়িং রুমে আসিয়াছে, বারিদবরণের ঠিক পাশেই তাহার চেয়ার। দৈনিক বাজার করা মিঃ মিত্রের বিলাস, তিনি বাজারে গিয়াছেন। চা আসিয়াছে, করুণা এক কোণে বসিয়া গম্ভীরভাবে পাশাপাশি উপবিষ্ট বারিদবরণ ও পান্নালালকে দেখিতেছে, মিত্র গৃহিণী রান্নার তদারক করিতে ভিতরে গিয়াছেন।

কথায় কথায় বারিদবরণ প্রশ্ন করিল, আপনি থাকেন কোথায়?

কাহারও দিকে না তাকাইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে পান্নালাল বলিল, কলকাতা, হ্যারিসন রোড।

বারিদচরণ চমকিয়া উঠিল। বলিল, মানে?

করুণা বিপদ গণিল, সে আর ঘরে থাকিতে সাহস করিল না।

PATHAGAR.NET

পান্নালাল শান্তভাবে পেয়ালাটা সামনের ট্রেতে রাখিয়া ড্রয়ারটা ঘুরাইয়া বারিদবরণের মুখোমুখি বসিয়া বলিল, মানে অতি সোজা, আপনাকে তাড়াতে এসেছি।

পান্নালালের দেহটার দিকে আপাদমস্তক চাহিয়া বারিদবরণ একবার টাকে হাত বুলাইল। তারপর খামকা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আই মীন হোয়াট আই সে!

বারিদবরণ আরও চেঁচাইতে যাইতেছিল, পান্নালাল বলিল, চুপ, চেঁচিয়েছেন কি ঘাড় ধরে—

কি?

কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। করুণার আশা আপনাকে ছাড়তে হবে, ট্রাই ইওর এল্স্‌হোয়্যার। ও আমার।

বারিদবরণ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, গায়ের জোর নাকি? মিঃ মিত্রকে—

সোজা এখান থেকে বাড়ি যাবেন। মিঃ মিত্র কিংবা মিসেস মিত্রকে কিছু বলেছেন কি ফাটিয়ে দেব আপনার টাক। পান্নালাল হাজরার নাম শুনেছেন?

বক্সার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই আপনার সম্মুখে। গুড বাই।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাহির হইয়া গেল। একেবারে ল্যান্স ডাউন মার্কেটের পথে।

মাঝরাস্তায় হরেকৃষ্ণ তাহাকে ধরিল, এদিকে নয়, মিঃ রায়। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার হুকুম আছে আমার ওপর। একটা ফিটন ডাকব?

বারিদবরণ ভাবিল, গুড গড, ইংরেজ রাজত্ব কি আর নাই!

বারিদবরণের বাড়ির দরজা তক্ পৌঁছাইয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, নমস্কার, আমরা আশেপাশেই থাকব। মিঃ মিত্রের বাড়ির দিকে ক'দিন যাবেন না যেন, দেখবেন। নমস্কার।

রাগে ও গরমে বারিদবরণের টাকে ঘাম দেখা দিল। টেলিফোনও ছাই মিঃ মিত্রের বাড়িতে নাই যে—। তাহা ছাড়া সেই গুন্ডাটা সেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে।

বারিদবরণ সমস্যা যতক্ষণে শেষে হইল, ততক্ষণে পান্নালাল চা খাইয়া দক্ষিণের ঘরে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতে বসিয়াছে, মিঃ মিত্র বাজার হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারিদবরণ তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াতে গৃহিণীর উপর তম্বি করিতেছেন। করুণা এই অবসরে চুপি চুপি পান্নালালের কাছে গিয়া বলিল, এসব করছ কি বল তো! আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। ধরা পড়লে—।

PATHAGAR.NET

পড়লে কি? ধরা তো পড়বই।

বাবা যদি পুলিশ-টুলিশ ডাকেন, যদি তোমায় অপমান করেন?

সতী দেহত্যাগ করবে, আমি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দোব। তোমাকে কাঁধে ফেলে ধেই ধেই করে নাচব।...বলিয়া পান্নালাল করুণাকে কাঁধে তুলিতে গেল। করুণা পলাইয়া বাঁচিল।

মিঃ মিত্র ও পান্নালাল টেবিলে সামনাসামনি খাইতে বসিয়াছে, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিঃ মিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সুরেশের...

মিসেস মিত্র চাটনি আনিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন, করুণা সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতেছে, তাহার ঘোর সবুজ রংয়ের লালপাড় শাড়িটা পান্নালালের মগজে রং ধরাইয়া দিল। সে হঠাৎ হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি সুরেশের কেউ নই।

মিত্র সাহেব চমকাইতেই দইয়ের প্লেট হইতে চামচটা ঝনাৎ করিয়া মেঝেতে পড়িল। এমন ভয় পাইয়া গেলেন যে, মনে হইল, তিনি একটা রিভালবারও যেন দেখিয়াছেন। গোড়ায় যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই বুঝি ঠিক, স্বদেশী ডাকাতির আসামী না হইয়া যায় না। চটিয়া পুলিশ ডাকাও ঠিক হইবে না।

মিঃ মিত্রের গোড়ার সন্দেহের কথাটা পান্নালাল করুণার কাছে শুনিয়াছিল, বিনীতভাবে বলিল, কোনো উপায় ছিল না আমার। পুলিশে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আমি নিরুপায় হয়ে...

সর্বনাশ! চট্টগ্রাম।

আজ্ঞে না, হিলি। কটা দিন আমাকে অশ্রয় দিন, আপনাকে বিপদে আমি ফেলব না। দু'দিন গাঢাকা দিয়ে থাকলেই...

এতদিন পরে মিঃ মিত্র ইষ্টদেবতার শরণ লইলেন। তাঁহার মনে হইল, টিকিটিকি পুলিশ তাঁহার বাড়ি ঘেরাও করিয়াছে, থানা এজাহার আর আদালতে সাক্ষী দিতে দিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত। হয়তো আসামীর কাঠগড়াতেই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে, গৃহিণী এবং করুণার উপরও নিশ্চয়ই জুলুম চলিবে, আর মাসিক পেন্‌শনের টাকাগুলি...মিঃ মিত্র আর ভাবিতে পারিলেন না, চট করিয়া এঁটো হাতেই পান্নালালের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমি বুড়ো মানুষ, তুমি আমার ছেলের বয়সী, আমাকে বাঁচাও বাবা।

মিত্র গৃহিণী চাটনি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক। সাহেব তো সকালে কখনও সেই ওষুধটা খান না, তবে?

জানলার ফাঁক দিয়া করুণা ঘটনাটা দেখিয়া গিয়াছে। পান্নালাল আঁচাইয়া পরম পরিতৃপ্তি সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে দক্ষিণের ঘরটায় প্রবেশ করিতেই সে ঝড়ের

PATHAGAR.NET

মতো সেখানে গিয়া বলিল, দেখ বাবাকে নিয়ে যদি অমন রসিকতা শুরু কর, তাহলে আমি মার কাছে সব ফাঁস করে দোব কিন্তু। বাবা বুড়ো মানুষ—

পরে সুদে আসলে সব শোধ দোব রুবি, এখন বেগতিক। তোমার টেকো ব্যারিস্টারের চিঠি এসে পড়বে আজ সন্ধ্যায়, না হয় কাল সকালে, তখন? আসল লোকটাকে না হয় হরেকেষ্টর জিম্মায় রেখে দিয়েছি, এখন ডাকঘরকে ঠেকাই কি করে?

ওই বুদ্ধি নিয়েই তুমি শেষরক্ষে করবে ভেবেছ, না? মশাই, চিঠির ব্যবস্থা আমি করব, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে অঘ্রাণ মাস যে এসে পড়ল, তার হিসাব আছে?

পান্নালাল যেন সদ্য আকাশ হইতে পড়িল, চোখ দুইটা ছানাবড়ার মতো করিয়া সে একবার করুণার দিকে চাহিল। পরক্ষণেই চট করিয়া মালকোঁচা মারিয়া লইয়া ডান হাতের চাপড়ে বাঁ হাতের বাইরে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে আওয়াজ তুলিতে তুলিতে বলিল, কুছ পরোয়া নেহি।

করুণা আর অপেক্ষা না করিয়া বাবার ঘরে আড়ি পাতিতে ছুটিল। স্বামী-স্ত্রীতে ততক্ষণে পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে, রুবির বিয়েটা লইয়াই যত গোল, নতুবা তাঁহারা আজই শিমুলতলা রওনা হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। বারিদবরণের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত ডাকাতটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যার দিকে মিঃ মিত্র বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া যখন বারিদবরণের বাসা হইতে ফিরিলেন, তখন এদিকেও বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

পান্নালাল এবং করুণার কলেজঘটিত ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বারিদবরণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ছাত্রছাত্রী মহলে তাহারা উভয়ে বিশেষ পরিচিত, তাহাদের প্রেম এত পুরাতন যে, সকলে প্রায় তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। কেবল মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র এবং ব্যারিস্টার বারিদবরণই যেন চোখ বুজিয়ে কাল কাটাইতে ছিলেন।

মিঃ মিত্র বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়ার পরেই মিসেস মিত্রও ছাতে উঠিয়া পায়চারি শুরু করিয়াছিলেন, হঠাৎ কি একটা কাজে নীচে নামিয়া করুণাকে আপেলের পুডিংটা সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। করুণা ঘরে নাই। এ ঘর ও ঘর খুঁজিলেন, কোথাও নাই। হঠাৎ মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়াতে পা টিপিয়া টিপিয়া দক্ষিণের ঘরের খোলা দরজার কাছে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। স্বদেশী ডাকাতটা চিৎ হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহার আদরের কন্যা পাকা গিন্নীর মতো তাহার শিয়রে বসিয়া চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচাড়াইতেছে। যুগপৎ বিস্ময়ে এবং ক্রোধে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

PATHAGAR.NET

পান্নালালই প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানী বুদ্ধিও যে তাহার মাথায় খেলে নাই, তাহা নয়। সে যেন মিসেস মিত্রকে দেখে নাই—এই ভাবে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া করুণার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, আমরা স্বদেশী ডাকাত হত্যার চাইতেও নিদারুণ, খুনের চাইতেও নির্মম, তোমার গয়নাগাঁটি যা আছে দিয়া ফেল, দেশের কাজ, মায়ের—

কিন্তু প্রহসনটাকে আর বেশিদূর টানিতে ইচ্ছা হইল না। সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মাথা নিচু করিয়া ঘরের একপাশে দাঁড়াইল। করুণা মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, মা, আমাকে মাফ কর! তাহার চোখে জল।

মা-মেয়ে বাহিরে হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা অদ্যোপান্ত শুনিয়া মা বলিলেন, এদ্দিন বলিসনি কেন? বললে এত গোল হত না। আর ওই বা এত গোঁয়ার-গোবিন্দ কেন, একেবারে বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে এসেছে?

অবনত মস্তকে আমতা আমতা করিয়া করুণা বলিল, ওরও কেমন বদ-স্বভাব মা, কোনো কাজই আর পাঁচজনের মতো করবে না।

তা হলে তো ওর হাতে পড়লে কষ্ট পাবি তুই।

আমার সয়ে গেছে মা।

এবারে মায়ের কথা জোগাইল না। প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, তুই যা মা, পান্নালালের কাছে, আহা বাছাকে কালকে একটা মশারিও দেওয়া হয়নি। এক কাপ চা খাবে কি না জিজ্ঞেস কর্।

এমন সময় কাটা টিকটিকির লেজের মতো লাফাইতে লাফাইতে লাঠি হস্তে মিঃ মিত্রের প্রবেশ। কোথায় সে হারামজাদা, দেখে নোব, আমার সঙ্গে চালাকি! বুবি—বুবি!

মিসেস মিত্র ততক্ষণে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, আঃ কর কি? কাকে হারামজাদা বলছ? ও তোমার জামাই যে। বুড়ো বয়েসে...

জামাই, না তোমার মুণ্ডু। বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হয়ে জামাই হতে আসবে? চাই না অমন...

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি চুপ কর, ওই ওর কেমন স্বভাব।

তিনি করুণার কাছে যেমন শুনিয়াছিলেন, ঘটনাটা স্বামীর কাছে বলিতে লাগিলেন। পান্নালাল ও করুণা ততক্ষণে আসিয়া মিত্র সাহেবের পায়ের ধুলো লইয়াছে। রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মেয়ে ও ভাবী জামাইকে আশীর্বাদ করিয়াই বলিলেন, তা দেখ বাপু তোমার চ্যালাকে বারিদবরণ ওখান থেকে।...

পান্নালাল তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না, বলিল, আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

PATHAGAR.NET

ভেজালের উৎপত্তি

মনোজ বসু

চাল-তেল-মাছ-মিঠায়ের আকাল। আবার ভূতেরও আকাল যাচ্ছে, সেটা ঠাহর করেননি বোধ হয়। কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে কত ভূতের বাড়ি ছিল, ভুলেও কেউ ছায়া মাড়াতো না, ভূত সরে গিয়ে এখন মানুষ কিলিবিল করে সে সব জায়গায়।

বাড়িওয়ালাদের প্রতি অনুকম্পাবশত ভূতেরা শহরের বাস তুলে পাড়া-গাঁয়ে আস্তানা জুটিয়েছে, তাও নয়। ভূতের উপদ্রব পাড়াগাঁয়েই বা কই? দু'-একটা যা শোনেন, অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে ভূত নয় তারা—ভূতবেশী মানুষ। বলতে পারেন মানুষ ভূত। এরা টিট হয় রোজার মন্ত্রে নয়, সরকারের আইনেও নয়, পাড়ার ছোঁড়ারা জুটেপুটে যখন সহিংস দাওয়াই প্রয়োগ করে। মোটের উপর রোজার রুজিরোজগার বন্ধ—দিনকে দিন তারা উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শহরের অগুন্তি হানা বাড়িতে, এবং পল্লীর শ্মশানে, গোরস্থানে, বাঁশ-বাগানে এত যে ভূত থাকত, গেল কোথায় তারা সব?

শুনুন বলি। কিন্তু তারও আগে জন্মান্তরবাদটা কিঞ্চিৎ সড়গড় করে নিন।

ধরুন, মরে গেলাম। আপনারা নন, বালাই ষাট।—আমি একলা। মৃত্যুর পর দেহ-খাঁচা থেকে আত্মা ছাড় পেল। যমদূত ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি যমের দরবারে হাজির করে দেবে। রেজেস্ট্রী খাতায় আত্মা নম্বরভুক্ত হল, তারপর ছুটি। এই অবস্থার নাম ভূত। পরলোকের কর্তারা অতিশয় বিবেচক—দেহ-খাঁচার অভ্যন্তরে এতদিন কষ্ট করে এলে, ছুটি ভোগ করো এবারে। যদ্দিন না আবার আহ্বান আসছে।

তাই করে বেড়ায় ভূতেরা। গাছের চূড়ায় চড়ে প্রাণভরে মুক্ত বায়ুর নিঃশ্বাস নিচ্ছে খানিক, ঝুপ করে নেমে পড়ে ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ছে এর বাড়ি তার বাড়ি, কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি ধরে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছে, এলো চুলে ডবকা ছুঁড়ি দেখে শেষমেশ তার কাঁধেই বা চেপে পড়ল। রোজা এসে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধরে, গালিগালাজ করে, পিটুনি দেয়—কিছুতে না পেরে কড়া মন্তোরের ধুনোবাণ সর্ষেবাণ ছাড়ে শেষটা। ভূত অগত্যা এই কাঁধ ছেড়ে পছন্দসই আর একটা দেখে নিয়ে সেখানে চড়ে বসল, রোজারা সেখানে আবার হানা দিয়ে পড়ে।

চলে এমনি ভূতের নৃত্য, তারপরে একদিন তলব এসে যায়। পিতামহ ব্রহ্মা ফরমান পাঠিয়েছেন : আড়াই লক্ষ বাচ্চা গর্ভপাত হয়েছে। অতএব সমপরিমাণ আত্মার জরুরি আবশ্যক। চিরগুপ্ত লিস্টি করে দিলেন, দূতগণ ভূতের আস্তানায়

PATHAGAR.NET

আস্তানায় ছুটোছুটি করছে, ফুর্তিফার্তি অঢেল হল, আবার কি। ডিউটিতে ঢুকে পড় এবারে।

সেই বন্দী জীবন। দুই পাঁচ পনের পঁচিশ পঞ্চাশ—তেমন তেমন আয়ুষ্মান হলে নব্বই-পঁচানব্বই বছর অবধি টানবে। মানুষটা না মরা অবধি ছুটি নেই। খোদ ব্রহ্মার হুকুম, তার উপরে আপিলও চলবে না। মুখ চুন করে ভূতেরা ফের আত্মা হয়ে নির্দিষ্ট ভ্রূণের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এই নিয়ম চলে আসছে বরাবর। কাজ বড় কষ্টের, তবে দুই জন্মের ফাঁকে ভৌতিক স্ফূর্তিতে কষ্টের উশুল করে নিত! ইদানিং অবস্থা বড় জটিল—ছুটি কমতে কমতে এবারের শূন্যের কোঠায় ধেয়ে আসছে, এই বেরুল এক দেহ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে ঢুকে পড়ার পরোয়ানা। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত দেয় না। জন্মের হার নাকি সাংঘাতিক রকম বেড়েছে, আত্মার জোগান দিতে হিম-সিম হয়ে যাচ্ছেন যমালয়ের প্রভুরা।

জন্মাচ্ছে দেদার, আবার ওদিকে মরণ ব্যাপারটা লোপ পেয়ে যাবার গতিক। ভাল ভাল ওষুধপত্তর বেরুচ্ছে—সে সব ওষুধ ডেকে কথা কয়, রোগ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সার্জারিও এমনি নিখুঁত একটা আস্ত মানুষ কেটে দু'-খণ্ড করে বেমালুম আবার জুড়ে দিচ্ছে। ফলে যমরাজের সেরেস্তায় কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। এবং ধরণীতে হু হু করে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে—নিতান্তই বালির বাঁধ, স্রোতের মুখে দাঁড়াতে পারছে না।

বিষম গণ্ডগোল—যেমন এই ধরালোকে তেমনি পরলোকেও। ছুটি বন্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ ভূতেরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু এত করেও তো সামলানো যায় না উপর থেকে ঘন ঘন তাগাদা। আত্মার সাপ্লাই অভাবে সৃষ্টি বানচাল হয়ে যাবার গতিক। তার সঙ্গে কড়া নোটও আসে সরাসরি যমের নামে : সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন কাল জুড়ে তিন টার্মে রাজত্ব করলে—লোভ ছাড়ো এবারে, পোর্টফোলিও কোনো কর্মঠ তরুণ দেবতার চার্জে দিয়ে দাও।

ব্যাকুল হয়ে যমরাজ নিজেই সেকশনে ছুটলেন। ম্যানেজার চিত্রগুপ্ত টেবিলে পা তুলে নাসাধ্বনি করে ঘুমোচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে কৈফিয়ৎ দেয় : কাজ না থাকলে ঝিমুনি ধরবে বলেই তো আছি নিমতলা-কেওড়াতলার মতো অহোরাত্রি অফিস সাজিয়ে। মরে না মানুষ—কী করব?

দূতগুলো তোমার কি করে? শুয়ে বসে আর তাস খেলে ভুঁড়ি যে ওদের পর্বতাকার হল। ধরাতলে নেমে পড়ুক।

চিত্রগুপ্ত মিনমিন করে বলে, মরে গেলে তারপরেই তো ওদের কাজ—আত্মা এনে হাজির করে দেওয়া। মরে না যে।

যম খিঁচিয়ে উঠলেন : পুরনো নবাবি চাল ছাড়ো দিকি। আপোস একটা লোকও মরবে না, বিনি ক্যানভাসিং-এ আপন নিয়মে কাজ হবার দিনকাল চলে গেছে। দূতেরা

PATHAGAR.NET

বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখুক, আত্মা জোটাতে না পারলে বরখাস্ত করবে। এখন গদি চেপে লাটসাহেবি করছ—চাকরি গেলে দৌবারিকের কাজেও ডাকবে না মনে রেখো!

চাকরির দায় বড় দায়। যমদূতেরা দুড়দাড় বেরিয়ে পড়ল। চিত্রগুপ্তও চুপচাপ থাকতে পারে না—চাকরির উদ্বেগে নিজেও বেরুল এক সময়।

গিয়ে হাজির কলকাতা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক ঝানু লেখকের বাড়ি। দোতলা ছিমছাম বাড়িখানা—ঠিকানা বলবা না, বাড়ির সামনে খাটিয়া পেতে দুটো হিন্দুস্থানী গোয়ালা ঘুমোচ্ছে এই থেকে যদি চিনে নিতে পারেন। নিচের ঘর দুটোয় লেখকের মা ও বাবা আছেন, উপরটায় লেখক একলা অকৃতদার, এবং ঘুরানো-সিঁড়ি রাস্তা থেকে সোজা দোতলায় উঠে গেছে—প্রেমচর্চারও সুযোগ-সুবিধা প্রচুর।

রাত দশটা। কামারের হাপরের মতো শাঁ শাঁ একটা আওয়াজ আসছে একটানা। ছায়ামূর্তি প্রথমটা সেই নিচের ঘরে ঢুকে মা-জননী বলে ডাক দিল, হাঁপানির বড় কষ্ট মা-জননী, প্রাণ যে নিঙড়ে বের করে।

বেরোয় না তবু যে আপদ বালাই—মরলে তো বেঁচে যেতাম।

একটা কথা ছুঁড়েই চিত্রগুপ্ত এতখানি ফল প্রত্যাশা করেনি। তবে যে মানুষের বদনাম দেয়, প্রাণ কড়া মুঠোয় আঁকড়ে ধরে থাকে, মরতে চায় না কিছুতে।

পুলকিত চিত্রগুপ্ত আরও তাতিয়ে দিচ্ছে : রত্নগর্ভা আপনি মা, আপনার লেখক-ছেলেকে দুনিয়াসুদ্ধ একডাকে চেনে। আপনার মরা তো পাঁচিখেদির মরা নয়—মরে দেখুন, কী মজা তখন। কাগজে কাগজে সচিত্র শোক সংবাদ, আপনার লেখক ছেলের ভক্তরা সব খোল বাজিয়ে খই-পয়সা ছড়িয়ে মিছিল করে নিয়ে যাবে—

মা-জননী প্রলুব্ধ কণ্ঠে বলেন, লোক আসবে অনেক, মচ্ছব হবে, কাগজে ছবি উঠবে—বানিয়ে বলছ না তো বাবা? সত্যি?

সত্যি না ঝুটো, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন। না, মেলাবেন আর কেমন করে—তখন যে মরে গেছেন, ফুল দিয়ে খাট সাজিয়েছে, ফুলে ফুলে মড়া দেখাবার জো নেই। পুলিশে ভাবতে পারে, মড়াই নয়—কেরোসিন টিন খাটে তুলে ফুলে ঢেকে তাকে পাচার করছে। সেই সেকালের ফুলশয্যায় রাত্রে ফুলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে মা-জননী? আবার তেমনি।

মা-জননী মহোৎসাহে বলেন, বটে বটে!

মড়ার খাট তো শ্মশান গিয়ে নামাল। ডবল-চিতে সাজিয়ে ফেলেছে ওদিকে—কিলো কিলো চন্দন কাঠ! এক ঝিনুক ঘি লোকে খেতে পায় না, টিন টিন ঘি ঢালছে চিতের আগুনে।

চিতেয় তুলে আগুনে দগ্ধাবে? ওরে বাবা, ওরে বাবা—

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে মা-জননী আর্তনাদ করে ওঠেন, সেটি হচ্ছে না, আগুন পুড়তে পারব না বাপু। ভীষণ জ্বালা করে। বাঁ-পায়ে কেটলির জল পড়লে

PATHAGAR.NET

সেবার, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিলাম। সে তবু একখানা মাত্তর পা, চিতের উপর কোনো অঙ্গ বাকি রাখবে না। সে ছিল গরম জল, এবারে চিতের গনগনে আগুন।

পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়, চিত্রগুপ্ত মনে মনে নিজের গালে চড়াচ্ছে। বর্ণনা এতদূর না টানলেই ভাল ছিল। ঠাণ্ডা করার মানসে সে বলে, ধর্মীয় আপত্তি না উঠলে কবরের ব্যবস্থা হতে পারে।

না বাপু, অন্ধকারে থাকতে পারিনি, ঘরে আমার সারারাত আলো জ্বলে। মাটির নীচে ঘুরঘুটি পাতালে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না।

কিছু বিরক্ত হয়ে চিত্রগুপ্ত শুধায় : তবে কি রেখে দিতে বলেন দেহটা?

ওয়াক থুঃ, পোকা পড়বে, গন্ধ গন্ধ হবে—

ধৈর্য হারিয়ে মা-জননী গর্জে উঠলেন : মলো যা। ঘরে শুয়ে আমি হাঁফ টানি আর জগঝম্প বাজাই—কোথাকার কোন মুখপোড়া এসে মরা মরা করছে দেখ! বেরো—

কথাবার্তার মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁপানির বিরাম ছিল। শোধ নিচ্ছেন তার, প্রাণপণে হাঁপাচ্ছেন। চিত্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকে, হাঁপানি কমলে আবার দু'-এক কথা বুঝিয়ে বলবে। না, এ হাঁপানি রাতের মধ্যে কমবে না। চোখ পাকিয়ে মা-জননী হাত নেড়ে দিলেন।

ছায়ামূর্তি অগত্যা চলল পাশের ঘরে।

তথায় পিতা—কর্তামশায়। তাঁর অবস্থা বিপরীত। শব্দসাড়া নেই, আফিমের নেশায় ঝিম হয়ে আছেন। ও-ঘরের মা-জননী তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় বিয়ের সময় কর্তার বয়স চুয়াল্লিশ; মা-জননীর চোদ্দ। ফাঁকা তিরিশটি বছরের ব্যবধান। তালগোল পাকিয়ে কর্তামশায় তক্তাপোষের উপর শুয়ে আছেন। অথবা বসেই আছেন।—দু' রকমই হতে পারে। শোওয়া-বসার তফাৎ করার অবস্থা নেই। ছায়ামূর্তি পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ভাব জমাচ্ছে : বয়স কত হল কর্তামশায়?

PATHAGAR.NET

তোমার কি দরকার বাপু?

বলেই বুঝি হুঁশ হল, কথা বাড়ানোয় তাঁরই ক্ষতি—মৌতাত চটে যাবে, তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়া ভাল! বললেন, আটের কোঠার শেষাশেষি—অষ্টাশি ঊননব্বই।

কি সর্বনাশ!

চিত্রগুপ্ত আঁতকে ওঠে। এমন বেয়াড়া রকম বাঁচলে আত্মার দুর্ভিক্ষ হবে ছাড়া কি। বলেই ফেললে, এদ্দিনে তিনবার অন্তত মরা উচিত।

কর্তা বলেন, মরা কি আমার হাতে?

আপনার হাতে বই কি। ধরুন, দোতলায় ছাতে উঠে আলশের উপর থেকে পা ছেড়ে যদি রাস্তায় পড়েন। এ বয়সে ধকল সামলাতে পারবেন না, নির্ঘাত মরবেন।

কর্তা বললেন, উঠব কেমন করে ছাতে? হার্টের দোষ—সিঁড়ি ভাঙতে গেলে বুক ধড়ফড় করে।

তবে রাস্তায় নেমে লড়ি চাপা পড়েন গে। ড্রাইভারগুলোর পাকা হাত, তিনটে-চারটে একসঙ্গে চাপা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায়। কাজখানিও এমনি নিখুঁত মানুষগুলো রাস্তার ওপরেই খতম। হাসপাতালে অবধি বড় যেতে হয় না।

কর্তা করুণ কণ্ঠে বলেন, গাঁটে গাঁটে বাত, মাটিতেই পা ছোঁয়াতে পারিনে, রাস্তা অবধি কেমন করে যাব? হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে পড়ে আছি, দেখতে পাও না? সাত-সাতটা বছর এই অবস্থা।

কথা কথান্তরে মৌতাত কিছু চটে গিয়ে থাকবে। কৌটা খুলে আফিমের একটা বড়ি তিনি মুখে ফেলেছিলেন। আশায় আশায় চিত্রগুপ্ত বলে, একতাল আফিমই তবে খেয়ে নিন না। হাতের কাছে রয়েছে, কষ্ট করে উঠে বসতেও হবে না, শুয়ে শুয়ে কাজ হয়ে যাবে।

আফিমের আকাল চলেছে, জানো না বুঝি? লাড্ডু সাইজের খেতাম, মালের অভাবে সরষে প্রমাণ ধরেছি। কে হে তুমি এ বাজারে তাল তাল ফরমাস দিচ্ছ?

লোলুপ চোখে কর্তা তাকিয়ে পড়লেন চিত্রগুপ্তের দিকে : এই ক'টা বছর কায়ক্লেশে বাঁচতে পারলে হয়। বলি ঘাঁত-ঘোঁত আছে নাকি জানা? দাও না কিছু মাল জুটিয়ে।

অনুরোধের জবাব না দিয়ে কৌতূহলী চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন করে : কি হবে এই ক'টা বছর পরে?

সমস্ত হবে, কল্পতরু হয়ে যাবে আমাদের সরকার। চাল চিনির পাহাড়, দুধ সর্ষের তেলের সমুদ্দুর। ষষ্ঠ প্ল্যানের শেষাশেষি কোনো কিছুর অনটন থাকবে না কর্তারা

PATHAGAR.NET

কসম খেয়েছেন। বাইশ বছর কষ্ট করেছি, আরও না হয় দশ-বারোটা বছর। সে তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

নাঃ বুড়ো-হাবড়া দিয়ে হবে না। বেশিদিন বেঁচে বেঁচে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—পুরনো অভ্যাস ঘোচানো কঠিন। তেড়ে-ফুড়ে চিত্রগুপ্ত এবার ঘুরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় খোদ লেখকের কাছে গিয়ে উঠল। ছুটকা বয়স, মরলে এরাই মরতে পারে। মরেও তাই—ভাল কাজে, এবং মন্দ কাজেও।

কুহুর খবর জানো?

প্রশ্নটা লেখকের কানে যায় না, কানে যাবার সময় নয় এখন। পুজোর লেখার চিন্তা। আঙুল টন টন করছে, মাথা ফোঁপরা—যা কিছু ছিল, ছাড় করিয়ে দিয়েছে ছ'টা উপন্যাস ও পুরো ডজন গল্পে। তবু লিখতে হবে, না লিখে পরিত্রাণ নেই, হাঁ করে বসে আছে সব। পাকে-প্রকারে শাসিয়েও গেছেন কেউ কেউ, বিজ্ঞাপনে নাম ছেপে বসে আছ—লেখা না দিলে কোর্টে দাঁড়াতে হবে কিন্তু।

নাছোড়বান্দা চিত্রগুপ্ত কানে না ঢুকিয়ে ছাড়বে না। বলে, তোমার কুহু যে উড়ছে।

মুখ না তুলে লেখক অন্যমনস্ক ভাবে বলে, আগরতলা না এর্নাকুলাম? আমায় যেন বলেছিল মাসতুতো না পিসতুতো কি রকমের দাদা আছে ঐ জায়গায়।

অদ্দূরে নয়, এই শহরের ভিতরেই। ভেবে ভেবে তুমি মাথার চুল ছিঁড়ছ, ট্রামে-বাসে সিনেমায়-রেস্তরাঁয় দিব্যি সে উড়ে বেড়াচ্ছে—

এহেন মর্মছেঁড়া সংবাদে লেখক খুব যে বিচলিত হয়েছে, মনে হয় না। কলম তুলে আঙুল মটকে তাকাল সে একবার।

বিশ্বাস হয় না? বেশ, মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াও গে—শো ভাঙলে দেখতে পাবে, সোমের সঙ্গে গলাগলি হয়ে বেরুচ্ছে।

লেখক বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখন নয়। দশটা লেখার দাদন নিয়ে বসে আছি। লেখাগুলো হয়ে গেলে তখন একদিন আসবেন, ভাল করে শুনব।

তদ্দিনে বেহাত হয়ে যাবে তোমার কুহু—

তাচ্ছিল্যের স্বরে লেখক বলে, কুহু গেল তা দেবিকা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রিকারা সব রয়েছে, ভিন দেশেরও আছে—আফরোজা, ফিলোমেলা। ট্রাম একটা চলে গেলে আমি পিছনে ছুটিনে—পিছনে কত কত আসছে।

সময়ের আর অধিক অপব্যয় না করে লেখক ঘাড় নামিয়ে খসখস করে কলম চালাতে লাগল।

ছিঃ ছিঃ প্রেমের মাহাত্ম্য শুধু কাগজে-কলমে। নিজের বেলা দিব্যি কেমন হাত ঘুরিয়ে দিল। গল্পের মধ্যে হতাশ প্রেমিক ডজন ডজন তুমি বধ করে ফেল—হিটলারের গ্যাস চেম্বারও হার মেনে যায়, গল্পের চরিত্র মরে গিয়ে ভূত হয় না যে—টের পেতে তা হলে বাছাধন। গল্পের ভূত লেলিয়ে দিতাম, দলবদ্ধ হয়ে এসে ঘাড় মটকে যেত তোমার।

রাগে গরগর করতে চিত্রগুপ্ত যমলোকে ফিরল। যমদূতেরা শয়ে শয়ে ফিরে এলো সর্বদেশ থেকে। একই খবর—আপসে কেউ মরবে না দুটো-চারটে হুটকো হোঁড়াছুড়ি ছাড়া। ভাল ভাল বচন ছাড়ে : মরণের শতপথ খোলা—মরণ মানেই পরাজয়। বাঁচা মানে শতক সংগ্রামে জয়ী হয়ে বর্তমান থাকা। কবিতা আওড়ায় আবার : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

আরে বাপু সে যখন ছিল তখন ছিল। কবিগুরু বেঁচে থাকলে ভুবনের নতুন চেহারাটা দেখে কবিতার লাইন স্বহস্তে পালটে দিতেন। কিন্তু শুনছে কে! হাত ঘুরিয়ে সবাই পথ দেখিয়ে দেয়। এক তাগড়া মেয়ে পায়ের স্যান্ডেল তুলেছিল, যমদূত তখন পালানোর দিশা পায় না।

যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত মুখোমুখি বসে, গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন। আত্মার দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর উপায়টা কি?

মাথা খুলে গেল হঠাৎ চিত্রগুপ্তেরই। বলে, ভেজাল—

একটুখানি ভেবে নিয়ে কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, অব্যর্থ দাওয়াই। রাম শ্যামা ইতরজনের কাছে যাওয়া ভুল হয়েছে—যেমন আছে থাকুকগে, ওদের ঘাঁটা দিয়ে কাজ নেই। দূতেরা চলে যাক এবার সেরা সেরা লোকের কাছে—যারা ম্যানুফ্যাকচার, বিজনেস ম্যাগনেট। পাইকার দোকানদারগুলোকেও চোখ টিপে আসবে। প্ল্যানটা লুফে নেব ওরা। দুধে নর্দমার জল, চায়ে চামড়ার কুচি, চালে কাঁকড়, ওষুধে ময়দা-ময়দায় তেঁতুল-বীচি এ সমস্ত বহু পরীক্ষিত পুরানো রেওয়াজ, কোলের বাচ্চাটা অবধি জানে। চুমরে দিলে মাথা আরও কত শত নতুন মশলা বের করবে, ভেজাল খেয়ে কতকাল মানুষ 'সুন্দর ভুবন' আঁকড়ে ধরে থাকে দেখা যাক।

প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভাল করে বিবেচনা করে দেখে যমরাজ সায় দিলেন : মন্দ বলোনি—কাজ হতে পারে।

পরমোৎসাহে চিত্রগুপ্ত বলে, ভি আই পি, রাজপুরুষের কাছেও দূতরা যাবে। জেনেশুনে তাঁরা যাতে চোখ বুজে থাকেন। তা থাকবেন নিশ্চয়ই—কাজটা আসলে তাঁদেরই তো। ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালিয়ে ফলের আশায় ভবিষ্যতের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। ভেজালে তড়িঘড়ি ফলপ্রাপ্তি ঠিক মতন চালু হলে জনসংখ্যা তরতর করে নেমে আসবে।

যমরাজ ভাবছিলেন। তাঁরও মাথায় সহসা আলাদা এক প্লান চাড়া দিয়ে উঠল। বলেন, নরলোকে খাদ্য ভেজাল দিক—আমরাও এদিকে আত্মার ভেজাল চালিয়ে যেতে পারি। মানুষ আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু, গাধা, নেড়িকুত্তা, পাতিশিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে যাও। সাপ-ছুঁচো-কেন্নোবিছেতেই দোষ কি। বায়ুভূত নিরাকার জিনিস—ভাল রকম মিশাল করে দিও, বুড়ো ব্রহ্মার পিতামহও ধরতে পারবে না।

সেই জিনিস চলছে। নবসাজে ইদানিং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, গূঢ় রহস্য এইখানে।

PATHAGAR.NET

এলার্জি

প্রমথনাথ বিশী

গ্রামের জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটি সম্প্রতি এম-এ পরীক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া পিতামাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল ব্যাপার কি?

মনোজ চিরকাল ছটফটে দুরন্ত, কৌতুকে ও কৌতূহলে উচ্ছল, তাহার দৌরাত্ম্যে গাঁয়ের লোক অস্থির, হঠাৎ তাহার ভাবান্তর কেন? সর্বদা বিষণ্ণ মনে একা বসিয়া থাকে, কাহারো সঙ্গে মেশে না, নিতান্ত জিজ্ঞাসিত না হইলে উত্তর দেয় না, মুখ মলিন, শরীর অবসন্ন।

ব্যাপার কি?

বাপ বলেন, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।

মা বলেন, তোমার যেমন কথা! পরীক্ষা খারাপ হলে মন খারাপ হোক, শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? বাছার আমার চেহারা যে আধখানা হয়ে গিয়েছে।

বড় ভাই বলেন, তোমরা ওকে আহ্লাদ দিয়েই মাটি করলে, খুব খানিকটা পরিশ্রম করুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছোট বোন বলে, দাদা অনেক রাত অবধি জেগে জেগে কি সব লেখে, ওতেই শরীর খারাপ হচ্ছে।

একটার জায়গায় চারটার মতো হইল, তবু সাবধান নিকটবর্তী হইল না, তখন বাধ্য হইয়া ডাক্তার ডাকিতে হইল।

বিজ্ঞ ডাক্তার রুগীকে দর্শন স্পর্শন জিজ্ঞাসার দ্বারা নানারূপে বাজাইয়া লইয়া ঘণ্টাখানেক পরে বলিলেন, এলার্জি।

আগেকার দিনে ডাক্তারেরা যেখানে বলিত কোনো রোগ নাই, এখন কোনো রোগ নাই বলা চলে না, রোগ নাই তবে ডাকিয়াছে কেন, তাই এখানকার বিজ্ঞ চিকিৎসক বলে, এলার্জি।

এলার্জি বাৎলাইবার অনেক সুবিধা। প্রথমত শব্দটা অপেক্ষাকৃত নূতন, দ্বিতীয়ত রোগের কারণ স্থির করিবার দায়িত্ব রোগীর উপরে বর্তায়, তৃতীয়ত স্বচ্ছন্দে যে-কোনো একটা ঔষুধ দেওয়া চলে—রোগী হঠাৎ মরে না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এলার্জি। এলার্জি শুনিয়া রুগীর ওষ্ঠাধরে একটা রজতরেখা ফুটিল।

PATHAGAR.NET

জমিদারবাবু শুধাইলেন, তার মানে?

তার মানে একটা কিছু মনোজের System-এ সহ্য হচ্ছে না, বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে।

কোন খাদ্য?

খাদ্য না হতেও পারে? কোনো গন্ধ এমনকি কোনো দ্রব্যের স্পর্শেও এলার্জি হওয়া অসম্ভব নয়।

কি সেটা?

সেটা রুগীকে আর আপনাদের সন্ধান করে আবিষ্কার করতে হবে, চিকিৎসকের পক্ষে বলা কঠিন।

তবে এখন উপায়?

আপাতত এই মিকশ্চারটা চলুক, আর আপনারা সকলে মিলে লক্ষ্য রাখবেন।

এখন বাড়িময় সকলের মুখে এলার্জি—আর সকলের সকল ইন্দ্রিয় এলার্জির কারণ সন্ধানে তৎপর!

এলার্জি! এলার্জি! খাদ্যে, গন্ধে এমনকি স্পর্শেও অসম্ভব নয়।

তোর এলার্জি কেমন করে হলে রে? স্বাদে না গন্ধে না স্পর্শে—প্রভৃতি প্রশ্নের কোনো উত্তর মনোজ দেয় না, মৃদু মৃদু হাসে।

মা বলেন, ডাক্তার রোগ ঠিক ধরেছে, তাইতে বাছার আমার মন অনেকটা যেন হাল্কা হয়ে গিয়েছে—এখন মাঝে মাঝে মুখে হাসি দেখা যায়।

বাপ বলেন, হাসি দেখলেই তো চলবে না, কিসে এলার্জি হচ্ছে সেটা আবিষ্কার করতে হবে তো।

বড় ভাই বলেন, হাসি দেখলেই তো চলবে না, কিসে এলার্জি হচ্ছে সেটা আবিষ্কার করতে হবে তো।

ছোট বোন মনুজা বলে, আচ্ছা আমি নজর রাখবো, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

২

পরবর্তী অধ্যায়।

মনোজের বড় ভাই অম্বুজনাথ একদিন মনোজকে ডাকিয়া শুধাইলেন, হ্যাঁ রে তোর কি হয়েছে?

মনোজ বলিল—আমি কি ডাক্তারের চেয়েও বেশি জানি?

তার মানে?

ডাক্তারে বলেছে, এলার্জি।

আমিও তাই অনুমান করি, কিন্তু এলার্জির পুরো নামটা কি?

পুরো নাম ডাক্তারে জানতে পারে, আমি কি করে জানবো?

বটে—তবে এখানা কি?

PATHAGAR.NET

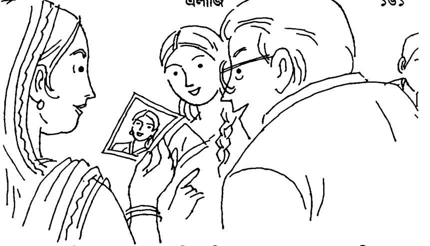

অম্বুজ ছোট একখানা রুমাল বাহির করিলেন, এক কোণে লাল রেশমী সূতায় লেখা আছে L.R.G.

ওটা কোত্থেকে এলো?

কোত্থেকে এলো! তোমার বালিশের ওয়াড়ের ভিতর থেকে।

রেল গাড়িতে বিছানা পেতে শুয়েছিলাম, পাশের কারো বিছানা থেকে এসে থাকবে।

তাও আবার ঢুকলো গিয়ে একেবারে বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে। ব্যাপারটা কি?

ঐ তো বললাম। কিন্তু পেলো কে?

মনুজা ওয়াড় বদলাতে গিয়ে পেয়েছে।

আর এই বইখানাতেও দেখছি লেখা L.R.G.

বইখানা মনোজের পুস্তকরাশির মধ্যে ছিল—এটাও মনুজার আবিষ্কার।

কলেজের কোনো বন্ধুর নাম হবে।

তা যে হবে জানি। কিন্তু পুরো নামটা কি?

মনোজের যাহা মুখে আসিল বলিল। বলিল, ললিত রঞ্জন গুপ্ত।

ললিত, না ললিতা ভালো করে ভেবে দ্যাখ্।

কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। মনুজা একখানা ছোট ফটোগ্রাফ হাতে প্রবেশ করিল, বলিল—ছোড়দা তোমার সুটকেসে ছিল, সুন্দর চেহারাটি।

সুটকেস কেন খুলেছিলি? দে আমাকে।

না, আমি দেখি, বলিয়া অম্বুজ ফটোখানি লইলেন, পড়িলেন নীচে লেখা—To Manoj From L.R.G.

অম্বুজ আর একবার ছবিখানা দেখিয়া বলিলেন, তবে এই হচ্ছে গিয়ে L.R.G.-র মূল বীজাণু!

PATHAGAR.NET

মনোজ উত্তর দিল না, উত্তর দিবার ছিলই বা কী, সে লজ্জায় লাল হইয়া প্রস্থান করিল।

৩

তা হলে মা [illegible] রা ঐ এলার্জির বীজাণু ঘরে আনাই ঠিক করলে।

তা কি করবো বাবা। ছেলের শখ। তাছাড়া মেয়েটিও তো মন্দ নয়।

কি করে জানলে?

মনুর কাছে সব শুনলাম যে, মেয়েটি নাম ললিতা রানি গুপ্ত, ওরা একসঙ্গে পড়তো। আমাদের পাল্টি ঘর। মন্দ কি? তুমি কি বলো?

কি বলবো! আমার ভাগ্য যে রোগটা এলার্জির উপর দিয়েই গিয়েছে—আরো কিছু মারাত্মক হয়নি।

অম্বুজ বলিল—তোমাদের যখন ইচ্ছা তবে তাই হোক।

মনুজা সব শুনিয়া ঘটনার ক্রেডিট আত্মসাৎ করিল, কারণ রুমাল, বই ও ফটোখানা তাহার আবিষ্কার।

সে বলিল—এমন যে হবে আমি জানতাম।

অম্বুজ এক তাড়া দিয়া বলিল—তুই চুপ কর।

কিন্তু সে চুপ করিল না।

কিন্তু যাই বলো মা, ললিতা বড় বৌদির চেয়ে সুন্দর নয়।

এবার অম্বুজের চুপ করিবার পালা—শুধু তাই নয় সে উঠিয়া পালাইল!

তবে তুমি ললিতার বাপকে একখানা চিঠি লেখো।

অগত্যা। ছেলের বাপ হয়ে মেয়ের বাপের সাধ্যসাধনা করিগে। দিনে দিনে দেশের হল কি!

PATHAGAR.NET

৪

অতঃপর মাসখানেক পত্রাপত্রি করিবার পরে একদিন শুভলগ্নে এলার্জি ওরফে L.R.G. ওরফে ললিতা রানি গুপ্ত মনোজের হৃদয়ে বেশ কায়েম হইয়া বসিল। কিন্তু এলার্জিগ্রস্ত ম্যানেজার সঙ্গে ডাক্তারি শাস্ত্রের সব লক্ষণ মিলিল না। কোথায় গেলো তাহার মন-মরা ভাব, কোথায় গেলো আলস্য, কোথায় গেল উদাসীনতা।

বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া প্রবীণ ডাক্তারবাবু বলিলেন, রোগটা তা'হলে ধরেছিলাম।

অম্বুজ বলিল—তাতে আর সন্দেহ কি?

এবারে আমার কথাটি ফুরালো, কিন্তু তার আগে একটি কথা না বলিলেই নয়। মনুজা নতুন বৌয়ের নামকরণ করিল—এলার্জি বৌদি।

একটুকু বাসা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মাথায় লাঠির বাড়ির মতো এক-একটা বদলির অর্ডার। ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে সেই গোবিন্দছাড়া বৃন্দাবন।

কিন্তু গৌরীর সবতাতেই ফুর্তি। পার্টি খাবে, মানপত্র পাবে, নতুন জায়গা দেখবে, নতুন সব বন্ধু জুটবে।—জলে ঢেউ তুলতে তার আপত্তি কি! তুমি তিনকড়ি হালদার সব ছাইয়ে ভাঙা কুলো, তোমারি হায়রানির একশেষ।

কেউ বললে, 'জায়গা তো খুব ভালো মশাই। পাহাড় আছে।'

পাহাড় ধরে তো আর আহার করা যাবে না।

'পাহাড় কোথায়। সমুদ্র আছে শুনেছি।' বলল অন্যেরা।

'সমুদ্রে কি শয়ন চলে?' হালদার বিরক্ত মুখে বলল, 'আসলে বাড়িই নেই শুনেছি।'

ভূগোলে যাদের অমন জ্ঞান, তারা তখন ইতিহাস নিয়ে পড়ল। আগে আগে যারা ও জায়গায় গিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস। কেউ বললে আছে, কেউ বললে নেই। অন্তত যারা এডিশনাল, ফালতু, তাদের জন্যে না থাকাই সম্ভব। দেখুন না টেলিগ্রামের কি উত্তর আসে।

উত্তর এল কোয়ার্টার্স নেই। তার মানে রাজা আছে রাজ্য নেই। মন্ত্রী আছে পোর্টফোলিও নেই।

'তাহলে উঠব কোথায়?' গৌরীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

চারদিক আঁধার দেখল তিনকড়ি।

'বাড়ি যখন নেই,' গৌরী বললে, 'আমি থাকি। তুমি একাই যাও।'

'একা?' সে যেন অসম্ভব, তিনকড়ি অসহায় মুখ করল।

'বাড়িটারি পেলে আমাকে নিয়ে যাবে।'

'ছেলেমেয়ে হস্টেলে, আবার তুমি এখানে! এতগুলি এস্টাবলিশমেন্ট চালাব কি করে? তাছাড়া তোমাকেই এখানে দেখবে কে?'

'এ জায়গা তো চেনা হয়ে গেছে, পারব থাকতে।' গৌরী বললে, 'বাড়িহীন অবস্থায় আমাকে নিলে অসুবিধেয় পড়বে।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে যেমন অসুবিধে তেমনি সুবিধেও। আর কোথাও জায়গা না

PATHAGAR.NET

হয় স্টেশনে থাকব। রোজ দুটো করে কাছাকাছি স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট কাটব, আর থাকব রিটায়ারিং রুমে।'

'খুব মজা হবে।' সব কিছুতেই গৌরীর ফুর্তি, 'কিন্তু ক'দিন পরে যখন জানাজানি হয়ে যাবে?'

'তখন সটান কোর্টের খাসকামরায় গিয়ে উঠব।'

'আরো মজা।'

সেখানকার অধিকর্তাকে চিঠি লিখল তিনকড়ি : 'দিগম্বর যাচ্ছেন তাঁর বাঘছাল জোগাড় করুন।'

'বাঘছাল মানে?' গৌরী ভুরু কুঁচকুলো।

'মানে আচ্ছাদন। এক্ষেত্রে বাড়ি।' হাসল তিনকড়ি।

অধিকর্তা প্রশ্ন করে পাঠাল : 'একা আসছেন, না সস্ত্রীক?'

'সস্ত্রীক।' উত্তর দিল তিনকড়ি : 'বৈরাগী হয়েছি যখন তখন মালা ফেলব কোথায়?'

অধিকর্তা পরামর্শ দিল, একা আসুন। তুফানের তরী ভারী করবেন না।

কে কার কথা শোনে। সস্ত্রীক পৌঁছাল তিনকড়ি আর সটান সার্কিট হাউসে গিয়ে উঠল। ফাঁকায় এসেছে, সামনে বড় ঘরটাই দখল করলে।

সন্ধ্যায় রঙ্গনাথ এল দেখা করতে। তিনকড়িকে দেখল। তাকাল ইতিউতি। অতিরিক্তকে দেখল না।

'একা এসেছেন?'

'না—'

'কই কোথায়, দেখছি না তো।' এ এলাকায় সবই যেন তার দেখবার কথা— এমনি ভাব করল রঙ্গনাথ।

'ঘরে শুয়ে আছেন।'

'সবচেয়ে ভালো ঘরটাই নিয়েছেন দেখছি।' রঙ্গনাথ একটু বা পায়চারি করে এল।

ঘর বন্ধ। ধাক্কা দিল রঙ্গনাথ। নির্দয়ের মতো বললে, 'কিন্তু যাই বলুন, সাতদিনের বেশি পারবেন না থাকতে। নিয়ম নেই।'

'বাড়ি নেই, বদলি এ নিয়ম থাকলেও ও নিয়ম চলে কি করে?'

'তা জানি না। রুল ইজ রুল।' তাছাড়া রুক্ষ হল রঙ্গনাথ : 'যে কোনো মুহূর্তে কমিশনার আসতে পারে, মন্ত্রীরা কেউ আসতে পারে, তখন তো ভ্যাকেট করতেই হবে।'

'করব। ছাড়ব।' গা-ঝাড়ার ভঙ্গি করল তিনকড়ি।

সাতদিন পর রঙ্গনাথ এল খোঁজ নিতে।

'কি মশাই, বাড়ির খোঁজ পেলেন?'

PATHAGAR.NET

'বা, এই তো পেয়েছে দিব্যি—' বাইরের ইজিচেয়ারে আরামে গা-ঢালা তিনকড়ি।

'এ নয় মশাই, বলি প্রাইভেট বাড়ি, ভাড়াটে বাড়ি দেখলেন কোথাও?'

'সে তো আপনি দেখবেন?'

'আমার বয়ে গেছে।' ছড়ি ঘোরাল রঙ্গনাথ : 'আপনার পিরিয়ড শেষ হয়েছে, আপনি এবার চলে যান।'

'কোথায় যাব? গাছতলায়?' পা নামিয়ে পিঠ খাড়া করল তিনকড়ি : 'গাছতলায় বসে রায় লিখব?'

'সে আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না তো কে জানে?'

একটু বুঝি ঢোক গিলল রঙ্গনাথ। ইতিউতি তাকাল। বলল, 'স্ত্রীকে নিয়ে এসেই গোল বাধিয়েছেন।'

'কেন?'

'একা হলে হোটেলে-মেসে থাকতে পারতেন, পেয়িং গেস্ট হয়ে কারু বৈঠকখানায়, নয়ত বা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে। আমাদের হরেন তরফদার তো বাড়ির অভাবে একটা আলয়ে ছিল। সেখান থেকে অফিস করত।' নিজের মনে হেসে উঠল রঙ্গনাথ : 'কিন্তু যাই বলুন এটাকে আলয় করে তুলতে দেব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে আরো তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে বাড়ি দেখে উঠে যান।'

'আমার বয়ে গেছে।' সেদিনের শোধ তুলল তিনকড়ি।

রঙ্গনাথের লোকজন অনেক বাড়ির খোঁজ আনল। একটাও পছন্দ হল না গৌরীর। কোনোটা টিনের চালা, কোনোটা কারখানার স্টোররুম, কোনোটা বা একতলার সিঁড়ির তলা।

'বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি তবু যাচ্ছেন না যে?' চড়াও হল রঙ্গনাথ।

'ওগুলো কি বাড়ি?'

'কি তবে?'

'ওগুলো, আর যাই হোক ভদ্রলোক বসবাসের যোগ্য নয়।'

'ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য এই সার্কিট হাউস?' জুতোর গোড়ালিতে ছড়ির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল রঙ্গনাথ : 'এমনতর কখনো দেখিনি মশাই, শুনিওনি, যে কোনো ভদ্রলোক বাড়ি-ঘর ঠিক না করেই সস্ত্রীক চলে আসে হুড়মুড় করে।'

'কত আরো দেখবেন। কত শুনবেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, আপনি এখন ট্রেসপাসার।' রঙ্গনাথ শূন্যে ছড়ি নাচাল : 'আপনার মেয়াদ এক্সপেয়ার করেছে। দয়া করে এটা মনে রাখবেন।'

তিনকড়ি কথা বলল না।

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

নিরিবিলি পেয়ে কে একজন তিনকড়ির কানে-কানে বললে, 'চটিয়ে লাভ নেই। যে সহায় হতে পারে তাকে শত্রু করবেন না।'

'কি করতে হবে?'

'স্ত্রীকে দিয়ে করিয়ে একটু চা খাইয়ে দিন। শাড়িটা শুধু রোদ্দুরে মেলে দিলেই কি চলে? এতে আরো বিরক্ত করা হয়। তার চেয়ে শাড়িটাকে একটু চলমান করুন। তাহলে সহজেই হয়ত আরো ক'দিনের মেয়াদ বাড়ে।'

গৌরীকে বললে কথাটা। গৌরী রাজি হল না। বললে, 'তুমি জানো না, বেড়ালের পিঠে হাত বুলোলে ক্রমশই লেজ মোটা হয়।'

কিন্তু এবার বাছাধন কি করবে? এবার স্বয়ং কমিশনার আসছে।

চল-বিচল নেই তিনকড়ির। ঝড়ে গাছ নড়ে যত তরু বদ্ধমূল তত—এমনি ভাব করে রইল।

'আর সকলে যার-যার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের মতো', বললে রঙ্গনাথ, 'আপনি যাননি যে?'

'কোথায় যাব? জায়গাটা বলে দিন।'

নামটা মুখে এসেছিল, চেপে গেল রঙ্গনাথ, বললে, 'অতশত বুঝি না। এই আপনাকে রিটন কুইট অর্ডার দিয়ে দিলাম। যদি না মানেন ফিজিক্যালি আউস্টেড হবেন।'

গৌরীকে একা রেখে কোর্ট ফেরত তিনকড়ি কোথায় চলে গেল। ফিরল রাত করে।

'এ কি, কোথায় গিয়েছিলে?' গৌরী হাঁপিয়ে উঠল।

'খবরের কাগজের করেসপন্ডেন্টের খোঁজে।'

'দেশে এত লোক থাকতে ওখানে কেন?'

'যদি জোর করে বার করে দেয় আমাদের, সে খবরটা যাতে ফ্লাশ করে তাই অনুরোধ করতে। গৃহহীন বিচারক সশরীর বিতাড়িত—ক্যাপশানটাও ঠিক করে এলাম—'

'কিন্তু এদিকে—'

'কি এদিকে? মেয়ে পুলিশ এসেছে?'

'না, কমিশনার এসেছে।'

'শোন। এক কাজ করো।' একটু বুঝি গাঢ় হল তিনকড়ি; 'এর প্রতি গোড়া থেকেই কাঠ হয়ে থেকো না।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকালো গৌরী।

'তার মানে, কমিশনারকে একটু কমিশন দাও।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'ওঁর কাছে অ্যাপিয়ার করো, দুরবস্থাটা বলো একটু বুঝিয়ে—'

'অসম্ভব।' ফোঁস করে উঠল গৌরী : 'আমি গৌরী বলে আমাকে তুমি গৌরী সেন পাওনি।'

'তাহলে এক কাজ করো। খুব করে চুড়ি বাজাও। অস্তিত্বটা ঝংকৃত করো।'

'চুড়ি বাজাব? চুড়ি কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌরী : 'আমি কি তেমন অদৃষ্ট করে এসেছি!'

এ আবার তিনকড়ির নতুন সমস্যা। বাজারে গিয়ে একরাজ্যের বেলোয়ারি চুড়ি কিনে আনল। 'লক্ষ্মীটি এই-ই বাজাও আপাতত। অতিরিক্ত আছি, পাকাপোক্ত হই, সোনার কাঁকণ গাড়িয়ে দেব।'

কমিশনার গোস্বামী রঙ্গনাথকে তলব করল।

'এটা কি মশাই ঘর-গেরস্থলির জায়গা?'

PATHAGAR.NET

'কেন স্যার?'

'কে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসবাস করছেন এখানে, দিব্যি সংসার পেতে রয়েছেন—বলি এটা কি—' বিড়বিড় করতে লাগল গোস্বামী।

'সস্ত্রীক আছেন?' আকাশ থেকে পড়বার মতো মুখ করল রঙ্গনাথ : 'কই জানি না তো। স্ত্রীলোক তো দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈ কি।' না দেখাই ভালো ছিল এমন মুখ করল গোস্বামী : 'রোদে চুল শুকোচ্ছেন, জামা-কাপড় সানিং করছেন, পাইচারি করতে করতে গান গাইছেন মৃদু মৃদু—'

'অসম্ভব।'

'বলি এদের জন্যে আজও একটা বাড়ি দেখে দিতে পারলেন না?'

'যা দেখাই পছন্দ হয় না।'

পা দিয়ে : 'ওরা সার্কিট হাউসকেই গোয়াল-আস্তাবল করে তুলবে, এটা আপনি—আপনার পক্ষে ডিসক্রেডিট।'

'কুইট অর্ডার সার্ভ করা সত্ত্বেও এরা যাচ্ছে না।'

'কুইট অর্ডার তো ওঁদের উপর নয়, আমাদের উপর।' গোস্বামী উঠে পড়ল : 'অমন ডেঞ্জারস এলিমেন্টের সঙ্গে একত্র বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। যা দিনকাল, কোন কথা থেকে কোন কথা গজায় ঠিক নেই। আমি আজ বিকেলেই ফিরে যাব।'

গোস্বামী ফিরে গেল।

ডিসক্রেডিট! খেপে গেল রঙ্গনাথ। না, আর নয়, এবার পুলিশকে বলি। পুলিশ লাগাই।

সত্যি সত্যিই সে রাত্রে পুলিশ পড়ল সার্কিট হাইসে! 'হটো হটো, সব ঘর-বারান্দা আগা-পাস্তালা ক্লিয়ার করে দাও।'

যে যেখানে যত অতিথি-আগন্তুক ছিল, কর্পূরের মতো উবে গেল নিমেষে। কী ব্যাপার? কেউ যেন এল মনে হচ্ছে। কে এল? বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট নিয়ে রাজসমারোহে এ কার অবির্ভাব?

মন্ত্রী এসেছেন।

সর্বনাশ। মাথায় এ বাড়ি নয়, মাথায় এ সর্পাঘাত।

কিন্তু একেবারে না বলে কয়ে এলেন কেন? আগে জানলে আমরা সময়মতো বেঁধেছেঁদে তৈরি হয়ে ধীরে সুস্থে চলে যেতে পারতাম। এমনি সব এলোমেলো হয়ে যেত না।

কি করে জানবে আগে? রাস্তায় গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছে। তাই পথে একরাত্রি এখানে একটু বিশ্রাম করে যাওয়া।

একরাত্রির জন্যে একটা ঘর হলেই তো চলে। সমস্ত বাড়িটাই চাই কেন?

PATHAGAR.NET

হ্যাঁ, সমস্ত বাড়িটাই দরকার। যাতে একেবারে নির্জনে নিঃসঙ্গে থাকতে পারেন। যাতে কোনো কথা না ওঠে, না হাঁটে। সন্দেহের নিশ্বাসও না শোনা যায়। যাতে রাজ্যের সমস্যাগুলো মনের গভীরে ভাবতে পারেন তলিয়ে।

পুলিশ এসে গৌরীর দরজায় দাঁড়াল।

'আপনাকে এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে এক্ষুণি।'

'আমার স্বামী পাশের শহরে কি এক কনফারেন্স গিয়েছেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবে। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।'

'সে কি আপনি নিজে অফিসার নন?'

'আমি কোন দুঃখে অফিসার হতে যাব? পরের ঘরে পরের ঘাড়ে বসে খাব এই-ই তো আমার নিশ্চন্ত স্বত্ব।'

'তাহলে তো কথাই নেই। আপনি ফালতু, আপনার কিছুতেই থাকা চলবে না এখানে—'

'কোন আইনে?' কোমরে প্রায় আঁচল জড়াল গৌরী।

'আপনি অন্তত এ বড় ঘরটা ওঁকে দিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে শিফ্ট করুন।'

কে আরেকজন বলল বললে মীমাংসার সুরে।

'আমরা দু'জন। আমাদেরই বড় ঘর দরকার।' গৌরী নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আর অনারেবল মন্ত্রী তো একা, একরাত্রির খদ্দের। অনারেবলকে ডাকুন না আমার কাছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

কী স্পর্ধা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। টের পাওয়াচ্ছি।

ট্রেন মিস করে ফিরতে ফিরতে তিনকড়ি প্রায় শেষ রাত।

চোরের মতো ফিরছে। গেটের সামনে পুলিশ ধরতেই আইডেনটিটি কার্ড দেখাল। বললে, 'ভেতরে আমার স্ত্রী আছেন। একেবারে একা আছেন। আর বস বাসিন্দে উধাও হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি কাল সকালেই চলে যাব, ছেড়ে দেব, ছুটি নেব।'

দেখবেন, আস্তে দরজা খুলবেন। অনারেবেলের ঘুমের না ব্যাঘাত হয়।

এ কি, দরজা খোলা, ঘর ফাঁকা। জিনিসপত্র ঠিক আছে। কিন্তু গৌরী কোথায়? গৌরী নেই।

কী সর্বনাশ! গৌরী লোপাট।

তিনকড়ির ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে আর্দালীকে রেখে দিয়েছিল গৌরী। ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলল তিনকড়ি। 'তোমার মা কই?'

'মন্ত্রীর ঘরে।'

'মন্ত্রীর ঘরে!' তিনকড়ির হৃৎপিণ্ডটা খসে পড়ল মাটিতে।

'হ্যাঁ মা একা আছেন দেখে মন্ত্রী তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়েছেন।'

মন্ত্রীর ঘরের দরজায় মাথা দিয়ে টুঁ মারতে যাচ্ছিল তিনকড়ি, কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে গৌরী বেরিয়ে এল। তিনকড়িকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'আর ভয় নেই, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে!'

যা লাগে দেবে গৌরী সেন। শেষ পর্যন্ত গৌরী সেনের এই খয়রাত! এতদূর!

ঠিকঠাক হয়ে বেরুতে অনারেবল মন্ত্রীর কিছু দেরি হল।

কিন্তু এ তার কি অদ্ভুত পোশাক! চোখ ধাঁধা লাগল তিনকড়ির। পরনে রঙিন লুঙ্গি, গায়ে ঢিলেঢালা রঙিন ফতুয়া, মাথায় চীনেদের মতো লম্বা টিকি আর এমন কি এখন ঠাণ্ডা যে গায়ে ফেরতা দিয়ে পুরু করে কাপড় জড়ানো! তিনকড়ি চোখ কচলাল। অনুপাত ঠিক করতে করতে স্থির করলো চাউনি, সামঞ্জস্যের উপশম আনল।

'গৌরীটা এখনো তেমনি ভীতু আছে।' মৃদু হাসি মেখে তিনকড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন অনারেবল : 'ঘরে নিয়ে এসে তবে তার ভয় ভাঙালাম। আমরা কলেজে চার বছর একসঙ্গে পড়েছি, থেকেছি এক হোস্টেলে, কত ভাব আমাদের গলায় গলায়। ও গৌরী, আমি উমা। লোকে বলত জোড়ের পায়রা—'

ইনি তাহলে মন্ত্রী নন, ইনি মন্ত্রিণী।

ডাকতে হয়নি, রঙ্গনাথ নিজের থেকেই এসেছে।

মন্ত্রিণী বললেন, 'দেখুন, গৌরী আমার নিজের লোক। যতদিন ওরা সুবিধামতো বাড়ি না পায়, এখানেই থাকবে। উপায় কি তাছাড়া! যাতে থাকতে পারে, কেউ বিরক্ত না করে দেখুন।'

রঙ্গনাথ চেষ্টা করেও গৌরীর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। লক্ষ্মণের মতো মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ তা তো ঠিকই। দেখছি। দেখব।'

আর তাতে চাকরিটাকেও দেখা হবে।

PATHAGAR.NET

সুমিতাকে সামলানো

শিবরাম চক্রবর্তী

আমার পিসী পারলে আমাকে পিষে ফেলেন। আমি নাকি সুমিতার যার-পর-নাই ক্ষতির কারণ হয়েছি এবং সেখানেই ক্ষান্ত না হয়ে সেই সাথে আত্মীয়-স্বজন সকলের মুখ পুড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করিনি।

আমার পিসী গভীর ভাবে এই বার্তাটাই আমার মনের প্রস্তরে খোদিত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন!

সত্যিই এরূপ ঘটে থাকলে, এহেন কৃতকার্যতা অগৌরবের নয়। অন্তত আমার পক্ষে তো বটেই। পারলে পরে আত্মীয়-স্বজনের মুখ ভালো করে পোড়াতে কে না চায়? (এক হনুমান কেবল চেয়েছিল না। নিজের মুখের দিকে চেয়েছিল সে। কিন্তু আমি হনুমানের ব্যতিক্রম) সত্যি বলতে আত্মীয়দের অক্ষত বদনচন্দ্রিমার আমি তেমন পক্ষপাতী নই।

কিন্তু আসলে ও কাজ আমি পারিনি। এই কারণেই যতই বাঞ্ছনীয় হোক, ইতিহাসবিরুদ্ধ এই কৃতিত্বের গৌরব আত্মসাৎ করতে স্বভাবতই আমার কুণ্ঠা ছিল। একথা আমার পিসীকে মুক্তকণ্ঠে আমি জানিয়ে দিলাম।

PATHAGAR.NET

পিসী বললেন, 'বোকাদের সংস্কৃতে বার্তাক বলে কিনা জানি নে, তুমি একটি আস্ত তাই।'

এই এককথায় আমাকে নিরুত্তর করে দিয়ে পিসী পুনরপি বলেন, 'ভেবেছিলাম এই কাণ্ডের পর আত্মীয়-সমাজে মুখ দেখাতে তুমি লজ্জা পাবে।'

'কেন বল তো?' আমি বলি।

বাস্তবিক অযাচিত পত্রাঘাতের দ্বারা আমাকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে অকারণ লজ্জিত করার এই অপচেষ্টার আমি অর্থ বুঝি না। তাছাড়া, আমার পিসী, যতই পটীয়সী হন না কেন, একটা কিছু সমস্ত আত্মীয়সমাজ নন।

'অকর্মাদের কি বলে সংস্কৃতে? কুষ্মাণ্ড না কি বলে থাকে না? তুমি একটি তাই', পিসীর জবাব পেলাম।

সাদা বাংলায় গালাগালি দিতে পিসীর শালীনতায় বাধে, এই হেতু ওগুলি তিনি সংস্কৃত করে শুদ্ধ করে, পরিত্যাগ করার সপক্ষে। এবং যথার্থ বলতে, ছোটবেলা থেকেই আমার যা কিছু সংস্কৃতি এবং সংস্কারও হবার, তা কেবল পিসীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যেই হয়েছে—অভ্যেসবশে ওসব আমার গা-সওয়া।

'সুমিতার সারা জীবনটা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ এবং কেবল তাই নয়, তাদের বংশে তুমি যে কলঙ্ক আরোপ করেছ, সাত জন্মেও তা ঘুচবে কিনা সন্দেহ।'

'তাহলে যেটা সুখের বিষয় হোত,' প্রতিবাদ করে আমি বলি, 'তেমনি একটা কাজ পারতাম যদিও কিন্তু পারিনি! আমার সমস্ত মাসতুতো বোনদের মধ্যে সুমিতাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তার অনিষ্ট আমার দ্বারা হবে কি করে, যে তুমি বল! সুমিতা জানে আমি ছাড়া তার কেউ নেই, আত্মীয়দের ভেতর নেই অন্তত। তার বাইরের বন্ধুদের কথা আমি জানিনে।' বলি, 'বনবিহারীর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধে কে ওর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল শুনি? এই শর্মাই মশাই।'

বাক্যালাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে পিসীকে অসংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে 'মশাই' বলতে হলো বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না বলে উপায় ছিল না। আমার পিসীকে অবলা বলে ভাবতে পারা যায় না। আমি তো কখনো পারি নে।

কিন্তু অনুপযুক্ত বিশেষণে নিঃশেষ হলেও কথাটা খাঁটি। কিশোরীর প্রেমের প্রথম উন্মুক্তির সেই উন্মুখর স্বপ্নে আমি ছাড়া আর কারো সহানুভূতি ছিল না। এমনকি সুমিতার এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পিসীর নিজেরও বোধহয় নয়। এতখানি বয়স পর্যন্ত স্বয়ং আইবুড়ো থাকার জন্যেই হয়তো সেটা হবে কিন্তু এই বনবিহারীঘটিত ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও তাঁর উৎসাহ দেখা যায়নি।

এই বনবিহারী-ব্যাপারটাই বেলুনের মতো ফেঁপে উঠে কয়েক সপ্তাহ আগে ফেটেছিল। ছেলেটাকে আমি পছন্দ করেছিলাম, নানাধারে গুণ ছিল ওর। আমি নিজেই কতবার ওর কাছে ধার নিয়েছি। ফেরৎ চাইতে ভুলে যেত। ভগ্নিবানদের বেলা লোকে ভুলে যায়। বলতে কি, কাউকে বধ করতে হলে তূণীরের ঐ অগ্নিবাণটিই মোক্ষম—একটি বোন থাকা।

PATHAGAR.NET

কিন্তু হলে কি হবে সুমিতার আত্মীয়দের ধারণায় ওরকম বাজে খরুচে লোক স্বামীরূপে নাকি নিত্যান্তই অপদার্থ। আত্মীয়দের মাপকাঠি আমার বুদ্ধির অগম্য, আমি সুমিতার রুচির প্রশংসা না করে পারিনি। এই যোগাযোগে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। ওরকমটি একটি ছেলে সারাদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করলেও দশ মাইলের মধ্যে মেলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার এতে সমর্থন আছে বলেই সন্দেহ জাগল। সকলেরই জাগল। আমি লোকটাই নাকি সন্দেহজনক! কথা উঠল। নানান কথা উঠল। লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না শোনা যায়, কিন্তু আমার মতে, যেসব বিয়েরা লক্ষ্যের বিষয় তা এক কথাতেই সেরে ফেলা উচিত। এমনকি, বিনা বাক্যব্যয়ে হয়ে গেলে আরো ভাল। কিন্তু সুমিতার তার অন্যথা হয়ে কথায় কথা বেড়ে বাড়তে বাড়তে আমাদের ব্যবস্থা-পরিষদের এক একটা প্রস্তাবের বরাতে এক এক সময়ে যেমন ঘটে সমস্ত বনবিহারী সম্বন্ধটাই কথাবার্তার বাইরে চলে গেল।

এখন দশদিন ধরে একশো মাইলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি লাগালেও বনবিহারীর পাত্তা পাওয়া যায় কিনা কে জানে। ও নাকি আত্মহত্যার মতলবে লেকে না গিয়ে সটান্ যুদ্ধেই চলে গেছে শোনা যাচ্ছে।

'কিন্তু না তুমি ওই ব্যাপারে মাথা গলাতে যাও, না, সুমিতার এই সর্বনাশ হত! আর তোমার সেই আহম্মকের মতো যত প্রস্তাব—আহম্মককে সংস্কৃতে কী বলে?'

'অনবদ্য' আমি বলি।

'তোমার যত অনবদ্য মতো প্রস্তাব—তাতেই তো আরো কাল হোলো। এখন সুমি বেচারী এমন মনমরা হয়ে গেছে যে—'

'তার জন্যেই তো আমি শেষ প্রস্তাব করে এলাম যে দিনকতক তোমার এখানে এসে থাকুক না। দৃশ্যপটে আর পারিপার্শ্বিক বদলে গেলে হৃদয়াহত মেয়েরা আস্তে আস্তে নাকি শুধরে ওঠে এরকম শোনা যায়। আর তার ওপর তোমার সদুপদেশ-শীতল স্নেহাচ্ছায় এসে তুমি—'

'কি বললে? হৃদয়াহত?' পিসী যেন নিজের হৃদয়ে আঘাত পান, ইস্কুল ছেড়ে অবধি সুমির তো হৃদয়াহত হবার কামাই নেই। এবার নিয়ে কবার হল ভেবে দ্যাখো—দাঁড়াও গুণে দেখি—বলতে বলতে পিসী অশান্তিপর্বে নিজগুণেই এসে উপস্থিত, 'বনবিহারী। বনবিহারীর আগে ছিল নৃপেন, নৃপেনের আগে ছিল শ্যামল; শ্যামলের আগে—কি নাম তার?'

'ডাকনাম ছিল ফড়িং। ওর সংস্কৃত আমি জানিনে।'

'এবং তারও আগে আরো কত কীটপতঙ্গ কি ছিল না?—অষ্টাদশ বছর থেকেই তো ও প্রেমে পড়েছে।'

'পড়লেই বা। ওই ভাবেই তো মেয়েদের মনে শান পড়ে। তারপরে পশু-পক্ষীদের ওপর দিয়ে একবার ছুরি শানানো হয়ে গেলে, একজনের গলাতেই গিয়ে বসে। প্রাণ নিয়ে টানাটানির কাণ্ডে সেই শেষ পাত্রটিই হচ্ছে আসল আর চরম। সুমির জীবনে বনবিহারীই ছিল সেই চূড়ান্ত ব্যক্তি।'

'তোমার পিণ্ডি। পিণ্ডির সংস্কৃত?'

'রাওয়াল।'

'রাওয়াল? তাহলে তুমি হচ্ছ একটি রাওয়াল। রাওয়ালপিণ্ডি। দুই তুমি। তোমার মতো অপদার্থ আর আমি দেখিনি।'

'তাহলে কেন এত কষ্ট করে এবং আমাকেও এহেন কষ্ট দিয়ে তাই দেখবার জন্য আমাকে ডাকিয়ে আনা।'

'এই কথা বলতে সুমি এখানে এসে আনন্দেই রয়েছে। বনবিহারীর কথা তার মনেও নেই আর। কিন্তু আরেকটা গোল বেধেছে সেইজন্যই তোমাকে ডাকানো—'

বলে, পিসী ক্ষণিকের জন্যে থামেন।

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

'তাহলে গোড়া থেকেই বলি। পেন-ফ্রেন্ড কাকে বলে জানো তো? বাঁচিয়েছ। ও-জিনিস তোমাকে আমি সংস্কৃত করে বোঝাতে পারতুম না, পারতুম কিনা সন্দেহ। এখন, এক শিশু-মাসিক পত্রিকার মারফতে আমার কতগুলি পাতানো পেন-ফ্রেন্ড রয়েছে। পদ্ধতিটা মন্দ নয়।'

'ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই তো, পেন-ফ্রেন্ড পাতায়।' ক্ষুদ্র ধারণা আমি ব্যক্ত করি।'

'আর বড়দের বুঝি পাতাতে নেই? তুমি একটি কুসংস্কারের হাঁড়ি। এই জন্যেই তোমাকে অনবদ্য বলতে ইচ্ছা করে। সাধে কি তোমাকে—রাওয়ালপিণ্ডি ফ্রেন্ডদের মধ্যে একজন আবার সৈনিক, বাঙালী সৈনিক। উপকূল গোলন্দাজ বাহিনীদের একজন, মাদ্রাজে থাকে। সৈনিকদের সঙ্গে পেন-ফ্রেন্ড পাতানো তোমার মতে কি খারাপ?'

'না, না, খারাপ কেন? খারাপ কেন হবে? ভালই তো।' আমি বলি, 'সৈনিকেরা কি কাজের নয়?'

'ভালো বলছ তুমি? তাহলে ভালোই।' পিসী সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান, 'তুমি ভালো

বললে আমার কিন্তু ভারী খারাপ লাগে। যাই হোক পত্রালাপে যদ্দুর বোঝা গেছে, বেচারীর আত্মীয় বলতে কেউ নেই—না মা-বাপ না স্ত্রী-পুত্র না ছেলেপিলে। আমি মাঝে মাঝে কিছু উপহারও পাঠাতুম বেচারীকে। এই সন্দেশ-টন্দেশ-মেওয়া-টেওয়া এই সব।'

'এতদূর এগুনো ভাল হয়নি বোধ হয়। উপহার পর্যন্ত এগুনো।' আমি জানাই, 'বিশেষত দুর্ভিক্ষপীড়িত আমরা যেকালে এত কাছাকাছি রয়েছি।'

'তুমি যখন বলেছ ভালো নয়, তখন বুঝতে হবে ভালোই করেছি। খুবই ভালো। এখন হয়েছে কি, দিনকতক ছুটি পেয়েছে বেচারা। ছুটি পেয়ে আর কোথায় বা যাবে! কেউ তো নেই কোথাও। কলকাতায় বেড়াতে আসতে চায়—আমার এখানে এসে উঠতে ইচ্ছুক।'

'বেশ, তা মন্দ কি আসুক না!' এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু আমি দেখি না।

'মন্দ কি? তুমি একটি আহাম্মোক, আহাম্মোকই তুমি। সংস্কৃত করে অনবদ্য বললে কিছুই তোমার বলা হয় না। আমি যখন তাকে নেমতন্ন করেছিলাম তখন তো এই সব গোলমাল বাধাওনি—সুমি আসবার ঢের আগেই তো। এখন যে বুঝি সুমি এসে রয়েছে এখানে।'

'থাকলেই বা!' আমি উৎসাহ দেখাই, 'সৈনিকেরা শুনেছি ভগ্ন-হৃদয় জোড়া লাগাতে ভারী ওস্তাদ।'

'আমারো তো সেই ভয়। সুমি যে রকমের মেয়ে আর সৈনিকদের হাবভাব যেরকম শোনা গেছে তা নাকি ভয়াবহ। প্রেমে পড়তে তারা নাকি কখনই পেছপা নয়। তা, ওদেরই বা দোষ কি।'

'না এমন আর দোষ কি?' আমি সায় দিই। 'মারা পড়তেই যারা পেছপা নয়, তারা আধমরা হতে ভয় খাবে কেন?'

'কোনো সৈনিকের কখনই তুমি 'না' বলতে পার না! কিছুতেই না। ভেবে দ্যাখো তোমার আমার জন্যেই তারা প্রাণ দিচ্ছে। আর যে দ্বিধা না করে নিজের সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত অকুণ্ঠিত মনে অপরের সর্বস্ব নেবার তার অধিকার আছে বৈ কি! এখন সুমি যদি সেই গোলন্দাজের নজরে পড়ে—সামনাসামনি পড়ে যদি সেও না বলতে পারবে না। আশ্চর্য নয়! কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাকেই তো সংস্কৃতে অবিমৃষ্যকারিতা বলে? তাই না? তাহলে অবিরত সেই মৃষ্যকারিতাই ঘটাবে সুমিতা। ও যা মেয়ে।'

'খুব স্বাভাবিক। সৈনিকেরাও মিশ্রকারিতা ঘটাতে এক একটি ডাক্তার যদ্দুর আমি জানি।' না জানিয়ে আমি পারি না।

'এখন সেই গোলন্দাজটি, আরে খবর পেলাম কাল আসছে। কালকেই এসে পড়েছে। এখন কি করা যায়?'

PATHAGAR.NET

'তাই তো কি করা যায় এখন?' আমিও খুব ভাবিত হয়ে পড়ি, 'তার কামানের মুখে কি আমাদের সুমিকে সমর্পণ করা যায়?'

'কিছুতেই নয়। আবার সুমিকে বাড়ি ফিরে যেতেও বলা তো যায় না। সেই বা কি ভাববে? মোটে তো ক'দিন হলো বেড়াতে এসেছে—'

এর মধ্যে ফেরৎ পাঠানো? সুমির বাপ-মা-ই বা কি মনে করবেন? সব দিকেই মুস্কিল! আবার সুমির সাথে এই গোলন্দাজেরও যদি গোলযোগ বাধে—ফের বেধে যায় এই বনবিহারী হাঙ্গামাটার পরেই তাহলে আত্মীয়দের মধ্যে আবার কি লঙ্কাকাণ্ড লেগে যাবে, কে জানে!' ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়।

'একটা পথ আছে। তুমি দিনকতকের জন্য সুমির ভার নাও। এই হপ্তাখানেক। এক সপ্তাহ পরে সৈনিকটির ছুটি ফুরিয়ে গেলে সে চলে যাবে। এই জন্যই তোমাকে ডাকিয়েছি।'

—'য়্যাঁহ?' ভাবটা আমার গলায় এসে যাবে—বলবার যা কিছু সব আটকে দেয়।

'আমি সমস্ত ছকে রেখেছি। সুমি রোজ সকালে উঠেই তোমার ওখানে যাবে—সারাদিন থাকবে তোমার সঙ্গে। সুমিকে নিয়ে তুমি ইচ্ছামতো বেড়াও চাড়াও, যেখানে খুশি যাও, সিনেমায় রেস্তোঁরায় যা প্রাণ চায়। দোকানে দোকানে বাজারে তোমার সাথে ঘুরে ওর নিজের ইচ্ছামতো কেনাকাটা করুক, তুমি ওকে না বলো না। তারপরে সন্ধ্যার পরে বেশ একটু রাত্রি হলেই ওকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। এই আমি স্থির করেছি।'

'থামো থামো—'

'ইতিমধ্যে আমি সেই সৈনিকটিকে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ইডেন-গার্ডেন ইত্যাদি কলকাতার যা যা দ্রষ্টব্য আছে দেখিয়ে-শুনিয়ে বেড়াবো কেমন?'

'কলকাতার দ্রষ্টব্যদের মধ্যে সুমিও তো একটা! তা কি আর ও দেখতে পাবে না? যদি ওর চোখ থাকে—'

'খুব রাত্রে কি খুব সকালে সুমির আসা-যাওয়ার কোনো ফাঁকে যদি চকিতের জন্য একটু চোখাচোখি হয়, সেটা তেমনি কিছু মারাত্মক হবে না বলেই আমি মনে করি। তাছাড়া, তুমিও সুমিকে সারাদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করে ফেরৎ পাঠাবে—যাতে বাড়ি ফিরেই সে বিছানায় গিয়ে পড়ে। আর আমিও এধারে ভোর না হতেই ওকে ফের তোমার দিকে রওনা করে দেব।'

'কিন্তু সারাদিন ধরে, সুমিকে কোথায় বা আমি ঘোরাই?' আমি হতাশ হয়ে পড়ি, 'ও তো লাট্টু নয়। আর এত জায়গাই বা কই?'

'কেন সিনেমায় নিয়ে যাও—সিনেমা তো পড়েই আছে। ১১ টার শো, ৩ টের শো—ছটা-নটা সব কটাতেই যাও না? ক্ষতি কি? তার পরে, ওর খুব কেনাকাটার

PATHAGAR.NET

শখ, জানো তো? এক নিউ মার্কেটেই তো সারাদিন ও ঘুরে কাটাতে পারে। যা কিনতে চায়, কিনুন না—বাধা দেবার কি আছে?'

'কিন্তু টাকাটা—' তবু আমার বাধা দেবার কিছু থাকে।

'সামান্য টাকার কথা তুলো না। ছি! সুমি যে তোমার সব বোনের মধ্যে প্রিয় তা কি আমার জানা নেই? সুমির ভালোর জন্যেই তুমি অক্লেশে প্রাণ দিতে পারো, তাও আমি জানি।'

'না না, পারি না'—চিৎকার করে, আমি বলতে যাই।

'এতদিন পরে তুমি একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব করেছ বটে।' আমার পিসী আমার আর্তনাদে বাধা দেন, 'তোমার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলুম। সুমি কাল সকালেই যাচ্ছে তোমার কাছে! আর কাল থেকে রোজ সকালে। এই ঠিক রইলো, তুমি যেতে পারো এখন। সুমি একটু বেরিয়েছে, ফিরলেই তাকে জানাবো যে তুমি তাকে দিন সাতেকের জন্য সিনেমা ইত্যাদির নেমন্তন্ন করে গেছো।'

তারপর আর কি, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে না মুছতেই সুমিতা।

এবং সমস্ত দিন ধরেই সুমিতা!

কতাবার্তার কোনো কোণ ঘেঁষে বিপজ্জনক সীমান্তে না গিয়ে পড়ি সেদিকে হুঁশ রাখতে হয়। পিসীর উপদেশ মতো প্রাণপণ সতর্কতায় সুমিতাকে সামলে সব দিক বাঁচিয়ে চলি।

কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়।

'পিসীর বাড়ি আজকে কে আসছেন জানো? জানো ছোড়দা!' সুমিতা উত্তেজনার চূড়ান্তে, 'একজন বাঙালী সোলজার শুনেছ?'

'হতে পারে, কিন্তু হলেই বা কী?' আমি উদাসীনভাবে জানাই, 'সোলজাররা লোক সুবিধের নয়। ওদের সোল্ বলে কিছু নেই।'

'কেন সুবিধেটা নয় কিসে?' বেঁকে বসে সুমি, 'সোলজারের মতো লোক আর হয় না।'

'ওদের থেকে দূরে থাকবি। মেয়েদের হৃদয়ে নিয়ে ওরা ছিনিমিন খ্যালে। ওদের ভালবাসা ক্ষণিকের।'

'বাঃ বাঃ কী চমৎকার!' সুমি চোখেমুখে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'সে-ই তো চাই।'

উত্তরটা যেন কিরকম নয়? ঠিক যেন সদুত্তর বলে বোধ হয় না। গোলমালের গন্ধ পাই যেন, অগত্যা আমি কথাটা ঘুরিয়ে বলি, 'স্বামী হিসেবে ওরা কি খুব টেকসই? কবে গোলার মুখে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই।'

'এই জন্যেই তো ওদের আরো ভালবাসতে ইচ্ছে করে।' বলে বসে সুমিতা, 'বন্ধুরূপে ওরা নাছোড়বান্দা নয়।'

PATHAGAR.NET

'ভালো বিপদে পড়া গেল। উঃ দিনটা কি গরম আজ দেখছিস!'—বলে চট্‌পট্ আমি তপ্ত খোলার ওপর থেকে আস্ত আগুনের গর্ভেই ঝাঁপিয়ে পড়ি। আবহাওয়ার দিনপঞ্জিতে।

এবং তারপর যখনই সুমিতার কাছ থেকে সৈনিক সংক্রান্ত কোনো কিছুর আভাসটুকু আসে, তক্ষুণি হয় আমি ওকে শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফেলি, নয় দামোদরের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাই। কিম্বা কাছাকাছি কোনো সিনেমা কি রেস্তোরাঁ থাকলে সেইখানেই গিয়ে উঠতে হয়।

অবশেষে আর একটা দিন মোটে বাকি। এই দিনটা কেটে গেলে সামরিক সেই লোকট্যর সাময়িক ছুটি কাটে, আর ছুটোছুটি কেটে গিয়ে আমিও ছুটি পাই।—সেদিনকার কথাবার্তায় কী কী বিষয় উত্থাপন করব আপন মনে আন্দাজ পাচ্ছি—কোথায় যেন আকাশ থেকে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো আকস্মিক ব্যাঙবর্ষণ হয়ে গেছে, সেদিনের দৈনিকের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এই সংবদাটি নিয়ে নিজ মনে নাড়াচাড়া করছি—সুমিতা চায়ের পেয়ালা থেকে মুখ তুলে বলল, 'শোন একটা কথা ক'দিন থেকেই তোমাকে বলব বলব করছি—'

'কি রকম মেঘলা হয়েছে দেখেছিস? বৃষ্টি হবে বোধ হয়—'

'হোকগে। ক'দিন থেকেই কথাটা তোমায় বলবার চেষ্টা করেছি। সেই বাঙালী সৈনিকটির কথা। লোকটি বেশ। বড্ড ভালো। ইয়া জোয়ান চেহারা—আর এমন গোলগাল মুখ—দেখলেই মায়া হয়। তা ছাড়া হাসলে গালে টোল খায় লোকটার—'

সর্বনাশ করছে। টোল খাওয়া দেখে যারা টাল্ খায়, টলে পড়ে, তাদের নাকি আর তোলা যায় না—টানাহ্যাঁচড়া করেও নয়।

য়্যাঁ? তাহলে এত ছক কেটে সারা সপ্তাহব্যাপী এতটা অপব্যয় সমস্তই নিছক হলো? ব্যর্থ হলো সব?

'আমি বলছিলাম কি—' স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ সুমিতার—'পছন্দসই বিয়ের কী একটা উপহার দেওয়া যায় সেই বিষয়ে তুমি চিন্তা করো।'

'দ্যাখো সুমিতা, এটা কি তোমার ভালো হচ্ছে?—' আর আমি সামলাতে পারি না, 'এত করে তোমাকে সামলানোর পরে তুমি যদি এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করো—' ওর ভগ্নদশা দেখে আমিও ভেঙে পড়ি।

'আমাকে? আমাকে সামলানো?' সুমিতার চোখ কপালে ওঠে, 'কী বোকার মতো বকছ? আমাকে সামলাবার কী হয়েছে? পিসীর কথাই বলছি তো! পিসীর সঙ্গে সেই সৈনিকটির বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক। কাল তার ছুটি ফুরানোর দিন আর কালকেই সব চুকে যাবে। সিভিল ম্যারেজ, জানো ছোড়দা? হ্যাঁ, ভালো কথা, সিভিল ম্যারেজের সংস্কৃত কি, বলো দেখি?'

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি

সৈয়দ মুজতবা আলি

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরুচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের ঝাঁছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর-জানলা বন্ধ, কিছু খোলার উপায় নেই। জানলা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চুড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘর নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেতো না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে আপোরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার—মুন্যিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জার্মান ভাষাতেই প্রবাদ আছে, ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়।

PATHAGAR.NET

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালাম, সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।

ডাক্তার যদিও জার্মান তবু হাত দু'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যার! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকি, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনিজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁ হাতটা পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত

থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে) সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদন করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা'টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু-আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিনা পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধোলাম, 'তবে যে বললেন সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা বলিনি।'

বুঝলাম, জার্মানি কান্ট হোগেলের দেশ। বললুম, 'অ।'

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাক-চোখ দিয়ে এবার রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

PATHAGAR.NET

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জার্মান সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়তো একটু বিরক্তি ফুঠে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর' লাতিন নাম জানিনে; 'হাতি' হল 'এলফ্যান্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।

'মানে! আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশপানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতি আর ঘণ্টা গালাগালি হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রান্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্স করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রান্ডি খাব বলে!

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদা সিদে বেশভূষা—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থসী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মতো সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালীতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রূপালী প্রজাপতির কি রাগিণী। তাই মতো তাঁর ব্লন্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখছেন? না? তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমি ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যুসুখ্যু। অনেক মেহানত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেই যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক থ্রিলেগেড্ রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানায়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মতো এঁকেবেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যে কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন, আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি। আজকের দিনে এসব তো বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনাদের দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি এখনো ঠিক করতে পারিনি, কি করে যে আমার তখন মনে হল এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলাম, আপনি ওয়াকিবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জার্মানরা আমার এ অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর

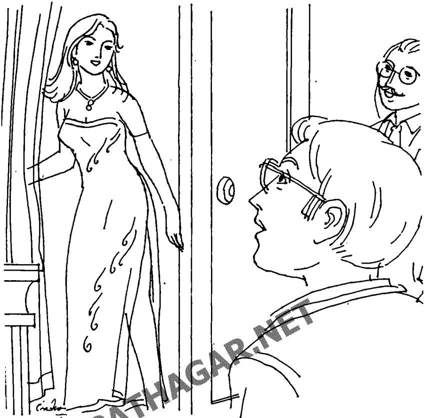

PATHAGAR.NET

হাসবেই বা না কেন? চেনা নাই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তালাশ না করে ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিস খান, না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথায় চুল ছিঁড়ছি—কোন অজুহাত কোন অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদিশ পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদে আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়কে পাওয়ার জন্য, তখন তার ফন্দি-ফকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এ-সব পাগলামি করছে কি করে!

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়ভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সিটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ একথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেন্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মতো অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু', 'হাতি', 'ঘণ্টা'।

এবার ডাক্তার কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা—হা—হা।' তারপর জার্মান উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটি, গন্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সিট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কা-ধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করলেন। একি আপনার ইন্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডোরে ঠায়। দেখি মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য)—নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুটপাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমি চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে

PATHAGAR.NET

যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপসোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামারায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী এরকম মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসলো নিয়ে একই টেবিলে, মুখোমুখি। হে মা মেরি, নত্রদাম গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশোটা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই। আমি বুদ্ধিমান! কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি! দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হত না।

'জানলা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানলাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেঁৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে বসল, 'দাঁড়ান আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি।'

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্রসম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলাম মেডিকেল কলেজে পড়ে! ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না না,' 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উঃ বড্ড লাগছে', 'এতেই হবে', 'ব্যস ব্যস' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মতো সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি, আপনি কখনো রাইল্যান্ডে গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

'প্রথমে পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শ-কাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে? মেয়েটি বোধহয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশির ঝিলিমিলি।

PATHAGAR.NET

তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন সাহসে এ বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই, বলুন।'

আমি গুন গুন করে বললুম,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরুপ্রেম হায় রে।'

ডাক্তার বললেন, 'খাশা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফটার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যার, জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালাম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টিসেপ্টিক আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তারপর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না; ওহে খানসামা, এদিকে—' ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারি ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো না থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'একখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'মুন্যিকে নাবলুম একবস্ত্রে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে নামতে গেলুম। যখন 'গুড বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে-মুখে এমন সব নতুন ভাবা পড়তে পারে যার জন্যে কোনো শব্দরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়তে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতলীয় এস্তার।

'আমি দেখলাম লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালাম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবদি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবার মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশি ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে।—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খাণিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, 'কমাবেন না! তালটা একটু দ্রুত করে নিন, আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটা গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে, বাপ-মা নেই! এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পরতে দেয়, ব্যস্। কলেজের ফিজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারি করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাবে বুড়ি এমনি নজরবন্দী করে রেখেছে যে, চকিতা হরিণীর মতো সমস্তক্ষণ সে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু অ.মার হাতে ধরে বলে, প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও, আমি তোমাকে হারাতে চাইনে। এর বেশি সে কক্খনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌছাতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনেরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার-সিনেমা মাথায় থাকুক, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজি হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম তোমার পিসির কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে? উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, প্লীজ প্লীজ।

'যা-কিছু আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা সব ঐ কলেজে রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে সার্ডিন-টিনের ভেতর মাছের মতো। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

PATHAGAR.NET

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁয় ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশি, কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভারে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?'

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস্, আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর। টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

'সব সংশয় অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মতো কাছে টেনে আনতে পারি!

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিনে। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ওরকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'

আমি বললাম, 'আপনি তো দারুণ লোক মশাই। তবে, হ্যাঁ, আপনাদের নীচশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো! কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটা আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ

কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটার বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।'

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিসই নেই—ভিখারিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতি হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জার্মানিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল—

'বেশি লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামত তোমায়-আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তারপর বিদায়। যতদিন পিসি আছেন ততদিনে আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'

ডাক্তার বললে, 'বিশ্বাস হয় আপনার! যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁয় বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজি হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশে সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কিনা আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

'আমি ম্যুনিকে পৌঁছলুম বুধবার সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ হয়ে চিংড়িটার মতো লাল হয়ে যখন বেরুলাম তখন আর হাতে বেশি সময় নেই। অথচ টাব থেকে ওরকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরল যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলাম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন তার আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বর শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, দুর্গা বলে ঝুলে পড়লুম।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে—আপনাদের পাগলা ফারেনহাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নীচে! রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।

'তিন মিনিটের যেতে না যেতে নামল মুষলধারে...বৃষ্টি নয়...সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামনো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপরে সে পরেছে সেই ক্রেপসোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল।

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরে খানিকটা পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মতো হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি ব্লু ডানয়ুবের মতো ঘন বেগুনী-নীল, ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন, পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণে হাঁচি চাপাবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম, কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চীৎকার, 'দরজা খোল!'

'পিসি!'

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরুলাম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

'আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মতো বীভৎস এক বুড়ি ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকাতেই এভাকে বলল, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি।'

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, ঘেন্না, কেলেঙ্কারি, শোবার ঘরে পরপুরুষ, 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার', এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ি আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে, যেন ছ'গজি পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি থাকতে পারলুম না। বুড়ির দুই বাহু দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম, 'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'

PATHAGAR.NET

ডাক্তার বললেন, 'মা মেরি সাক্ষী আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এতদিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করেছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মতো তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হাঁ করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশির পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস। মুখের কুঁচকানো এবড়ো খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা-নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আর বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বললে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনো অচৈতন্য।

'বুড়ি ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারাটা খুশির পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশি হয়েছে, এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই রাত দুপুরে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেলে থেকে সসেজ কাট্‌লেট এল। হৈ হৈ রৈ রৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মতো। বুড়ি এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশিটাই না হত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ, সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ-সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালীর সোনালী রোদে রূপালী প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ রাইল্যান্ডের শামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস্ কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলি-প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

PATHAGAR.NET

রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'রবিনসন ক্রুশো! আসলে তিনি কে ছিলেন জানেন, একজন মেয়ে।' সকলের দিকে চেয়ে একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, 'তবে আপনারা আর সে কথা জানবেন কী করে?'

আহত অভিমানে শিবপদবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর সকলের চোখের ইশারায় নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

ঘমশ্যামবাবুর এই উক্তি নিঃশব্দে হজম করে উৎসুক ভাবে সকলে তাঁর দিকে তাকালেন।

ঘনশ্যামবাবুর কথার প্রতিবাদ পারতপক্ষে কেউ আজকাল করেন না।

কেন যে করেন না তা বুঝতে গেলে ঘনশ্যামবাবুর এই বিশেষ আসরটি ও তাঁর নিজের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে একটি কৃত্রিম জলাশয় আছে করুণ রসিকতা সঙ্গে আমরা যাকে হ্রদ বলে অভিহিত করে থাকি। জীবনে যাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই অথবা উদ্দেশ্যের একাগ্র অনুসরণে যারা পরিশ্রান্ত, উভয় জাতের সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় সেই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজের নিজের রুচি-মাফিক স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই নব চতুর্বর্গের সাধনায় একা বা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায় বা বসে থাকে।

এই জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে জলের কাছাকাছি এক-একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বৃত্তাকার আসন পরিশ্রান্ত বা দুর্বল পথিক ও নিসর্গদৃশ্য বিলাসীদের জন্য পাতা আছে।

ভালো করে লক্ষ করলে এরকম একটি বৃত্তাকার আসনে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় পাঁচটি প্রাণীকে একত্র দেখা যাবে। তাঁদের একজনের শিরোশোভা কাশের মতো শুভ্র, একজনের মস্তক মর্মরের মতো মসৃণ, একজনের উদর কুম্ভের মতো স্ফীত, একজন মেদভারে হস্তীর মতো বিপুল, আর-একজন উষ্ট্রের মতো শীর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন।

প্রতি সন্ধ্যায় এই পাঁচজনের মধ্যে অন্তত চারজন বিশ্রাম-আসনে এসে সমবেত

হন এবং আকাশের আলো নির্বাপিত হয়ে জলাশয়ের চারিপার্শ্বের আলো জ্বলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার-দর থেকে বেদান্ত দর্শন পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব অলোচনা করে থাকেন।

ঘনশ্যামবাবুকে এ সভার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রাণান্তও অবশ্য তিনিই। এ আসর কবে থেকে যে তিনি অলংকৃত করেছেন ঠিক জানা নেই, তবে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এ আসরের প্রকৃতি ও সুর একেবারে বদলে গেছে। কুম্ভের মতো উদরদেশ যাঁর স্ফীত সেই রামশরণবাবু আগেকার মতো তাঁর ভোজন-বিলাসের কাহিনী নির্বিঘ্নে সবিস্তারে বলার আর সুযোগ পান না, ঘনশ্যামবাবু তার মধ্যে ফোড়ন কেটে সমস্ত রস পাল্টে দেন।

রামশরণবাবু হয়তো সবে গাজরের হালুয়ার কথা তুলেছেন, ঘনশ্যামবাবু তারই মধ্যে রানি এলিজাবেথের আমলে প্রথম কিভাবে হল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড গাজরের প্রচলন হয় তার কাহিনী এনে ফেলে সমস্ত প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কোনোদিন বিলাতী বেগুনের 'জেলি' সম্বন্ধে রামশরণবাবুর উপাদেয় আলোচনা শুরু না হতেই ঘনশ্যামবাবু তাঁর শীর্ণ হাড়-বেরুনো মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি টেনে বলেন, 'হ্যাঁ, বেগুন বলতে পারেন, তার বিলাতী নয়।'

তারপর কবে ২০০ খৃস্টাব্দে গ্যালেন নামে কোনো গ্রীক বৈদ্য মিশর থেকে আমদানি এই তরকারীটির বিশদ বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, তারও প্রায় বারশো বছর বাদে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে কিভাবে জিটোমেট্ নামে অ্যাজটেক জাতের এই তরকারীটি টোম্যাটো নামে ইংলন্ডে ইউরোপে প্রচলিত হয়, বিষাক্ত ভেবে কত দিন পর্যন্ত খাদ্য হিসাবে টোমাটো ব্যবহৃত হয়নি সেই কাহিনী সবিস্তারে বলে ঘনশ্যামবাবু ভোজন-বিলাসের প্রসঙ্গকে ইতিহাস করে তোলেন।

মস্তক যাঁর মর্মরের মতো মসৃণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবুর ঐতিহাসিক কাহিনীকেও আবার তেমনি ভোজন-বিলাসের গল্পে তিনি অনায়াসে ঘুরিয়ে দেন।

আসল কথা এই যে সব বিষয়ে শেষ কথা ঘনশ্যামবাবু বলে থাকেন। তাঁর কথা যখন শেষ হয় তখন আর কিছু বলবার সময় কাবুর থাকে না।

তাঁর ওপর টেক্কা দিয়ে কিছু বলাও কঠিন। কথায় কথায় এমন সব অশ্রুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ধৃতিটি তিনি করে বসেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাবার ভয়েই যার প্রতিবাদ করতে কাবুর সাহসে কুলোয় না।

ঘনশ্যামবাবু এই সান্ধ্য আসরের প্রাণস্বরূপ হলেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কাবুর জানা নেই। কলকাতার কোনো এক মেসে তিনি থাকেন ও ছেলে-ছোকরাদের মহলে ঘনাদা-রূপে তাঁর অল্পবিস্তর একটা খ্যাতি আছে এইটুকু মাত্র সবাই জানে। শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা কঠিন, আর তাঁর মুখের কথা শুনলে

PATHAGAR.NET

মনে হয় পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি যাননি, এমন কোনো বিদ্যা নেই যার চর্চা তিনি করেন না। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশিলা থেকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ হার্ভার্ড, চীনের প্রাচীন পিপিন থেকে ইউরোপের সালে প্রাগ হিডেলবার্গ লাইপজিগ্ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়।

তাঁর পাণ্ডিত্যে যত ভেজালই থাক তার প্রকাশে সে মুন্সীয়ানা আছে একথা স্বীকার করতেই হয়।

তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে আমরা আজকাল তাই নীরবে তাতে সায় দিয়ে থাকি।

রবিনসন ক্রুশোর প্রসঙ্গটার বেলায়ও সেইজন্যই জিভের উদ্যত বিদ্রোহ আমরা কোনোরকমে সামলে নিলাম।

মাথার কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবুর ছোট দৌহিত্রীটির দরুন সেদিন প্রসঙ্গটা উঠেছিল।

দৌহিত্রীটিকে সেদিন হরিসাধনবাবু বুঝি আদর করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যে বয়েসে ছেলেদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা মেয়েরা বুঝতে শেখে না বা বুঝেও মানতে চায় না, মেয়েটির বয়স ঠিক তাই। আমাদের গল্পগুজবের মধ্যে কিছুকাল মনোনিবেশ করবার বৃথা চেষ্টা করে, ওদের মাঝখানে দ্বীপের মতো জায়গাটিকে দেখিয়ে সে বুঝি বলেছিল, 'দেখেছ দাদু, ঠিক যেন রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ!'

দাদু কিংবা আর কারুর মনোযোগ তবু আকর্ষণ না করতে পেরে সে আবার বলেছিল, 'বড়ো হলে আমি রবিনসন ক্রুশো হব জানো।'

এত বড়ো একটা দুঃসাহসিক উক্তির প্রতি উদাসীন থাকা আর বুঝি আমাদের সম্ভব হয়নি। মেদভারে যাঁর দেহ হস্তীর মতো বিপুল সেই চিন্তাহরণবাবু হেসে বলেছিলেন, 'তা কি হয় রে পাগলী! মেয়েছেলে কি রবিনসন ক্রুশো হতে পারে?'

মেয়েটির হয়ে হঠাৎ ঘনশ্যামবাবুই প্রতিবাদ করে বললেন, 'কেন হয় না?'

একটু চুপ করে কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সঙ্গে আমাদের দিকে চেয়ে তিনি আবার যা বললেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

আমাদের কোনো প্রতিবাদ করতে না দেখে ঘনশ্যামবাবু এবার শুরু করলেন, 'রবিনসন ক্রুশো ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা বলেই আপনারা জানেন। এ গল্পের মূল কোথায় তিনি পেয়েছিলেন তা জানেন কি?'

মস্তক যাঁর মর্মরের মতো মসৃণ সেই শিবপদবাবু সসংকোচে বললেন, 'যতদূর জানি, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বলে একজন নাবিকের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই এ গল্প তিনি বানিয়েছিলেন।'

'যা জানেন তা ভুল!' ঘনশ্যামবাবুর মধ্যে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা ফুটে উঠল, 'আত্মম্ভরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিখে গেছে তাই অম্লান

PATHAGAR.NET

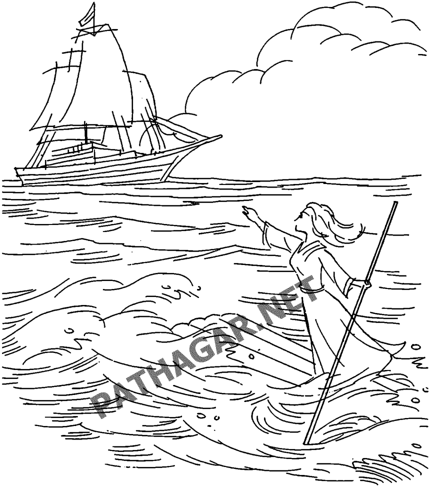

বদনে বিশ্বাস করেছেন। মনমাউথের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য ড্যানিয়েলের একবার ফাঁসি হবার উপক্রম হয় জানেন তো? লন্ডনের বাসিন্দা বলে কোনো রকমে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। তারপর নতুন রাজা-রানি উইলিয়াম আর মেরী দেশে আসার পর ড্যানিয়েল কুগ্রহ কাটিয়ে বেশ-কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই সময়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় স্পেনে! সেই স্পেনেই মাদ্রিদ শহরের এক ইহুদী বুড়োর দোকানে খুঁটিনাটি জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুঁথি পেয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। সে পুঁথির অনুলেখক রাস্টিসিয়াঙ্গে আর তার কথক স্বয়ং মার্কো পোলো।[১]

উদর যাঁর কুম্ভের মতো স্ফীত সেই রামশরণবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মার্কো পোলো মানে, যিনি ইউরোপ থেকে প্রথম চীনে গেছলেন পর্যটক হয়ে, রবিনসন ক্রুশোর মূল গল্পের লেখক তা হলে তিনি!'

একটু রহস্যময়ভাবে হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, 'না, তিনি হবেন কেন! তিনি শুধু সে গল্প সংগ্রহ করে এনেছিলেন মাত্র। সংগ্রহ করেছিলেন চীন থেকে।

ষোলো বছর বয়েসে মার্কো পোলো তাঁর বাপ আর কাকার সঙ্গে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজধানী ক্যাম্বালুকের উদ্দেশ্যে সাগর-সম্রাজ্ঞী ভিনিসের তীর থেকে রওনা হন। ফিরে যখন আসেন তখন তাঁর বয়স একচল্লিশ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর কুবলাই খাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে প্রায় সমস্ত চীন তিনি পর্যটন করে ফিরেছেন। ১২৮২ খৃস্টাব্দে ইয়াং চাওয়ের এক লবণের খনির পরিদর্শক হিসেবে কাজ করবার সময় বিখ্যাত চীনা লেখক ও সম্পাদক সান কাও চি-র সঙ্গে তাঁর সম্ভবত সাক্ষাৎ হয়। সান কাও চি তখন অতীতের সমস্ত চীনা কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করে তাতে নতুন রূপ দিচ্ছেন। সেই সান কাও চি-র কাছে শোনা একটি চীনা গল্পই রবিনসন ক্রুশোর প্রথম প্রেরণা।

মার্কো পোলোরা চীন থেকে তাঁদের বিশ্রী নোংরা রেতপ তাতার পোশাকের ভেতরে সেলাই করে শুধু হীরা মতি নীলা চুনিই নয় আরো অনেক কিছুই এনেছিলেন। ভেনিসের ডোজেকে তাঁরা যা যা উপহার দেন, ১৩৫১ সালে লেখা মারিনো ফালেইরোর প্রাসাদের মূলবান দ্রব্যের তালিকায় তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সেসব উপহারের মধ্যে ছিল স্বয়ং কুবলাই খাঁর দেওয়া আংটি, তাতারদের কলার, তেফলা একটি তরবারি, টাঙ্গুটের চমরী গাইয়ের রেশমী লোম, কস্তুরী-মৃগের শুকিয়ে রাখা পা আর মাথা, সুমাত্রার নীলগাছের বীজ।

কিন্তু বাইরে যা এনেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ এনেছিলেন পোলো তাঁর স্মৃতিতে বহন করে। জেনোয়ার কারাগারে বসে সেই স্মৃতি-সমুদ্র মন্থিত কাহিনীই তিনি মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে বলে যেতেন।

মুগ্ধ শ্রোতা কারা? না, শুধু তাঁর কারাসঙ্গীরা নয়, জেনোয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের আমীর-ওমরাহ পুরুষ-মহিলা সবাই। এই কারাকক্ষ তখন জানোয়ার তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে—রূপকথার চেয়ে বিচিত্র, সুদূর ক্যাথের কাহিনীর মধুতীর্থ।

কিন্তু সাগর-সম্রাজ্ঞী ভিনিসের পরম শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্র মার্কো পোলো জেনোয়ার কারাগারে কেন? সে অনেক কথা। দেশে ফেরবার মাত্র তিন বছর বাদে ভেনিসের চির প্রতিদ্বন্দ্বী জেনোয়ার নৌবাহিনী লাম্বা দোরিয়ার নেতৃত্বে একেবারে আদ্রিয়াতিক সাগরে চড়াও হয়ে এল। আর সকলের সঙ্গে মার্কো পোলো গেলেন একটি রণতরীর অধিনায়ক হয়ে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েই জেনোয়ার আরো সাত হাজার ভেনিসবাসীর সঙ্গে তিনি বন্দী হলেন।

PATHAGAR.NET

জেনোয়ার কারাগারে তাঁর মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে হেলে-পড়া মিনারের শহর পিসার এক নাগরিক ছিলেন। নাম তাঁর রাস্টিসিয়ানো। কাব্যের ভাষা প্রেমের কাহিনীর অপরূপ ভাষা হিসেবে ফরাসী তখনই ইউরোপে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পিসার লোক হলেও সেই ফরাসী ভাষায় রাস্টিসিয়ানের অসাধারণ দখল ছিল। মার্কো পোলোর অপূর্ব সব কাহিনী সেই ভাষায় তিনি টুকে রাখতেন।

তাঁর সেই টুকে রাখা কাহিনীই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে তার পর। দেড়শো বছর বাদে জেনোয়ার আর এক নাবিক সেই কাহিনীর ল্যাটিন অনুবাদ পড়তে পড়তে, সিপাঙ্গুর সোনায় মোড়া প্রাসাদচূড়া যেখানে প্রভাত-সূর্যের আলোয় ঝলমল করে সেই সুদূর ক্যাথের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন। সে নাবিকের নিজের হাতে সই করা ও পাতার ধারে ধারে মন্তব্য লেখা বই এখনো সেভিলের কলম্বিয়ায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়। সে নাবিকের নাম কলম্বাস।

আরো প্রায় দুশো বছর বাদে ড্যানিয়েল ডিফো মাদ্রিদের এক টুকিটাকি শখের জিনিসের দোকানে রাস্টিসিয়ান অনুলিখিত এমনি আর একটি পুঁথির সন্ধান পান। সেই পুঁথি থেকেই তেত্রিশ বছর বাদে রবিনসন ক্রুশোর গল্প তিনি গড়ে তোলেন।'

মর্মরের মতো মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু এবার বুঝি না বলে পারলেন না, 'কিন্তু রবিনসন ক্রুশো মেয়ে হলেন কী করে?'

'সান কাও চি-র যে গল্প মার্কো পোলোর মুখে শুনে রাস্টিসিয়ান টুকে রেখেছিলেন, তাতে মেয়ে বলেই তাঁকে বর্ণনা করা আছে বলে। ড্যানিয়েল অবশ্য সে গল্পের নায়িকার নাম ও জাত দুই-ই পাল্টেছেন।'

মাথায় কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু বললেন, 'কিন্তু সেই পুঁথির গল্পটা কি শুনতে পারি?'

'সে গল্প শুনতে চান? কিন্তু আসল কাহিনী অনেক দীর্ঘ, সংক্ষেপে তার সারটুকু আপনাদের বলছি শুনুন...

সুং রাজবংশের রাজধানী তখনো উত্তরের কাইফেং থেকে টাঙ্গুতে দৌরাত্ম্যে কিন্‌সাই নগরে সরিয়ে আনা হয়নি। পৃথিবীর আশ্চর্যতম শহর হিসাবে কিন্‌সাই-এর নাম কিন্তু তখনি মালয়, ভারতবর্ষ, পারস্য ছাড়িয়ে ইউরোপে পর্যন্ত পৌঁচোচ্ছে। দ্বাদশ তোরণ ও দ্বাদশ সহস্র এই নগরে চুয়ান-উ নামে এক সদাগর তখন বাস করেন। সদাগরের মণি-মাণিক্য ধন-রত্নের অবধি ছিল না, কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ তাঁর ছিল। সে হল তাঁর একমাত্র কন্যা নান সু।

কিন্‌সাই-এর খ্যাতি যেমন সারা পৃথিবীতে, নান সু-র রূপের খ্যাতি তেমনি সারা চীনে তখন ছড়িয়ে গেছে। অসামান্য রূপ হয় নিজের, নয় সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনে। নান সু-র বেলায়ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। উত্তরের কিতানরা তখন কাইফেংয়ের ওপর সমুদ্রের তরঙ্গের মতো বার বার হানা দিচ্ছে। সেই কিতানদের

দলপতি চুয়ো সান্-এর কানে একদিন কী করে নান সু-র অসামান্য রূপ-লাবণ্যের খবর পৌঁছোল। কাইফেংয়ের নগরপ্রকারের ধারে তার দুরন্ত সৈন্য-বাহিনীকে থামিয়ে চুয়ো সান্ তার সন্ধির শর্ত সুং রাজসভায় জানিয়ে পাঠাল। দ্বাদশ তোরণ ও দ্বাদশ সহস্র সেতুর যে নগরের মারকত নীল হ্রদের জলে স্বপ্নের মতো হরিত দ্বীপ ভাসে, সেই নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, চীনের নয়নের মণি নান-সুকে তার চাই। নান সু-কে পেলেই কাইফেংয়ের প্রান্ত থেকে ভাঁটার সমুদ্রের মতো তার দুধর্ষ বাহিনী সরে যাবে।

সমস্ত চীন চঞ্চল হয়ে উঠল এ সংবাদে, রাজসভা হল চিন্তিত, নান সু-র পিতা চুয়ান-উ সদাগর প্রমাদ গণলেন।

একটিমাত্র মেয়ের জীবন বলি দিয়ে সমগ্র চীনের শান্তি ক্রয় করতে সুং রাজসভা শেষ পর্যন্ত দ্বিধা করলেন না। চুয়ান-উর কাছে আদেশ এল নান সু-কে কাইফেং-এ পাঠাবার।

জাফ্রি কাটা জানলার বাইরে গজদন্তের পাখার ওপর দিয়ে ব্রীড়াবনতা নব-যৌবনা নান সু তখন বাইরের পৃথিবীর যেটুকু পরিচয় পেয়েছে, তার সমস্তই জুড়ে আছে একটিমাত্র মুখ। সে মুখ ভিনসাই নগরের তরুণ নৌ-সেনাপতি সি হুয়ান-এর।

নান সু কেঁদে পড়ল বাপের পায়ে, নতজানু হল সি হুয়ান। কিন্তু চুয়ান-উ নিরুপায়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি তাঁর নেই।

যেতেই হবে নান সু-কে সেই বর্বর কিতান দলপতিকে বরণ করবার জন্যে উত্তরের সেই হিমের দেশে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সি হুয়ানের ওপরই নান সু-কে নিয়ে যাবার ভার পড়ল।

দ্বাদশ তোরণ আর দ্বাদশ সহস্র সেতুর নগর থেকে সি হুয়ানের রণপোত যেদিন মেঘের মতো সাদা পাল মেলে রওনা হল, সমস্ত কিন্সাই নগর সেদিন চোখের জল ফেললে। কিন্তু সি হুয়ান আর নান সু-র মনে কোনো দুঃখ সেদিন নেই। ভাগ্য তাদের যদি পরিহাস করে থাকে ভাগ্যকেও তারা বঞ্চনা করবে—এই তাদের সংকল্প।

সাত দিন সাত রাত রণপোত ভেসে চলল সীমাহীন সাগরে। রণপোতের হাল ধরে আছে স্বয়ং সি হুয়ান। উত্তরে হিমের দেশের কোনো বন্দর নয়, দক্ষিণের রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের মায়াময় কোনো দ্বীপই তার লক্ষ্য। একবার সেখানে পৌঁছলে নিঃশব্দে রাত্রের অন্ধকার নান সু-কে নিয়ে সে নেমে যাবে। সুং সাম্রাজ্যের অবিচার আর বর্বর কিতান বাহিনীর অত্যাচার যেখানে পৌঁছয় না তেমনি এক নির্জন দ্বীপে নান সু-কে নিয়ে সে ঘরে বাঁধবে। হাল্কা হাঁসের পালকের ভেলা সে জন্যে সে আগে থাকতেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

মানুষের এ স্পর্ধায় ভাগ্য বুঝি তখন মনে মনে হাসছে। সাত দিন সাত রাত্রি বাদে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল আকাশে। দুর্যোগ ঘনাল মানুষের মনে।

সি হুয়ান নিজের হাতে হাল ধরায় তার অনুচরেরা গোড়া থেকেই বিস্মিত

PATHAGAR.NET

হয়েছিল। সাত দিন রাত্রিতেও গন্তব্য স্থানে না পৌঁছে তারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। উত্তর নয় দক্ষিণ দিকেই তাদের রণপোত চলেছে আকাশের তারাদের অবস্থানে সে কথা বোঝবার পর তাদের সে সন্দেহ জ্বলে উঠল বিদ্রোহ হয়ে।

রাত্রের আকাশে তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। সমুদ্র উঠেছে উত্তাল হয়ে। ভাগ্যের সঙ্গে যারা জুয়া খেলে, বিপদকেই সুযোগ-রূপে ব্যবহার করবার সাহস তারা রাখে। এই ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের পালকের ভেলা সমেত নান সু-কে নীচে নামিয়ে সি হুয়ান তখন নিজে নেমে যাবার উপক্রম করেছে। বিদ্রোহী অনুচরেরা হঠাৎ এসে তাকে ধরে বেঁধে ফেলল।

উন্মত্ত এক তরঙ্গের আঘাত রণপোত থেকে ভেলা সমেত দূরে উৎক্ষিপ্ত হতে হতে নান সু শুধু ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে একটা চিৎকার শুনতে পেল, 'ভয় নেই নান সু, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি। আমি যাব-ই।'

জ্ঞান যখন হল নান সু-র ভেলা তখন ছোট্ট এক পার্বত্য দ্বীপের সৈকতের ওপর পড়ে আছে।

সভয়ে নান সু উঠে বসল। উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকাল চারিদিকে। কয়েকটা সাগর-পাখি ছাড়া কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। দূরে অশান্ত নীল সমুদ্রের ঢেউ পার্বত্যতটের ওপর ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে এসে পড়ছে।

শশকের মতো ক্ষুদ্র নবীন-কোমল নান সু-র পা—সে পা তো কঠিন পার্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে হাঁটবার জন্যে নয়, তবু নান সু-কে ক্ষতবিক্ষত পায়ে সমস্ত দ্বীপ পরিভ্রমণ করতে হল। কোথাও কোনো জনবসতির দেখা সে পেলে না।

তুষার ধবল নান সু-র অতি সুকোমল হাত—গজদন্তের চিত্রিত পাখা ছাড়া আর কিছু যে হাত কখনো নাড়েনি, তবু সেই হাতে কন্টকগুল্ম থেকে ফল ছিঁড়ে নান সু-কে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হল।

ভীরু সলজ্জ নান সু-র চোখ, আঁখিপল্লব তার কাঁপতে কাঁপতে একটু উঠেই চিরকাল নেমে এসেছে; তবু সেই চোখ উৎকণ্ঠিতভাবে মেলে পাহাড়ের চূড়া থেকে দূর সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে হল দিনের পর দিন সি হুয়ানের আশায়। আসবে, সে বলেছে, আসবে-ই।

কত দিন কত রাত গেল কেটে। উত্তরে আকাশে কতবার সপ্তর্ষিমণ্ডলের বদলে শিশুমার আর শিশুমারের বদলে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারা প্রধান প্রহরী হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে গেল। তার কোনো হিসাবই নান সু-র আর রইল না।

কখন ধীরে ধীরে তার হৃদয় থেকে সমস্ত লজ্জা আর দেহ থেকে জীর্ণ বাস খসে পড়ে গেল সে জানতে পারলে না।

অনেক কিছু তার গেল, গেল না শুধু চোখের সেই উৎসুক দিগন্ত-সন্ধানী দৃষ্টি আর মনের সেই অবিচলিত প্রতীক্ষা।

PATHAGAR.NET

একদিন সেই প্রতীক্ষা সফল হল। দূর দিকচক্রবালে দেখা দিয়েছে সাদা পালের আভাস। দেখতে দেখতে দূরের সেই পোত স্পষ্ট হয়ে উঠল, লাগল এসে শিলাকঠিন কূলে।

কে নামছে সেই পোত থেকে? ওই তো সি হুয়ান!

অধীর আগ্রহে পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্ছল ঝরনার মতো নামতে লাগল নান সু।

মাঝপথেই সি হুয়ানের সঙ্গে দেখা হল।

উচ্ছ্বসিত ভাবে নান সু যেন গান গেয়ে উঠল, 'এসেছ সি হুয়ান, এসেছ এতদিনে?'

লুব্ধ ভাবে যে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, সে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু বিমূঢ় ভাবে চমকে দাঁড়াল, কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এসেছি এতদিনে, মানে? কে তুমি!'

সি হুয়ানের বিস্মিত অথচ লুব্ধ দৃষ্টি নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করে নান সু কাতরভাবে বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না সি হুয়ান! আমি নান সু।'

'নান সু! নান সু তো এই দ্বীপের নাম। যে দ্বীপ খুঁজতে আমরা বেরিয়েছি, সে দ্বীপ এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।'

'আমার খোঁজে তা হলে তুমি আসনি? এসেছ দ্বীপের খোঁজে?'

'হ্যাঁ এই নান সু দ্বীপের খোঁজে—সাত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য যার মাটিতে পোঁতা আছে। বলো কোথায় ঐশ্বর্য?'

অশ্রুজল চোখে নান সু এবার যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'তোমার কি কিছু মনে নেই সি হুয়ান! মনে নেই তোমার রণপোত থেকে কেমন করে ঝড়ের রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?'

'রণপোত থেকে ছাড়াছাড়ি! সাত পুরুষে আমাদের কেউ রণপোতে চড়েনি। আট পুরুষ আগে এক সি হুয়ান কি রকম নৌ-সেনাপতি ছিলেন বলে শুনেছি। এই নান সু দ্বীপের গুপ্তধন নাকি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে তো কাইফেং যখন চীনের রাজধানী ছিল সেই দু'শতাব্দী আগের কথা!'

'দু' শতাব্দী আগেকার কথা!' অস্পষ্ট আবেগরুদ্ধ উচ্চারণ করলে নান সু, তারপর নবাগত নাবিকের লুব্ধ দৃষ্টিতে হঠাৎ নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতা আবিষ্কার করে চমকে উঠল।

নাবিক তখন লোলুপভাবে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নান সু শরাহত হরিণীর মতো প্রাণপণে ছুটে পালাল, ছুটে সেই পর্বত-চূড়ার দিকে, জীবনের পরম স্বপ্ন আজও যাকে ঘিরে আছে।

কিন্তু পদে পদে তার দেহ কী গুরুভারে যেন ভেঙে পড়ছে, লুব্ধ হিংস্র নাবিকের হাত থেকে আর বুঝি রক্ষা পাওয়া গেল না।

PATHAGAR.NET

পর্বত চূড়ার প্রান্তে এসে যখন সে আছড়ে পড়ল তখন শরীরের এতটুকু শক্তি আর তার অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু লুব্ধ নাবিক তাকে সবলে আকর্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ সভয়ে শিউরে পিছিয়ে এল। সবিস্ময়ে নান সু একবার তার দিকে তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একাগ্র প্রতীক্ষা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে যে যৌবনকে অক্ষয় করে ধরে রেখেছিল সে যৌবন দেখতে দেখতে সরে যাচ্ছে। চোখের ওপর তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

বহু যুগের অভ্যাসে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দূর দিগন্তের দিকে সে বুঝি একবার তাকাল। চারিদিকে নীল সমুদ্র মথিত করেও কারা আসছে! 'কারা?' সে চিৎকার করে উঠল।

'ওরা সি হুয়ান!' অট্টহাস্য করে উঠল নাবিক, 'হুয়ানের পাঁচ হাজার বংশধর। ওরাও আসছে এই নান সু দ্বীপের গুপ্তধনের সন্ধানে, আসছে পুড়িয়ে মারতে সেই ডাকিনীকে, দু' শতাব্দী ধরে এ দ্বীপের গুপ্তধন যে আগলে রেখেছে!'

যে পাহাড়ের চূড়া থেকে নানা সু-র উৎসুক চোখ দু' শতাব্দী ধরে দিকচক্রবাল সন্ধান করে ফিরেছে, সেদিন রাত্রে জীবন্ত মশালরূপে তারই শীর্ষ সে উজ্জ্বল করে তুললে।'

ঘনশ্যামবাবু চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর মর্মরের মতো মস্তক যাঁর মসৃণ সেই শিবপদবাবু বললেন, 'কিন্তু রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে এ গল্পের কোনো মিল তো নেই?'

'থাকবে কী করে?' ঘনশ্যামবাবু একটু হাসলেন, 'সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কসাইয়ের ছেলে, গেঞ্জি আর টালির ব্যবসাদার ড্যানিয়েল ডিফো এ গল্পের সূক্ষ্ম মর্ম কতটুকু বুঝবেন! মোটা বুদ্ধিতে তাই একে তিনি ছেলে-ভুলানো গল্প করে তুলেছেন!'

'এ গল্পের আসল মর্মটা তা হলে কী?' মাথার কেশ যাঁর কাশের মতো শুভ্র সেই হরিসাধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু উত্তরে ঘনশ্যামবাবু এমন ভাবে তাকালেন যে, এ প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করবার উৎসাহ কারুর রইল না।

PATHAGAR.NET

ঘাড়

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

নিদানচার্য নেত্যধন কবিরাজ মহাশয়ের নাম আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, তবে এককালে ওঁর খুব পশার ছিল। বাড়ি, গাড়ি, সবই হয়েছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে আত্মীয়-স্বজন ছিলেন তাদের সকলের হাঁড়ি ওঁর উনুনেই চাপতে লাগল! একদিন নয়, মাসের পর মাস। কবরেজমশাই কোনোদিন কাউকে পাততাড়ি গুটোতে বললেন না, ফলে ওঁর স্ত্রীর আমন্ত্রণে শ্বশুর-শাশুড়ি, তাঁদের পুত্র, পৌত্র মায় প্রপৌত্ররা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিতে দিতে ওঁর বাড়িতেই আস্তানা বাঁধলেন।

বছর কয়েক পরেই দেখলুম, কবরেজ মশায়ের মাথাটা যেন গড়বড় করছে। আমি প্রায় প্রত্যহই যেতুম একটু গল্প করতে, কিন্তু দেখতুম, চিন্তান্বিত হয়ে সবার নাড়ী টিপে ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি অযথা রুগীদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন, আচ্ছা, আপনার নিজের বাড়িতে ক'খানা গাড়ি আছে? আপনি নিজে ক'বার চাপেন, অন্যরা কতবার চাপে? আপনার বাড়িতে ক'জন ধাড়ি মেয়ে আছে? তাদের জন্য কতগুলি বাহারি শাড়ি কিনতে হয়? আপনার আদর পেয়ে কতকগুলো ছেলে বাঁদর হয়, কতগুলো লোকের সঙ্গে সাদর ব্যবহার করে ইত্যাদি।

তাঁর বিদঘুটে প্রশ্ন শুনে কিছু লোক ক্ষেপে যায়। কিছু লোক ঢোক-গিলে দু'-চারটে কথা কয়ে সরে পড়ে।

আমি বললুম, কবরেজমশাই, আপনি নাড়ী টিপে কী আজেবাজে আজকাল বকেন! ধাত বুঝে ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেবেন—এছাড়া আজেবাজে প্রশ্ন করে লোককে চটাচ্ছেন সেটা ঠিক হচ্ছে কি? উত্তরে কবরেজমশাই বললেন, আপনি বুঝছেন না, মানুষের মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক অনেকখানি। চটলে মনে বিগড়ে, মানে নাড়ীর স্পন্দন কতখানি বাড়ে কতখানি কমে, এগুলো জানবার জন্যেই তো নাড়ী টিপে ধাতটা জানতে চেষ্টা করি। এতদিন তো আন্দাজে ওষুধ দিয়ে গেলুম, যে সারলো সারলো, মোলো, মোলো, গোলমাল চুকে গেল। ওষুধে কি কাজ হয়?

যা হোক করে কটা পুরিয়ে খেতে দিই, স্রেফ আন্দাজে। যাদের বাপের ভাগ্যি ভাল, তারা বেঁচে থাকে, আর যেগুলো কেঁচে যাবার, সেগুলো যায়। ওষুধে কিছু হয় না। ডাক্তার, কবরেজ স্রেফ আন্দাজে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে! আমিও দিই।

অথচ মূল রোগটা কোথায় বাসা বাধে, কেন বাধে, কোথায় শরীরটা দুর্বল, সেইটে

PATHAGAR.NET

জানবার জন্যেই এখন রিসার্চ করে চলেছি—এটা বুঝতে পাচ্ছেন না? আমি তাই নিয়েই তো গবেষণা করছি।

আমি বললুম, আরে মশাই, শতকরা নিরেনব্বই জনের রোগের উৎপত্তি স্থল হল মুড়ি আর ভুঁড়ি। তবে এইটে নিয়ে মাথা খাটালেই তো গোড়ার পাত্তা পাবেন।

কবরেজ মশাই মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, অত সহজ নয় মশাই, দেহের কোন অঙ্গে রোগের মূলটা আছে আমি সেইটা আবিষ্কার করে যাব। বেঁচে থাকলে নোবেল পুরস্কার পাব, যখন গবেষণা করে বিশ্বে সেটার প্রচার হবে, তখন বুঝবেন, কবরেজ ঠিক রোগের মূলটা বার করেছেন, না পাগলামো করে সরে পড়েছেন।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। হঠাৎ কবরেজ মশাই তাঁর এক ভৃত্যকে দিয়ে বলে পাঠালেন, জরুরি দরকার।

কথাটা শুনেই চলে গেলুম। দেখলুম কবরেজ মশাই তাঁর বিছানায় মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। বাড়ির সবাইকে সেখান থেকে বার করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, শুনুন বিরুপাক্ষবাবু, বার করে ফেলেছি। পুরস্কার পাব কিনা জানি না আর পেলেও লাভ হবে না। আসল রোগের গোড়া আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। আপনি এটা প্রচার করে দেবেন কোনো বেটা অস্বীকার করতে পারবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম, সেটা কি?

তিনি একবার হেসে বলে উঠলেন, ঘাড়। এর ওষুধ, রোজ আধপো করে সরষের তেল ঘাড়ে ঘষবেন। ওটাকে যতটা পারেন, শক্ত করে রাখবেন। ওটা নড়বড়ে হলেই মহাবিপদ। কিছু সামলাতে পারবেন না, কাছা-কোঁচা খুলে একেক্কার হয়ে যাবে। এবং যমরাজ ঐটে একটু দু'বেলা দেখলেই পট্ করে ওটা মটকে দেবেন, এ একেবারে নির্ঘাৎ।

এই বলে কবরেজ মশাই ঘাড় কাত করে সেই যে শুলেন আর উঠলেন না।

আমিও সেই থেকে ঘাড় সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ বুঝতে পারলুম—কবরেজ মহাশয়ের গবেষণা সার্থক। সত্যি, সংসারে জন্মগ্রহণ করে ঐ অঙ্গটিকে রীতিমতো জোরালো না করে রাখতে পারলে, সব কিছু তো ঘোরালো হয়ে পড়বেই।

আপনারা ভেবে দেখুন—আমাদের একটা চলতি কথাই রয়েছে যে, রাত-বেরুতে অন্ধকার যেখানে সেখানে বেরিয়ো না, ভূতে ঘাড় ভাঙতে পারে। কেন? ভূত তো অনেক কিছু ভাঙতে পারত কিন্তু তা তো ভাঙে না। এমনকি মাথাটাও ফাটায় না। ঘাড়ের ওপর তার যত আক্রোশ। হয় তার ওপর চেপে বসে, নয় ক্ষেপে সেটা মটকে দেয়। অতএব যারা ঘাড়কে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করতে যাবে—তাতে তাদের নিরেট আহাম্মুকিই প্রমাণিত হবে এ একেবারে ধ্রুব সত্য। বাঙালী ঘাড়ের মর্যাদা বোঝে না বলে দেখুন, প্রত্যেক জায়গায় আজকাল ঘাড় ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসছে। সোজা

PATHAGAR.NET

ঘাড় উঁচিয়ে চলবার মতো সাহস আমাদের নেই। কেউ একটা রদ্দা বাড়ালেই ঠ্যাং ছিটকে রাস্তায় চিৎপাত হয়ে সে শুয়ে পড়ে।

অথচ সেখানে শোনা যায়, আগেকার দিনে বড় বড় সব লোক ঘাড় সোজা করে অন্য লোকের ঘাড়ে কটা মাথা আছে তা দেখে আসবার তাকত রাখতেন। আর এখন দেখুন, অধিকাংশ লোকের ঘাড়টি নুড়বুড় করছে। ওটাকে জোরালো না করে, বাবুরা হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে ঘাড়ের চুলের কেয়ারী করে নিজেদের পেয়ারীদের কাছে দর বাড়াবার তাল ঠুকছে! এর বেশি করার কিছু নেই। বলিহারী লোকের রকম সকম।

এ দেশে শক্ত ঘাড় যে কারুর নেই সে কথা বলছি না, কিন্তু তার সংখ্যা ক্রমশ এ দেশের গণ্ডারদের সংখ্যার মতো কমে আসছে। আমরা এখন বাজারে ঘাড় হেঁট করে দোকানীদের কাছে গিয়ে থলে হাতে একটু অনুনয়-বিনয় করে মাছের, আনাজের দর কষাকষি করছি। যেন ক্রেতা হিসেবে আমাদের কোনো দাম নেই—বিক্রেতারাই ঘাড় উঁচু করে আমাদের শাসাচ্ছে, আর গাল দিয়ে চলেছে। আমরা বুড়ো যা হোক করে এঁকেবেঁকে ঘাড়টাকে সামলে চলছি কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তো ঘাড়ে রক্ত উঠে, ব্লাড প্রেশারের চাপে থ্রম্বসিস হয়ে, দাঁত ছিরকুটে বিছানায় শুয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। আপনারাই বুঝুন ক্রমশ যা চাপ পড়ছে, তাতে ঘাড় সোজা রাখাও শক্ত। কিন্তু উপায়ই বা কি। এদেশে অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব ঘাড়ে চাপা। নিজের ঘাড়ে নিতান্ত বোকচন্দররা ছাড়া আধসের ঝুঁকিও কেউ নিতে রাজি হয় না। সবার লক্ষ্য—একটা সুবিধে মতো ঘাড় কোথায় পাওয়া যায়। সেইটে পাবার জন্য সবাই তালে ঘোরে। কারণ, অপরের ঘাড় ভেঙে পরমানন্দ পাওয়ার সুবিধে, অন্য কিছুতে হয় না। তাই আজকাল দেখবেন, পথেঘাটে শতকরা আশিজনকে ঘাড়ে বড় বড় বগলোস পরে ঘুরতে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন—স্পন্ডিলাইটিস। এর বাংলা নাম কি জানি না, আমি একে বলি ঘাড়াতঙ্ক।

আমার বাড়িতে দেখুন—একজন লোক রোজগার করছে, আর তার ঘাড়ে গুষ্টিবর্গ বেশ নিরাপদে চেপে বসে আছে। সংসার কর, টাকা রোজগার কর, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখতে টাকা দাও, বাজার যাও, রাত্তিরে কচি ছেলেপুলেরা পরিত্রাহি চেল্লাচ্ছে, ছাতে নিয়ে গিয়ে ওদের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ঠাণ্ডা কর, আর পারি না বাপু। তুমি সব দেখ শোন, সারাদিন উনুনে তাতে মাথা কেমন কচ্ছে—তুমি একটু দেখ। সবাই বুঝেছে যে এর ঘাড়টা এখনও শক্ত আছে। অতএব বাহান্নজন চেপে বসলে ক্ষতি নেই।

আচ্ছা, সব বাড়ির কর্তা কি সার্কাসে খেল দেখিয়ে এসেছেন যে সবাইকে কায়দা করে হোল্ড করে রাখার ক্ষমতা রাখেন! তা রাখতে পারলে তো সংসারটা ভোল পাল্টে দিতে পারতেন কিন্তু সেটা অসম্ভব।

PATHAGAR.NET

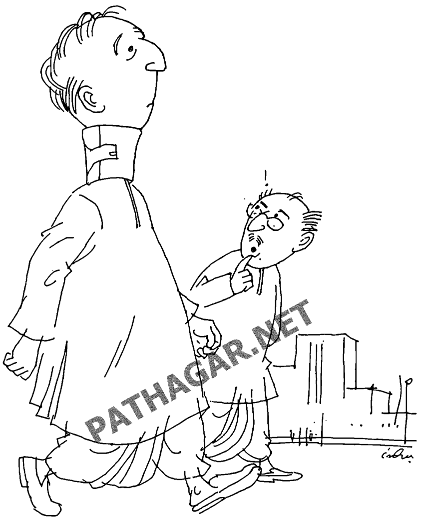
PATHAGAR.NET

কিন্তু যতক্ষণ না হরিবোল হরিবোল বলতে 'কর্তাদের' শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে ততদিন ঘাড়ের থেকে বোঝা নামে না।

আমার মনে হয়, সেইজন্যে মানুষ ভূত হয়ে শুধু প্রতিশোধ নিতে সন্ধ্যেবেলা পাঁচিলে পাঁচিলে ঘোরে, আর তারপর সুবিধে পেলেই জীবিত লোকদের ঘাড়ে চেপে খেল দেখায়।

কবরেজ মশাই তো বলে গিয়েছিলেন সরষের তেল মাখিয়ে ঘাড়কে শক্ত করুন। কিন্তু সেটা করব কিরে? সেটা যোগাড় করাই তো কঠিন। ও তো অগেকার গাওয়া ঘিয়ের চেয়ে দাম বাড়িয়ে রেখেছে। বলা সহজ কিন্তু কোনো কিছু জোগাড় করা

আজকাল অসম্ভব, সরষের তেলের কথা দূরে থাক, সরষে পোড়া দিয়ে ভূত ছাড়ানো যাচ্ছে না বলেই তো দেখছেন না অধিকাংশ লোকের ঘাড়ে মামদো, বেহ্মদিত্য, ডাকিনী, যোগিনী সব ভর করে রয়েছে—নইলে কলি শেষ হবে কিভাবে?

ঘাড়ে যদি সবাই রীতিমতো তেল মাখাতে পারত তাহলে তো ওরা দু'-চারটে পিছলে ও খসে যেত, কিন্তু তেলের অভাবে তো সবাই দন্ত মেলে চারধারে ঘোরাফেরা করছে।

আসল কথা, ঘাড় সম্বন্ধে তো আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। ঘাড়কে শুধু জোরালো করলেই তো চলবে না—কারণ সেটাকে যত জোরালো করবেন ততই আবার ওজনও বাড়তে থাকবে।

ঠিক রেসের ঘোড়াদের অবস্থা যেমন হয়। ফার্স্ট হলেই ওয়েট্ ঘাড়ে চাপবে আরও বেশি করে, দ্বিতীয়বার জিতলে তার দ্বিগুণ বাড়বে, যতক্ষণ না সে মুখ থুবড়ে পড়বে ততক্ষণ নিস্তার নেই। অতএব ঘাড় বাঁচাবার কৌশলটা রীতিমতো শিখে নিতে হবে। যদি না পারেন গেলেন।

প্রথমে ঘাড় টনটন করবে, তারপর দু'বার চিড়িক এবং তারপরেই দেহযন্ত্রের পিড়িক-পাড়াক সব বন্ধ—যেখানে যে অবস্থায় আছেন সেইখানেই ফাঁক হয়ে গেলেন। একটু গাঁক করে যে জানান দিয়ে যাবেন—তারও টাইম পাবেন না।

অতএব যদি নিরাপদে বাঁচতে চান—তাহলে সর্বাগ্রে ঘাড়টির দিকে নজর দিন।

সেদিন দেখলুম আমাদের বুড়ো ঘোষজামশাই দুই নাতিকে ঘাড়ে চাপিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন।

আমি বললুম, ঘোষজামশাই, বাজারেও ঘাড়ে দুইটি চাপিয়ে চলে এসেছেন। তিনি দেঁতো হাসি হেসে বলে উঠলেন, কি আর করি বলুন, ছাড়ে না। বাড়িতে সবাইকে বললুম, ওরে, তোরা এদের সামলা না, আমি বাজারটা সেরে আসি, কিন্তু তাতে হামলা আরও বাড়ল, মামলার নিষ্পত্তি হল না।

গিন্নী ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন, কেন ওদের তো থলি করে নিয়ে আসবে না, একটু নয় কাঁধে করে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে—তাতেই মাথা ঘুরে যাবে? আ মরি, ঠাকুরদাদার কি ছিরি!

তাই দুটিকে কাঁধে তুলেছি। একটু কষ্ট হচ্ছে—হাজার হোক বয়েস হয়েছে তো?

আমি বুঝলুম, বুড়ো এই করেই একদিন আছাড় খাবে। বুঝছে না, আসলে কে ওঁকে বোঝাবে যে বাপু, যত ঘাড় পাতবে, তত সবাই ঘাড়ে উঠে, শেষে মাথায় পা দিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন নৃত্য শুরু করে দেবে, তখন মজা বুঝবে।

অবশ্য এখনও তিনি সে অবস্থায় পৌছাননি—তবে পরিণাম যে ভীষণ তা বুঝবেন সেই দিন, যেদিন হরিনাম করারও টাইম মিলবে না।

মশাই, বিদেশ থেকে দশ বছর পরে চিকিৎসা করাতে আমার বাড়ি এক

PATHAGAR.NET

পিসেমশাই এলেন, কোনো মতে একটা ঘর খালি করে দিলুম, সঙ্গে পিসিমা রয়েছেন। পরে তার দুই ছেলে। আরও কিছুদিন পরে তাদের দুই বৌ, নাতি নাতনি জা হল—। দিন পনেরো থাকার কথা ছিল কিন্তু সেটা ওঁরা ভুলে গেলেন। আমি আর গিন্নী চিলেকোঠায় কোনো মতে শুলুম। সেখানে আবার আমার নাতি-নাতনিদের থাকবার জায়গা করতে হল। আমি ছাদে তেরপল খাটিয়ে শুয়ে রইলুম কিন্তু ওঁদের সাড়া নেই।

বাড়ির লোকেরা আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠল। সবাই বললে ওদের ভাগাও। শেষ পর্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে অসুবিধার কথাটা ওঁদের বললুম। ব্যস। একেবারে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে। পিসিমা, পিসেমশাই যাচ্ছেতাই করে জন্মের মতো আড়ি দিয়ে স্বস্থানে পাড়ি দিলেন, ভবিষ্যতে দেখা হলে বোধহয় লাঠির আঘাতে আমায় শেষ করে দেবেন সেই ভাবটা দেখিয়ে চলে গেলেন। ঘাড় পাতলেই এই বিপদ।

যদুবাবু আপিসে ঘাড় গুঁজে সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল সাড়ে ছটা পর্যন্ত মাথা গুঁজে কাজ করেন। বড়সাহেব থেকে বড়বাবুর সব ফাইল তাঁর টেবিলে জড় হয় অর্থাৎ সব কাজ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে সবাই নিশ্চিন্দি থাকে। কিন্তু উন্নতির বেলা ইন্‌ক্রিমেন্ট পাঁচ টাকা—মাথা ঠুকে আপিসের সিমেন্ট ফাটিয়ে ফেললেও লাভ নেই।

আর তার পাশেই দেখুন, এক দঙ্গল ছোকরা বসে, খাতায় তিনটে আঁচড় কেটেই টিফিন, ইউনিয়নের মিটিং। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সেমি-ফাইনাল, ক্রিকেট, টেস্টম্যাচ, অফিসের থিয়েটার রিহার্শাল, ইয়ারদের নিয়ে সিনেমায় পিয়ারদের কাকে কেমন লাগে তার আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে দিনরাত গজল্লা চলছে আর সেই হুল্লোর মধ্যে যদুবাবু ঠিক ঘাড়টি গুঁজে কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মাইনে একই।

আসল কথা ঘাড় বাঁচাতে আধুনিকরা অনেকে জানে। বুড়ো হাবড়াগুলো তার টেকনিক না শেখায় তাদের ঘাড় মুচড়ে সবাই কাজ সেরে নেয়।

আর এই জন্যই পৃথিবীতে ঘাড়ে বেশি চাড় পড়লেই ভাঁড়েও কিছু থাকবে না। যাবার সময়টা খুব দ্রুত এগিয়ে আসবে। আর এই সংসারের দাঁড়ে বসে শেকল বাঁধা অবস্থাতেই দেহটি বিকল হয়ে অকস্মাৎ কাত হয়ে পড়বে।

PATHAGAR.NET

মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না

অন্নদাশঙ্কর রায়

কফি খাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। একটা হাল্‌কা কাঠের ছবি আঁকা টিপয়ের উপর এক পেয়ালা কফি আর এক প্লেট বিলিতি মিষ্টি। কফিটা পেয়ালা থেকে পিরিচে ঢেলে বেশ একটু আওয়াজ করেই খেয়েছিলুম। তখন তো আমার ইনি ছিলেন না যে আদবকায়দার ভুল ধরতেন!

মা শুনে বললেন, 'গেল জাত। গেল ধর্ম।' তাঁর শুচিবাতিক মাত্রাতিরিক্ত। 'কিরস্থান বাড়িতে কফি খেয়ে এসেছিস। এর পর শুনব ব্রান্ডি।' তিনি কানেই তুললেন না যে কফিটা চায়েরই মতো নেশাহীন পানীয়। 'চায়ের মতো হলে হিন্দুরা খেত। কই, কেউ খায়, কখনো শুনেছিস্?'

আমার দশ-এগারো বছর বয়সে বাস্তবিক কখনো শুনিনি। তা বলে নোটনদিরা সত্যি ক্রিশ্চান ছিলেন না। ওঁরা আমাদেরই মতো হিন্দু। দোষের মধ্যে ওঁরা কফি খান, আর ওঁদের বাড়িতে ছোট জাতের লোক রাঁধে, আর ওঁদের মেয়ের অর্থাৎ নোটনদির বয়স যদিও উনিশ-কুড়ি তবু বিয়ের নামগন্ধ নেই। তখনকার দিনে ওটা কল্পনাতীত।

বাবা বলতেন, 'বিয়ের সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল কী একটা স্বদেশী মামলায়। নোটনও আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

মা বলতেন, 'হিন্দুর ঘরে এমন হয় বলে শুনিনি। ওরা কিরস্তান।'

তিনি ভুলেও ওঁদের বাড়ি যেতেন না, আমাদেরও যেতে দিতেন না। কে জানে আমরা কী মনে করে খেয়ে আসব, কোন মাংস ভেবে কোন মাংস। এই যে আমি নিষেধ না মেনে কফি খেয়ে এলুম, কে বলবে ওটা কফি না ব্রান্ডি না মাংসের সুপ।

অথচ বাড়িটা খুব কাছেই। একটা মাঠ পেরিয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। বাংলো বাড়ি, চারি দিকে নানা জাতের গাছ, বিলিতি লতাপাতা ও ঝোপ। খুব কাছে হলেও আমার মতো বালকের চোখে কেমন যেন অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন রহস্যময়। ও বাড়িতে কারো আসা-যাওয়া না থাকায় ওখানে যে কী হত তা নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলত।

নোটনদিকে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোতে দেখতুম না। কারো বাড়ি যাওয়া তো দূরে থাক নিজেদের বাগানে কি বারান্দায় তাঁর পা পড়ত না। বাইরের বাগানের

ও বারান্দার কথা বলছি, ভিতরের নয়। যত দূর মনে পড়ে সেই কফি খাওয়ার দিন তাঁকে প্রথম দেখি।

আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুধু বললেন, 'আরো?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তা জানতুম না। তিনি বোধ হয় উল্টো বুঝলেন, গম্ভীরভাবে আরো কয়েক রকম লজেন্স দিয়ে গেলেন। কোনোটা রঙিন মার্বেলের মতো, কোনোটা স্বচ্ছ আমলকীর মতো। মুড়কির মতো একরকম ছিল, তার কিছু আমি লুকিয়ে পকেটস্থ করলুম, সব যদি পেটস্থ করি তো সমবয়সীরা বিশ্বাস করবে না যে আমার কপালে ওসব জুটেছিল।

'কেমন দেখলি নোটনকে?' মা শুধালেন।

'ভালো।' ও ছাড়া ও বয়সে আর কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করতে শিখিনি মেয়েদের বেলায়।

বাবার সঙ্গেই সেদিন ওঁদের বাড়ি যাওয়া। বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই ছেলেটির নাম খোকা। বইয়ের পোকা। আপনার এখানে তো মস্ত লাইব্রেরি। ও যদি মাঝে মাঝে আসে বই পড়তে—'

জ্যোতিবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'পোকা শুনে ভয় করে। যদি কাটে।' তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত দূরে পড়েছি।

আমি লজ্জায় নিরুত্তর। বাবা বললেন, 'বঙ্কিম বাকি নেই, গিরিশ শেষ করেছে। রবি ঠাকুরের বই চায়। সেই যিনি নভেল লিখে প্রাইজ পেয়েছেন।'

'নোবেল প্রাইজ।' আমি সংশোধন করলুম।

তা শুনে জ্যোতিবাবু চমৎকৃত হলেন। 'তাও জানো? আচ্ছা, তুমি রোজ এসে রবিবাবুর বই পড়তে পারো। কেটো না কিন্তু।' তিনি শাসালেন।

সেদিন খান কতক ইংরেজি-বাংলা পত্রিকা ধার দিয়ে ও কফি খাইয়ে তিনি আমার ভয় ভেঙে দিলেন। লোকটি যে আদৌ ভয়ঙ্কর নন সেটা আমি আর একটু বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলুম। তখন কিন্তু সব ছেলের মতো আমিও তাঁকে জুজুর মতো ডরাতুম।

ক্রমে ক্রমে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হল। আমার মা কেন তাঁর বাড়ি যান না তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না। তাঁকেও বলতে পারলুম না যে, আমাদের বাড়ি আসবেন। জানতুম, মা যেমন ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন, তাঁকে হয়তো অপদস্থ হতে হবে।

বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে গেলুম। একটা ঘর যেন বই দিয়ে ঠাসা। আমার সাড়াশব্দ কেউ পায় না, বাড়ি ফিরেছি না চুপ করে পড়ছি খোঁজ করতে এসে নোটনদি শুধান, 'খোকন এখনো পড়ছ? কী বই ওটা?' 'সোনার তরী।' 'বুঝতে পারো?'

আমি লজ্জায় নীরব থাকি। তিনি বলেন, 'আমি পারিনে।'

তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে আমি ফলমূল খাই। দেখি, তিনি যে কেবল বইটই পড়েন তা নয়, তিনি ব্যায়ামও করেন। এক জোড়া গ্রিপ ডাম্বেল ছিল তাঁর টেবিলে, একটা চার্ট ঝুলছিল দেয়ালে। তিনি কাছা দিয়ে কাপড় পরতেন মরাঠী ধরনে। বীরাঙ্গনা বলে মনে হত। কেমন একটা শুষ্কতা ছিল তাঁর চুলে ও চোখে। তাঁর ঘরের এক কোণে পুজোর সরঞ্জাম। পুজোর পাত্রটি কোনো দেবদেবী না, একটি যুবক। যুবকটি বেশ তেজীয়ান। হয়তো একটু নিষ্ঠুর।

নোটনদি একবেলা আহার করতেন, মাছমাংস খেতেন না, ব্রহ্মচারীর মতো থাকতেন। তবু লোকে বলত কিরস্থান। তাঁর বাবা জ্যোতিবাবু ছিলেন পরম শাক্ত। তাঁর খাওয়ার সময় আমাকে দেখলে ধরে নিয়ে গিয়ে মুরগি চাখতে দিতেন, বলতেন, 'তোরা তো বৈষ্ণব। এটিও রামচন্দ্রের বাহন।'

মা শুনে বলতেন, 'আমার এই ছেলেটা মেলেচ্ছ হবে।' মাতৃবাক্য ব্যর্থ হবার নয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

* * *

তারপরে কেমন করে কী হল ভালো মনে পড়ে না। জীবনের সব পর্যায়ের স্মৃতি সমান তীক্ষ্ণ নয়। নোটনদিরা চলে যান আগে, জ্যোতিবাবু তার কয়েক মাস পরে। ইস্তাফা দিলেন না অবসর নিলেন, ঠিক জানিনে। লাইব্রেরির পড়া শেষে আমি তাঁদের বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ করে এনেছিলুম। তাঁদের প্রস্থান আমাকে তেমন স্পর্শ করেনি।

ম্যাট্রিক দেওয়ার আগে অসহযোগ করেছিলুম, কিন্তু পরীক্ষাটা পাঁচজনের অনুরোধে দিয়েই ফেললুম। দিয়েই চললুম ভাগ্যপরীক্ষা করতে কলকাতা। বাবা একখানা চিঠি লিখে দিলেন জ্যোতিবাবুর নামে। জ্যোতিবাবুর চাকরি নেই। পদমর্যাদার মিথ্যে মুখোশ খসে পড়েছে। দেখলুম তিনি চমৎকার লোক। যেমন হাসিখুশি, তেমন স্নেহপ্রবণ। আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন সম্পাদক মহলে। শুরু হল শিক্ষানবিশী।

খবর নিয়ে জানতে পারলুম নোটনদির বিয়ে হয়েছে সেই যুবকটির সঙ্গে। ভারত সম্রাটের মার্জনা পেয়ে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে তিনিও আন্দামান থেকে ফিরেছেন। ফিরে কিছুদিন বসে থেকে সম্প্রতি অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন। প্রায়ই মফঃস্বলে সফর করে বেড়ান। কলকাতায় থাকেন কম সময়। নোটনদি কিন্তু শাশুড়ি-শ্বশুর ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতায়।

ঠিকানা জোগাড় করে গেলুম একদিন দিদিকে দেখতে। গড়পার না বেলেঘাটা ঠিক স্মরণ নেই। বাড়িটা পুরানো ও ভাঙা। বাড়ির মেয়েদের পরনের কাপড় ময়লা ও মোটা। নোটনদি চরকা ঘটর ঘটর করছিলেন, আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন পরিবারের হালচাল, কেন কলকাতায় এসেছি, কোথায় উঠেছি, এমনি কত কথা। না খাইয়ে ছাড়বেন না, কী করি। মেসের খাওয়া খেয়ে

PATHAGAR.NET

আমারও ন্যাড়ার মতো ভাব। খেতে বললে আঁচাবার প্রশ্ন তুলি। আর বস্তুত তখন আমি ন্যাড়াই ছিলুম। কারণ তার কিছুদিন পূর্বে আমার মাতৃবিয়োগ হয়।

খুব দুঃখ করলেন আমার মা নেই শুনে। বললেন, 'আমার সাধ্য থাকলে আমি মেসে থাকতে দিতুম না খোকন। কিন্তু—'

আমি বুঝতে পেরেছিলুম কিন্তুর পরে কী। কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, 'না, না আমার অসুবিধে কিসের? মেসে কী কেউ থাকে না?'

নোটনদির সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না হলেও তাঁর মানসিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হল। প্রিয়প্রাপ্তির আনন্দে সেই তাপসী অপর্ণা যেন ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা। মনের আনন্দ শরীরেও সঞ্চারিত হয়েছে। ভরন্ত গড়ন। শ্রীমন্ত আকৃতি। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

কথা ছিল কলকাতায় যতদিন থাকি মধ্যে মধ্যে দেখা করব ও খেতে পাব। কিন্তু মেসের খাওয়া তবু সহ্য হয়, চোদ্দ পয়সার হোটেলের খাওয়া একেবারে অরুচিকর। তারপরে ডাল-রুটির দোকানে মুখ বদল করতে করতে ক্রমে ক্রমে করতে হল সজল উপবাস। ঘুরেঘুরে শেষে একটি কুঁচকি নিয়ে শয্যাশায়ী—মেসে নয় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটি কুঠুরিতে। কাজেই কলকাতা ছাড়তে বাধ্য।

কাকার কাকুতি-মিনতি শুনে অসহযোগ জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কলেজে ভর্তি হই। মফঃস্বলের কলেজে। ভাগ্যপরীক্ষার সেইখানেই ইতি।

নোটনদির কথা অচিরেই ভুলে গেলুম। মনে রাখবার মতো তেমন কোনো কারণও ছিল না। তার পরে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমরা জন কয়েক সতীর্থ মিলে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের নেতৃত্বে দিল্লী আগ্রা বেনারস বেড়াতে যাই। সারনাথে সাক্ষাৎ হল জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। তিনি কিছুদিন থেকে কাশীবাসী হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে নোটনদিও। বললেন, 'নোটন যদি শোনে তুমি কাশী এসেছিলে, ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে, তাহলে খুব দুঃখিত হবে।'

অগত্যা অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে জ্যোতিবাবুর টাঙ্গাতেই তাঁর কাশীর বাড়িতে গেলুম। দিদি আমাকে প্রত্যাশা করেননি, প্রথমটায় চিনতে ইতস্তত করলেন। পরিচয় পেয়ে বললেন, 'ওঃ! তুমি! খোকন!'

দেখলুম তাঁর কোলে একটি নতুন মানুষ এসেছে, মানুষটির নাম চামেলী। মা হয়ে নোটনদি বদলে গেছে। হৃদয়ের স্নিগ্ধ মাধুর্য যেন শতধারে ঝরে পড়েছে—চাউনিতে, কথায়, চলনে। খদ্দর-টদ্দর নয়, সাধারণ গৃহস্থ ঘরে যা পরে তাই পরেছেন।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কবে কলকাতা ফিরছেন?'

'ফিরব না বলেই এসেছি।' তিনি উদাস সুরে বললেন।

'কেন জানতে পারি?'

'গোপন করবার কিছু নেই।' তার পর ভেঙে বললেন, 'ওর সঙ্গে এক পথে চলা

PATHAGAR.NET

অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অহিংসার ভেক পরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হিংসাবাদীর দল গঠন করা আমি পছন্দ করিনে। আমিও হিংসাবাদী, কিন্তু আমার মন-মুখ এক।'

ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ওঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ তখন যুদ্ধে সব কিছু ন্যায়সঙ্গত। শিবাজী যেমন আফজল খাঁর বিশ্বাস অর্জন করে তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করলেন তেমনি অহিংসার দ্বারা ইংরেজের সঙ্গে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের ধ্বংস করতে হবে।'

আমি শিউরে উঠলুম। তিনি বলতে লাগলেন, 'এই মতবাদ আমার বিবেকবিরুদ্ধ। যতদিন পেরেছি সহ্য করেছি, কিন্তু ঘাতকের চেয়ে অশ্রদ্ধা করি বিশ্বাসঘাতককে। কী করে সে অশ্রদ্ধা চেপে রাখি? এই নিয়ে শেষকালে রাগারাগি হয়ে গেল। না হলেই ভালো হত।'

তিনি হঠাৎ উঠে গেলেন। মনে হল ওঘরে গিয়ে কাঁদলেন।

জ্যোতিবাবুর সেই টাঙ্গাওয়ালা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। হোটেলে সাথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাশী থেকে যাত্রা করলুম পাটলীপুত্র। নোটনদির স্মৃতি আবার ছায়া হয়ে গেল।

আরো তিন বছর পরে এলাহাবাদে গেছি নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় লক্ষ্যভেদ করতে। পথে বেনারসে নামতে হল একজন বন্ধুর আগ্রহে। মনে পড়ে গেল নোটনদিকে, জ্যোতিবাবুকে। ভাবলুম, এখনো কি তাঁরা সেখানে আছেন? কে জানে! একবার দেখাই যাক না।

দেখা হল নোটনদির সঙ্গে। কিন্তু এ কোন নোটনদি! এ তাঁর রুদ্রাণী রূপ। ভিতরে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলছে শাড়ির পাড়, সিঁথির সিঁদুর, হাতের রুলি। আমাকে বসতে না বলে চলে যেতে বললেন।

PATHAGAR.NET

'খোকন, বড় অসময়ে এসেছ। এখনি এ বাড়ি খানা-তল্লাশ হবে। মাকে আর চামেলীকে নিয়ে বাবা কলকাতা রওনা হয়ে গেছেন। পুলিশ যদি দয়া করে আমিও রওনা হব জেল হাজতে।'

আমি তো তাজ্জব বনলুম। কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ার ধরে বসে পড়লুম। তখন তিনিও বসলেন। বললেন, 'সময় থাকলে শোনাতুম সব কথা। আবার কবে দেখা হবে জানিনে। হয়তো এ জীবনে এই শেষ।'

আমার চোখ ছলছল করছিল। তিনি কোমল স্বরে বললেন, 'এতে মন খারাপ করার কী আছে! যারা এ পথে পা দেয় তাদের পায়ে কাঁটা ফুটবেই তো। আমি তো এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই জীবন আরম্ভ করেছি।'

'কিন্তু আপনি না ও পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন, নোটনদি?'

'কে বললে! না, আমি আমার পথে ঠিকই আছি। ছেড়ে দিয়েছি আমার স্বামীর পথ। তুমি ভুল বুঝেছিলে।'

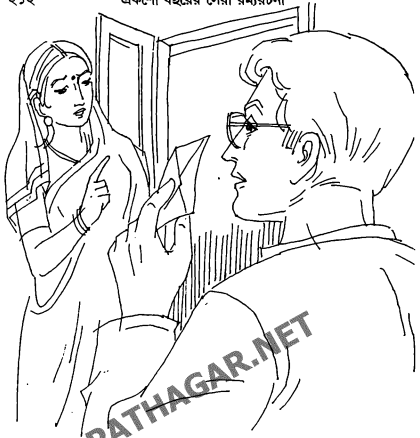

PATHAGAR.NET

তিনি আমাকে একরকম জোর করে তাড়ালেন। বাড়িটাতে আরো কয়েক জনের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম। তারা ছিল নেপথ্যে।

তাড়াতাড়ি একখানা খামের উপর ঠিকানা লিখে তাতে এক টুকরো কাগজ ভরে তিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সামনে যে ডাক বাক্স দেখতে পাবে তাতে ফেলে দিয়ো, কাছে রেখো না।' এই বলে আমাকে এক ঠেলা দিলেন।

এর পর আমি বিলেত যাই। নোটনদির যে কী হল সে খবর জানতে পাইনে। জ্যোতিবাবুর কলকাতায় বাড়ির নম্বরও ভুলে গেছলুম।

বিলেত থেকে ফিরে পুরোদস্তুর সংসারী হলুম, সমস্ত সংসারটা সংকীর্ণ হয়ে আপিস ও বাংলো এই দুই বিন্দুতে ঠেকল। দিন যায় আপিসের কাজে, রাত কাটে বাংলোয়, ছুটি ক্বচিৎ মেলে। এমন কি পুজোর ছুটিতেও আমি আটক, বড়দিনেও আমি বাঁধা।

নোটনদির নাম একবার যেন কাগজে পড়েছিলুম। শক্ত অসুখে ভুগে জেল থেকে

ছাড়া পেয়েছেন কোনো এক গ্রামে—সেখানেও অন্তরীণ। দিদিকে একখানা সহানুভূতি ভরা পত্র লিখি এমন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন যে দিনকাল, টেররিস্টের প্রতি সহানুভূতি কেউ হয়তো ভুল বুঝত টেররিজমের প্রতি সহানুভূতি বলে। মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হল।

কয়েক বছর পরে কলকাতা গেছি একদিনের ছুটিতে। এক বন্ধুর বাড়ি কী একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণটা দুপুরে। দেখি নোটনদি ও তাঁর স্বামী। দিদি যে আমার সাহেবী পোশাক সত্ত্বেও আমাকে চিনতে পারলেন এতে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। বলতে গেলে এটা আমার সাহেবিয়ানার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। সাহেবের মতো সাহেব হলে কী কেউ আমাকে বাঙালী বলে চিনতে পারত!

নোটনদি যখন শুনলেন যে আমি পরের দিন কলকাতায় যাব তখন আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে একবার হাজিরা দিতে বললেন। আমার অন্য এনগেজমেন্ট ছিল, গ্রাহ্য করলেন না।

অগত্যা যেতে হল তাঁদের সেই শ্যামবাজারের বাড়িতে। সেটা জ্যোতিবাবুর বাড়ি, তিনি ইতিমধ্যেই মারা গেছেন, তবে স্ত্রী বেঁচে। নোটনদি মার কাছেই থাকেন। তাঁর স্বামী করপোরেশনে চাকরি করে সাত বছরে তিনখানা বাড়ি করেছেন। কিন্তু স্বামীকে সহ্য হলেও স্বামীর উপদলটিকে দিদির সহ্য হয় না। কাজেই দু'জনে আপোসে আলাদা হয়েছেন। চামেলী থাকে মার কাছে একমাস, ঠাকুমার কাছে একমাস। দিদিও মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি যান, কিন্তু থাকেন না। কানাঘুষা শোনা যায় দিদির নাকি সতীন জুটেছে। অসামাজিক সতীন।

সন্ধ্যাবেলা বাঙালী সেজে দিদির ওখানে গিয়ে দেখি, আরে রাম রাম, সবাই সাহেব, হাফ সাহেব। আমি যেন হংসো মধ্যে বকঃ। ওটা অবশ্য ককটেল পার্টি নয়, কিন্তু যা চলছিল তা বিশুদ্ধ পানীয় জল নয়। অভ্যাগতরা চুরুট কিম্বা সিগারেট টানতে টানতে এক এক বার গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন। খুব রাজা-উজির মারছিলেন। পরে শুনেছিলুম এই মহাপুরুষরা নাকি লেফ্‌টিস্ট।

ব্যাপার দেখে দিদিকে বললুম, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না। আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে।'

তিনি তখন তাঁর দলবলকে বোঝালেন যে আমি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সোদর, প্রায় দশ বছর পরে আবির্ভূত হয়েছি, তাও এক রজনীর তরে। ভদ্রলোকেরা বিদায় হলেন। আমিও দিদির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পেলুম।

তিনি কোনো কালে এতটা শৌখিন ছিলেন না। পায়ের চপ্পল থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত সব ফ্যাশনেবল। চেহারা আগের চেয়ে ঢের চলনসই। ফিগার আগের মতোই স্লিম।

আমার এনগেজমেন্টের কথা তুলতেই তিনি কাকে যেন একটা হাঁক দিলেন,

বললেন আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে আমার বিছানা-বাক্স আনিয়ে নিতে। তার পর চিঠির কাগজ আনিয়ে বললেন, 'লিখে দাও, অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার সেই এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করিতে বাধ্য হইলাম।' ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার জন্য আমার কমরেডদের সঙ্গে দুটো কাজের কথা কওয়া হল না, আর তুমি কিনা যেতে চাও আড্ডা দিতে! আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, রাত বারোটা বাজবে, সেইজন্যে তোমার বিছানা আনতে পাঠালুম। কী জানি যদি এ বাড়ির বিছানা তোমার মতো সাহেব লোকের নামঞ্জুর হয়।'

সত্যি সেদিন রাত বারোটা বাজল। নোটনদি আমাকে সেই কাশীর আখ্যান ব্যাখ্যা করে শোনালেন। আর বলে চললেন কারা কাহিনী অন্তরীণ প্রসঙ্গ। শেষে তাঁর বর্তমান মতবাদ, মনোভাব ও কাউকে যা বলেননি এমন একটি রহস্য।

'তুমি সাহিত্যিক বলেই তোমাকে বিশ্বাস করে বলা।' তিনি কৈফিয়ত দিলেন।

দিদি আমার লেখা পড়েননি। শুধু সাহিত্যিক খ্যাতির খবর পেয়েছিলেন। তাতে আমার সাহিত্যিক অভিমানে আঘাত লাগলেও সাহিত্যিক কৌতূহল উজ্জীবিত হয়েছিল।

যে স্বামীকে তিনি দেবতার মতো পুজো করতেন, তাঁর কাছ থেকে কাশী চলে গিয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন তা শান্তি। তাঁর কোনো প্রোগ্রাম ছিল না সে সময়। কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁকে ঘিরে একটি দল গড়ে উঠল। দলটি আন্তঃপ্রাদেশিক।

সে দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে মাথুর বলে একটি যুবককে তিনি সকলের চেয়ে পছন্দ করতেন। মাথুর যখন বাংলা বলত তখন তাকে বাঙালি বলে ভ্রম হত, যখন মারাঠি বলত তখন মারাঠা বলে। ভারতবর্ষে সাত-আটটা ভাষায় তার সমান দক্ষতা। তার রংটিও ছিল যথেষ্ট ফরসা। সাহেবী পোশাক পরলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে লোকে সেলাম করত।

তা ছাড়া মাথুর ছিল যেমন সাহসী তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতি। তার দোষের মধ্যে সে বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু বাহুবলের কাছে সে হার মানত না। বার বার সে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছল।

এমন যে মাথুর যার কাছে নোটনদির কিছুই লুকোনো ছিল না, সেই কিনা অবশেষে স্বীকারোক্তি করে দলশুদ্ধ লোককে ধরিয়ে দিল। কী কারণে সে অমন কাজ করল—মারের চোটে না মদের নেশায় না ধনের লোভে না রূপের কুহকে—তা এখনো অজ্ঞাত। মাথুর অবশ্য নেই, স্বীকারোক্তির প্রতিশোধ কাশীর গুণ্ডারা নিয়েছে। মাথুরের শব গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু স্বীকারোক্তির দ্বারা সে যে ক্ষতি করে গেছে তার জের এখনো চলছে। নোটনদির সহকর্মীরা এখনো জেল খাটছে।

স্বীকারোক্তি দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতি করলে নোটনদির। কেননা এর পরে তিনি মানুষ মাত্রকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন। কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই, এই

PATHAGAR.NET

বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ঘোরতর সিনিক হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের স্বাস্থ্যও গেল। বেঁচে থাকতে তাঁর রুচি ছিল না। চামেলীর জন্যেও না। তিনি মরতেই চেয়েছিলেন, আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিলেনও। এমন সময় তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরীণ করা হয়। তাতেও কি তিনি বাঁচতেন! কিন্তু কেমন করে তাঁর প্রত্যয় জন্মাল যে বুর্জোয়ারাই বিশ্বাসঘাতী, কিষাণ শ্রমিকরা নয়। বুর্জোয়াদের বিশ্বাস করে তিনি ভুল করেছেন, সে ভুল অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি আরোপ করা আরো ভুল।

কিষাণ শ্রমিকদের বিশ্বাস করতে শিখে তাঁর মনের অসুখ সারল। শরীরের ব্যাধিও ক্রমে আরোগ্য হল। কমিউনিজম সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করে তাঁর সন্ত্রাসবাদে এলো সম্পূর্ণ অনাস্থা। যেদিন চাষী মজুর এক হয়ে বিপ্লব বাধাবে সেদিন সব আপনা আপনি হবে। সেই সুদিনের জন্যে নিজেকে ও নিজের দেশকে প্রস্তুত করা ব্যাতীত তাঁর অন্য কোনো কর্মপন্থা নেই। যাঁদের আছে তাঁদের তিনি অশ্রদ্ধা করেন। নিজের স্বামীকেও।

'উনি একজন ক্যাপচারওয়ালা। কংগ্রেস ক্যাপচার করব, করপোরেশন ক্যাপচার করব, কাউনসিল ক্যাপচার করব এই তাঁর প্রোগ্রাম। কার জন্যে ক্যাপচার করব? একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপদলের জন্যে। কিসের জন্যে ক্যাপচার করব? মধু লুটবার জন্যে। এই গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতাকে আদর্শবাদ বলে চালিয়ে বাবুরা নিজেরাই চালমাৎ হয়েছেন। কমুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের আর কোনো মানে নেই, ভাই।'

'কিন্তু আপনার কমরেডদেরকে দেখে তো একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে মালুম হয় না দিদি। ওঁরাও হয়তো একটা উপদল। কংগ্রেস করপোরেশনের কর্তৃত্ব করবার একটা নতুন ছল খুঁজে পেয়েছেন। বিপ্লবের অভিপ্রায় নেই।'

'বাঃ! আমি কি ওদের সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি নাকি? ওরা হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া। ঐ মাথুরের মতোই একদিন ভেঙে পড়বে মারের চোটে কি মদের নেশায় কি ধনের লোভে কি রূপের কুহকে। আমার আশা ভরসা ওরা নয়, চাষী মজুর।'

'তা হলে চাষী মজুরদের সঙ্গে খুব মিশছেন বলুন।'

তিনি মাথা নাড়লেন। 'না, খুব না। মিশতে তো চাই, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়। যত দিন অন্তরীণ ছিলুম বেশ মিশেছি।'

এর পরে কখন এক সময় তাঁর রিকশাওয়ালার কথা উঠল। সভা-সমিতিতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি একটি রিকশা করিয়েছেন।

'আমার আশা ভরসা ফাগুয়ার মতো মজদুর।' তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন। একদিন একটা মোটর লরির সামনে পড়ে অক্কা পেয়েছিলুম আর কী। ফাগুয়া তখন রিকশাটাকে এমন সুকৌশলে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল যে তেমন হাতসাফাই তোমার বুর্জোয়া ম্যাজিশিয়ানদেরও কর্ম নয়। ভারতের ভাগ্য ওরাই ঘোরাবে, তুমি দেখো ওরাই ঘোরাবে অমনি অবলীলাক্রমে। মনে হবে যেন একটা মিরাক্ল।'

PATHAGAR.NET

ততক্ষণে আমার খাওয়া সারা হয়েছিল। আমি দিদির খাওয়া লক্ষ করছিলুম। একবেলা খাওয়ার অভ্যাস কবে ঘুচে গেছে, এখন তিনি রাত্রেও খান। যা খান তাঁর সমস্ত নিরামিষ নয়, আমিষেই তাঁর তৃপ্তি অনুমিত হল। এ নিয়ে আমি একটু রসিকতা করতেই তিনি ফোঁস করে উঠলেন, 'তোমরা পুরুষেরা সব খেতে পারো, আমরা মেয়েরা পারিনে! কেন, এ বৈষম্য কেন? আমি সাম্যবাদী, জীবনের আর দশটা ব্যাপারের মতো আহারেও।'

'কিন্তু আপনি তো এখনো সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি, নোটনদি। আমার সঙ্গে টেবিলে খেলেন না, মেঝের উপর আসন পেতে খেতে বসেছেন।'

'এটা এ বাড়ির দস্তুর। মা বেঁচে থাকতে দস্তুর বদলাবে না। তা বলে তো তাঁর মরণ কামনা করতে পারিনে।'

আহারাদির পর ফাগুয়ার গল্প আবার চলল। 'সেদিন দেখি,' তিনি বললেন, 'ওদিক থেকে একটা রিকশা আসছে। তাতে বসে আছেন এক বিপুলাকায় ভদ্রলোক, সঙ্গে এক বিরাট মোট। এসব লোকের জন্যে রিকশা নয়, মোষের গাড়ি রয়েছে। একটি মহিষাসুর বিশেষ।' দিদি হাসলেন।

'তার পর?'

'তার পর দেখলুম, বেচারা রিকশাওয়ালা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মতো ভঙ্গি করছে। নিশ্চয় মাইল চার-পাঁচ টেনেছে। আমি ফাগুয়াকে বললুম তোর জাতভাই মরছে, তুই দেখছিস্? তোর শ্রেণীশত্রুর কী আসে যায়? একটা মরলে আরেকটাকে পশুর মতো হাঁকাবে। যেই কথা বলা অমনি সে লাফ দিয়ে বাবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁকে নামাল। বাবু তো রেগে টং। ছাতা উঁচিয়ে মারতে যান। যেমন মহিষাসুর তার শিং বেঁকিয়ে তেড়ে আসে। তখন ফাগুয়া তাঁর ছাতা কেড়ে নিয়ে তাঁরই পিঠে ভাঙল।'

আমি ফাগুয়ার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শুনে বিশেষ পুলকিত হইনি। কাজটা বে-আইনি। আর আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট।

'আঃ! সেই একটা দৃশ্য। এমন তেজ আমি ভদ্রলোকের মধ্যে দেখিনি, সেইজন্যেই তো আমি বিশ্বাস করি যে ভদ্রলোকেরা ওদের সঙ্গে পারবে না। শ্রেণী সংঘর্ষের দিন একতরফা মার খেয়ে ভাগবে।' তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন।

শ্রেণী সংঘর্ষ বলতে কী বোঝায় ও কী বোঝায় না, এ বিষয়ে তাঁকে দু'-চার কথা বলতে হয়েছিল। ওটা যদি একটা দেশব্যাপী দাঙ্গাই হত তবে সব দেশেই সফল হতে পারত, কারণ সব দেশেই ফাগুয়ারা বলিষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ। অথচ একমাত্র রাশিয়ায় সফল হয়েছে, তাও ফাগুয়াদের গুণে নয়, বহু জটিল যোগাযোগে।

নোটনদি শুনলেন না। তিনি তো বুঝতে চান না, তিনি চান, না বুঝেই বীর পূজা করতে। একদিন তাঁর বীর ছিলেন উৎপলাক্ষ, তাঁর স্বামী। আর একদিন তাঁর বীর হল মাথুর, তাঁর সহকর্মী। এখন তাঁর বীর হয়েছে ফাগুয়া, তাঁর রিকশা চালক।

PATHAGAR.NET

পরের দিন ফাগুয়া আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। নোটনদি ট্যাক্সি করতে দিলেন না। লোকটা বাস্তবিক গুণী। গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এমন জোর কদমে দৌড়ায় যে প্রাচীন গ্রীকদের ম্যারাথন রেস মনে পড়ে যায়। গ্রীক স্ট্যাচুর মতো পরিপাটি গড়ন, তেমন সৌষ্ঠব একটা ঐশ্বর্য।

একটাকা বকশিস দিতে গেলুম। হাত জোড় করে বলল, 'মাইজীকা হুকুম নেহি।' কিছুতেই নিল না।

* * *

তার পরে তাঁর খোঁজ রাখিনি বহুকাল। নিজের ধান্দায় ব্যস্ত ছিলুম। মনে আছে একবার একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল, নিমন্ত্রণকর্তা উৎপলাক্ষ সেন। যার সঙ্গে চামেলীর বিয়ে তার নাম পড়ে মালুম হয়নি যে সেটি একটি কিষাণ বা মজদুর। ভাবছিলুম নোটনদিকে তামাশা করে লিখব, বুর্জোয়াকে জামাই করলেন কেন? কিন্তু চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। একখানা শাড়ি কি বই, কী উপহার দিয়েছিলুম মনে নেই, সেও তিন-চার বছর আগের ঘটনা।

সম্প্রতি মাস কয়েক আগে যখন কলকাতায় বোমার হুজুগ উঠলো, গুজব শুনে মান্যবর মহোদয়রাও মধুপুর গিরিডিতে ধনজন সরালেন ও সপ্তাহান্তে সরে পড়তে লাগলেন, তখন নোটনদিও হঠাৎ আমাকে পত্রযোগে স্মরণ করলেন। লিখলেন, 'ভাবছি আমরা দিনকতক তোমার ওখানে কাটিয়ে সুবিধামতো একটা বাসা খুঁজে নেব তোমার শহরে। কোনো অসুবিধা হবে কী তোমার গৃহিণীর? তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ো। স্নেহাশীর্বাদ দিলে কি তিনি নেবেন?'

উত্তরে আমাদের দু'জনের প্রণাম জানালুম। বাড়ির সন্ধানে লোক লাগিয়ে দিলুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখলুম নোটনদি এসেছেন বটে, কিন্তু বহুবচন-এর সার্থকতা নেই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কই, আর কেউ আসেননি?'

'না, আর কে আসবে? মা নেই, তা বোধ হয় শোনোনি। চামেলীর বিয়ে হয়ে গেছে, তা বোধ হয় জানো না, আর উনি—ওঁর চাকরি না ছাড়লে কলকাতা ছাড়তে পারেন না।'

'তা হলে,' আমি জেরা করলুম, 'কেন লিখেছিলেন আমরা?'

'ওঃ!' তাঁর খেয়াল হল। 'আমরা মানে, আমি আর আমার চাকর-বাকর। তা কী করি, বলো, সব কটাই পালিয়েছে। ফাগুয়াটা শেষ পর্যন্ত ছিল। সেও যেই সাইরেন শুনেছে অমনি উধাও হয়েছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। লক্ষ্য করলুম তিনি আবার কিছু কাহিল হয়েছেন। তেমন জলুস নেই। তবে ফিগার ঠিক আছে।

কানে কানে বললুম, 'নোটনদি, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?'

'নির্ভয়ে বলো।'

PATHAGAR.NET

'বীরকে বিশ্বাস করতে পারলে কি?'

তিনি উত্তর করলেন না, আমার একখানা হাত ধরে হৃদয়ের চাঞ্চল্য নিঃশব্দে সঞ্চালিত করলেন।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, 'বাউলরা গান গায়, মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না।' যা মিলবার নয় তা ভাগ্য মিলাবে কী করে?'

তিনি ভগ্ন কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলেন, 'মিলবে কী করে!'

এ গল্পের এইখানে শেষ হলে নামকরণের মর্যাদা রক্ষা হয়। কিন্তু সত্যের মর্যাদা তার চেয়েও বড়। তাই নীচেরটুকু লিখছি।

নোটনদি থাকতে আমার বাড়িতে কয়েকজন মিলিটারি অফিসার Call করতে এলেন। সকলেই ভারতীয়। কেউ ল্যান্ড ফোর্সের, কেউ এয়ার ফোর্সের, কেউ নেভির। ঐ যাঃ নেভির উল্লেখ করতে হয় সর্বাগ্রে। আমি ভুল করেছি। তাঁরা একটা স্পেশাল ট্রেনে ভারতময় রণকৌশল ও রণসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

নোটনদি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। যেন কতকালের চেনা। তিনি তাঁর স্বহস্তে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করলেন, আমাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। বিদায়ের সময় তাঁদের প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টীকা দেওয়াও তাঁর নিজস্ব আইডিয়া। পরে যখন এই নিয়ে তাঁকে ক্ষেপালুম, তিনি বললেন ভাবালু কণ্ঠে, 'এরা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এরাই আমাদের রক্ষী। দেশ কাদের? যারা রাখতে পারে তাদের। এরাই একদিন দেশকে জয় করে নেবে, স্বাধীন করে দেবে। এতদিনে আমার প্রত্যয় হল যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে এই উপায়ে।'

তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু।

তখন তাঁকে বিরক্ত করলুম না। পরে এক সময় তাঁর কানে কানে বললুম, 'নোটনদি, তা হলে কি তোমার সমস্যার সমাধান হল? মিলল তোমার মনের মানুষ?'

তিনি অকপটে উত্তর দিয়েছেন, 'মিলেছে।'

'কোন জন যদি জানতে চাই বেয়াদপি হবে?'

তিনি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'এয়ার ফোর্স।'

'তাঁর মানে, পুরুষোত্তম লাল?'

তিনি সগৌরবে বললেন, 'মেরে লাল।'

'তা যেন হল,' আমি জেরা করলুম, 'কিন্তু মন কি মিলেছে?'

'তাও মিলেছে। শুনলে না কেমন ডাকছিল, এ বহিন! এ বহিন!'

আমি রঙ্গ করে বললুম, 'আমিও তো কতবার ডেকেছি, ও দিদি! ও দিদি! আমার উপর তো তোমার কৃপাদৃষ্টি পড়েনি।' তিনি Serious ভাবে নিলেন। বললেন, 'তুই কি পুরুষোত্তম?'

পত্রলেখার বাবা

সতীনাথ ভাদুড়ী

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নেই, হৈচৈ নেই, কথা-কাটাকাটি নেই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। সবটা কোনো কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পের সবটা করা যায়, সেসব গল্পের এ আসরের লোকের উৎসাহ নেই। রুচির মিলের জন্যই তিন-চারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডা টিঁকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হল।

'শুরু হল।'

'হ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়!'

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা ওই বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিস এঁদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটা ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটি বাক্যে।

আবার সবাই নীরব—যতক্ষণ না আর-একটা নতুন বিষয়ের উপর কথা ওঠে। নীরবতা ভাঙল সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনে।

'ন্যাপলা আসছে।'

'হ্যা-অ্যা-অ্যা।'

দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'এ বাড়ির কাছাকাছি এসে ও সাইকেলের ঘণ্টা বাজাবেই বাজাবে।'

'হ্যা-অ্যা।'

ঠিকই নেপাল। সাইকেলখানাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। বেরিয়ে এল খবরের কাগজখানাকে হাতে নিয়ে।

'কাগজে কোনো খবরটবর আছে নাকি হে নেপাল?'

'তাই দেখছি।'

গভীর মনোযোগে সে খবরের কাগজ পড়ছে দেখে সকলে অবাক হয়।...ব্যাপার কী? দোলগোবিন্দবাবু কিন্তু একবারও নেপালের দিকে তাকাননি।

আবার মিনিট-দুয়েক সকলে চুপচাপ।

রাস্তার দিক থেকে 'টর্চ'-এর আলো পড়ল, কারা যেন আসছে।

PATHAGAR.NET

'ও আবার কারা?'

'অনুপ আর পত্রলেখা হবে বোধ হয়।'

'পত্রলেখা বাড়িতে ছিল না? তাই বলো।'

মদনবাবুর বেফাঁস কথাটাকে সামলে নিলেন, 'তাই আজ চা পাওয়া যায়নি এখনও।'

'এত রাত করে গিয়েছিল কোথায়?'

'নীলমণিবাবুর বাড়িতে আটকৌড়ে ছিল যে। ওঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে জান না?'

নীলমণিবাবুর বাড়ির চাকর পত্রলেখাদের পৌঁছে দিতে এসেছে। হাতের ধামিতে আটকৌড়ের মুড়িমুড়কি আর জিলিপি।

'আটকৌড়ের খুব ঘটা দেখছি।'

'হ্যা অ্যা।'

অনুপ দেখাল, তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটে মুড়ি-কড়াই ভাজায় ভরা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরই তো ছিল আসল নেমন্তন্ন। দিদি তো পেটুকের মতো তোরই পিছনে পিছনে গিয়েছে।'

'সে আর বলতে হয় না। আমাকে ডাকতে এসেছে তবে গিয়েছি। নইলে আমার দায় পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে।'

'তোকে ডাকতে এসেছিল, সেও ভাইয়েরই খাতিরে। নইলে আটকৌড়ের কুলো পেটাবার জন্য মেয়েদের আবার ডাকে নাকি।'

'আচ্ছা বেশ, আমি পেটুক। হল তো?'

'এই রে, পত্রলেখা চটেছে। আরে তোকে চটালে কি আমাদের চলে! এই দ্যাখ্ না, তুই আজ ছিলি না, তাই আমরা এখনও চা পাইনি।'

'এই নিয়ে এলাম বলে।'

পত্রলেখা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল হাসতে হাসতে।

'এই সেদিন বিয়ে হল না নীলমণিবাবুর মেয়ের?' একটু চাপা গলা মাধববাবুর। নপাল কাছেই রয়েছে। ছেলেমানুষদের সম্মুখে এসব কথা যত না বলা যায় তত গল। তবে হ্যাঁ, নেপাল আর এখন ছেলেমানুষ নেই। এই মাস থেকেই কালেক্টরিতে কপিস্ট'-এর কাজ পেয়েছে। চাকরি-বাকরিতে ঢুকলেই ছোটরা বড়দের সঙ্গে সমান বার অধিকার পায়। তবুও প্রথম প্রথম একটু বাধে। কাল প্রথম দোলগোবিন্দবাবু নপালকে একটা গোপন কাজের ভার দিয়ে, তার বড় হবার অধিকারকে সুনিশ্চিত ীকৃতি দিয়েছেন। সে খবর আড্ডার অন্য বন্ধুদের জানা নেই, তাই তাঁরা গলার স্বর কটু নামিয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। নেপাল গভীর মনোযোগের াঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছে।

'শ্রাবণ মাসে।'

PATHAGAR.NET

'হ্যা-অ্যা।'

'আর আজকে হল এ-মাসের তেইশে।'

'হ্যাঁ।'

আঙুলের কড় গোনা শেষ হলে দোলগোবিন্দবাবু বললেন, 'যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা।'

সকলেই দোলগোবিন্দবাবুর এ স্বভাবের কথা জানে। পরকুৎসা শোনবার আগ্রহ তাঁরই বোধ হয় দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথাসময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন। তাই আসল কথাটা শোনা হয়ে গেলে, তিনি মৃদু আপত্তি তুলে বলেন, 'থাক—কী দরকার আমাদের এইসব পরের কথার মধ্যে থাকবার!'

তাঁর এই বারণ কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু এই কম কথার আড্ডাটা আপন নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়।

ভিতর থেকে পত্রলেখা সকলের জন্য আটকৌড়ের মুড়ি-কড়াই ভাজা নিয়ে এল।

'দেখুন কাকা, কে পেটুক—আমি না আপনারা।'

'আরে তোকে কি কখনো পেটুক বলতে পারি! তাহলে তো আমাদের চা-ই দিবি না আজ।'

'মা চা ঢালছে; এই এনে দিলাম বলে। নেপালদা, তুমি হুট করে চলে যেয়ো না যেন রাগ করে। তোমার মুড়ি নিয়ে আসছি। হাত তো আমার মোটে দু'খানা। একসঙ্গে কতগুলো বাটি আনব?'

'পত্রলেখা, একটি লঙ্কা আনিস তো মা আসবার সময়।'

'আচ্ছা, কাকা।'

তাঁর বন্ধুরা কেমন অনায়াসে মেয়েদের মা বলে সম্বোধন করেন, দেখে দোলগোবিন্দবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি তো চেষ্টা করেও পারেন না। বাধো-বাধো ঠেকে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। পত্রলেখা নামটা যা বড়—অনেক সময় যেন মনে পড়তেই চায় না। মা মা বলে ডাকতে পারলে সুবিধা ছিল। পত্রলেখার অন্য নামে ডাকনাম দেবারও উপায় নেই ; স্ত্রীর কড়া হুকুম মেয়েকে পত্রলেখা বলেই ডাকতে হবে। তিনি নিজে এই পাড়ারই মেয়ে—ডাকনামেই আজও পরিচিত—ভাল নামটা কেউই জানে না—ডাকনামটা আবার বিশেষ ভাল নয়—তাই পত্রলেখার নাম সম্বন্ধে এত সতর্কতা। পত্রলেখা নামটায় দোলগোবিন্দবাবুর প্রথম থেকেই আপত্তি। বলেছিলেন যে, যদি লেখা দেওয়া নামই রাখতে হয় তবে সুলেখা, বা চিত্রলেখা রাখ না কেন? কিন্তু স্ত্রীর কাছে কি তাঁর কোনো কথা খাটে? যে কথা একবার মুখ থেকে বার হবে, তার আর নড়চড় হবার জো নেই। পাড়ার মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তো তাকে। আর যার নিজের নাম দোলগোবিন্দ তার কি পত্রলেখা নামটাকে বড় বলবার মুখ আছে?

PATHAGAR.NET

কথার খই ফুটোতে ফুটোতে পত্রলেখা চা দিয়ে গেল।

'এবার তুমি পড়তে বোসোগে যাও পত্রলেখা।'

'ও কী হে নেপাল, তুমি যে একগাল মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে চা খাচ্ছ। মুড়ির মুচমুচে ভাবটা চা দিয়ে নষ্ট করে লাভ কী?'

'আমার তাই ভাল লাগে।'

'হ্যা-অ্যা আপরুচি খানা।'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাড়ার ইউনিভার্সাল মাসিমা। এঁর জিভের ধার আছে। আর কোনো খবর ইনি এগারটার সময় শুনলে, সে খবর এগারটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার সব বাড়িতে অবধারিত পৌঁছে যাবে, এইরকম একটা খ্যাতি তাঁর আছে এখানে।

'কিসের গল্প হচ্ছে ছেলেদের?'

'ও আপনি এখানে ছিলেন? হচ্ছে এইসব, হাবিজাবি কথা। আচ্ছা, চা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে মুড়ি-চিঁড়েভাজার মুচমুচে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় না?'

'দাঁতই নেই, আবার মুড়ি খাওয়া। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমার এখন। তবে যেকালে খেতাম তখন মুড়ির সঙ্গে শসা খেতে আমার ভালই লাগত। মুড়ির মুড়মুড়ে ভাবটা শসার জন্য নষ্ট হয়ে যেত বলে তো বোধ হয় না।'

'তাহলে দেখছি নেপালেরই জিত।'

'হ্যা-অ্যা, ওরই জয়জয়কার আজকাল।'

'শুনতে পাচ্ছি তো তাই। আচ্ছা, আমি এখন চলি।'

'বড় তাড়াতাড়ি চললেন।'

'এসেছি কি এখন? জপসন্ধ্যা আমার এখনও বাকি।'

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান। এই অন্ধকারে একা যাবেন কি! নেপালের চা খাওয়া শেষ হল বলে। ও পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।'

'না না, ও এখন অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে চা খাবে। কী বলিস নেপাল? আমার আবার কোথাও যাবার জন্য লোক লাগে নাকি? কাশী-বৃন্দাবন সেরে এলাম একা; এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যেতে লোক লাগবে সঙ্গে?'

'না না। নেপাল সঙ্গে যাক।'

'ও বেচারা এসেছে খবরের কাগজ পড়তে—তোমরা ওকে জোর করে পাঠাবে ফোকলা দিদিমার সঙ্গে!'

'ও কাগজ ওর পড়া। এখন এমনি নাড়াচাড়া করছে।'

'হ্যা-অ্যা, রিভাইজ করছে।'

'ইংরাজি করে আবার কী বলা হল? এসব কি আমরা বুঝি! ওসব বুঝবে পত্রলেখার মতো ইংরেজি-পড়া মেয়েরা। আচ্ছা আমি চলি। নেপাল, তুমি খবরের কাগজ পড়।'

PATHAGAR.NET

'পড়া না হয়ে থাকে, কাগজখানা বাড়িতেও তো নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যা-অ্যা।'

এতক্ষণে নেপাল কথা বলল। আর চলে না চুপ করে থাকা।

'আমার কাগজ-পড়া হয়ে গিয়েছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান মাসিমা। একটা কথা। নীলমণিদার নাতি দেখতে গিয়েছিলেন তো? কেমন হয়েছে?'

'দিব্যি বড়সড় ছেলে।'

প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই চাপা গলায়। দুই-ই অর্থপূর্ণ। এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না।

'থাক্ থাক্ যেতে দাও, দরকার কী ওসব পরের বাড়ির কথায়!'

নেপাল খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করছে।

বাড়ির ভিতর থেকে দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর চিৎকার শোনা গেল,·'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় পত্রলেখা! অঙ্ক-টঙ্ক নয়। ওসব চালাকি আমি ঢের বুঝি, বুঝলি!'

'এতক্ষণে শক্ত পাল্লায় পড়েছে পত্রলেখা।'

'হ্যা-অ্যা।'

পত্রলেখা জোরে জোরে ইতিহাস-পড়া আরম্ভ করেছে।

'বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম পদ্মমুখী, মেয়ের নাম হ্ল কিনা পত্রলেখা। হেসে বাঁচি না। নেপাল আর কেন—চল এবার আমরা যাই। তোর দরকার থাকে তো আবার না ফিরে আসিস এখানে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে।'

'হ্যা-অ্যা।'

'না না না—আমি আর আসব না—ওই দিক দিয়েই বাড়ি চলে যাব।'

বেশ জোরের সঙ্গে বলা। বোঝা গেল যে এতক্ষণে নেপাল সত্যি সত্যিই মত স্থির করে ফেলেছে।

অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবরের কাগজখানা দোলগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে নেপাল বারান্দা থেকে নেমে এল। তিনিও নিস্পৃহভাবে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অকিঞ্চিৎকর জিনিসটাকে নিলেন। বুঝে গিয়েছেন তিনি, কাগজখানা বাড়ির ভিতরে না রেখে নেপাল তাঁর হাতে দিল কেন। বুদ্ধিমান ছেলে নেপাল...

কারও মুখে একটাও কথা নেই। মাসিমার গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, তারপর আর শোনা গেল না। নির্বাক আড্ডায় একজন পা দোলাচ্ছেন, একজন আঙুলের কর গুনছেন, একজন আঙুল মটকাচ্ছেন। এ সবই প্রত্যাশিত আচরণ, হিসাব করবার সময়ের। গুণে, হিসাব করে একটা তারিখ বার করবার গুরুদায়িত্ব এখন এঁদের মাথায়। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের তারিখটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, আর এখন এঁদের উপায় নেই। চুপ করে আছেন বলে যে এঁরা সময় নষ্ট করছেন তা নয়।

'সেটা ছিল উনিশে আগস্ট। ঠিক মনে পড়েছে।' তারিখের হিসাব মদনবাবুর সব সময় নির্ভুল। সেইজন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

'যেতে দাও ওসব কথা।'

'হ্যা-হ্যা।'

এর চেয়ে বেশি কথা খরচ করতে কেউ রাজি না। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দোলগোবিন্দবাবু নেপালের দেওয়া খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামাননি তখন থেকে। রোলারের মতো গোল করে পাকিয়ে নিয়েছেন কাগজখানাকে।

মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুখে না প্রকাশ পেয়ে যায়, এ সংযম এঁদের প্রত্যেকেরই আছে। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের সঠিক তারিখটা খুঁজে বার করার মধ্যে অঙ্কর উত্তর মিলবার তৃপ্তি নেই। ওটা শুধু কৌতূহল জাগ্রত করবার প্রথম ধাপ। তার পরের প্রশ্ন ও উত্তরটাই যে আসল। সেইটা আসছে—এইবার আসছে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা খোঁজবার পালা এখন চলেছে। কার মুখ থেকে সেই কথার নির্যাসটা বার হবে প্রথম, তার এখনও ঠিক নেই। দোলগোবিন্দবাবু পা নাচাচ্ছেন। তিনি যখনই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন তখনই এমনি করে পা নাচান। এই রকম অবস্থায়, তিনি অনেক সময় ভুলে পরনিন্দা করে ফেলেন।

তবে কি ছোট্ট টিপ্পনিটা তাঁর মুখ থেকেই বার হবে? তাঁর অবিরাম পা-নাচানো লক্ষ্য করে বন্ধুরা সেই প্রত্যাশাই করেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যরকম। অতিপরিচিত ভঙ্গিতে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটা বাজল?'

অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ব্যাপার কী? সবে আজ আড্ডাটা জমে আসছিল। বন্ধুরা জানে এই প্রশ্ন দোলগোবিন্দবাবুর নোটিশ—আড্ডা ভাঙবার। রাত সাড়ে-আটটা পর্যন্তই এ আড্ডার মেয়াদ। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রী হুকুম। স্ত্রীর কথা না শুনে চলবার সাহস তাঁর নেই। শাসন বড় কড়া। পত্রলেখার পড়াশোনায় একটু মন কম; তার লেখাপড়ার একটু দেখাশোনা না করলে গিন্নী রাগারাগি করেন।...'অঙ্ক না হয় তোমার মাথায় ঢোকে না, অন্য বিষয়গুলো তো পড়াতে পার। আর কিছু না হোক বানান-টানানগুলোও তো একটু দেখিয়ে দিতে পার। না-ও যদি পড়াও, কাছাকাছি একটু বসে থাকলেও তো মেয়েটা নভেল-নাটক না পড়ে, পড়ার বইটই নাড়াচাড়া করে। মেয়েকে ঢুলতে দেখলে চোখে জলের ঝাপটাও তো দিয়ে আসতে বলতে পার। আমি থাকি সে-ই রান্নাঘরে...'

এইসব মুখ ঝামটার ভয়ে সাড়ে-আটটার সময় আড্ডা ভাঙতে হয় প্রতিদিন। খাওয়া রাত দশটায়। তার আগে কিছুতেই না—মরে গেলেও না। এই হচ্ছে পত্রলেখার মায়ের ব্যবস্থা।

PATHAGAR.NET

এইসব ব্যবস্থার কথা দোলগোবিন্দবাবুর বন্ধুদের সকলেরই জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকে যেন সাড়ে-আটটা বড় তাড়াতাড়ি বেজে গেল। অবশ্য তাঁদের কারও কাছেই ঘড়ি নেই—তবে একটা আন্দাজ আছে তো সব জিনিসেরই। দোলগোবিন্দবাবু যেন একটু উসখুস করছেন। এ জিনিস বন্ধুদের নজর এড়ায় না।...কেন?...মেয়ের পরীক্ষার সময় তো এখন নয়। কোনো কথা না বলে বন্ধুরা উঠলেন। যাবার আগে দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখ আর একবার ভাল করে দেখে গেলেন।

'হ্যা-অ্যা।'

শুধু এই কথাটা জুতো পরবার সময় একজনের মুখ থেকে অজানতে বার হয়ে গেল। এতক্ষণে দোলগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের খবরের কাগজখানা খুলবার সময় পেলেন!...ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে! পারবে। এ ছেলে পারবে। কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এসব ছেলেকে!...এদের হাতে রাখতে পারলে লাভ আছে।

খবরের কাগজের ভাঁজের ভিতর, টাইপ-করা চিঠি, আর একখানা খাম। খামের ঠিকানাও টাইপ করে লেখা...এত তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি খেলেছে খুব।...

টাইপ করবার জন্য কাল রাত্রিতে নিজের লেখা খসড়াটা দিয়েছিলেন নেপালের কাছে। নেপাল ফৌজদারী আদালতে কপিস্ট-এর পদে বহাল হয়েছে নতুন। তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেনি নেপাল ব্যাপারটা। 'দশের উপকার', 'অপ্রিয় কর্তব্য' ইত্যাদি কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুর মতো অল্পকথার মানুষের মুখে শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল তার। তার উপর আবার ফিসফিস করে বলা। পরমুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আগাগোড়া জিনিসটা। গলা নামিয়ে সে বলে, 'এ আর একটা শক্ত কাজ কী কাকাবাবু! কিছু ভাববেন না। মেশিন বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারি যদি দরকার পড়ে তো। যখন যা দরকার লাগবে বলবেন কাকাবাবু।'

'না না, আমার নিজের আবার দরকার কী! পাবলিকের উপকারের জন্যই এ কাজ করা।'

'সে তো বটেই।'

এই হয়েছিল কালকের কথা। নেপাল পত্রলেখার বাবার আস্থাভাজন হতে পারবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সম্বন্ধে বেনামী চিঠি হাতে না লিখে, টাইপ করে পাঠানোই সব দিক থেকে বিবেচনা করে যুক্তিযুক্ত। নিজের অফিসে মেশিনে টাইপ করা নিরাপদ নয়। তাই নেপালের সাহায্য নেবার দরকার হয়েছিল।

PATHAGAR.NET

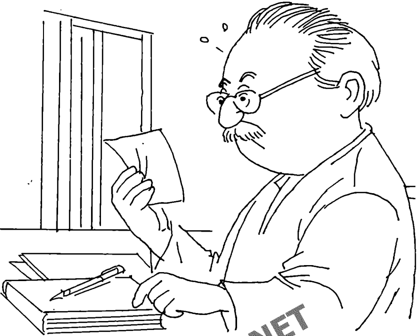

বেনামীতে চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁর এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর তুলনায় পানসে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুনসুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ; সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলে তো কথাই নেই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিখতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা-ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ওসবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস, প্রচারে; চটকদার কুৎসার কথাটা দশজনে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশি গভীর। তাই তিনি ক্রমে ওসব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদও অপেক্ষাকৃত কম।

PATHAGAR.NET

এই নিরাপত্তার দিকে চিরকাল তাঁর দৃষ্টি সজাগ। তাঁর বেনামী চিঠি দেবার কোনো কথা বন্ধুরাও জানেন না। কারও সঙ্গে তিনি কখনও আলোচনা করেননি এসব কথা। কাউকে বিশ্বাস পাননি। ওসব বিষয়ে কখনো কোনো কথা উঠলে, তিনি চিরকাল একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাব দেখাতে অভ্যস্ত। জানেন এক শুধু তাঁর স্ত্রী—তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা কর না কেন, স্ত্রীর কাছে কোনো-না-কোনো সময় সেটা ধরা পড়তে বাধ্য। চাবি-দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই তাঁর স্ত্রীর মতো বুদ্ধিমতী মহিলা হয়তো অন্য একটা মনগড়া মানে করে নিতেন। তাই তিনি তাঁর সমাজসেবার নিজস্ব ধারার কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা হল। বেনামী চিঠিও আবার নানা রকমের আছে তো। দরকার পড়েছিল সেদিন একখানা মেয়েমানুষের হাতে-লেখা বেনামী চিঠির। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলতেই দেখা গেল যে এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতা প্রচুর। একবার জিজ্ঞাসাও করেননি এ কাজে কোনো বিপদ আছে কি না। সম্মতিজ্ঞাপক মৃদু আপত্তি জানিয়ে, পরার্থে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, স্বামীর দেওয়া 'ডিক্টেশন' লিখেছিলেন। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোনোদিন পাইনি; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোনোদিন হয়নি। চিঠি লেখার পাটই আমার নেই। যাক, ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।'

আর গুণের মধ্যে বেনামী চিঠির কথা পাড়ার অন্য কারও কাছে বলে না ফেলবার মতো বুদ্ধি আছে তাঁর স্ত্রীর।

এখন কথা হচ্ছে যে, নেপালটারও সে সুবুদ্ধি আছে কি না। নেপালকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করলেন কি না সেই কথাটাই কালকে থেকে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তবে আজকে খানিক আগেই নিজের আচরণে নেপাল যা দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

যাক, সেসব যা হবার তা তো হয়েছে। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত টাইপ করা চিঠিখানা দেখেশুনে এখনই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে; নইলে ভোরে উঠে মাইল চারেক দূরের ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে আসতে পারবেন কী করে! এ পাড়ার পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিখানার উপর কোনোমতেই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আবার একটু নতুন কাজ হাতে এসে পড়ল হঠাৎ, আজকের সান্ধ্য আড্ডার গল্প থেকে। নীলমণিবাবুর মেয়ের 'কেসটা'। এই রকমই হয়; কোন দিক থেকে যে কখন কাজের বোঝা মাথায় এসে পড়ে তার কি ঠিক আছে! যখন আসে, তখন যেন অনেকগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়ে—এ তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন। এখন নীলমণিবাবুর নামে

PATHAGAR.NET

একখানা বেনামী চিঠি ছাড়তেই হয়। নতুন জামাইয়ের কাছে এখন নয়। সে সব হবে পরে দরকার বুঝলে—একটা সতর্কবাণীর মধ্যে দিয়ে। এখন শুধু নীলমণিবাবুকে দিতে হবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রথম চিঠিতে তার চেয়ে বেশি দেবার প্রয়োজন হবে না! একসঙ্গে বেশি না। নিংড়ে নিংড়ে একটু একটু করে এসব আনন্দের রস নিতে হয়। কোণঠাসা প্রাণীটা এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আঘাত খাওয়ার পর আহত শিকারটার চোখের মণি দুটোকে তাঁর বড় দেখতে ইচ্ছা করে; ভয়ার্ত বুকের অসহায় স্পন্দন আঙুলের ডগায় নিতে ইচ্ছে করে।...জামাইয়ের চিঠিখানাও এখনই দিয়ে দিলে কেমন হয়?...কিন্তু ঠিকানা যে জানা নেই। মদনবাবুর এসব মুখস্থ। কথায় কথায় জেনে নিলেই হত আজ। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে...

দোলগোবিন্দবাবু উঠলেন, ঘরের ভিতর যাবার জন্য। পত্রলেখা ছুটে আসছিল এই দিকেই—হাতে বই।

'নেপালদা। এ কী, নেপালদা চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সে তো মাসিমার সঙ্গে গেল। কেন রে?'

'লাইব্রেরির বইখানা আজ ফেরত দেবে বলেছিল।'

নেপালই নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয় এ বাড়িতে।

'যাক, কালকে ফেরত দিলেই হবে। বইখানা দে তো দেখি একবার।'

'এ বই তোমার পড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।'

'না, সেজন্য চাচ্ছি না। বইখানা বেশ লম্বা সাইজের আছে। দু'-চারখানা অফিসের চিঠি লিখতে হবে; ওই বইখানার উপর কাগজ রেখে লিখবার বেশ সুবিধা।'

'দাঁড়াও, আমি বড় প্যাডখানা এনে দিচ্ছি।'

'না না, এতেই হবে। তুই শিগগির পড়তে বোসগে যা। নইলে তোর মা এখনই আবার বকাবকি আরম্ভ করবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বি, বুঝলি। আর তোর কলমটা দিয়ে যাস তো।'

এসব কাজে নিজের কলম ব্যবহার না করে অপরের কলম ব্যবহার করাই ভাল। পত্রলেখা কলমটা নিয়ে যাবার সময় একখানা লম্বা গোছের খাতাও আনে।

'লাইব্রেরির বই; ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যাবে; তার চেয়ে এই খাতাখানার উপর কাগজ রেখে লেখাপড়া করো।'

'লাইব্রেরির বই ছিঁড়বে কেন! আমি কি বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে যাব! যা, পড়তে বোসগে যা। তুই দেখছি আমাকেও আজ বকুনি না খাইয়ে ছাড়বি না!'

মেয়ে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথাগুলো বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে তিনি কোনোদিনই বকতে পারেন না। শুধু মেয়েকে কেন, কাউকেই না। বকা, চিৎকার করা এসব তাঁর কোনোকালেই আসে না।

চাবি দিয়ে প্রাইভেট দেরাজ খুলে, তিনি লেখাপড়ার কাগজপত্র বার করলেন।

PATHAGAR.NET

একে তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কুনোব্যাঙের দপ্তর খুলে বসা। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, কাগজ,—রকমের কালি আরও অনেক দরকারি জিনিসের তাঁর স্টক থাকে, কখন কাজে লাগবে বলা তো যায় না। বেনামী চিঠি পাঠাবার দিনে ওসব কেনা ঠিক না। নেপালের চিঠিখানা তিনি ভাল করে পড়লেন। দু'-চারটে বানানে ভুল করলেও মোটামুটি মন্দ টাইপ করেনি নেপাল। ভুলগুলো কালি দিয়ে সংশোধন করা ঠিক হবে না।—কে জানে কিসে থেকে কি হয়। খামখানা থুতু দিয়ে আঁটবার সময় চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই সরকারী কর্মচারীটির ছবি। অপ্রত্যাশিত আঘাতে কেমন করে ছটফট করে বেড়াবে, অথচ কাউকে কিছু বলতেও পারবে না—এ কথা ভেবেও আনন্দ।...লোকটার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।...

'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, পত্রলেখা।'

এইবার দোলগোবিন্দবাবু দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখতে বসলেন। অপ্রতিহত তাঁর ক্ষমতা এখন। পুতুলনাচের সুতো তাঁর হাতে; যেমন ভাবে ইচ্ছা নাচাতে পারেন। আজকের হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া দায়িত্ব; সর্বাধুনিক কিনা, তাই এতটাই আজকের আসল কাজ। তিনি একখানা খামের উপর খসখস করে বাঁ হাত দিয়ে নীলমণিবাবুর ঠিকানাটা লিখলেন। অভ্যস্ত হাত। তারপর আরম্ভ হল চিঠি লেখা। কলম হাতে ধরলে কখনও কথার জন্য ভাবতে হয় না তাঁকে। কিন্তু আজ প্রথমেই আটকাল একটা বানানে! আরম্ভ করেছিলেন, 'আমরা ঘাস খেয়ে থাকি না। লোকের চোখে ধুলো—'

খটকা লাগল ধুলোর বানানে। ধ-এ দীর্ঘউ না ধ-এ হ্রস্বউ? এইটা দেখবার জন্য পত্রলেখার কাছ থেকে বাংলা অভিধানখানা চাইতে একটু সংকোচ বোধ হল। লাইব্রেরি বইয়ের মলাটের উপর 'ধূলো' আর 'ধূলো' দুটো পাশাপাশি লিখে দেখলেন কোনটা দেখায় ভাল। দুটোই সমান যে!...যদি ধুলো কথাটা পাওয়া যায় এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা ওলটাতে আরম্ভ করলেন।...বঙ্কিম চাটুজ্যে কি আর ধুলোটুলো নিয়ে কারবার করে! গোধূলি, ধূলি, ধূলিকণা এই সব গোটাকয়েক পাওয়া গেল; কয়েক পৃষ্ঠার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বইখানা নাড়াচাড়া করছেন—একখানা কাগজ বেরিয়ে এল। কতদূর পর্যন্ত পড়া হল, তারই বোধ হয় চিহ্ন দিয়েছিল লাইব্রেরির কোনো পাঠক ওই কাগজখানাকে দিয়ে।...কাগজখানার উপরের লেখাটার দিকে নজর গেল।...এ কী! পত্রলেখার হাতের লেখা না?...লেখাটা পড়লেন। প্রথমটায় একটু গোলমেলে ঠেকে। চিঠিখানার নিচে কোনো নাম নেই। কাকে লেখা তারও কোনো উল্লেখ নেই চিঠির ভিতরে। চিঠিখানা তাড়াতাড়িতে লেখা—মনে হয় খানিক আগেই লেখা হয়েছে।

—সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে পারিনি। ছোট ভাইকে নিয়ে মা'র হুকুমে আটকৌড়েতে যেতে হয়েছিল। আমার যেতে একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাগ করো না লক্ষীটি।—

PATHAGAR.NET

শেষের শব্দটার ভুল বানান এই মানসিক অবস্থাতেও নজরে পড়ে।...না...অসম্ভব! আবার পড়ে দেখলেন।...রাগে সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে। নিজের মেয়ের এই কাজ। ইচ্ছা হয় চুলের ঝুঁটি ধরে এখানে টেনে নিয়ে এসে মেয়ের এই আচরণের জবাবদিহি নেন!

চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে মনে হল যেন হঠাৎ মেয়ের নামটাই মনে পড়ছে না; কেমন যেন গুলিয়ে গেল! পরের মুহূর্তে নামটা খুঁজে পেলেন। পত্রলেখাকে তিনি আজ পর্যন্ত কখনো বকেননি। মারধর বকুনি, ওসব তাঁর আসে না কোনো কালে। বলেছেন ওসব হচ্ছে ওর মায়ের ডিপার্টমেন্ট!...তা ছাড়া মায়ের কাছে কি কখনো ওসব কথা তিনি বলতে পারেন।...

সব রাগ গিয়ে পড়ল ভিজে-বিড়াল ন্যাপলাটার উপর। ওটার ওপর বিশ্বাস করে তিনি কী ভুলই না করেছেন!...মা-বাপেরই বুঝি এসব জিনিস নজরে পড়ে সবচেয়ে শেষে! এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে আজ সন্ধ্যার আড্ডায় বন্ধুদের কথাগুলোর ইঙ্গিত এই দিকেই ছিল। মাসিমা পর্যন্ত নেপালের এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার উপর কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। দেখা যাচ্ছে সকলেই জানেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন; সকলে ঘুরিয়ে তাঁকেই খোঁটা দিচ্ছিলেন এ নিয়ে। অথচ শুধু তিনিই বুঝতে পারেননি সে সময়। এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে।...ছি ছি ছি!...ওই হতভাগাটাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে; ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে; করতে হবে তো আরও কত কী! কিন্তু তাঁর যে ওসব আসে না কোনো কালেই! পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাট কি তাঁরই উপর এসে পড়বে!...ওই বাঁদরটাই নিশ্চয় পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানোর ফন্দিটা শিখিয়েছে। ও চালাকিটা আগে থেকে রপ্ত না থাকলে, কখনও কি অত তাড়াতাড়িতে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে ভরে চিঠি চালান দেবার কথাটা কারও মাথায় খেলে? ধরে চাবকানো উচিত রাস্কেলটাকে!...কিন্তু মারধর করলে নেপালটা আবার চটে তাঁর বেনামী চিঠি দেবার অভ্যাসের কথা লোকের কাছে বলে বেড়াবে না তো? তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠির খসড়াটাও যে সেই হতভাগাটার কাছেই থেকে গিয়েছে।...ভয়-ভয় করে।

কী করা উচিত এখন? অনেকক্ষণ ধরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন বিষয়টাকে নানা দিক থেকে। যত ভাবেন তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোনো কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজ থেকে একটা পুরনো পেনফোল্ডার বার করলেন। কলমটার নিব নেই। কলমের উল্টোদিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।

PATHAGAR.NET

চিঠি

বুদ্ধদেব বসু

'চিঠি লিখো কিন্তু।'

শোভা লজ্জিতভাবে হেসে বললে, 'হ্যাঁ, এই বুড়ো বয়সে আবার চিঠি!'

স্ত্রীর কথায় তার এই নেহাৎই যুবকোচিত সখের জন্য সুরেন নিজেও মনে মনে একটু লজ্জিত হল। ব্যাপারটাকে যা-হোক একটা শোভন আচ্ছাদান দেবার চেষ্টায় সে বললে, 'বাঃ, ছেলেপুলেদের জন্য একটা ভাবনা হবে না।'

শোভা বললে, 'ক' দিনই বা!'

সত্যি, বেশিদিন নয়। যে-দরকারে যাচ্ছে, তাতে বড় জোর দিন চারেক সবসুদ্ধ। 'তা এক জায়গায় গেলে কি আর', নিজেকে বোঝাবার মতো করে সে বললে, 'চট করে চলে আসা যায়। দু'-চারদিন দেরি হয়ই। তার উপর আবার মানিকের সর্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা', শোভা হেসে ফেললে, 'সে হবে খ'ন।'

'মনে থাকবে তো ঠিক?'

'থাকবে। তুমি গিয়েই একটা পৌঁছসংবাদ দিয়ো কিন্তু।'

এবার সুরেনের সুযোগ। বললে, 'দিল্লি-লক্ষ্ণৌ তো আর যাচ্ছি নে। এত ভাবনা কিসের?'

'এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে পৌঁছসংবাদ একটা দিতে হয়।'

'মা-র কাছে লিখবো।'

'বেশ তা-ই লিখো।

'তুমি মনে-মনে রাগ করবে না? একটুও নয়?'

'আর কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ো তো চট করে। কাল আবার সকাল-সকাল উঠতে হবে খেয়াল আছে?'

সুরেন চুপ করলে, কিন্তু শিগ্‌গির তার ঘুম এলো না। এত আনন্দ তার মনে। কলকাতা পৌঁছে শোভাকে সে যে-চিঠি লিখবে, সেটা সে মনে মনে তৈরি করছিল,—না, তা ঠিক নয়, সেটা ভাবছিল মনে-মনে অস্পষ্ট, অনির্দ্দেশ্যভাবে। যে-কথাগুলো নিয়ে সেই চিঠি, তা সে তখনো জানে না। সে শুধু দেখতে পাচ্ছিল তার ছবি। চার পৃষ্ঠা ভরা ঘন লাইনে কালির আঁচড়, সাদা খামের উপর তার ব্যবসাদার হস্তাক্ষরে শোভার নাম, টিকিটের উপর ডাকঘরের ছাপ ভাঙা হয়ে পড়েছে। দু'দিন

PATHAGAR.NET

বাদে শোভার জবাব পৌঁছবে এসে তার হাতে—কাঁচা হাতের লেখা, অনেক কাটাকুটি, পুনশ্চর পর আবার পুনশ্চ। এই রকম রাত্তিরে ঘরে খিল এঁটে আলো জ্বেলে সে লিখবে—অনভ্যস্ত আঙুলে বারবার যাবে কালি লেগে। লেফাফার গোপনতায় আবদ্ধ দু'জনের মনের কথা করবে আনগোনা। লেফাফাটা প্রথম হাতে এলে উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে একটু দেখা—কী আছে ভিতরে জানি নে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। তারপর সেটা খোলা—খোলবার সময় হয়-তো আঙুল যাবে একটু কেঁপে। সাদা কাগজের উপর থেকে কতগুলো অক্ষর নীরবে তাকিয়ে আছে। যে-সব কথা এত বেশি সত্য, তা এত বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—আশ্চর্য। বড় সহজ কথা, কিন্তু মুখে কখনো বলা যায় না। সহজ বলেই যায় না। আর মুখের কথা—সে তো বলামাত্র ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। চিঠি—চিঠি হচ্ছে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিস। তাকে ছোঁয়া যায়। রাত বেশি হলে বার করে এনে আর-একবার পড়া যায়। হয় তো সে ফিরে এলে, যে-সব কথা তার চিঠিতে লিখেছিল, তার জন্য দু'জনের মনে-মনে একটু লজ্জা করবে। পারতপক্ষে চিঠির কথা তুলবে না। হয়-তো তা-ই হবে। কেননা, চিঠি লিখে তাদের অভ্যেস নেই। অভ্যেস নেই বললে কমিয়ে বলা হয়, এ পর্যন্ত তারা একে-অন্যের কাছে একখানা চিঠি লেখেনি। সুযোগ পায়নি লেখবার। সাত বছর তাদের বিয়ে হয়েছে, আর এই সমস্ত সময় তারা রয়েছে কাছাকাছি, এমন একটু ফাঁক ঘটেনি যাতে চিঠি লেখা যায়।

এই ছোট শহরেই সুরেনের পৈতৃক ভিটে, মস্ত বড় পরিবারের মধ্যে এখানেই সে বরাবর মানুষ হয়েছে। কুড়ি বছর যখন তার বয়েস, তার মা ঐ শহরেই এক বিধবার মেয়েকে খুঁজে বার করে তার বিয়ে দিলেন। শোভার মাও শহরে অনড়, দেশে তাঁর বাড়ি-ঘর নেই, অন্য কোথাও যাবার নেই। শোভা যখন মাঝে-মাঝে মা-র কাছে গিয়ে থাকতো, সুরেন যেত প্রায় রোজই। বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলেই উচ্ছ্বসিত পত্রস্রোত উভয় দিকে ধাবিত হতে থাকে—বাঙালি দম্পতির মধ্যে এটাই রেওয়াজ। সুরেনও তার দাদার সঙ্গে জুটে গেলো বীমার দালালির কাজে; তাদের অঞ্চলে বীমা জিনিসটা তখনো খুব বেশি প্রসার লাভ করেনি। শহরের মধ্যে থেকেই তারা জুটিয়ে ফেললে অনেক গ্রাহক। সাত বছরের মধ্যে সুরেনকে বাইরে যা যেতে হয়েছিল, তা আশেপাশের কোনো গ্রামে, তাকে বাইরে যাওয়া বলে না। কাজের চাপ বাড়তে লাগলো; কোম্পানি বড় ভাইয়ের তদারকে সেই শহরে খুললে এক ব্রাঞ্চ আপিস। সুরেন এমনিই বাড়ি থাকতে ভালোবাসে, বেড়াতে যাবার সখ তার বড়-একটা নেই। এর পর থেকে, কাজে জড়িয়ে পড়ে বাইরে যাওয়া তার পক্ষে ধারণার অতীত হয়ে উঠলো। আপিসের কাজে তাকে না হলে তার দাদার চলে না। দালালি সে করতো ভালো; ঐটুকু শহরের মধ্যে বীমা করবার মতো এতগুলো জীবন ছিল, অবাক হতে হয় ভাবলে। নিজেরে বাড়িতে বসে দু'পয়সা রোজকার করে বেশ ছিল

PATHAGAR.NET

সে, স্ত্রীকে নিয়েও সে সুখী হয়েছিল। মা দাদা বৌদি ভাগ্নে, নানা বয়েসের ছেলেমেয়ে, নানা সম্পর্কের ভাইবোন, প্রাত্যহিক অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদির মধ্যে একরকম ফুটে উঠেছিল শোভার সঙ্গে তার চাপা মৃদু গোছের ভালোবাসা। খুব একটা তীব্রতা প্রথম অবস্থাতেও ছিল না; সাত বছর পরেও, তিনটি ছেলেমেয়ে সত্ত্বেও, অভ্যাসের ঢিল ধরেনি। সুরেনের শুধু মাঝে মাঝে যেন মনে হত, সাত বছর ধরে শুধু ওর কাছেই থাকলাম। হঠাৎ ইচ্ছে করতো, কয়েকদিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে; শুধু, ওকে ফেলে থাকতে কেমন লাগে, তা জানবার জন্য। ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে, কিন্তু সেই সমস্তটা ফাঁকা যেন ওকে দিয়ে ভরা। এখানে এত কথা, এত কাজ, এত ভিড়ের মধ্যে ওকে যেন ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, অন্য-কোথাও গেলে ওর সবটা ধরা পড়বে চোখে। তাছাড়া—চিঠি, হ্যাঁ চিঠি লেখাটা দাম্পত্য জীবনের একটা অঙ্গ, সে জানতো। কম মধুর নয়। বন্ধুর কেউ-কেউ তাদের বউদের চিঠি দেখাতো তাকে—কী মস্ত মস্ত ব্যাপার, কত সুন্দর-সুন্দর কথা, বানানো কথার মতো। সুরেন মুগ্ধ হয়ে হয়ে যেত। একটা চিঠির কয়েকটা লাইন তার মন ভুলতে পারেনি; 'জানলার কাছে নিমগাছ থেকে ঝরে পড়েছে ছোট-ছোট সাদা ফুল, কয়েকটা উড়ে এসে পড়ল আমার বিছানায়। তক্ষণি মনে পড়ে গেলো তোমার কথা; লিখতে বসলুম চিঠি।' এই পত্রের লেখিকা ছিলেন বি-এ পাশ; সম্ভ্রমে সুরেনের মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। ও-রকম চিঠি পেতে ভালো লাগবে, আর লিখতে। ঠিক ও-রকম না-ই বা হল, চিঠি তো হবে। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে করতো, শোভাকে চিঠি লিখতে—কোনো বাছবিচার না করে যা খুশি তা-ই, মন খুলে শুধু বকে যাওয়া ভাবতেই হাসি পায়। কিন্তু এমন হাসি পাবারই বা কী, মুখের যখন কিছুতেই বলবার নয়? কী লিখবে চিঠিতে, সুরেন তা ঠিক জানে না, ভেবে দ্যাখেনি কখনো। শুধু জানে অনেক কথা লিখবে। বাজে কথা। সাত বছরের মধ্যে এমন একটা দিন এলো না, যেদিন দূর থেকে সে শোভাকে শোনাতে পারে তার মনের বকুনি।

এতদিনে সুযোগ এসেছে। প্রতি বছর তাদের কোম্পানির বাৎসরিক ভোজে ও পরামর্শ-সভায় কলকাতার আপিস থেকে তাদের নিমন্ত্রণ আসে। নিমন্ত্রণ-রক্ষা করেন তার দাদাই; তবে এ বছর তিনি জ্বরে পড়েছেন বলে তাকে যেতে হচ্ছে। কাল সে যাবে। কলকাতা পৌঁছেই সে শোভাকে চিঠি লিখবে। চিঠি লিখবে, এ-কথা মনে করতেই এত আনন্দ যে স্বভাবত ঘুম-কাতুরে লোক হয়েও খানিকক্ষণ তার ঘুম এলো না। পরদিন রওনা হবার আগে নানা সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যেও এক ফাঁকে সে সুযোগ করে নিলে আর-একবার এ-কথা বলবার; 'লিখো কিন্তু চিঠি।'

কলকাতায় এসে সুরেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলো। এত বড় শহর, এত লোক—এর মধ্যে নিজেকে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে, চিনতে পারছে না নিজেকে। তাদের ছোট শহরে সে, রাস্তায় বেরোয় ঢিলেঢালা-ভাবে; হাতে আছে কাজ,

PATHAGAR.NET

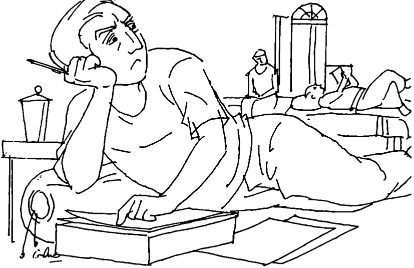

কিন্তু চলার ধরনে ব্যস্ততা নেই ; আস্তে-আস্তে হাঁটে, পদে-পদে সাক্ষাৎ হয় বিভিন্ন স্তরের পরিচিতর সঙ্গে, কুশল প্রশ্ন-বিনিময়ে, এটা-ওটা-সেটা আলাপে লঘু হয় কাজের দায়িত্ব, অন্তরের প্রসন্নভাব যেন দিনের বিস্তৃত কর্মরাশিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আর এখানে, কলকাতায়, কাজ হচ্ছে নেহাৎই কাজ, চোখ-মুখ বুজে সম্পন্ন করবার, যেমন করে হোক সারবার একটা দায়। সবাই তড়বড় করে চলে, তাকায় না কোনোদিকে, কথা কয় না কারো সঙ্গে। যেন এক প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি সবগুলো লোককে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ফুটপাত ভরে, অসংখ্য ট্রাম আর বাস ভর্তি করে নানা দিক থেকে নানা দিকে আনাগোনা করছে এত লোক—কেউ কাউকে চেনে না, কারো সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই—এই ব্যাপারটা সুরেনের মনে বিভীষিকার মতো ঠেকলো। তার প্রাদেশিক জীবনের সুলভ-অবসর মন্থরতা নিয়ে এখানে সে একেবারে খাপছাড়া। যে-মেসটাতে সে এসে উঠলো, সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দারা তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহল দেখালো না—কোত্থেকে আসছেন, কেন এসেছেন, ক'দিন থাকবেন, এ-সমস্তও নয়। সে যে এসেছে, তাদের মধ্যে নতুন একজন লোক, কিছুই নয় যেন এ-ব্যাপারটা। নিতান্ত প্রয়োজনীয়ের বাইরে কোনো কথা বলবার সে বাইরে থেকে উৎসাহ পেলো না। না পেলে তার নিজের মধ্যে সাহস; রাজধানীর ভাষা তার জিহ্বায় সহজে আসতো না। নামমাত্র আহার করে সে বেরিয়ে পড়ল তার কাজে; সমস্ত দিন কাটলো ক্লাইভ স্ট্রীটে তাদের হেড আপিসে। বেরুলো যখন, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রে ফিরতি স্রোতের খর-চাঞ্চল্য। মৃদুসঞ্চারী সান্ধ্য ছায়ায় প্রকাণ্ড দালানগুলো অশুভ দৈত্যচমূ-র মতো আকাশের দিকে উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কলকাতা তার ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড়,

PATHAGAR.NET

যান-যন্ত্র নিয়ে চারদিক থেকে সুরেনকে ঠেসে ধরলো। তার নিঃশ্বাস যেন আর সহজে পড়ছে না। কর্মক্ষেত্রে তার সমাদর হয়েছে, স্বয়ং গোল্ডিং-সাহেব তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন, কোম্পানি থেকে তাকে একটা বাঁধা মাইনে দেবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কিছুই তার ভালো লাগছিল না। তার চারদিক এমন ফাঁকা, সে এমন একা এত অসুখী তার জীবনে এর আগে কখনো লাগেনি। শুধু তার শোভাকে মনে পড়ছিল, শোভার মুখ, মনে পড়েছিল তার লুটিয়ে পড়া আঁচলের লাল পাড়। মিথ্যে এই ব্যস্ততা, এই কোলাহল, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে-চলা এই ভিড়। সব মিলিয়ে গিয়ে রইলো এক নির্জনতা, যেখানে এক শোভা ছাড়া আর-কিছু নেই। মোটে তো একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন শোভাকে সে দ্যাখেনি। যদি তার নিজের ইচ্ছে-মতোই সে চলতে পারতো, তা হলে আজকে রাত্তিরের গাড়িতেই সে যেত ফিরে।

ভারি মন নিয়ে সে ফিরে এলো তার বৌবাজারের মেসে। সে এসেছে, এই ব্যাপারটা কোথাও একটু ছাপ পড়লে না। সে যেমন ছিল, রইল তার মনে। তীব্র ক্ষুধা তার জঠরে, অথচ সে-বিষয়ে তার বোধ ছিল না। খাবার কথা তার মনেও হল না একবার। এত অবসাদ তার শরীরে সেই পোশাকেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল তক্তপোশের উপর। ঘরের অন্য দিকের সিটে মাথার সামনের দিকে টাকপড়া চশমা চোখে এক ভদ্রলোক পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছেন কোন জন্মের পুরনো এক ছবিদার বিলিতি সাপ্তাহিকের। ধোবার হিসেব আর অশ্লীল ছড়া অঙ্কিত দেয়ালে দুটো মোটা টিকটিকি শিকার নিয়ে লড়াই করছে কি প্রেম করছে বোঝা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিক বাল্‌বের সামনে একরাশ খুদে-খুদে পোকা তাদের মুহূর্তের জীবন নিয়ে জড়ো হয়েছে। রাস্তার ট্রাফিকের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর ভেসে আসছে অস্পষ্ট হয়ে। পাশের ঘরে স্টোভে ভাজা হচ্ছে ওম্‌লেট, পাওয়া যাচ্ছে তার গন্ধ। সুরেনের ইন্দ্রিয় যে-সব জিনিস অনুভব করছে, তার মন তা দিচ্ছে ফিরিয়ে, গ্রহণ করতে পারছে না কিছুই। তার মনের মধ্যে একটা শূন্যতা, ভীষণ একাকীত্ব। চুপচাপ সে শুয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ সেই একাকীত্ব আর শূন্যতা তার মনের মধ্যে যেন কথা কয়ে উঠলো; তারা তোলপাড় তুলছে, কলরব করছে, তারা খুঁজছে ভাষা। তারা প্রকাশিত হবে। এতক্ষণে সুরেনের মনে পড়ল তার সেই চিঠির কথা, শোভাকে যা লিখতে পারবে বলে কলকাতায় আসবার কল্পনায় সে অত খুশি হয়েছিল। হ্যাঁ, এখনই সে শোভাকে চিঠি লিখবে, সাত বছরের মধ্যে তার প্রথম চিঠি। মনের মতো করে লিখবে একটি চিঠি, মনের কথা দিয়ে ভরে; তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বার-বার মনে পড়ছে তোমাকে। এ-কথা এত সত্য আর এত সহজ, নিজের মনে উচ্চারণ করে সুরেন নিজেই অবাক হয়ে গেলো। সে উঠে বসল; বার করলে কাগজ আর কলম ; দেওয়ালের দিকে মুখ করে, কেউ যাতে না দেখতে পায়, নিজের শরীর দিয়ে

PATHAGAR.NET

কাগজটাকে যথাসম্ভব আড়াল করলে। ঠিকানা আর তারিখ ঘষঘষ করে লিখে আরম্ভ করলে—

'শোভা'

তারপর সে একবার বালিশটাকে বুকের নিচে ভালো করে চাপা দিয়ে নিলে, খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো, বাজে একটা কাগজের উপর কলম দিয়ে কয়েকটা আঁকিবুঁকি আঁকলে, তারপর আবার তাকালো তার চিঠির দিকে, যেখানে লেখা রয়েছে;

'শোভা'

'শোভা' কথাটার উপর সে কয়েকবার কলম বুলোলে ; অক্ষরটা বিশ্রীরকম মোটা হয়ে উঠলো। বালিশটাকে নিলে পালটিয়ে। কলমটাকে ঠিক প্রস্তুত অবস্থায় ধরে সে ভাবতে লাগল...ভাবতে লাগল। কী বলে আরম্ভ করবে? তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বার-বার মনে পড়ছে তোমাকে; ঐ তো দুটি কথা, এক লাইনেই শেষ হয়ে যায়। ঐ দুটি কথা নিয়ে কী করে সে পাতা ভরাবে? তার সেই চার পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি, যার ছবি মনে-মনে সে দেখেছিল, ছবি হয়েই তা রইল, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অনেক অনেক দূরে। ঐ তার দুটি কথাই বার-বার লিখে পাতার পর পাতা ভরে সে যদি পাঠাতে পারতো! আর, অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে-ভাবতে সেই দুটি কথার ধার যেন তার নিজেরই মনে ক্ষয়ে আসতে লাগল, কাগজের উপর তাদের লিখিত হবার যোগ্যতাকে সে আরম্ভ করলে সন্দেহ করতে; এমন কি, ঐ দুটি কথা সত্যি তার মনের কথা কিনা, সত্যি কি শোভাকে ছেড়ে এসে কিছুই তার ভালো লাগছে না, সত্যি কি বার-বার মনে পড়ছে তাকে, তাও যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না। অদ্ভুত আধ-শোয়া অবস্থায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তার কোমর টাটাতে লাগল। তখন হঠাৎ সে লিখে ফেললে তার চিঠি;

'আজ সকালে এখানে নিরাপদে পৌঁচেছি। পথে কোনো অসুবিধা হয়নি। মানিকের জন্য চিন্তিত আছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর কী লিখবো। ইতি।'

কাগজটা ভাঁজ করে সে খামে ভরতে যাবে, হঠাৎ থেমে গেল। কী একটু ভাবলে, তারপর ভাঁজ খুলে বসিয়ে দিলে একটা পুনশ্চ—

'মনে হচ্ছে আমার ঘরের টেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে গোটা সাতেক খুচরো টাকা পড়ে রয়েছে। দেরাজটায় চাবি লাগিয়ে রেখো, আর যদি চাবি খুঁজে না পাও, টাকাগুলো তোমার হাতবাক্সে তুলে রেখো।'

কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল বলে সুরেন মনে-মনে একটু শান্তি অনুভব করলে। মন্মথ নামে তার এক দূর সম্পর্কের ভাই এসে উঠেছে বাড়িতে ; ছেলেটা সুযোগ পেলেই চুরি করতে ছাড়ে না।

PATHAGAR.NET

কালোবাজারে প্রেমের দর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনঞ্জয় ও নীলার মধ্যে গভীর ভালোবাসা।

কোনো নাটকীয় রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে তাদের ভালোবাসা জন্মেনি, প্রেমে পড়ার বয়স হবার পর ঘটনাচক্রে হঠাৎ দেখা এবং পরিচয় হয়েও নয়। অল্প বয়স, ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও স্নেহ-মমতার সম্পর্ক বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভালোবাসায় পরিণত হয়, তাদের প্রেমটা সেই জাতের।

লীলা যখন স্কুলে পার হয়ে কলেজ ঢুকেছে এবং ধনঞ্জয় ব্যবসায় নেমেছে তখনো তারা ভালবাসা টের পায়নি। মাঝখানে ধনঞ্জয় ব্যবসা উপলক্ষে বছর তিনেক বাইরে ছিল—সেই সময় দু'জনের মনেই খটকা লাগে যে ব্যাপারটা তবে কি এই? ধনঞ্জয় ফিরে আসা মাত্র সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়ে যায়—প্রথম দর্শনের দিনেই।

তা, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে এত আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বিশেষত এ রকম পাকাপোক্ত বনিয়াদের ওপর অনেককাল ধরে যে ভালোবাসা গড়ে ওঠা সেটা বিরাট দালানের মতোই—গাঁথুনি শেষ হবার আগে কে সেটাকে ইমারত বলে মনে করে?

তারপর বছরখানেক ধরে তাদের ভালবাসা জমাট বেঁধেছে। এখন বিয়ের মধ্যে যথারীতি সমাপ্তি ঘটলেই হয়।

একটু বাঁধা আছে, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ব্যবসা ধনঞ্জয় মন্দ করছে না। কিন্তু এখনো ততটা ভালো করতে পারেনি লীলার বাবা পশুপতির যেটুকু দাবি। এমন একটা কিছু এখনো ধনঞ্জয় করতে পারেনি যাতে ব্যবসায়ী জাতের বড় বা মাঝারি রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে তুলনায় যতই ছোট হোক অন্তত বড় ব্যবসায়ীর জাতে উঠতে পেরেছে বলে তাকে গণ্য করা যায়।

ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্য ধনঞ্জয় বলেছে, 'যেমন ধরুন লাখখানেক টাকা? কিন্তু সেটা কিভাবে দেখতে চান? কারবারে খাটছে অথবা ব্যাংকে জমা হয়েছে?'

পশুপতি বলেছে, 'না না, এমন কথা আমি বলছি না যে আগে তোমাকে লাখপতি হতে হবে? লাখ টাকার কারবারি কি দেউলে হয় না? সে হল আলাদা কথা। ব্যবসার আসল ঘাটিতে তুমি মাথা গলিয়েছ—এটুকু হলেই যথেষ্ঠ। তারপর তোমার লাক আর আমার মেয়ের লাক। তুমি এখনো যাকে বলে ব্যবসায়ে এপ্রেন্টিস।'

লীলার ইচ্ছা হলে অবশ্য এ বাধাটুকু কোথায় ভেসে যেত। কিন্তু লীলাও এ বিষয়ে বাপের সমর্থক।

PATHAGAR.NET

সে বলে, 'যাই বল তাই বল; এদিকে ঢিল দিলে চলবে না। তোমার চাড় নষ্ট হয়ে যাবে—আমাকে নিয়ে মেতে থাকবে দিনরাত। তোমার ফিউচার নষ্ট করতে রাজি হব অত সস্তা পাওনি আমাকে।'

ধনঞ্জয়ের ভবিষ্যৎ অবশ্য লীলারও ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভালবাসার মানেও তো তাই। কাজেই, এটা লীলার স্বার্থপরতা মনে করা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। ধনঞ্জয় তা মনেও করে না।

খুব বেশি দুর্ভাবনার কারণও তার নেই। অপূর্ব যে কালোবাজার সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব যে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে ব্যবসা করে মুনাফা লুটবার, তাতে একবার একটা লাগসই সুযোগ পাকড়াতে পারলে আর দেখতে হবে না, রাতারাতি ব্যবসাজগতে নিজেকে এমন স্তরে তুলে নিতে পারবে যে লীলা বা তার বাবার কিছু বলার থাকবে না।

লীলা মাঝে মাঝে বলে, 'কী করছ তুমি? অ্যাদ্দিনেও কিছু করতে পারলে না, টুকটাক চালিয়ে যাচ্ছ! এদিকে কত বাজে লোক উতরে গেল। লোকেশবাবুর হতভাগা ছেলেটা পর্যন্ত একটা পারমিট বাগিয়ে কী রেটে কামাচ্ছে!'

ধনঞ্জয় বলে, 'তোমরা শুধু ব্ল্যাকমার্কেটটা দেখছ আর এটা বাগিয়ে ওটা বাগিয়ে কত সহজে কে বড়লোক হচ্ছে সেটা দেখছ। ওই বাগানের জন্য যে কী ভয়ানক কম্পিটিশন, কত কাঠখড় পোড়াতে হয়—সেটা তো দেখছ না।'

লীলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে হেসে বলে, 'তুমি পারবে। বাবা বলেন, মালটা তুমি খাঁটি।'

ধনঞ্জয় হেসে বলে, 'আর তুমি কী বল? ভেজাল?'

'ভেজাল! আমার কাছে ভেজাল চলে? খাঁটি না হলে তোমায় আমি হাত ধরতে দিলাম?'

ইতিমধ্যে ধনঞ্জয়ের আশা-লোলুপতার বৃন্তে ফুল ধরবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিকে যেমন বেড়ে যায় তার কর্মব্যস্ততা আর কমে যায় লীলার সঙ্গে দেখা করা গল্প করার সময়, অন্যদিকে তেমনি তার কথাবার্তা চালচলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নতুন ধরনের একটা উৎসাহ ও উত্তেজনা।

'কী হয়েছে তোমার?'

লীলার প্রশ্নের জবাবে ধনঞ্জয় তাকে শুধু একটু আদর করে।

'ব্যাপারটা কী?'

'বলব পরে।'

লীলা হেসে বলে, 'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।'

'বুঝেছ?'

'বুঝব না? বিয়ের তারিখ ঘনিয়ে না এলে পুরুষমানুষের এ রকম ফুর্তি হয়!'

PATHAGAR.NET

কয়েকদিন পরে তারা দু'জনে এক ভাটিয়া কোটিপতির বাড়িতে এক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরেছে। ধনঞ্জয় বলে, 'একটা মোটা কন্ট্রাক্ট বোধহয় পাব।'

লীলা গিয়েছিল পশুপতির সঙ্গে, ধনঞ্জয় গিয়েছিল একা। প্রীতি অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় অযাচিত উপেক্ষিত হয়েছিল আগাগোড়া—যেটুকু খাতির পেয়েছিল সবটুকুই লীলার জন্য। কিন্তু আজ ধনঞ্জয়ের কোনো ক্ষোভ আছে মনে হয় না।

লীলা খুশি হয়ে বলে, 'খুলে বলো।'

ধনঞ্জয় খুলেই বলে। হাজার আশি টাকার ব্যাপার। পরে কৌশলে আরো কিছু বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ নিরঞ্জন দর দেবার মালিক, তাকে অনেক চেষ্টায় বাগানো গেছে।

'বাবা কম হাঙ্গামা করতে হয়েছে আমাকে। লোকটা নিজে এতটুকু রিস্ক নেবে না, সব নিয়মদুরস্ত হওয়া চাই। কোনো দিকে ফাঁক থাকলে চলবে না। অথচ এদিকে চাহিদাটি ঠিক আছে। দশ বছরের পুরনো ফার্ম ছাড়া কন্ট্রাক্ট দেওয়া চলবে না। এ রকম একটা ফার্ম কোথায় লালবাতি জ্বালতে বসেছে খুঁজে খুঁজে গা বাঁচিয়ে কিনে নেওয়া কি সোজা কাজ!'

'কিনেছ?'

'হ্যাঁ। তবে মোটা রকম ঢালতে হয়েছে। তিনটে দিন মোটে সময়, করি কী। গরজ বুঝে গেল। যাকগে, সব তুলে নেব। হাজার গুণ তুলে নেব।'

লীলা একটু ভেবে বলে, 'সব একেবারে ঠিকঠাক তো?'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা একরকম ঠিকঠাক বৈকি।'

'একরকম।'

লীলা ধনঞ্জয়ের একটা কান আদর করে মলে দেয়, 'বাবা যে বলেন তুমি এপ্রেন্টিস, সেটা মিছে নয়। এত টাকা ঢেলে এতদূর এগিয়ে এখনো বলছ একরকম ঠিক! মোটা নিরঞ্জনকে বাঁধনি বুঝি যাতে কোনোরকম গোলমাল করতে না পারে? কী বুদ্ধি। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি এই বাজারে ব্যবসা করবে!'

ধনঞ্জয় রীতিমতো ভড়কে যেতে লীলা সাহস দিয়ে বলে, 'মোটা নিরঞ্জন তো? গোলমাল করবে না মনে হয়। আমি বরং একটু চাপ দেব। লোকটা খুব শিভালরাস।'

'চাপ দেবে মানে?'

লীলা সশব্দে হেসে ওঠে, 'অমনি ঈর্ষা জাগল? এই মোটা নিরঞ্জনকেও তুমি ঈর্ষা করতে পার আমার বিষয়ে! ধন্য তুমি! মেয়েরা কী করে গা বাঁচিয়ে চাপ দেয় জান না?'

গা বাঁচিয়ে চাপ দিতে গেলেও কাছে যেতে হয়, মিশতে হয়, হাসি আর মিষ্টি কথায় মন ভুলাতে হয়। তার ফলেই সৃষ্টি হয় সমস্যা।

PATHAGAR.NET

প্রেমের সমস্যা।

এতদিন পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল যে জগতে অন্য সমস্ত কিছুর দরদাম আছে, একটা ফুটো পয়সায় হোক বা লক্ষ টাকায় হোক সবকিছুর দাম ঠিক করা যায়—প্রেম অমূল্য। কারণ প্রেম তো কোনো বস্তু নয়—মাল নয় যে দাম দিয়ে কেনা যাবে।

নিরঞ্জন স্বয়ং ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

নিরঞ্জন লীলাকে বিয়ে করতে চায়। কোনোরকম সস্তা বা কুৎসিত মতলব তার নেই, সে শুদ্ধ পবিত্র শাস্ত্রীয় অথবা ততধিক শুদ্ধ আইনসঙ্গতভাবে লীলাকে গরীয়সী মহীয়সী স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। এর মধ্যে কালোবাজারি কোনো চাল নেই।

সে নিজে কিছু বলেনি। খ্যাতনামা একজনকে ঘটক হিসেবে পাঠিয়েছে পশুপতির কাছে। লীলার কাছে প্রেম নিবেদন করাও সে দরকার মনে করেনি। কারণ সে ভালো করেই জানে যে সোজাসুজি লীলার কাছে কথা পাড়লে লীলা সোজাসুজি জবাব দেবে—'না।'

ধনঞ্জয় গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার প্রত্যাশায়, নিরঞ্জন তাকে একটু অকারণ লজ্জা মেশানো হাসি দিয়ে খাপছাড়া অভ্যর্থনা জানিয়ে সরলভাবে বলে, 'শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু বিয়েটিয়ে করে সংসারী হচ্ছি ভাই! তুমি চেন, পশুপতির মেয়ে। সামনের মাসেই একটা শুভদিন দেখে যাতে হয় তার প্রস্তাব পাঠিয়েছি।' নিরঞ্জন তাকে একটা সিগারেট দেয়। হাসিমুখে আবার বলে, 'পশুপতিবাবু অনেকদিন ঘোরাফেরা করছেন—এ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। এবার কিছু করে দিতে হবে। তোমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি—অন্য কেউ হলে এই কন্ট্রাক্টটিই পশুপতিবাবুকে করে দিতাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা—তোমাকে তো আর না বলতে পারি না এখন।'

কথাটা সহজে বুঝতে পারে ধনঞ্জয়। অতি স্পষ্ট মানে নিরঞ্জনের কথার। লীলাকে তার চাই, ধনঞ্জয় যদি ব্যাঘাত ঘটায় তবে বর্তমানের আশি হাজার এবং অদূর ভবিষ্যতে যা লক্ষাধিক টাকার কন্ট্রাক্ট দাঁড়াবে সেটা ফসকে যাবে ধনঞ্জয়ের হাত থেকে। শুধু তাই নয়, পশুপতিরও ভবিষ্যতে কোনোদিন কিছু বাগাবার আশা ভরসা থাকবে না নিরঞ্জনের মারফতে।

তারপরে কাজের কথায় আসে নিরঞ্জন। বলে, 'খুব সাবধানে হিসেব করে সব করবে। কোনো দিকে যেন ফাঁক না থাকে। এদিককার সব আমি সামলে নেব।'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই ঠেকে ব্যাপারটা তাদের কাছে। পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে পর্যন্ত দু'জনেই তারা ভয় পায়। নিজের নিজের ঘরে একা বসে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে যে কিসে কী হল এবং এখন কী করার আছে!

নিরঞ্জনের প্রস্তাব নিয়ে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ঘটকালি করতে গিয়েছিল তাকে

PATHAGAR.NET

পশুপতিবাবু জানায় যে মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু'-তিন দিনের মধ্যেই নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবে।

নিরঞ্জনের আপিস থেকে ধনঞ্জয় সোজা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। পশুপতি ধনঞ্জয়কে টেলিফোনে ডেকে পাঠায়।

ধনঞ্জয় বলে, 'আমি সব শুনেছি। কাল সকালে আপনার ওখানে যাব।'

'লীলাকে ডেকে দেব?'

'থাক।'

ধনঞ্জয় ও লীলা দু'জনেই সারারাত জেগে কাটায়—মাইলখানেক তফাতে শহরের দুটি বাড়ির দু'খানা ঘরে, যে ব্যবধান তারা যে কেউ একজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটে ঘুচিয়ে দিতে পারে!

সকালে ধনঞ্জয় আসে পশুপতির বাড়ি।

পশুপতি বলে, 'লীলার সঙ্গেই কথা বলো। তোমরা ছেলেমানুষ নও, তোমরা যা ঠিক করবে আমি তাই মেনে নেব।'

লীলার চোখ লাল। বোঝা যায় রাত্রে বেশ খানিকটা কেঁদেছে। ধনঞ্জয়ের শুকনো বিবর্ণ মুখ একনজর দেখেই আবার সে কেঁদে ফেলে। চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'বোসো।'

ধনঞ্জয় বসে, ধীরে ধীরে বলে, 'কিছু ঠিক করেছ?'

লীলা বলে, 'আমি?'

তারপর দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

প্রথমে লীলার কাছেই অসহ্য হয়ে ওঠে এই নীরবতা। বলে, 'নিরঞ্জন ছাড়বে না, সব ভেঙে দেবে।'

ধনঞ্জয় বলে, 'সে তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছে।'

'আবার কবে তুমি এ রকম চান্স পাবে, কে জানে! একেবারে পাবে কিনা তারও কিছু ঠিক নেই।'

ধনঞ্জয় নীরবে সায় দেয়।

লীলা বলে, 'তাছাড়া এদিক-ওদিক টাকাও ঢালতে হয়েছে অনেক। সব নষ্ট হবে।'

ধনঞ্জয় বলে, 'তা হবে। এমনিতেও তোমাকে পাবার আশা একরকম ঘুচে যাবে।'

লীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভাবছি। কাল আমরা বিয়ে করতে চাইলে এ জগতে কারো সাধ্য আছে ঠেকায়? কিন্তু আমরা ছেলেমানুষ নই। বিয়ে নয় হল, তারপর? তোমার আমার দু'জনেরই জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো লাভ নেই।'

ধনঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সত্যি লাভ নেই।'

PATHAGAR.NET

জামাই চাই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রথমা দুই কন্যাকে তবু আঠারোর ওধারেই পার করিয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয়া বাইশ বছরের একেবারে অচলা হইয়া রহিলেন। আত্মীয়স্বজনকে এখনও বলি সতেরো-আঠারো—বন্ধুবান্ধবকে বলি ষোল-সতেরো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠি। তাহার উপর ওপক্ষ হইতে কোনো সহানুভূতি নাই। তিনি নিত্য আমাকেই অনুযোগ করেন, 'কী করে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে আছ? আমি যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। আমাকে গলায় দড়ি দিতে দেখলেই কি তোমার সুখ ষোলকলা পূর্ণ হয়!'

প্রায়ই উত্তর দিই না, একদিন খালি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, 'এমন আর গলায় দড়ি দিয়ে লাভ কি, টুটু জন্মাবার আগে যদি সেটা বিবেচনা করতে তাহলে না হয় কন্যাদায়ের দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেতুম।'

বলা বাহুল্য, ইহার পর প্রায় দিন ছয়েক তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। অথচ পাত্র যে জোটে না তাহা আমার দোষেও নয়, মেয়ের দোষও নয়, নিতান্তই আমার ভাগ্যের দোষে। টুটু দেখিতে ভালই, মাজা রং, গড়ন পেটন—মেয়েলি ভাষায় যাহাকে বলে—বেশ থোড়ের মতন, মুখশ্রীও নিতান্ত মন্দ নয়, কেবল দোষের মধ্যে চোখ দুইটি পরস্পরের একটু কাছাকাছি। মানে, একটু বেশি কাছাকাছি। কিন্তু উহার চেয়ে অনেক কুৎসিত মেয়ে বিনা বাধায় পার হইতে দেখিয়াছি। আমারও চেষ্টার ত্রুটি নাই, মেয়ে দেখাইয়া এবং ছেলে দেখিয়া একেবারে হয়রান হইয়া গিয়াছি। জলখাবারের খরচ মাসিক তিন টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, এখন আর খাবার খাওয়াই না, শুধু চা ও পানের উপর দিয়াই সারিয়া দিই।

এই যখন অবস্থা তখন গৃহিণীই সহসা একদিন দুর্বুদ্ধি জোগাইলেন, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, 'ওগো শুনছ, এক কাজ করো দিকিনি, আনন্দবাজারে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও, প্রায়ই তো দেখি 'পাত্র চাই' বলে থাকে। ফল না পেলে কি আর এত লোকে দেয়।'

মুখে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলাম, 'সবাই কি আর অপরের কাছ থেকে জেনে দেয়, ফলের আশাতেই লোকে দেয়, আমাদের মতো জ্বালায় পড়ে।'

কিন্তু কথাটা প্রাণে লাগিল, পরের দিন অফিসে গিয়া আর কোনো কাজ করিতে পারিলাম না, সমস্ত ক্ষণটা বসিয়া বসিয়া বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করিলাম এবং সাড়ে

চারটা বাজিবার পূর্বেই বড়বাবুকে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আনন্দবাজার অফিসে গিয়াও আবার খসড়াটা কিছু পালটাইতে হইল, অবশেষে অনেক ঘষামাজার পর দুইটি টাকা জমা দিয়া আসিয়া দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। ভোর হইতেই আমি বাহিরে গিয়া নগদ তিন পয়সা খরচ করিয়া একখানা কাগজ কিনিয়া দেখি তিনিও তাঁহার ছেলেকে দিয়া একখানি কাগজ ইতিমধ্যে কিনিয়া আনাইয়াছেন। ইহার পর বিজ্ঞাপনটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে পড়িতে এবং অন্যান্য 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনের রচনায় মুন্সিয়ানার সহিত মিলাইয়া দেখিতেই সকালটা কাটিয়া গেল, কোনোমতে দুটি ভাত মুখে গুঁজিয়া অফিসে গিয়া যখন পৌছিলাম তখন মনে বেশ ভরসা আসিয়াছে যে, এবারে হয়ত টুটুকে পাত্রস্থ করিতে পারিব। বেচারি টুটু, সে কাল হইতে লজ্জায় আমার সামনে আসাই ছাড়িয়া দিয়াছে।

দুই-তিন দিন পরেই চিঠি আসিতে শুরু করিল। গৃহিণীর কথাই ঠিক। বিজ্ঞাপনে 'ফল' যথেষ্টই হয়। চিঠি দেখি প্রত্যেক ডাকেই তিন-চারখানা করিয়া আসে। কিন্তু তাহাদের কাহারও কন্যা সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, প্রত্যেকেই জানিতে ইচ্ছুক যে বিজ্ঞাপনে 'যৎসামান্য পণের' কথা লেখা থাকিলেও আমার ঠিক কতটা টাকা খরচ করিবার সাধ্য আছে। কেহ বি-কম পাশ করিয়া বসিয়া আছেন, ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, হাজার চারেক টাকা পাইলে একটি পোল্ট্রির ব্যবসা করিতে পারেন। বাঙালি শুধু ভাল হিসাব রাখিতে অক্ষম বলিয়াই কেমন করিয়া ব্যবসা নষ্ট করে, তিনি সেই সম্বন্ধে বিস্তর নজির দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে আমি যদি ঐ টাকাটা এবং আমার কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি তাহা হইলে তিনি চাইকি ব্যবসা করিয়া বৎসর তিন-চারের মধ্যেই আমাকে পরিশোধ করিতে পারেন। শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই...ইত্যাদি।

কেহবা মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, ইতিমধ্যে একবারও ফেল করেন নাই এই নজির দিয়া লিখিয়াছেন যে বিধান রায় ও নীলরতনের খ্যাতি ম্লান করিবার মতো প্রতিভা লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় যদি বিলাত যাইতে তিনি না পারেন তাহা হইলে উহা জাতিরই দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে। সেই শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে জাতিকে আমি রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি কি না, তিনি তাহাই জানিতে চান।

একজন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি খুলিয়া ফেলিয়াছেন, এখন কিছু বিপন্ন। মাত্র তিন-চার হাজার টাকা পাইলেই তিনি ঐ কোম্পানিকে 'প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করিতে পারেন, অতএব...। আর একজন অফিসে চাকুরী করেন, সামান্য একটু জমিও খরিদ করেছেন, এক্ষণে যদি কেহ উক্ত জমির উপর একটি ছোট-খাটো মাথা গুঁজিবার মতো আশ্রয় করিয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তিনি সেই উদার ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধার করিতে রাজি আছেন।

একটি লোক খালি বিনা পণেই আমার কন্যাকে উদ্ধার করিতে ঔৎসুক্য জানাইয়াছেন, তবে এটি তাঁহার তৃতীয় পক্ষ হইবে। অবশ্য ঐ নামেই তৃতীয় পক্ষ, বয়স তাঁহার বেশি নয়, মাত্র চল্লিশ। দুইটি পক্ষ, মিলাইয়া সন্তান মাত্র তিনটি...তাহাদেরই একটি জননী তিনি খুঁজিতেছেন। উপার্জন করেন ভাল, স্বাস্থ্য আরও ভাল, চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে কিন্তু চুল নাকি তাঁহার বংশে ষোল বৎসরেই পাকে। দাঁত দুটি তিনি ইচ্ছাপূর্বক তোলাইয়াছেন, নহিলে এখন বেশ শক্তই আছে। ইত্যাদি...

গৃহিণী কটূক্তি করিয়া কহিলেন, 'বাহাত্তুরে বুড়ো, কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছে দেখ না, ও নিশ্চয়ই আমার বাবার বয়সী...এই আমি বলে রাখলুম।...'

কিন্তু তাহাতে আর সান্ত্বনা কি? অন্ধকার পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই রহিল। মিছিমিছি দুইটি টাকাই খরচ হইল। তৃতীয় পক্ষের বাবাজী চিঠির মধ্যে করিয়া জবাবের প্রত্যাশায় একখানা ডাকটিকিট দিয়া দিয়াছিলেন, সেইটিই গৃহিণীর হাতে দিয়া কহিলাম, 'এইটে তুলে রাখ, তবু এক আনা পয়সা উসুল হল, যথা লাভ।'

ইহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া অফিস করিতে লাগিলাম। আর আশা নেই, সুতরাং আকাঙ্ক্ষাও নাই, চিঠিগুলি আজকাল আর খুলি না, মধ্যে মধ্যে আমার চতুর্থী মিনি পড়িয়া শোনায় মাত্র। কিন্তু সহসা একদিন চিঠির বদলে এক পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

আবার ঘটক-ঘটকীর খোসামোদ করিব কিম্বা গৃহিণীর কথামতো কোনো আধুনিক বিবাহ অফিসে নাম লিখাইব এই কথাটাই একটা রবিবার বাহিরের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে কানে গেল পাশের বাড়িতে কে খোঁজ করিতেছে, 'হ্যাঁ মশাই, এইটে কি তেরর দুয়ের এক নম্বর?'

PATHAGAR.NET

ব্যস্ত হইয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, চমৎকার গেরুয়া রঙের কাছা খোলা কাপড় ও পাঞ্জাবি পরা এক তরুণ সন্ন্যাসী। বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমার কাছে এমন আধুনিক সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, পাশের বাড়ি হইতে সন্ধান লইয়া তিনি আমার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নম্বরটা চোখ বুলাইয়া সটান ঘরের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া চৌকিটার ওপর বসিয়া পড়িলেন। আমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা তো রাখিলেন না, এমন কি আমাকে কোনো প্রকার প্রশ্ন করাও আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। চাঁদা চাহিবার আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া নিজেই প্রশ্ন করিলাম, 'কাকে চাই আপনার?'

তিনি একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বোধ করি পথশ্রমেই চোখ বুঁজিয়া ছিলেন, এক চোখ মেলিয়া চাহিয়া কহিলেন, 'আপনার নামই বোধ হয় শৈলেন রায়? নমস্কার।'

প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু কি দরকার আপনার?'

স্মিত হাস্যে তিনি কহিলেন, 'বসুন, ব্যস্ত হবেন না। তাড়াহুড়ো করার কাজ নয়,

কিছু সময় লাগবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, চাঁদা চাইতে আসিনি।' সত্যিই আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। একটু পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপন আপনিই দিয়েছিলেন?'

বিস্ময়ে প্রায় বাক্‌রোধর উপক্রম হইয়াছিল, কোনো মতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, 'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি কেমন দেখতে? নেহাতই কি অচল?'

প্রশ্ন করলাম, 'এসব অবান্তর কথার কি অর্থ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

তিনি বিচলিত হইলেন না। তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠেই কহিলেন, 'পারেন, তবে এখন নয়, আর একটু পরে। বয়স কত মেয়ের? মানে লোককে কত বলেন?'

অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলাম, 'সতেরো।'

'হুঁ তার মানে কুড়ি-একুশের কম নয়।...ভালোই। বুদ্ধিসুদ্ধি কেমন? খুব হাঁদা নয় তো?'

আর ধৈর্য রাখতে পারিলাম না, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই তিনি খপ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, বসুন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার উপর রাগ করতে নেই—হিঁদুর ছেলে, এটা মানেন তো?'

এ লোকের উপর রাগ আর কতক্ষণ রাখা যায়? অগত্যা বসিয়া পড়িলাম, কিন্তু লোকটার ধৃষ্টতায় মনটা অপ্রসন্ন হইয়াই রহিল।

সাধুটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'বিবাহ আমি করতে চাই।'

খানিকক্ষণ নির্বাক অবস্থায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শুধু প্রশ্ন করিলাম, 'তার মানে?'

'মানে আর কি, বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে—এই আমি আপনাদের পালটি ঘর, পদবী বোস।' লোকটাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা বহুক্ষণ হইতেই মনে ছিল, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলাম, 'কেন, সাধুগিরিতে কি অরুচি ধরে গেল?' সাধুজী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'উহুঁ, বরং তাহার বিপরীত। যত দিন যাচ্ছে ততই সাধুগিরিতে প্রবল আসক্তি জন্মাচ্ছে।'

হয় এ লোকটি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, নয়ত আমারই মাথার ঠিক নাই। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, প্রশ্ন করিবার চেষ্টা এ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

তিনি বোধ করি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, 'ভয় নেই, আমরা কেউই পাগল হইনি। তবে আসল কথাটা আপনাকে খুলে বলি। সাধুগিরি আমার পেশা—নেশা নয়।'

জবাব দিলাম, 'সেটা তো অনেকেরই। তবে আপনার মতো সহজে কেউ স্বীকার করে না। আপনি কোন সম্প্রদায়ের?'

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কোনো সম্প্রদায়ের নয়। আসপন্থী। রামকৃষ্ণ

PATHAGAR.NET

মিশনের সন্ন্যাসীদের মতোই পোশাকটা করেছি, কারণ এইটেই ফ্যাশন। লেখাপড়া জানা লোকেরা জটা-ফটা অত পছন্দ করে না।'

আমি হাসিয়া কহিলাম, 'নেহাতই ভণ্ড তাহলে।'

অকস্মাৎ লোকটি একটু তাতিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'ভণ্ড কিসের?'

'কেউ লোকের সেবা করে প্রাণে পরোপকারের বাসনা আছে বলে আর নার্সরা করে মাইনে পায় বলে। তা বলে নার্সদের কি আপনারা ভণ্ড বলবেন?'

কহিলাম, 'তাই বলে গেরুয়া কাপড়টাকে অপমান করা কি ভাল?'

'গেরুয়া কাপড়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি? এটা তো আমার ইউনিফর্ম। কর্পোরেশনে যারা কাজ করে তাদের একরকম পোশাক, রেলে যারা কাজ করে তাদের আর এরকম, আবার পুলিশের লোকের পোশাক অন্যরকম। কৈ তাতে তো আপনারা আপত্তি করেন না। গেরুয়া কাপড় তো অনেকে শখ করেও পরে।' এসব কথার আর কি জবাব দিব? অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'যখন আই. এস. সি পড়ি তখন বাবা মারা গেলেন, মা আগেই গিয়েছিলেন। ছিলেন এক মামা, আমাকে পড়াতে পারেন এ সঙ্গতি তাঁর ছিল না, তবু কোনো মতে পাশ করা পর্যন্ত খরচটা তিনিই চালিয়ে ছিলেন। তারপর পুরো তিনটি বছর ধরে কলকাতায় প্রায় সমস্ত অফিসে, সমস্ত দোকানে ঘুরে বেড়িয়েছি যে কোনো একটা চাকরির জন্যে। কিন্তু দশ টাকা মাইনের চাকরিও একটা জোটেনি। টিউশানি একটা ছিল, দু'বেলা

পড়ানো তিনটে ছেলে-মেয়ে, দশ টাকা মাইনে—তবুও করছিলুম কিন্তু তাও একদিন গেল। তারা বদলি হয়ে বিদেশে চলে গেল। তখন মরিয়া হয়ে উঠে এই পেশা ধরলুম। দেশে পৈত্রিক ভিটের সিকিখানা অংশ ছিল, জ্ঞাতি ভাইকে পঁচিশ টাকায় বেচে কলকাতাতে চলে এলুম। আর সেইদিন থেকেই গেরুয়া ধরলুম।'

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত কথাগুলি শুনিতেছিলাম, প্রশ্ন করিলাম, 'কিন্তু টাকা? সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্গে টাকার কী সম্পর্ক?'

তিনি প্রশান্ত নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন, 'টাকা নইলে কোনো ব্যবসাই চলে না। সাধুগিরিরও মূলধন চাই। এখানে একটা ভাল দেখে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়েছে, দু'-একটা সিল্কের বহির্বাসও রাখতে হয়েছে—তার ওপর প্রথম দিনকতক তো অনবরত ট্যাক্সি করেই ঘুরতে হয়েছে, ট্রামে-বাসে চাপতে সাহস হয়নি, পাছে লোকে ছোট-খাটো সন্ন্যাসী ভাবে।' কহিলাম, 'তারপর?' 'তারপর আর কি, প্রথম প্রথম কিছুদিন একটু বেগ দিয়েছিল, টাকা যা উঠত তাতে ট্যাক্সি ভাড়া পোষাত না, মূলধন খেয়ে যাচ্ছিল। তারপর বেশ জমে গেল কারবার। এখন আপনার আশীর্বাদে ছোটখাটো একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও হয়েছে। দু'-একখানা ক্যাশ সার্টিফিকেটও কিনেছি, তা ছাড়া দেওঘরের কাছে অনেকখানি জমিও কিনেছি আশ্রমের জন্যে। এসব, যদি মেয়ে দিতে রাজি থাকেন তো কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারব।'

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু সন্ন্যাস নিয়েছেন, আশ্রম করেছেন—এর ভেতর আবার স্ত্রী আসছে কোথায় তা তো বুঝতে পারলুম না?' সন্ন্যাসী হাসলেন, কহিলেন, 'আশ্রম-টাশ্রম না থাকলে নিয়মিত চাঁদা পাবার অসুবিধে হয়। অথচ বিবাহ করাও প্রয়োজন আমার, এক্ষেত্রে স্থির করেছি যে একেবারে আশ্রম তৈরি করার পর, ঐখানেই একদিন সত্যানন্দ স্বামীজী মহারাজ ও তার মাতাজী, একেবারে গিয়ে হাজির হবেন। মাতাজী ওখানে গার্লস স্কুল করবেন আর আমি করব হাসপাতাল—দেখবেন হুড় হুড় করে টাকা আসতে থাকবে। তাতে কোনো বাধাও তো নেই, অবধূতরা বিবাহিত হতে পারেন।'

বিস্ময়ে কহিলাম, 'তার মানে—আমার মেয়েকে গেরুয়া পরাবেন?'

মহারাজ করিলেন, 'তা পরতে হবে বৈকি! কিন্তু তার জন্যে ভাববেন না। অল্প বয়সী মেয়েদের গেরুয়া পড়লে ভালই দেখায়। ট্রেনে গেলে দেখবেন ট্রেনসুদ্ধ লোক ভিড় করবে সেই কামরারই সামনে। আশ্রমও খুব সম্ভব চট্‌পট্ জমে যাবে, তরুণী মাতাজী থাকলে।' আমার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল, উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, 'না মশাই, ওসব আমার এখানে চলবে না। আপনি অন্যত্র পাত্রী দেখুন।' এইবার সাধুজীর বিস্মিত হইবার পালা। তিনি কহিলেন, 'সে কি! আমার মতো পাত্র পাওয়া কি সোজা কথা? কোন কেরানি জামাই আমার মতো রোজকার করে শুনি? বিশ্বাস না হয় ব্যাঙ্কে চলুন, আমি পাশ বই দেখিয়ে দিচ্ছি।' আরও উচ্চকণ্ঠে কহিলাম, 'টাকা অনেকের থাকে, আমাকে ওসব দেখিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তাই বলে আমার মেয়েকে

PATHAGAR.NET

দিয়ে রোজগার করাবেন, একথা জেনেও আমি আপনাকে মেয়ে দিতে পারি না। কোনো ভদ্র সন্তানই পারে না।' যেন ঈষৎ একটু বিদ্রূপের সুরে তিনি বলিলেন, 'মেয়ে মাস্টারী করবে তাও বরদাস্ত করতে পারবেন না।' জবাব দিলাম, 'কিন্তু এ মাস্টারি করার পিছনে যে আপনার একটা মস্ত বড় অভদ্র ইঙ্গিত রয়েছে—'

তিনি হাসলেন, 'দেখুন সত্যি কথা বলার বিপদ এই। এমন কোথাও দেখেছেন যে-সব মেয়েরা মাস্টারি করে, তাদের মধ্যে যাদের সুন্দর চেহারা তাদের হু হু করে মাইনে বাড়ে—তা জানেন কি? কিন্তু এর পিছনে অভদ্র ইঙ্গিত খুঁজে কোনো 'ভদ্র সন্তান' মা-বাপই মেয়েকে মাস্টারি ছাড়ায় না কিম্বা কোনো মেয়েও ছাড়ে না—বরং নিজের কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে ওঠে। আমি কথাটা স্পষ্ট করে বলে ফেলেছি এই কি আমার অপরাধ!' ততক্ষণে মাথাও কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে। এ-লোকটাই কটুভাষী, সব জিনিসেরই কদর্থ করা ইহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে, ইহার সহিত বিবাদ করা বৃথা। কহিলাম, 'কিন্তু এ কথার তো চট্ করে জবাব দেওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর মত নিতে হবে, মেয়েকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে একবার।'

সাধুজী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'তার জন্যে বেশি বেগ পেতে হবে না, তাঁরা ঐ দোরের আড়ালেই আছেন, বোধ করি সবই শুনেছেন।'

দোরের আড়ালে অকস্মাৎ দুড় দুড় শব্দ উঠিল। বুঝিলাম সাধুজীর অনুমানই ঠিক, এখন লজ্জা পাইয়া পলাইতেছেন। সুতরাং মহারাজকে বসাইয়া অন্তঃপুরে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি গৃহিণী অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'বিদেয় করো, বিদেয় করো তো আপদকে এক্ষুণি। ভণ্ড নাস্তিক আবার সন্ন্যাসী সেজে গেরুয়া পরেছেন, আর কি অসভ্য। তুমি বসে বসে ওর কথাগুলো শুনছিলে কী করে?' ইহার জবাব দেওয়া হয়ত আমার সাহসে কুলাইত না, কিন্তু মিনি বলিয়া ফেলিল, 'শুনছিলে তো তুমিও মা, এতক্ষণ ধরে—'

গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম মিনি, সব তাইতে কথা কইতে আসিসনি। ওসব গেরুয়া-ফেরুয়া আমার এখানে চলবে না—'

ঢোক গিলিয়া কহিলাম, 'কিন্তু লোকটা কথাগুলো খুব অন্যায় বলছিল না, তাছাড়া লেখাপড়া জানা ছেলে, সুশ্রী দেখতে, ভাল রোজগার করে এমন পাত্র এত সহজে আর কোথায় পাচ্ছ তুমি?'

'তা বলে ঐ জোচ্চোরটাকে মেয়ে দিতে হবে নাকি?' গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন, 'তা ছাড়া সন্ন্যাসীর হাতে মেয়ে দেবে কি করে? কুটুম সাক্ষেৎকেই বা বলব কি! এধারে সন্ন্যাসী তার সঙ্গে আবার সাতপাক ঘুরিয়ে বিয়ে?' জবাব দিলাম, 'কুটুম সাক্ষেৎ না হয় কাউকে না-ই বললে, বিয়ের দিন ওকে সাদা কাপড় পরে চুপিচুপি আসতে বললেই হবে—। পরে বললেই হবে যে মেয়ে-জামাই দু'জনেই সন্ন্যাস নিয়েছে!'

বেশ সোরগোল পড়ে যাবে তখন। কল্পনায় নিজেই তাতিয়ে উঠিতেছিলাম, কিন্তু

গৃহিণী তখনও কঠিনা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে একবার চতুর্থীর দিকে চাহিলাম, মেয়েটা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, অন্তত আমার তাই ধারণা। আর বাস্তবিক মিনিই সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করিল, কহিল, 'বাবা, সেজদিও তো সব শুনেছে আড়াল থেকে, ওর মতটা একবার নাও না।' আমি যেন আঁধারে কূল পাইলাম। টুটুর হাতটা ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া কহিলাম, 'আমাকে ঠিক ঠিক জবাব দিবি মা। তা হলে ওকে তাড়িয়ে দিই?'

টুটুর গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল। মাথা নিচু করিয়া নীরবে নখ খুঁটিবার পর কহিল, 'তুমি যদি ভাল বোঝ বাবা তাহলে আমার আর আপত্তি কি থাকতে পারে?' তবে কি সাধুজী আমার কন্যার উপর ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন! সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলাম, 'শুধু আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য একথা বলছিস না তো? বাইশ বছর মেয়েকে পুষলুম, আর দুটো-তিনটে বছর অনায়াসে পুষতে পারব। ভাল করে ভেবে দেখ'—কন্যা জবাব দিলেন, 'তা কেন বাবা। আমি তো তোমাদের আপদ বালাই হয়ে নেই।' নিশ্চিন্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেলাম। দেখি সাধুজী তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। চক্ষু নিমীলিত। আমার পদশব্দে চোখ খুলিয়া কহিলেন, 'বুঝেছি, অন্তঃপুরে গোলযোগ, দেখুন, বিয়ের কথাটা আজ থাক—আজ আর আপনার কাছ থেকে শেষ জবাব নেব না। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।'

'আমাদের এই পাড়ায় যে দরিদ্র ভাণ্ডার আছে, আসছে রবিবার তার বার্ষিক উৎসব, আমাকে ধরেছে বক্তৃতা করার জন্যে, মানে আমিই তাদের ধরিয়েছি...যাক ঐদিন একবার গৃহিণীকে নিয়ে যেতে পারেন? দোষ কি?...তারপর আমি শেষ জবাব শুনে যাবো একদিন...' লোকটি কি অনবরতই নব-নব বিস্ময় নিক্ষেপ করিবে!

বিস্ময়-বিমূঢ় নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম, 'কী বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' তিনি কহিলেন, 'বাংলা কথাগুলোর শব্দগত অর্থ বুঝেছেন কি?' 'তা তো বুঝেছি...' 'তাতেই হবে।'...এই বলিয়া তিনি একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তখনও আমি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই,...একটা দারুণ সন্দেহও দেখা দিয়েছে। লোকটা পাগল নয় তো? একটা উন্মাদের সহিত কি এতক্ষণ বকিলাম? কিন্তু ঠিক তাও তো মনে হয় না...গৃহিণীও...বাহির হইতে উঁকি মারিয়া ভিতরে আসিয়া কহিলেন 'সে মড়া চলে গেল নাকি?' আসল কথাটা চাপিয়া গিয়া কহিলাম, 'না, তুমি যাতা বলতে তাকে, চোর-জোচ্চোর আরও কত কি...তার পরেও সে কি থাকতে পারে?' গৃহিণী সংক্ষেপে কহিলেন, 'বলব না তো কি? হক কথা যা তাই বলেছি। গেছে আপদ গেছে।' তাহার পর কতকটা আপন মনেই কহিলেন, 'ছোঁড়ার চেহারাটা কিন্তু বাপু মন্দ নয়। লেখাপড়া শিখেছিস একটা চাকরি-বাকরি কর যা হোক্ তা নয়...জুচ্চুরি করে খাবার মতলব।'

PATHAGAR.NET

সন্দেহ যাহাই হউক, রবিবার দিন গৃহিণী আর টুটুকে লইয়া দরিদ্রভাণ্ডারের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিলাম। গৃহিণী কিছুই জানিতেন না, সভাগৃহে ঢুকিয়া সভাপতির পাশে সত্যানন্দকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, 'ওমা, সে মড়া আবার এখানে কি করছে!' কোনো জবাব দিলাম না। মেয়েদের বসিবার নির্দিষ্ট আসনের দিকে তাঁহাদের ঠেলিয়া দিয়া নিজে যতটা সম্ভব সামনের দিকে গিয়া বসিলাম। সাধুজী সবই দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত ও সমাহিত মুখের চেহারায় কোনো পরিবর্তনই হইল না। যেমন ভাবে বসিয়া ছিলেন, তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সভার কার্য আরম্ভ হইল। কোনো এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের পাঠ শেষ হইবার পরই তিনি সত্যানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করিলেন, 'কিছু বলিবার' জন্য। পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বহু মুমূর্ষু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে ইনি আবার নতুন করে গড়ে তুলেছেন, দরিদ্রনারায়ণের সেবাই এঁর জীবনের ব্রত।' তারপর 'মহারাজ' স্বয়ং উঠলেন। অতি শান্ত কণ্ঠস্বর। বিনয় এবং জ্ঞানের অদ্ভুত একটা সমন্বয় সে কণ্ঠে—শুনিলেই চোখ নত হইয়া আসে। লোকটাকে চাক্ষুষ দেখিয়াও বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই লোকটিই মাত্র দিন সাতেক আগে আমার বৈঠকখানায় আমার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিতে আসিয়া ছিলেন। সাধুজী বলিতে শুরু করিলেন, 'আমি আজ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি বটে কিন্তু সে মিছে কথা। আমি সন্ন্যাসী নই, মুক্তি আমার সাধনার লক্ষ্য নয়। কিন্তু তবু আমি গেরুয়া পরেছি, কেন জানেন? আপনারা আর কোনো পোশাককে বিশ্বাস করেন না বলে। অন্য যে কোনো বেশে গিয়ে আপনাদের দোরে দাঁড়ালে খালি হাতে ফিরতে হত। অথচ আমার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আপনাদের সাহায্য চাই-ই, তাই আমার এ ভণ্ডামি, তাই আমার এ ছদ্মবেশ।' এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আবার তিনি শুরু করিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাই যে ভগবানের পূজা, এই চির পুরাতন কথাটা অতি কৌশলে নতুন করিয়া বুঝাইতে কেমন করিয়া এবং কখন যে তিনি আধ্যাত্মিকতায় চলিয়া গেলেন তাহা ধরিতে পারিলাম না।

কিন্তু ইহার পর যেভাবে অনর্গল বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য জলপ্রপাতের মতো তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গৃহিণীর দিকে আড়ে চাহিয়া দেখি তাঁহার চোখ দিয়ে জল পড়িতে শুরু করিয়াছে, আর টুটু স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া আছে। এইভাবে আধঘণ্টা কাল অনবরত গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, পালি ধর্মগ্রন্থ, কোরান এবং বাইবেল হইতে বিভিন্ন বাণী উদ্ধার করিবার পর যখন তিনি থামিলেন তখন আর কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার উৎসাহ রহিল না। দু'-একজন ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর মিনিট কতকের মধ্যেই সভার কার্য শেষ হইয়া গেল।

PATHAGAR.NET

গৃহিণী বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, 'আহা সাক্ষাৎ দেবতা!...ছিঃ ছিঃ কী কটু কথাই না বলছি এঁকে! মানুষ নন বলেই অম্লান বদনে সহ্য করেছেন।...ওগো ইনি নিশ্চয় সেদিন ছলনা করতে এসেছিলেন তোমায়।' কহিলাম, 'এখনও যদি উনি রাজি থাকেন তাহলে কি মেয়ে দেবে ওঁকে?' 'এক্ষুণি, এক্ষুণি। দয়া করে যদি পায়ে ঠাঁই দেন তো আর দু'মত করো না।' জবাব দিলাম, 'কিন্তু আত্মীয় কুটুমদের কি বলব?' তিনি তাহার উত্তরে যে কটূক্তি করিলেন, কুটুম্বদের ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিব না। পরের দিন ভোরবেলাই সাধুজী উপস্থিত। কহিলেন, 'কেমন, সব ঠিক হয়ে গেছে তো?' বিস্মিত হইয়া কহিলাম, 'তা হয়েছে কিন্তু সেই জন্যেই কি আপনি'...তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়। ঐ তো আমার কোয়ালিফিকেশনের পরীক্ষা।' মনটার মধ্যে যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। বলিলাম, 'কিন্তু এখনও যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন, 'ঐখানেই তো আমার কৃতিত্ব।'

তাহার পর কহিলেন, 'আর্জি তাহলে মঞ্জুর তো?' প্রাণপণে দ্বিধা দমন করিয়া কহিলাম, 'হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নেই। যা থাকে কপালে, একটা তবু নতুন কিছু হবে। আপনি যদি রাজি থাকেন এখনও আমি আছি।'

সাধুজী বলিলেন, 'আপনার মেয়েটি সেদিন দেখলুম, মন্দ নয় বলেই বোধ হল। সুতরাং আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে?'

অতঃপর পাকা কথা শুরু হইল। আগামী ৮ই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য হইল, কথা হইল আমরা দেশে চলিয়া যাইব এবং সেইখানেই উনি সাদা পোশাকে দুই-তিনটি বন্ধুবান্ধব লইয়া গিয়া বিবাহ কার্যটা সারিয়া ফেলিবেন। তাহার পর মাস দুই-তিন বিহারের কোনো শহরে গিয়া হনিমুন সারিয়া আবার সাধুবেশে দেওঘরে আসিবেন এবং আশ্রমের পত্তন করিবেন।

সাধুজী বিদায় লইলে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। সবই ঠিক, তবু মনটা কেমন ভারী হইয়াই রহিল, বিসদৃশ কোনো কাজ করিতে গেলে যেমন ভার ঠেকে, তেমনিই। কে জানে কি হইবে।

গৃহিণীও আসিয়া কহিলেন, 'আহা এমন ভাগ্যি কি তার হবে? টুটুর আমার জন্ম সার্থক, দেবতার পায়ে ঠাঁই পেলে।'

মিনি বড়ই ঠোঁটকাটা, সে কহিল, 'অতই যদি সাধু তো বিয়ে করছেন কেন?'

গৃহিণী জিভ কাটিয়া কহিলেন, 'বলতে নেই। ও ওঁদের ধর্মলীলা।' মিনি মুচকি হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'তুমি কিছু ভেব না বাবা, সেজদিকে আমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি...ঐ তিন মাসেই সাধুজীর গেরুয়া ঘুচিয়ে দিদি মানুষ করে নেবে'খন। দেওঘরের জমিতে বলে দিয়েছি মুরগির চাষ আর গোলাপের বাগান করতে, আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব।'

PATHAGAR.NET

সোনা-পিসিমা

লীলা মজুমদার

আমার নিজের জীবনটা একটু আটপৌরে বলেই আমার আত্মীয়স্বজনদের জীবনকেও যে তাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। এতগুলো উঁচু উঁচু আদর্শকে অন্য কোনো পরিবারে একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেতে দেখা যায় কি না জানি না, তবে আমার ছোটবেলা থেকেই এরকম দেখে এসেছি। এমন কি আমাদের পরিবারে ভালোবাসাকেও ভারি একটা সম্মান দেওয়া হয়। বলেছি তো, পাঠককে প্রথম থেকেই বুঝে নিতে হবে যে নিজের গুষ্টির হাঁড়ি নিয়ে হাটের মধ্যে ভেঙে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত প্রেমের গুণগান করাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। ঘটনাগুলিও আমার কল্পনাপ্রসূত নয়, আমার ছোট ভাই অমিয়ের ডায়েরি থেকে গোপনে হুবহু টোকা। ভালমন্দ যা হয় সবটার জন্য সে-ই দায়ী। তবে শুনুন।

'আমার সোনা পিসিমার নাম বললে সবাই তাঁকে চিনে ফেলবে বলে আর বললাম না। তবে এটুকু প্রকাশ্য যে তিনি একজন বিখ্যাত দেশনেত্রী, ত্রিশ বছর ধরে নানারকম রাষ্ট্রনীতি ঘেঁটে ঘেঁটে চুলও যেমন পাকিয়ে ফেলেছেন, তেমনি পয়সাও করেছেন বিস্তর। বাড়ি করেছেন, গাড়ি কিনেছেন, দেশপ্রেমিক অনুষ্ঠানে দান করেছেন মেলা। ছেলেপুলে নেই, আমরাই তাঁর মুখ চেয়ে থাকি। তিনি সধবা কি কুমারী তাই নিয়ে বাইরের লোকে যতই জল্পনা-কল্পনা করুক না কেন, ভিতরের কথা আমরা সকলেই জানি। সোনা পিসেমশাইকেও আমার একটু একটু মনে পড়ে, রোগাপট্‌কা মানুষটি, মাথাভরা কোঁকড়া চুল, থুতনিতে খরগোশের কামড়ের দাগ, খেতে-টেতে ভালবাসেন, ভীতু স্বভাব, কাগজে-টাগজে লেখবার খুব ইচ্ছা; রান্না-টান্না করবার খুব শখ, তার কোনোটাই হয় না, কারণ ওদিকে আবার পিসিমার ভয়ে জুজু। চাকরি-বাকরি নেই, কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাও পিসিমার নামে লিখে দিয়েছিলেন। পিসিমা তখন সবেমাত্র রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাগ্মিতার জন্য নাম করছেন, জেলেটেলেও গেছেন। তাঁর ফাইফরমাশ খেটে, চিঠিপত্রের উত্তর দিয়ে নজির-টজির খুঁজে দিয়ে পিসেমশাইয়ের আর কিছুরই সময় থাকত না। এসব কথা অবিশ্যি আমার নিজের মনে নেই, মা-খুড়িদের কাছে শোনা।

তারপর বছর ত্রিশেক হল ঘাটালে ভীষণ বন্যার সময় সেখানে পিসিমার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পিসেমশাই একেবারে নিরুদ্দেশ। পিসিমা মেলা খোঁজাখুঁজি, পুলিশ দিয়ে গোয়েন্দা দিয়ে খানাতল্লাশি করিয়েও কিছু না পেয়ে অগত্যা একাগ্র মনে দেশসেবাতেই লেগে গেলেন। বারো বছর সিঁদুর পরে ছিলেন, তারপর লোহা আর

PATHAGAR.NET

সিঁদুর তুলে হাতের কাছে রেখেছিলেন, পিসেমশাই ফিরে এলেই যাতে টপ করে পরে নিতে পারেন। কারণ পিসেমশাই যে সহজে স্বর্গে যাবেন, একথা পিসিমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না।

যাই হোক, আমার সোনা-পিসিমা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন। কিছুদিন থেকে খবরের কাগজে ধারাবাহিকভাবে বেনামীতে পিসিমার জীবনী বেরোচ্ছে, তাতে যে পিসিমার খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নাকি এমন সব অশ্রদ্ধার কথাও বেরোচ্ছে, যা নিয়ে মানহানি মোকদ্দমাও করা যায় না, অথচ শত্রুরা যা নিয়ে নিশ্চয় হাসাহাসি করতে ছাড়বে না। আমি বাংলা খবরের কাগজের মানে বুঝতে পারি না বলে (অর্থাৎ আমি না, আমার ভাই অমিয় পারে না) অবশ্য সেসব কিছুই পড়িনি কিন্তু বাড়িতে পদার্পণ করবা মাত্র পিসিমা আমার হাতে কাগজ থেকে কতকগুলো কাটিং দিলেন, পিসিমার বিবাহিত জীবনের বিবরণী জলজ্যান্ত ভাষায় বর্ণিত। পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। দেখি কপালে আবার সিঁদুর, হাতে লোহা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বলি না, ও সহজে মরবে না। এগুলো ওরই কাজ, ও ছাড়া কেউ হতেই পারে না। তুমি যদি ওকে খুঁজে বের করে দাও, আমি তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব উইল করে দিয়ে যাব।'

অগত্যা থেকে গেলাম। খাসা আছেন পিসিমা, ঘরে ঘরে নরম গদি আঁটা চেয়ার, গালচে, বিছানা, মাথার উপর পাখা, আবার স্নানের ঘরে গরম জল, আর সে কী রাজার যুগ্যি খাওয়া। পঁচিশ বছরের পুরনো সব মাদ্রাজী চাকরবাকর, যেন দ্রৌপদীর পিতাঠাকুর। রাঁধবার লোকটিকে তো ডেকে অভিনন্দন করে ফেললাম। ইয়া মোটা তেল-চুকচুকে হাসিখুশি লোকটার মাথাভরা টাক, মুখভরা দাড়ি, খালি ইংরিজি বলে, তাকে ইংরিজিতেই অভিনন্দন করে ফেললাম। পিসিমাও মহাখুশি : 'বুঝলি তোরা আজ বলছিস যে প্রাদেশিকতা বড় খারাপ, দেখ আমি আজ পঁচিশ বছর ধরে সেটাকে কাজে পরিণত করে আসছি।'

তোফা ছিলাম, তবে পিসিমাকে নিয়েই মুশকিল। রোজ দু' বেলা খোঁজ করবেন—'বলি কিছু খবর করলি?' কোথায় খবর করব? সেই খবরের কাগজের আপিসে যে একেবারে কেউ আমার চেনাজানা নেই তা নয়, আমার বন্ধু বিনয়ই তো আছে, কিন্তু সেখানে বারকয়েক আনাগোনা করেও কোনো লাভ হল না। তাঁদের কাছ থেকে যে বিন্দুবিসর্গটি জানা যাবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উলটে বিনয় বলল—'অত ব্যস্ত কিসের, রাজার হালে আছ, যত দেরি হয় তত তোমার পক্ষে তো ভাল, রস'ই না, আমাদের সিরিয়েলটাকে শেষ হতে দাও।' পিসিমার কাছ থেকে পিসেমশায়ের ফটো, দু'-একখানা যা ছিল নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। ছোট ছোট চিঠি। 'প্রিয়তমাসু, তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ সবই করিয়াছি। আর কি করিতে হইবে।...প্রিয়তমাসু, তোমার আদেশমতো সবই কিনিয়া রাখিয়াছি, কিছু টাকা

PATHAGAR.NET

কম পড়িয়াছে, কিছু যদি মনে কর তো পাঠাইয়া দিও।...প্রিয়তমাসু, ওই ওই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছি, তাহারা সম্মত হইয়াছে।...প্রিয়তমাসু, যানবাহনের অভাবে সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। আগাগোড়া পদব্রজে আসাতে কাল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই' ইত্যাদি। চিঠিগুলি পড়ে আমার উপস্থিত কাজের কোনো সুবিধা হল না বটে, কিন্তু পিসেমশায়ের নিরুদ্দেশের রহস্যটা কিঞ্চিৎ ফরসা হয়ে এলো। তার উপর রোজ তিনবেলা সে যে কী অমৃতই ভোগ করতে থাকলাম সে আর কি বলব! তারই ফলে বোধ হয় পিসেমশাইয়ের উপর পুরানো রাগটি বেমালুম উড়ে গেল।

কিন্তু এ-দুনিয়াতে সুখের দিন ক্ষণস্থায়ী। পিসিমা ধৈর্য হারাতে লাগলেন। 'দু' বেলা খালি খাচ্ছিসই, কাজের বেলায় তো লবডঙ্কা। কিছু খবর পেলি? কাছাকাছিই আছে নিশ্চয়। এখন তো বিবাহিত জীবন শেষ করে এদানিকের কথা লিখেছে।' মরিয়া হয়ে বললাম, তা কিছু কিছু কি আর পাইনি! তবে আর একটু না পেলে মিছিমিছি তোমাকে আশা দিতে চাই না। কী করি, মিথ্যে কথাই বলতে হল।

সেদিন রাত্রে বেশি খেয়ে এমনিতেই ঘুম হচ্ছিল না, তায় আবার খালি মনে হচ্ছিল, আমার পিছনের ঘরে কে যেন অনবরত ফিঁচির ফিঁচির করে হাসছে। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে, ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে গেলাম সেখানে। দেখি কী, না মোমবাতি জ্বেলে পিসিমার মাদ্রাজী বাবুর্চি খসখস করে কী যেন লিখছে আর থেকে থেকে দু' হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে ভীষণ হাসছে। আমিও অবাক, সেও অবাক। কাগজটি টেনে দেখি স্পষ্ট বাংলায় লেখা—দেশনেত্রীর ইতিকথা শেষ অধ্যায়। হাঁ করে বাবুর্চির দিকে তাকালাম। সে আস্তে আস্তে দু' হাতে দাড়ি সরিয়ে কাছে এগিয়ে এলো, মোমবাতির আলোতে স্পষ্ট দেখলাম, খরগোশের কামড়ের দাগ। চেঁচাতে যাব, অল্প একটু মিষ্টি মিষ্টি পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধযুক্ত হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বিনীতভাবে হাসতে লাগল। তারপর হাত ছেড়ে দিলে ভীষণ রেগে

চাপা গলায় বললাম,'৪৪। এমন পাষণ্ড তুমি, সাক্ষাৎ বিয়ে-করা স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছ? লজ্জাও করে না তোমার, আবার হাসছে?'

পিসেমশাই তখন আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে ইংরিজি-বাংলা মিশিয়ে বললেন, 'লজ্জা কেন, গৌরব বল। এত বছর ধরে নিঃস্বার্থভাবে নিজের স্ত্রীর সেবা করছি না? রেঁধে খাওয়াক তো আর কেউ এই রকম। পঁচিশ বছর ধরে কত মন জুগিয়ে কোর্মা কালিয়া চপ কাটলেট খাইয়েছি বল তো? পুলিশে আতিপাতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে আর আমি নিজের বাড়িতে চাকরি করছি।' নিজের পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, 'খাইয়েওছি যেমন, খেয়েওছি তেমনি। কেউ আমাকে সন্দেহটি করেনি। নিরিবিলি ঘরটি পেয়েছি, সময়মতো রেঁধে বেড়ে দিলেই, ব্যস্, ছুটি। আগে তো ছুটি বলে কিছু ছিল না। মাইনেও দিয়েছে মাসে মাসে ত্রিশটে টাকা, আগে তো ত্রিশটা পয়সাও দিত না। পাছে অন্য লোকে বেশি মাইনে দিয়ে ভাগিয়ে নেয় তাই দিনরাত খোশামোদ করে, জানিস তা? আগে তো অহর্নিশি খিটখিট করত। যা করি এখন তাই ভাল লাগে, আগে তো মুখ দেখলে বিরক্ত হত। আদর্শ ভালবাসা তোরা আর কাকে বলিস?'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সত্যি বলে দিবি নাকি? বুড়োবয়সে কোথায় যাই বল তো? পঁচিশ বছর ধরে আরাম করা অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন অন্য জায়গায় বড় কষ্ট হবে রে! তোর কি দয়ামায়া নেই? হাজার হোক পিসে তো?' কী যে বলব ভেবে পাই নে। পিসেমশাই বললেন, 'ধরিয়ে দিলে তোকে উইল করে সব দিয়ে যাবে বলেছে এই তো?' হাতে 'ইতিকথা' শেষ অধ্যায় গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এইটে দিয়ে দে, ধরিয়ে দিস না। আমি গেলে কোথায় এমন খেতে পাবি? আমার কী? রাজারাজড়া আমাকে লুটে নেবে, সত্যি কি আর কষ্টে পড়ব? কষ্টে পড়বি তোরা। আর তোর পিসিমার কথা ভাব দেখি, তার কী হবে, কে তাকে এমনি করে খাওয়াবে বল্ দেখি, শেষটা বুড়োবয়সে কষ্ট পাবে।' পিসেমশাই আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

'বরং কিছু বলিস না। লেখাটা দিয়ে দে, খবরের কাগজে লেখার শখ আমার মিটে গেছে। বলিস যে লেখকের চাকরি গেছে, বর্মা চলে গেছে, মরে গেছে। কাল তোর নারকেল দিয়ে রসুন দিয়ে ঘি দিয়ে মুরগি করব ভেবেছিলাম, তা চলেই যদি যেতে হয়—'

পিসেমশাইয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে উঠে পড়লাম। 'নেহাত পিসিমার প্রতি তোমার এমন আদর্শ ভালবাসা, তাই।' 'একেবারে আদর্শ রে, একদম নিষ্কাম। কিছু বলিস না রে কাউকে। ও রাষ্ট্রনীতি ছেড়ে দিলেই সব খুলে বলা যাবে, কী বলিস?'

ওইটুকুই টুকবার সময় পেয়েছিলাম। পিসিমা এখন বাবুর্চি বেয়ারা নিয়ে নীলগিরি পাহাড়ে কুনুরে বাস করতে চলে গেছেন, বাংলা কাগজ কক্ষনও পড়েন না, তাই ছাপতে দিলাম। তা ছাড়া রাষ্ট্রনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তো আদর্শ প্রেমটার কথা ওঁকে জানানোই উচিত।

PATHAGAR.NET

আসল বেনারসী ল্যাংড়া

আশাপূর্ণা দেবী

সীমা ঘরবার করছিল।

অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন প্রতুলের!

যানবাহনের দুর্গতিতে দেরিটাই অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে গেছে আজকাল, তবু ভাবনা না হয়েও পারে না। ওই যানবাহন থেকে দুর্ঘটনার নজিরও তো কম নেই।

সীমা অনেকবার চেষ্টা করেছে একটা পড়ে থাকা সেলাই নিয়ে বসতে। কিন্তু পারছে না। মন বসছে না। হাতের কাজ হাত থেকে নামিয়ে বারে বারেই রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছে। এবং আপন মনেই নানা মন্তব্য করছে।

যথা—

'কী হল রে বাবা, ব্যাপারটা কী? পাড়ার প্রায় সব ভদ্রলোকেরাই তো এসে গেল একে একে। রাস্তা তো ক্রমশই ঝিমঝিমে হয়ে আসছে।...যা দিনকাল, জানি না কী ঘটছে। হে মা কালী, রক্ষা কর! যেন বিপদ-আপদ না হয়।'

একবার এদিকে গলা বাড়িয়ে ডাক দিল, 'খুকু, কটা বাজল, দেখ্ তো আর একবার।'

অলক্ষ্য কোনোখান থেকে 'খুকু'র ঝঙ্কার ভেসে এল, 'ন'টা চব্বিশ! এই নিয়ে ক'বার হল মা?'

সীমা ক্ষুব্ধ বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'ঠাট্টা করছিস? তা করবি বৈ কি? ঠাট্টারই সম্পর্ক তো? তোদের এ যুগের 'মনপ্রাণ' বলে তো কিছু নেই! ভাবনা করছি আমি সাধে? কী রকম দিনকালটি পড়েছে? বাসে-ট্রামে লোক চলেছে যেন বাদুরঝোলা হয়ে! বিপদ-আপদ ঘটতে পারে না?'

খুকু যেখানে ছিল সেখান থেকে একটু সরে এসে বলে, 'বিপদ-টিপদ তো দৈবের ঘটনা মা! তোমাদের সে যুগের এই 'মনপ্রাণ' খানি নিয়ে বসে বসে দুর্ভাবনা করলেই সেটা বন্ধ করতে পারবে? সব সময় খারাপটাই বা ভাবতে বসো কেন? সেটা বুঝি অপয়া নয়?'

'হয়েছে, আমায় আর জ্ঞান দিতে হবে না তোমাকে। রাত্তির দশটা বাজতে চলল, বাপ-ভাই দুটো মানুষই রাস্তায় অথচ মেয়ের—'

খুকু বলে, 'তুমি যে অবাক করলে মা! ভাই আবার কবে রাত এগারোটার আগে

আড্ডা সেরে বাড়ি ফেরে? দেখ গে কোথায় কোন্ পাড়ায় মোড়ের মাথা আলো করে দাঁড়িয়ে রাজকার্য চালাচ্ছেন তোমার পুত্ররত্ন।'

সীমা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে, 'তা জানি। তার জন্যে তো এক্ষুনি ভাবতে বসছি না। যে মানুষটা আড্ডা-ফাড্ডার ধারও ধারে না, তার জন্যে ভাবনা হবে না?'

খুকু নরম গলায় বলে, 'সে তো ঠিক! কিন্তু পরশু না তরশুও বাবার এরকম দেরি হয়েছিল।'

'মোটেই এত নয়,' সীমা প্রতিবাদ করে ওঠে, 'সেদিন মোটে ন'টা দশ হয়েছিল।'

খুকু হেসে ওঠে, 'ওরে ব্যস! একেবারে মিনিট-সেকেন্ডের কাঁটাটা পর্যন্ত মুখস্থ! কী সাংঘাতিক পতিব্রতা হিন্দু নারী!'

'বাজে বকবক করিস না খুকু। এই মানুষটাই আমায় পাগল করবে।'

খুকু হি-হি করে, 'করবে? ওটা এখনও ফিউচারে আছে?'

সীমা রেগে বলে ওঠে, 'খুকু! যাও! তুমি যেমন তোমার গল্পের বইয়ে মুখ দিয়ে পড়েছিলে, তাই থাকো গে যাও। উঃ! দিন দিন এত বাচালও হয়ে যাচ্ছিস—ওই য্যাঃ! গেল! কারেন্ট চলে গেল! ও মাগো! একে মরছি ভেবে ভেবে, আর এখন আলোটাও নিভে গেল!'

খুকু রোষভরে বলে, 'তা যাবে না? আমার গল্পের বই পড়ায় অত নজর দেওয়া। গল্পের বই পড়ব না? ওর জোরেই তো বেঁচে আছে মানুষ!'

'খুকু থাম তুই! অত কথা ভাল লাগছে না।'

খুকু (নেপথ্যে)—'নাঃ! অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। ভাবছিলাম কথা কয়ে মনটা একটু ইয়ে করে রাখি। বাবাকেও বলিহারি! এই ছিঁচকাঁদুনি গিন্নীটিকে তো চেনোই বাবা। গাড়ি না পাও, পায়ে হেঁটেও চলে আসা উচিত!'...গলার স্বর তুলে বলে, 'মা, এই অন্ধকারে তো কিস্যু হবে না, বরং ট্র্যানজিসটারটা খুলে দিই গান শোনো। চিত্তচাঞ্চল্যের মহৌষধ—'

ফট্ করে ছোট্ট ট্র্যানজিসটারটা খুলে দিল।

এটাই তো এখন ভরসা।

লোড্শেডিং-এর কল্যাণে রেডিও তো এখন প্রায় বাতিল আসবাবপত্রের সামিল হয়ে গেছে।

গান গেয়ে উঠলেন কোনো নামকরা গায়িকা, 'চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কী জানি কী মহালগনে।'

সীমা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'খুকু, ক্ষ্যামা দিবি?'

খুকু চট্ করে বন্ধ করে দিল যন্ত্রটা। সেও কড়া গলায় বলল, 'উঃ! বাবা বাবা! যে লোক গান সহ্য করতে পারে না, সে মানুষ খুন করতে পারে।'

PATHAGAR.NET

খুকুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। কারেন্ট অফ্, দরজার ইলেকট্রিক বেল অকেজো। অতএব সেই আদি ও অকৃত্রিম দুয়ারে করাঘাত।

'ওই এসেছেন—' খুকু দরজা খুলতে গেল।

সীমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক্ আমি দিচ্ছি—'

ফ্ল্যাটবাড়ি, দরজা খুলতে অধিক দূর যেতে হয় না। প্রথম দর্শনের অভিব্যক্তিটা নিজের একারে থাক।

দরজা খুলে দিয়েই সীমা বিচলিত গলায় বলে উঠল, 'তুই! তুই এক্ষুনি?'

পিন্টু ওরফে পল্লব দুই হাত উল্টে বলে, 'টাইমের একটু আগে এসে পড়েছি বটে মা-জননী। তা দেখে এমন হতাশ হয়ে যাবে তা তো ভাবিনি!'

সীমা চড়া গলায় বলে, 'ছেলের কথার ছিরি শোনো। তোকে সকাল সকাল আসতে দেখে আমি হতাশ হলাম?'

'কি জানি, তাই যেন মনে হল।'

সীমা চড়া গলায় বলে, 'ঘড়ির কাঁটা এগারোটা না ছাড়ালে তো আসতে দেখি না—'

পিন্টু হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু দেখো—এগারোটা! 'বারোটা' বাজেইনি কোনো দিন।...এই যাঃ...খুকু টর্চটা আন তো একবার, পকেট থেকে কী পড়ে গেল মনে হল—'

দাদার গলা পেয়ে খুকু প্যাসেজের এদিকে বেরিয়েই আসছিল, এখন টর্চটা নিয়ে এল। বলে উঠল, 'কী রে দাদা, সূয্যি আজ কোন দিকে উঠেছে? তুই এক্ষুনি বাড়ি ফিরলি তোর প্রাণের আড্ডাদারদের অনাথ করে?'

পিন্টু বলে, 'কথাটা মিথ্যে বলিসনি। ওরা তো মারতে উঠেছিল। তাও চলে এলাম। কাল 'ফাদার' যা ফায়ার হয়ে উঠেছিল। উঃ বাপ!'

সীমা বলে, 'তবু ভালো! ফাদার ফায়ার হলে একটু ভয় আছে এখনও। মাও রেগে মরে গেলেও তো—'

পিন্টু উদাত্ত গলায় বলে, 'মা? মা'র রাগে কি আর ভয় হয় গো? কথায় বলে মাতৃস্নেহ! কুপুত্র যদ্যপি হয়—'

'থাম্ থাম্ হয়েছে। তোকে আর শাস্তর আওড়াতে হবে না। পকেট থেকে কী পড়ে গিয়েছিল পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'কী ওটা? চিঠি? চিঠির মতন মনে হল যেন?'

'ক্ষেপেছ! এ অভাগাকে চিঠি কে দেবে মা? এ একটা লন্ড্রীর বিল।'

'লন্ড্রীর বিল?'

'হ্যাঁ তো! অবাক হবার কি আছে? কুপ্লে একটা টেরিকট প্যান্ট আর একটা

টেরিলিন শার্ট আছে বলে কি আর জন্মে, জীবনেও লন্ড্রীর দরকার হয় না গো জননী!...তা বাড়িটা এমন আইসব্যাগ আইসব্যাগ লাগছে কেন বল তো? ফাদার কি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

সীমা কিছু বলার আগে খুকু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না রে দাদা, বাবা এখনও আসেইনি।'

'তাই নাকি?' পিন্টু কিছুটা অবাক গলায় বলে, 'গুড্ বয়ের আজ এ কী অধঃপতন!'

'দাদা থাম্। মা দারুণ দুশ্চিন্তা করছে।'

'মা দারুণ দুশ্চিন্তা করছে? তা সেটা তো কিছু নতুন খবর নয় ভগিনী। দুশ্চিন্তা করাটাই তো মা'র পেশা। কারুর বাড়ি ফিরতে একটু দেরি দেখলেই তো মা ধরে নেয়, সে খট করে ট্রামে কাটা পড়েছে, সাঁ করে ডবল ডেকারের তলায় চলে গিয়ে ব্যাংচ্যাপ্টা হয়ে গেছে, নয়তো দুরন্ত লরির মুখে পড়ে স্রেফ ছাতু বনে গেছে।...তাই ভাবো না মা?'

'জানি না যা। আমি কোথায় ভাবছি তুই এসে পড়েছিস, কোনখান থেকে একটু খবরটবর নেবার চেষ্টা করবি, তা নয় তুই ইয়ার্কি মারতে বসলি!'

'খবর? কোনখান থেকে? এই নিবিড় আঁধারে। বুঝেছি, ব্যাপার বুঝেছি। বাবা নিশ্চয় সেই বিরাট প্রসেশনটার মুখে পড়েছে। দেখে এলাম কিনা খানিক আগে, মাইল দেড়েক লম্বা শোভাযাত্রা। শত শত যানবাহন আটকে আছে। সেটা—সেটা দেখেছি তা প্রায় হ্যাঁ ন'টা। তার মানে আসতে এখনও খানিক দেরি আছে।'

সীমা গম্ভীর গলায় বলে, 'সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে হবে তাহলে?'

'ভেবে-টেবে নয়, আমি বলছি ওটাই ঠিক। নচেৎ এত দেরি হবার কারণ নেই। ওভারটাইম খাটলেও নয়।'

সীমা স্থির কঠিন গলায় বলে, 'আর কিছু হতে পারে না?'

পিন্টু তরল গলায় বলে, 'হতে অবশ্য কত কী পারে! বহু কষ্টে বহু আরাধনায় যে বাসটায় চেপে বসেছিল, সেই বাসটা ব্রেকডাউন হয়ে যেতে পারে, মস্তান দাদুরা হঠাৎ আঙুল তুলে 'স্টপ' বলে বাসটাকে অহল্যা পাষাণী করে দিতে পারে, আরোহীর সঙ্গে কনডাকটরের বিরোধ ঘটায় গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা তো কখনই হবে না, বাবা এই বৃদ্ধ বয়েসে কোনো বান্ধবী যোগাড় করে ফেলে, সেখানেই চা খাচ্ছে মাছের চপ খাচ্ছে ডিম ভাজা খাচ্ছে আড্ডা দিচ্ছে—'

সীমা কঠোর কঠিন গলায় বলে, 'খুকু টর্চটা আমায় দাও, আমি এগারো নম্বরের হরনাথবাবুর বাড়িতে যাই একবার—'

'এগারো নম্বরের হরনাথবাবুর বাড়ি?'

পিন্টু অবাক হয়ে বলে, 'এই রাত দশটার পর? কী বলবে গিয়ে?'

PATHAGAR.NET

'কী আর বলবো? বলবো—বলবো—'

কথা শেষ হল না, আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল, প্রবল ভাবে। যেন দরজা ভেঙে ফেলবে।

সীমা স্খলিত স্বরে বলে ওঠে, 'বুঝেছি! সর্বনাশ হয়ে গেছে, পুলিশের লোক খবর দিতে এসেছে। পিন্টু—'

'পুলি-শ! এই সেরেছে! দাদা তুই যা—'

'যাচ্ছি। মা টর্চটা দাও—'

পিন্টু দরজা খুলে দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তার হুঙ্কার শোনা যায়, 'কী ব্যাপার কী? ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি সবাই মিলে?'

এই লোকটার জন্যে এতক্ষণ এত দুশ্চিন্তা করছিল সীমা! প্রাণের মধ্যে এত উথাল-পাতাল হচ্ছিল!

অবিরত চোখের সামনে অজানা অচেনা কোনো এক রাস্তার মাঝখানে লোকটার ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিল, দেখতে পাচ্ছিল পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের খাট, মাথায় ব্যান্ডেজ, (সিনেমার কল্যাণে যে সব দৃশ্য দেখে দেখে মুখস্থ), নাকে অক্সিজেনের নল, মর্গ, খাটিয়া, সাদা চাদর মোড়া শরীর, অগুরু চন্দন, ফুলের মালা, চিতার আগুন, থান, হবিষ্যি, শ্রাদ্ধসভা, মুণ্ডিতমস্তক পুত্র—

এইখানটাতেই একটু ঠেক খাচ্ছিল সীমা, ওই নাস্তিক মস্তান ছেলে কি আর তার সাধের ঘাড়-ছাড়ানো কেশকলাপ মুড়োবে?

এসব চিন্তা তো ইচ্ছাকৃতও নয়, চেষ্টাকৃতও নয়, চোখের সামনে এসে যাচ্ছিল, ভেসে যাচ্ছিল, নাচানাচি করছিল। নেচে নেচে সীমা নামের একটি প্রেমের প্রতিমাকে কাবু করে দিচ্ছিল, শিথিল করে দিচ্ছিল তার হাত-পা। সেই শিথিল স্নায়ুর উপর পড়ল এই হাতুড়ির ঘা।

এ ঘায়ে সীমা যদি ছিটকে ওঠে, দোষ দেওয়া যায় না তাকে।

ছিটকে-ওঠা সীমা তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঘুমোবে কেন? বাড়ির গিন্নী মরে পড়েছিল, তাই ছেলেমেয়েরা পাথর হয়ে বসেছিল। বলি বলতে একটু লজ্জা করল না? রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে—'

ক্রুদ্ধ গৃহকর্তা আরও গলা চড়ান, 'লজ্জা করবে? কেন? কেন? লজ্জা করবে কেন শুনি? এতক্ষণ কি আমি তাড়িখানায় বসে তাড়ি খাচ্ছিলাম? না বন্ধুর বৌয়ের হাতের পান খাচ্ছিলাম?'

সীমার স্বর তিক্ত তীক্ষ্ণ, 'কী করছিলে তা নিজেই জানো। এ কথা তো বিশ্বাস করব না ড্যালহাউসি থেকে রাসবিহারীতে তোমার পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছে—'

'বিশ্বাস করবে না? বিশ্বাস করবে না?' কর্তা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন,

'বিশ্বাস না করলে তো বয়েই গেল। অ্যাঁ! বলে কিনা বিশ্বাস করব না!...গামছা নিংড়োনোর মতো শরীরের রক্ত নিংড়ে নিংড়ে শালার অফিস যাওয়া-আসা! বুকে পিঠে ভিড়ের চাপে দমবন্ধ হয়ে হয়ে হার্টের রোগ জন্মে গেল, রড্ ধরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শালার হাতে বাত, পায়ে গোদ হবার যোগাড়, আর বলে কিনা বিশ্বাস করি না!...মুরোদ থাকে তো একদিন গিয়ে দেখে এসো না? ঘরের মধ্যে আরামে আয়েসে বসে দুটো ভাতসেদ্ধ করতেই তো ক্ষয়ে যাচ্ছ! বুঝতে ঠ্যালা, যদি আমার মতন—'

এই অপমানের পরও কি সীমা চুপ করে থাকবে?

প্রিয়তম স্বামীর দুর্দশার বিবরণে ঈষৎ নরম হয়ে আসা মন আবার ফোঁস করে ওঠে।

'কি, কী বললে? তোমার সংসারে ঘরের মধ্যে বসে আরামে আয়েসে দুটো ভাতসেদ্ধ করেই আমার কর্তব্য মিটে যায়? বলি তোমার সংসারের জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ চালাচ্ছে কে? মেয়ে তো আহ্লাদী ফুলকুমারী, দু'পেয়ালা চা করতে হলে পাখার তলায় বসে হাঁপান। আর ছেলে? তিনি সারাদিন এমন রাজকার্য করে বেড়ান যে, একদিনের জন্যে গমটা ভাঙিয়ে আনতে পারেন না, রেশনে লাইন দিতে পারেন না।'

অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, চলছে শব্দভেদী বাণ ছোঁড়াছুঁড়ি।

পিন্টু বোনের ঘাড়ে একটা চিমটি কেটে চাপা গলায় বলে, 'এই খুকু, বাতাস ঘুরে যাচ্ছে, আক্রমণ আমাদের দিকে আসছে, সরে পড়ি আয়।'

চলে আসে নিজেদের পড়ার ঘরে, বাতিটা খোঁজাখুঁজি করে, অবশেষে পায়, জ্বালে।...ওদিকে চলছে বাক্যযুদ্ধ, কান দেয় না।

পকেট থেকে একটা পাট-করা কাগজ বার করে পিন্টু অবহেলার গলায় বলে, 'এই নে লন্ড্রীর রসিদটা—'

খুকু ভুরু কুঁচকে বলে, 'কার কি কাচতে গিয়েছিল?'

'খুলে দেখ—'

খুকু খুলে ধরে কাগজটা মোমবাতির সামনে, পরক্ষণেই চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'দাদা! এর মানে? লন্ড্রীর রসিদ?'

পিন্টু পরম অগ্রাহ্যে বলে, 'তা তোর লাভারের চিঠি, লন্ড্রীর রসিদের থেকে আর কত উঁচুদরের?'

'ভালো হবে না বলছি দাদা! যত সব অসভ্য কথা—'

পিন্টু ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'আছো বেশ! তুমি লাভার জুটিয়ে লাভ করতে পারো, 'লাভলেটার' চালাচালি করতে পারো, আর সেটা বললেই দোষ?'

'আহা! তাই বলে বৃদ্ধ হাঁদাগঙ্গা ছোটলোকটা তোমার হাতে চিঠি দেবে?'

PATHAGAR.NET

'আহা! ও কি আর নিজে সাহস করে দিতে আসছিল? লাইব্রেরিতে দেখা, অবোধ ইনোসেন্ট মুখে বলতে লাগল, পিন্টুদা, বাড়ির খবর কি? মেসোমশাই কেমন আছেন? মাসিমা কেমন আছেন? মাসিমার ঝি-টি ঠিকমতো আসছে তো? রেশনে চিনি পেয়েছেন? কয়লা পাওয়া যাচ্ছে? এই সব। তখন বললাম, এত কথা তো তোমার মাসিমাকে জিজ্ঞেস করতে আমার মনে থাকবে না ভাই, তুমি বরং তোমার মাসিমাকে কি খুকুকে দু'লাইন লিখে জিজ্ঞেস করে নাও—'

খুকু তেমনি চাপা গলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'আঃ দাদা! তুমি না! এমন! উঃ!'

হঠাৎ ওদিক থেকে একট বাসন আছড়ানোর শব্দ এ ঘরে এসে আছড়ে পড়ল।

চমকে উঠল দু'জনেই।

খুকু চমকে বলে, 'কী হল?'

পিন্টু অম্লান গলায় বলে, 'কিছু না, কর্তা-গিন্নির প্রেমালাপ বোধ হয় চরমে উঠেছে।'

তা কথাটা মিথ্যে নয়।

কর্তার প্রবল কণ্ঠের বাণী শোনা যায়, 'সংসার চালানোর বড়াই হচ্ছে। পায়ের কাছে বাসন ছড়ানো। অন্ধকারে লোকে হোঁচট খেয়ে মরুক।...এই সংসার চালানোর আবার বাহাদুরি। যাক, চুলোয় যাক! এ সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যাব।'

সীমা ওই পায়ের কাছে বাসন রাখার লজ্জায় যাও বা একটু নরম হতে যাচ্ছিল, তখনই সীমার প্রতি তীরটি নিক্ষিপ্ত হয়।

'বটে!' সীমা বলে ওঠে, 'তুমি চলে যাবে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে? আর আমি? আমি বুঝি বসে বসে সে আগুনে জল ঢালব? মনে জেনো আমি তার আগেই চলে যাব। 'বাপের বাড়ি' একটা আছে এখনও, বুড়ো বাবা-মা কত বলে, 'একদিন আয়, কতদিন দেখিনি', এই তোমাদের সংসারের জন্যে একটা দিন গিয়ে থাকতে পারি না। আর আমায় বলা কিনা আরাম আয়েসের ওপর বসে আছি!...বলি অফিসেও তো আর সারাক্ষণই ফাইল ঠেলছো না, আড্ডাও তো চলে; বন্ধুরা বলে না এযুগে সংসার করার সুখটা কত!'

একটু থেমে, একটু হাঁপিয়ে, একটু কেসে আবার শুরু করে, 'রাতদিন বাজার থেকে মাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। আজ তেল উধাও, কাল দালদা উধাও, পরশু কেরোসিন উধাও, তরশু রেশনের গম চাল চিনি উধাও, নিত্যি দুধের গাড়ি আসছে না,—খালি বোতল নিয়ে ফিরছে, দশ-বিশ ঘণ্টা লোড্‌শেডিং, পাম্প চলে না, হিটার জ্বলে না, আটা ভাঙানোর চাকী বন্ধ, ফ্রিজের দফা গয়া, কে ম্যানেজ করছে এসব? আগে সকাল বেলায় উঠে বাজারটা নিয়ম করে করে দিতে, এখন তাও তোমার নিত্যিই সময় হয় না, খবরের কাগজ পড়া আর দাড়ি কামানো এই করতেই সকাল কাবার। ভাতটি খেয়েই লম্বা দাও, আর এই এখন এসে পদার্পণ! সারাদিনে কত মল্লযুদ্ধ চলছে জানতে পারো, না জানতে চাও? মনে করো সংসারের চাকাখানি আপনি চলছে মিহি মোলায়েম সুরে!...সেই চাকার তেলটি যোগাড় করতে যে ঝিয়ের পায়ে কত তেল দিতে হয় তার খোঁজ রাখো? কতগুলো পাতানো বোনপো পুষতে হয় তার হিসেব রাখো?'

'ওরে বাবা, এই রাজধানী এক্সপ্রেস যে থামেই না দেখছি—', পিন্টু বলে, 'দুশো মাইলের মধ্যে স্টেশন নেই!'

খুকু এই কৌতুক উক্তিতে কান দেয় না, শুকনো গলায় বলে, 'মা ওই পাতানো বোনপোদের কথা কী বলল রে দাদা!'

'বলল সংসার চালাতে অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসেবে অনেকগুলো পাতানো বোনপো পুষতে হয়!'

PATRAGAR.NET

আরও শুকনো গলায় গলায় বলে খুকু, 'অনেকগুলো আবার কী?'

'ওই হল আবার কী! গৌরবার্থে বহুবচন।'

খুকু কান পাতে নিবিষ্ট হয়ে। ওঘরের কলধ্বনি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'কী বললে? পাতানো বোনপো পুষতে হয়! বাড়িতে তাদের আসতে দেওয়া হয়?'

'তা বাড়িতে আসতে না দিলে, তারা কি রাস্তা থেকে আমার উপকার করে যাবে নাকি? আসতে দিতে হয়, বসতে দিতে হয়, চা খাওয়াতে হয়,—'

'হয়! এত সব হয়!' কর্তা প্রবল গর্জনে প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'বলি এত সব হওয়ার বদলে কী কী মহৎ উপকারটা হয় শুনতে পাই?'

সীমা বেশ ডাঁটের সঙ্গে বলে, 'অনেক কিছুই হয়। তোমার ছেলের দ্বারা তো এক ইঞ্চি কাজও হয় না। সিনেমার টিকিট কিনতে পাঠালাম টাকা দিয়ে, ফিরে এল ছেলে, বলল, 'হল না, হাউস ফুল।'...অথচ আমার সোনার চাঁদ পাতানো বোনপো তক্ষুনি সেই টিকিটই এনে দিল।'

'দিল! বলি কোথা থেকে দিল শুনি?'

'এলেম থাকলেই সবই হয়।...এই তো ত্রিভুবনের কেউ যখন দালদা পাচ্ছে না, স্বপন আমায় দু'-দুটো দু'কিলো দালদার টিন এনে দিল।'

কর্তা হিংস্র গলায় বলেন, 'যখন ওই দালদার টিনের বদলে মেয়ে খোওয়া যাবে, তখন বুঝবে ঠ্যালা!'

'মেয়ে খোয়া যাবে? গেলেই হল?'

'না যাবে না! পৃথিবী দেখছ না? আমি এই বলে দিচ্ছি, তোমার ওই আদুরে খুকুকে যদি সামনের মাসেই না পাত্রস্থ করি—'

সীমা ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'পাত্র মজুত আছে বুঝি?'

'অভাবও নেই। ডজনে ডজনে প্রজাপতি অফিস আছে—'

খুকু আর্তনাদের গলায় বলে, 'দাদা!'

পিন্টু নির্লিপ্ত নিরাসক্ত গলায় বলে, 'কাতর আর্তনাদে কোনো ফল নেই, এলেম থাকে বাবাকে গিয়ে জোর গলায় বলগে যা, 'বাবা, মেয়ের বিয়ের জন্যে সোনাদানা, টাকাকড়ি, ঘড়ি, আংটি, বোতাম-ফোতাম, জামাকাপড়, বিছানাবালিশ, খাট-আলমারি, সোফা-সেট ইত্যাদি প্রভৃতি আলটু-বালটু মালগুলো তুমি যোগাড় কর, আসল মালটি তোমায় আর কষ্ট করে যোগাড় করতে হবে না, ওটা আমি ম্যানেজ করব—'

'আঃ দাদা! ওই কথা বলব আমি বাবাকে?'

'না বলতে পারলে, হল না। তবে হওয়া আর না হওয়া! শেষ পর্যন্ত তো প্রেমালাপের নমুনা ওই—যা শুনতে পাচ্ছ—'

'ধ্যেৎ! সবাই যেন—'

PATHAGAR.NET

'সবাই। সবাই। সংসার-চক্রে তেলের ঘাটতি হলেই ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ ওঠে। তাছাড়াও আরও বহুবিধ জটিল ব্যাপার আছে।...'

'মা-বাবার বিয়েটাও তো শুনেছি পছন্দ করে বিয়ে।'

'আহা রে! কে বলেছে তোকে?' বলল খুকু।

'শুনেছি বাবা শুনেছি! বড়মাসির শ্বশুরবাড়ির কোনো বিয়ে-বাড়িতে মাকে দেখে—বাবা—'

'ওঃ! সেই!'

খুকু গৌরবান্বিত গলায় বলে, 'সে কথা ছেড়ে দাও। ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই, কিসের ওপর ওঁরা জীবন চালিয়ে আসছেন!'

খুকুর বলার ভঙ্গিতে এইটাই প্রকাশ পায়, আমাদের স্বর্গীয় প্রেমের সঙ্গে ওনাদের কিছুর তুলনাই হয় না!

কিন্তু ওদিকে যে এখনও যুদ্ধ-সমাপ্তির চিহ্নমাত্র নেই।

যুদ্ধনিনাদ মাঝে মাঝে অস্পষ্ট, মাঝে মাঝে স্পষ্ট। তার মানে ওঁরা লম্বা দালানটায় পায়চারি করে করে তূণ থেকে বাণ নিক্ষেপ করছেন।

কর্তার প্রবল স্পষ্ট, 'আলবাৎ বলব! মেয়ে আমার!'

'মেয়ে তোমার?' সীমার স্বর স্পষ্ট হলেও রুদ্ধ, 'তোমার একলার? মেয়ে নিয়ে যা কিছু কষ্ট খাটুনি ভোগান্তি সব আমার, আর অধিকারের বেলায় তোমার?'

'এই সেরেছে! মা যে ফ্যাঁসফ্যাঁস শুরু করে দিল রে খুকু!'

'দিয়েছে?' খুকু উল্লাসিত গলায় বলে, 'তাহলে অবস্থা আয়ত্তে এসে গেল!'

পিন্টু ভীত গলায় বলে, 'না না সর্বনাশ! এ সব কী বলছে মা? এই খুকু—'

এখন—

সীমার অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে, 'জীবনভোর শুধু এ সংসারের চাকরানিগিরিই করে এলাম। একদিনের জন্যে কারুর কাছে একটু মায়া পেলাম না, মমতা পেলাম না, আদর পেলাম না—এখনও এই। আর আমার সংসারে সাধ নেই, এই তিন সত্যি করছি—মরব, মরব, মরব। হয় বিষ খেয়ে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে—'

'খুকু!'

খুকু আশ্বস্ত গলায় বলে, 'কিচ্ছু ভয় পাস নে, আর চিন্তা নেই, তরঙ্গিত সমুদ্র থেকে তরণী এখন তীরে এসে লেগেছে। দেমাক কর্তার কণ্ঠে এখন আর হুঙ্কার শুনবি না।'

তা খুকুর কথাটা মিথ্যে নয়, কর্তার কণ্ঠস্বরে আপোসের সুর।

'ঠিক আছে! মরা কারুর একচেটে ব্যবসা নয়। অগাধ রেললাইন পড়ে আছে গলা দিতে, পাহারা নেই কোথাও। আমার মতন হতভাগা, চৌদ্দঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরে যার কপালে এক কাপ চাও জোটে না, তার পক্ষে ওই পরিণতিই উচিত।'

'ইস!' পিন্টু বলে, 'খুকু তুই কী রে! মা না হয় ঝগড়া করছে, তোর তো উচিত ছিল বাবাকে একটু চা করে দেওয়া!'

খুকু বলে, 'ক্ষেপেছিস! মা ইচ্ছে করে উচিত কর্তব্যে অবহেলা করছে, সেখানে মাথা গলিয়ে আমি যাব উচিত কর্তব্য করতে? এই অধম খুকু বোকা হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধু নয়। তাছাড়া ওই শোন্ না, চামচের টুংটাং শুরু হয়ে গিয়েছে।'

পিন্টু সেই টুংটাং ধ্বনি একটুক্ষণ কান পেতে শুনে উদাস-উদাস গলায় বলে, 'আচ্ছা খুকু, আমি বাড়ি এসে চা খেয়েছি?'

'ওমা! কখন আবার খেলি? এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই তো লেগে গেল নারদ-নারদ।'

'হুঁ! কিন্তু দেখ্, ইচ্ছে করলে মা তো আমাকেও এক কাপ অফার করতে পারত!'

'এই ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের মধ্যে কি আর স্নেহ-দীপখানি জ্বলছে রে দাদা! চিরকালের কথা—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।...আমরা, মানে ছেলেমেয়েরা হচ্ছে উলুখড়, বুঝলি? গৃহযুদ্ধের প্রধান বলি!'

'তার মানে তুই বলছিস, আমার আর আজ চায়ের কোনো আশা নেই? মা ভুলে যাবে?'

ঠিক এই সময় ফট্ করে কারেন্ট এসে যায়, আবার আলো জ্বলে ওঠে।...তার প্রতিক্রিয়ায় রাস্তায় এবং পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে সমবেত একটা উল্লাসধ্বনি ওঠে, 'এসে গেছে। আলো এসে গেছে!'

খুকু (জনান্তিকে) : 'বাবা বাঁচা গেল, আলো এসে গেছে, চিঠিটা পড়ি ভাল করে।'

সীমার বাষ্পাচ্ছন্ন অথচ উল্লসিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'পিন্টু, চা ঢালছি আয়। বাবাঃ, এতক্ষণ অন্ধকারে যেন হাত-পা আসছিল না, চা বানাতে এত দেরি হয়ে গেল!...আর এই দেখ্ তোদের বাবার কাণ্ড! এত দুর্গতি করে আসা, তার মধ্যে কিনা বুকে করে গুচ্ছির ল্যাঙড়া আম বয়ে আনা হয়েছে। কী না পোস্তায় আম সস্তা! আর দেরি দেখে কিনা আমি বকে বকে মরছি—'

এখন আলো জ্বলে উঠেছে, এখন কর্তা প্রসন্নজীবন রায়ের চেহারাখানি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অগ্নিতাপশূন্য প্রসন্ন প্রদীপ্ত মুখ। সেই মুখে আরও প্রসন্নতার আলো জ্বেলে বলেন তিনি, 'শুধু সস্তা বলেই নয়, জিনিসগুলোও উৎকৃষ্ট। আসল বেনারসী ল্যাংড়া। তোমাদের মাতৃদেবীর তো আবার হাবিজাবি আম মুখে রোচে না, তাই প্রত্যেকটি বেছে বেছে—উঃ, যে করে আমের থলিভরা হাতটা উঁচু করে—এতটি রাস্তা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসেছি—বলি আমি ব্যাটা ভিড়ে আখমাড়াই হই-হই, তোদের মা'র আমগুলো না টস্কায়!'

PATHAGAR.NET

নকলদানা

সুমথনাথ ঘোষ

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না সহদেববাবু। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন আয়নাটার ভেতরে। রোজ যে মুখ দেখতে অভ্যস্ত তার বদলে মনে হয় এ যেন আর একজনের।

ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এপাশে-ওপাশে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। নাঃ একেবারে বেমালুম কালো হয়ে গেছে। সাদা চুল কোথাও আর একগাছিও নেই। সস্নেহে একবার হাতটা নিজের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে ধন্যবাদ দেন মিসেস সেনকে। তাঁর শালাজ, বড় শালার স্ত্রী, স্বামীকে অপিসের কাজে দিল্লী থেকে দু'-দিনের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে শুনে তাঁরই সঙ্গে জোড়ে এসে উঠেছেন সহদেববাবুর বাসায়।

অবশ্য এর পিছনে কার চক্রান্ত সবই তিনি জানেন। গত দু'-তিন বছর ধরে তাঁর স্ত্রী মলিনা যখন তখন বলে, চুলটাতে একটু রং দিলেই তো পারো। ইচ্ছে করে বুড়ো অপবাদ নেবার দরকার কি। মল্লিকমশাই, চ্যাটার্জিবাবু, ভদ্রার বাবা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু কারো চুল তোমার মতন এমন অল্পবয়সে ধুতরো ফুল হয়ে যায়নি।

অল্প বয়েস! বয়স কত হল জানো? সামনের ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চান্নতে পড়বো! সহদেববাবু বয়সের উল্লেখ করেও স্ত্রীকে ক্ষান্ত করতে পারেন না, বরং তার ক্রোধ আরো বেড়ে যায়। বলে, মল্লিকমশাই-এর বৌ আমায় নিজে বলেছেন, তাঁর স্বামীর এই উনসত্তর হল। আর চ্যাটার্জীবাবুকে তিনি দাদা বলে যখন ডাকেন বুঝতেই পারছো, অন্তত দু'-এক বছরেও বড়। কিন্তু কার মাথায় তোমার মতো এত পাকা চুল! কেউ তো তাঁদের বুড়ো বলে না।

সহদেববাবু জবাব দেন, বলে কিনা বলে, তুমি কি করে জানলে?

থামো আমি সব জানি। বলে ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয় মলিনা। সেদিন মুচিটা এসে ডাকছে, মা বুড়োবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর কি জুতো সারাতে হবে।

আর একদিন এক ছুতোর মিস্ত্রী এসে বলে, বুড়োবাবু আছেন, কোন দরজার নাকি কব্জা গেছে। সেদিন বাজারে দেখা হয়েছিল, বলেছিলেন সেরে দিয়ে বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে যেতে।

PATHAGAR.NET

সবচেয়ে রাগ হয়, পাড়ার লোক যারা সবাই তোমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে জানে, তারা যখন চাঁদা চাইতে এসে বলে, বুড়োকত্তা বাড়ি আছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখের ওপর দরজাটা আছড়ে বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করে মলিনার। তবু একদিন প্রশ্ন করেছিল, বুড়োবাবু কে?

মানে, মানে ওই সুকান্তর বাবা।

স্ত্রীর মুখ থেকে ওই সব শুনে সহদেববাবু হেসে উঠেছিলেন, তা বুড়োমানুষকে বুড়ো বললে যদি তোমার রাগ হয়, তাহলে তো নাচার। জানো শাস্ত্রে বলেছে 'পঞ্চাশোর্ধ্ব বনং ব্রজেৎ'। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলে, তার বনে গিয়ে বাস করা উচিত।

কিন্তু তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরুতে আমার যে লজ্জা করে। জানো সেদিন কাজলের মা জিজ্ঞেস করছিল, আপনি কি দ্বিতীয়পক্ষ? ওঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তিন বছর হল, এ-পাড়ায় ভাড়া এসেছেন। তোমার পাকা চুল দেখে শুধু তাঁর কেন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে। সেদিন ঠাকুরতলায় তুমি আমায় পুজো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের কত তফাৎ ঠারে-ঠোরে অনেকেই সে-কথা শুনিয়ে দিলে।

সহদেববাবু রসিকতা করে বলে উঠলেন, তা যদি কুন্তীর মতো অনন্ত যৌবনা হও, সে কি আমার দোষ!

থামো। এ নিয়ে আর রঙ্গ করতে হবে না।

বাস্তবিকপক্ষে এক একজন মেয়ের দেহের গঠন এমন, সেই যে তিরিশে এসে থমকে যায়, আর যেন এগুতে চায় না, মলিনাকে এই দলের নেত্রী বললে অত্যুক্তি হয় না। হাল্কা মুখে পাউডারের তুলি বুলিয়ে সেদিন বড় মেয়ে এ বছর যে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে, তাকে নিয়ে মার্কেট করতে গিয়েছিল। কোয়ালিটিতে 'আইসক্রীম' খেতে ঢুকে মলিনার সঙ্গে অনেক দিন পরে তার পুরনো কলেজ ফ্রেন্ড দীপ্তি রুদ্রের দেখা, ওমা, তুই মলি, এখনো তোকে কি ছেলেমানুষ দেখতে! আমি তো আগে ভেবেছিলুম তোদের দুই বোন—তারপর টেবিলে বসে তোর মুখের দিকে তাকাতে হঠাৎ মনে হল, আর এ-তো সেই আমাদের মলি, তোর মেয়েকে দেখেছিলুম বোধ হয় বছর দশেক আগে। তোর মুখের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য ছিল, তখন চিনতে বাকি রইল না।

তারপর মেয়ে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে শুনে, কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর টেনে বললে, বাবা, এতবড় হয়ে গেছে তোর মেয়ে! মাইরি তুই কি করে চেহারাটা এখনো এমন রেখেছিস বল্ না। আমি তো দিনে দিনে ফুলছি। আমার কত্তা তো আমার সব খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্রে দু'খানা রুটি খাই। মাংস নয়, ডিম নয়, ঘি-দুধ সব ছেড়ে দিয়েও তো দেহের মেদ কমাতে পারছি না।

PATHAGAR.NET

বাড়ি ফিরে এ-সবই সহদেববাবু সবিস্তারে গল্প করেছিল মলিনা। তাকে যে এখনো কত 'ইয়ং' দেখায় সেটা তার কানে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে।

বলা বাহুল্য সহদেববাবুকে এ-সব শুনেও চুপচাপ ছিলেন। কলপ মেখে চুল কালো করার কথা চিন্তা করে দেখেননি কোনোদিন।

অবশ্য এই ব্যাপারে মলিনা একদিন চরম আঘাত পেয়েছিল, সেকথাটাও সহদেববাবু জানতেন, তবু তিনি তেমনি নীরব ছিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তার দেখবার...জন্যে তিনি...মলিনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের কথা লিখে দিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন, আজ থেকেই ওষুধটা খেতে পারলে ভালো হয়। আপনার বাবা তো সঙ্গে এসেছেন, বলুন, যাবার সময় এইখানে কাছেই যে ওষুধের দোকান রয়েছে যেন কিনে নিয়ে যান।

এটা বেশ কিছুদিন আগের কথা। তারপর তিন-চার বছর কেটে গেছে।

সেদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল সহদেববাবুর। অপিসের ছুটি। বেলাতে বাজারে গেলেও চলবে। যদিচ বাড়িতে অতিথি...বহুদিন পরে তাঁর শ্যালকদম্পতি এসেছেন, বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়নের কথা এবং কি 'মেনু' হবে রাত্রেই স্বামী স্ত্রীতে মিলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তবু সহদেববাবুকে বেলা পর্যন্ত ঘুমতে দেখেও যে কেউ ডাকেনি কেন, তা বুঝতে বিলম্ব হল না। হঠাৎ মাথায় একটা চটচটে তেলের মতো কি বস্তুর স্পর্শ পেয়ে ধড়মড় করে সহদেববাবু খাটের ওপর উঠে বসেই সামনে মিসেস সেন ও মলিনাকে দেখে চমকে উঠলেন। মিসেস সেনের এক হাতে একটা চায়ের কাপ, আর এক হাতে একটা দাঁত মাজার ব্রাশ। মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসছেন দু'জনেই। তবে হাসির ছটা বেশি যেন মলিনার মুখে। ভাবটা এই, কেমন জব্দ, এবার না বলো। এতদিন পরে তোমায় বাগে পেয়েছি।

না, না এসব কি করেছেন বৌদি এই বুড়োবয়সে। বলে মাথায় হাত দিতেই কালো মতো রং আঙুলে লেগে গেল সহদেববাবুর।

মিসেস সেন হেসে জবাব দিলেন, বুড়োবয়সেই তো এসব করে ভাই। ছোকরা বয়সে তো দরকার হয় না। এখন রাগ করছেন কিন্তু পরে আমায় ধন্যবাদ দেবেন এর জন্যে। জানি। বলে এক ঝলক হাসি উথলে দিলেন ঠাকুরজামাইয়ের মুখের ওপরে।

মলিনা বলে উঠল, হাত দিয়ো না মাথায়।

চোখে যেন লাগে না। এই তোয়ালেটা দিয়ে চোখটা চেপে ধরে আমাদের সঙ্গে বাথরুমে আসুন। এ রংটা বড় খারাপ। কোথাও লেগে গেলে সহজে ওঠানো যায় না।

চোখ চেপে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতে ওরা ননদ-ভাজে মিলে সহদেববাবুর মাথায়

PATHAGAR.NET

বেশ করে রং লাগিয়ে দিলো। তারপর মিসেস সেন বললেন, এখন ভিজে চুলটা পাখার নিচে বসে শুকিয়ে নিন। পরে আর কিছু করার নেই। ছোড়দামণি এসে মাথায় সাবান দিয়ে রংটা ধুয়ে দেবেন। কিন্তু একটু সাবধান থাকবেন, ওই রং-ধোয়া জল যেন চোখের ভেতরে না যায়।

যথা আজ্ঞা দেবী। সহদেববাবু রসিকতা করে উঠতে ওঁরা ননদ ভাজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে মলিনা বাথরুমে এসে সহদেববাবুর মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে দিয়ে চলে গেল, তিনি স্নান করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে বড়ো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান! সে কি। একেবারে কুচকুচ করছে মাথার চুল। সেই কুড়ি বছর আগের চেহারাটা যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হয়।

মিসেস সেন, ভেতরের ঘরের দেওয়াল থেকে তাঁদের বিয়ের তোলা ফটোটা এনে, ননদকে নন্দায়ের পাশে দাঁড় করিয়ে বলেন, দেখুন তো ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে, একেবারে এক দেখাচ্ছে না? অকালে চুলগুলোকে পাকিয়ে বুড়ো হয়ে যাবার কি দরকার ছিল।

অ-কালে! বলেন কি বৌদিভাই! পঞ্চান্ন বছর অকাল?

মলিনা খপ্ করে বলে ওঠে, দাদা তো তোমার চেয়েও দু'বছরের বড়—কিন্তু তাকে দেখলে, এখনো মনে হয় না চল্লিশ পেরিয়েছে।

অবশ্য তার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দাও। ঠিক রেগুলার কলপটা পনেরো দিন অন্তর লাগিয়ে তবে আমি ওকে বাইরে বেরুতে দিই। কেউ বলতে পারবে না যে একদিন ওর মাথায় একটা সাদা রেখা দেখতে পেয়েছে।

আমিও সব দেখে নিয়েছি। এবার থেকে ঠিকমত লাগিয়ে দেবো। তখন সহদেব হাসতে হাসতে বলেন, জানেন বৌদিভাই, ওকে এতদিন বলিনি কথাটা। সেদিন আমার অপিসের বড়বাবু আমায় চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি দ্বিতীয়পক্ষ নাকি? গত বছর মুসৌরিতে আমরা যেদিন 'সিলভারটোন হোটেলে' যাই, উনি আমাদের দেখেছিলেন ওপরের ঘর থেকে। নিচে লনে তাঁর ট্যাকসি দাঁড়িয়ে, সেইদিন কলকাতায় ফিরবেন, তাই আলাপ করতে আসতে পারেননি।

তখন তুমি কি বললে? ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মলিনা।

বললুম ঠিকই ধরেছেন!

তোমার লজ্জা করল একটু? দেখছেন বৌদি কি বেহায়া পুরুষ? বলে মলিনা মিসেস সেনকে সালিশী মানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সহদেববাবু হাসি চেপে বলে উঠলেন, লজ্জা কি! ওটাতে বরং পুরুষের আরো গৌরব! এই বয়সেও ভালবেসে আর একজন মালা গলায় দিয়েছে। কি বলেন বৌদিভাই।

ভালবাসা না ছাই। বলে মুখে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে যান মলিনা ঘর থেকে।

সহদেববাবু যখন অপিস বেরোন, রোজই তাঁর হাতে সিগারেটের টিন আর পোর্টফোলিওটা দিতে এসে মুচকি হাসে মলিনা।

হাসছ যে!

হাসছি তোমায় দেখে। মাইরি বলছি, তুমি যখন অপিস থেকে আসো, তখন তোমায় ওই গলির মোড় থেকে দেখা যায়, আমার চোখে একেবারে সেই বিয়ের পরের ছবিটা ভেসে ওঠে, কতদিন ধরে বলছি, একটু কলপ লাগাও, তা আমার কথা তো কানে নেবে না। এতে লজ্জার কি আছে বুঝি না। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে এলে লোকে যেমন চশমা নেয় দাঁত পড়ে গেলে দাঁত বাঁধায় ফোক্‌লা মুখটা কাউকে দেখাতে চায় না, তাহলে এই চুলটার বেলায় যত অপরাধ হল। তোমায় এ বিরূপ মনোভাবের কোনো অর্থ হয়নি। যে যুগের যেমন হাওয়া। এই বলে একটু থেমে মলিনা বললে, তুমি বিশ্বাস করবে না একদিন লক্ষ্মীদির স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা লেকের ধারে, ওঁরা পাইকপাড়ার বাসা ছেড়ে উঠে এসেছেন কেয়াতলা লেনে—ছড়ি হাতে নিয়ে পায়জামা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে বেড়াচ্ছিলেন ঠিক যেন মনে হয় ইয়ংম্যান—মাথায় চুল যেমন কালো, দাঁতগুলো বাঁধানো, চোখে চশমা অথচ বয়েস খুব যদি কম হয়, তো পঁয়ষট্টির নিচে তো নয়ই বরং ওপরের দিকে। ও-মা তারপর একদিন রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হল, আমায় টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, ওষুধ কিনতে এসেছিলুম, স্বামী খুব ভুগছেন, এক মাস ধরে। বিশ্বাস করবে না, ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে দেখে অবাক। মাথার চুলগুলো সব সাদা, বাঁধানো দু'পাটি দাঁত খোলা, চোখে চশমা নেই—মনে হচ্ছে যেন একটা অতি বৃদ্ধ মানুষ শুয়ে আছেন।

PATHAGAR.NET

সহদেববাবু স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, এই জন্যেই তো এইসব 'ফল্‌স্' জিনিস ব্যবহার করতে চাই না।

আরে, একমাস ধরে যে লোকটা অসুস্থ বিছানায় তার মাথায় রং দেবে নাকি? তোমার যত উল্টো কথা।

আপিসের সহকর্মীরা প্রথমটা একটু ঠাট্টা-তামাসা করেছিল সহদেববাবুর সঙ্গে, কিন্তু কিছুদিন পরে অনেকেই এসে তাঁকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোন কলপ লাগান, নামটা একটু লিখে দিন না ভাই।

কিন্তু স্বামীর মাথার চুল কালো রেখে মলিনা খুশি হলে কি হবে, মনে মনে গজরাতে থাকেন সহদেববাবু ট্রামে-বাসে আসা-যাওয়ার সময়।

ভীড়ের মধ্যে আগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে নিজেরা দেহটাকে সঙ্কুচিত করে 'আপনি বুড়োমানুষ বসুন' বলে একটা জায়গা করে দিতো। কিন্তু এখন উল্টো বিপত্তি হয়েছে। কনুয়ের গোঁত্তা মেরে, ঠেলেঠুলে ওঁকে ভেতরের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলে, দেখতে পাচ্ছেন না, লোক বাইরে ঝুলছে, একটু ভেতরে চাপন না!

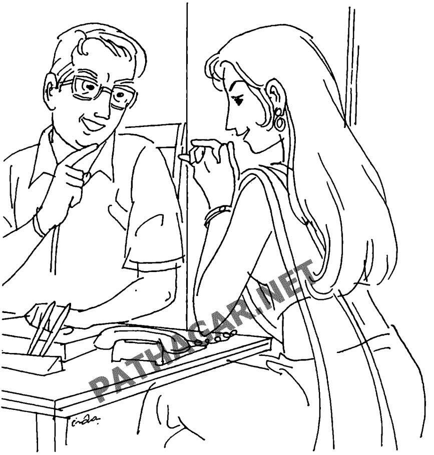

আর কত চাপবেন! চাপতে চাপতে এদিকে দেহটা যে চিঁড়ের মতো হয়ে গেছে। হাঁপ ধরে। যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

তাছাড়া মেয়ের পাশে খালি সিট থাকলে আগে যেমন মাথার পাকা চুলের দোহাই দিয়ে ঝুপ করে বসে পড়লে, মেয়েরা কেউ আপত্তি করতো না বরং কেউ ডেকে বসতে বলতো পাশে।

তাদের গায়ের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি লাগলেও কিছু মনে করতো না, এখন তাদের মনোভাব পাল্টে গেছে। তারাই ভাবে, যেন সুযোগগ্রহণকারী। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শ-সুখ লাভ করতে চান? একদিন একটি মেয়ে এক ট্রামভর্তি লোকের সামনে একরকম অপমানই করলে বলা যেতে পারে।

খুব ভীড়। অভ্যাসবশত একটি মেয়ের পাশেই শূন্য আসন দেখে তিনি ধপ করে বসে পড়লেন। যেমন বসা মেয়েটি তাঁর দিকে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলে উঠলো, মেয়েছেলের ঘাড়ের ওপরে যে বসছেন, দেখছেন না, 'লেডিস সীট' লেখা রয়েছে।

লজ্জা পেয়ে সহদেববাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন বটে কিন্তু সকলে যখন উল্টে তাঁর মুখের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল, তখন যেন বিনাদোষে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল এবং সারা পথটা তিনি মলিনার মস্তক চর্বণ করতে করতে এলেন। সত্যি কথা বলতে কি এক এক সময় ইচ্ছা করছিল, ঝাঁপ দিয়ে ট্রামের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে।

কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো সহদেববাবুর। শেয়ারের ট্যাক্সিতে চাপতে গিয়ে কোথাও আর সিট পান না। তিনি বুড়োমানুষ এগিয়ে বসার আগেই অন্য লোক টপাটপ উঠে পড়ে। শেষে একটা ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দেখেন সেটাতে চারজনই মেয়ে যাত্রী, বোধ হয়, আর একজন মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তিনি কাছে যেতেই একটি মেয়ে বলে, উঠুন আসুন।

ভেতরে উঠেই বিশেষ করে যে তরুণী মেয়েটির ঠিক গায়ের কাছে বসেছিলেন, কিসের যেন লজ্জায় নিজের দেহটাকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিতে থাকেন সহদেববাবু। এই সময় হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে, আপনি ভাল হয়ে বসুন।

একটু অবাক হয়ে সহদেববাবু মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালেন। সেদিনের ট্রামের সেই মহিলাটির অপমানের কথা বুঝি আজো ভোলেননি। সে ছিল বিবাহিতা। এর চেয়ে কেবল বয়েসই বেশি নয়, দেখতেও কুৎসিত। আর এই মেয়েটি কুমারী, সুশ্রী, তরুণী। তাঁর সঙ্গে গায়ে গা দিয়েই সারাটা পথ এলেন। মেয়েটির মুখে কোথাও কোনো বিরক্তির রেখা না দেখে হঠাৎ একবার মনে উদয় হল, বোধহয় তাঁর মাথার চুল কালো বলে মেয়েটি ভেবেছে 'ইয়ংম্যানদের' প্রতি 'ইয়ং' মেয়েদের যে সহজাত আকর্ষণ থাকে, বোধহয় তাই, নইলে এত লোক থাকতে তাকে ডেকে পাশে বসাবে কেন?

এই সময় সহদেববাবু হেড অপিস থেকে খিদিরপুরের ব্রাঞ্চ অপিসের ম্যানেজার হয়ে এলেন।

স্ত্রীর কাছে এই পদোন্নতির সংবাদ দিতে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং স্পষ্টই বলে ফেললেন, এর জন্যে সব 'ক্রেডিট' বৌদির। সেদিন যদি তিনি তোমার চুলটাকে এইভাবে কালো করে না দিতেন, তাহলে বুড়োমানুষকে কেউ এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কি বসাতো? সবাই জানে বুড়োকে দিয়ে কাজ বেশি হয় না।

অবশ্য তখন থেকে নিয়মিত মলিনা সহদেববাবুর চুলে কলপ দিয়ে যাচ্ছিল। একদিনের জন্যেও তার একাজে ত্রুটি হয়নি।

নতুন অপিসে সহদেববাবুর জন্যে যেমন কাঁচঘেরা নিজস্ব সুন্দর ঘর, তেমনি তাঁর নিজস্ব পি.এ. মিস চ্যাটার্জি। সুশ্রী তরুণী তন্বী ছিপছিপ গঠন। নিত্যনতুন বেশভূষা করে তাঁর পাশে এসে বসে। সহদেববাবুর ওই ছোট্ট ঘরে সে যেন একটা জাগ্রত বসন্তের প্রতীক।

মিস চ্যাটার্জি আধুনিকা কেবল নন, অতি সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না। অতি সূক্ষ্ম জর্জেটের শাড়ি পরে আসেন। ঘরে ঢোকামাত্র তার গা থেকে দামী পাউডার ও এসেন্সমিশ্রিত একঝলক সুগন্ধ যেন সহদেববাবুর মুখের ওপর আছড়ে পড়ে তাঁকে কেমন উন্মনা করে তোলে! হালকা পেন্ট করা মুখ, কাজল টানা চোখে ও মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত ঈষৎ উঁচু, কথা কইতে গেলে পাতলা ঠোঁটের আড়াল থেকে আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সহদেববাবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু অবসর পান মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে গল্প করেন। খুব ভাল লাগে, ওর মুখের কথাগুলো। তার এই ফুলের পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট ও মুক্তোর মতো দাঁতগুলির স্পর্শে ভরা ওর মুখের কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন গিলে খেতে ইচ্ছা করে সহদেববাবুর।

ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সহদেববাবুর। 'ওভারটাইম' কাজের ছুতোয় ছুটির পরও দু' ঘণ্টা একসঙ্গে অপিসে কাটান। তারপর বাড়ি ফেরার পথে কখনো কখনো, তাকে নিয়ে বিলিতি ঢঙের কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে ঢোকেন।

খাওয়াটা উপলক্ষ্য, মুখ্যত তাকে কাছে পাওয়া, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, একথা মিস চ্যাটার্জিও জানে। কাজের উন্নতির আশায় মাঝে মাঝে তার জন্যে সহদেববাবুকে প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এইরকম রুচিসম্পন্না আধুনিকার প্রীতিলাভে সহদেববাবুর জীবন যেন ধন্য মনে হয়।

এদিকে, মলিনার সন্দেহ দেখা দেয়। একই প্রশ্ন রোজই করে সে। এত দেরি হবে ফিরতে বলে গেলেই পারো।

অপিসে কাজ, বেশি কম, আগে থেকে কি জানা যায়। জরুরী কাজ এলে শেষ না করে তো আসা যায় না।

সেদিন যখন সহদেববাবু রাত করে বাড়ি ঢুকলেন, তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই কেমন একটা সুগন্ধ যেন নাকে এসে লাগল মলিনার। সহদেববাবুর জামাটা চট করে শুঁকে সে প্রশ্ন করলে, এসেন্স মেখেছো নাকি?

সেকি। না কেমন যেন থতমত খেয়ে যান সহদেববাবু।

মলিনার কিন্তু ভুল হয় না সে গন্ধ চিনতে। ওই দামী এসেন্সটা একদিন তার খুব প্রিয় ছিল। ইদানীং দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে।

PATHAGAR.NET

সেদিন কি জানি কেন, সারারাত তার চোখে ঘুম এলো না। পরদিন হঠাৎ তার পিসতুতো ভাই এসে খবর দিলে, দিদি জামাইবাবুকে সেদিন দেখলুম মেট্রোতে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ছবি দেখতে গেছেন। ও মেয়েটি কে গো?

কিরকম দেখতে বলতো?

খুব সুন্দর। যেমন লতানে চেহারা তেমনি বেশভূষা। আমি ছিলুম দোতলায়। আসতে আসতেই ওরা বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে কোথায় গেল!

আর বেশি কিছু বলতে হল না। কালকের সেই সুগন্ধ এসেন্সের ইতিহাসটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিসতুতো ভাই চলে যেতেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। এরপর মলিনা দু'-তিনদিন বেশ গম্ভীর হয়ে রইলো। স্বামীর সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত কইলে না। ঠিক তিনটে দিন পরে সহদেববাবু বললেন, আজ আমার কলপ্ দেবার দিন মনে আছে।

আছে। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে মলিনা।

কিন্তু শিশিটা তো দেখতে পাচ্ছি না। বাথরুমের শেলফ-এ ছিল, কোথায় গেল বলো তো?

মলিনা বললে, নর্দমায়।

সেকি! কে ফেললে?

আমি ভেঙে ফেলে দিয়েছি।

তার মানে?

তার মানে আজ থেকে আর কোনোদিন তুমি ওটা মাথায় দেবে না।

কিন্তু তাহলে চুলগুলো আবার সাদা হয়ে যাবে যে। লোকে কি মনে ভাববে। বিশেষ করে অপিসে—

দৃঢ়স্বরে মলিনা বললে, আমি তাই চাই। বিশেষ করে অপিসের লোকেরা তোমার স্বরূপ চিনতে পারবে। আসলে তুমি যে বৃদ্ধ সেটা আমি জানাতে চাই। অপিসের মেয়েদের।

বলতে বলতে কান্না চাপতে না পেরে একেবারে স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল মলিনা। আমি নিজের সর্বনাশ নিজে হাতে করেছি বুড়োমানুষের চুলে কালো রং দিয়ে তাকে যুবক সাজাতে গিয়ে। আমার ভুল আজ বুঝতে পেরেছি। সহদেববাবু হতভাগ্যের মতো চেয়ে থাকেন। স্ত্রীকে কি বলবেন ভেবে পান না।

PATHAGAR.NET

মহেশ্বরবাবু
বিমল মিত্র

আজও মাঝে মাঝে ভাবি এইসব মানুষগুলো গেল কোথায়? এই মহেশ্বরবাবুর মতো মানুষ? আর কি তাঁরা এ-যুগে জন্মাবেন না?

মনে আছে বাড়ির সামনের রাস্তায় হয়ত আমরা খেলা করছি, মহেশ্বরবাবু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে থেমে গেলেন। মাথার ছাতি, পায়ে মোজার ওপর ফিতে-বাঁধা জুতো, জামার বোতামের ফুটোর সঙ্গ চেন দিয়ে বাঁধা ঘড়িটা বুক পকেটের ভেতর রাখা।

খুব মোলায়েম গলায় বলতেন—কী বাবারা, খেলছো?

প্রবীণ লোকের সামনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে খেলা বন্ধ করতাম।

—আমাকে খেলতে নেবে বাবা তোমরা?

আমরা আর কী বলবো। চুপ করে থাকতাম। তিনি খানিকক্ষণ আমাদের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার তাঁর নিজের অফিসের দিকে চলতে আরম্ভ করতেন।

এ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল মহেশ্বরবাবুর। নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক মাইলটাক দূরে তাঁর নিজের দফতরে গিয়ে বসতেন। বেশ গণ্যমান্য ভদ্রলোক। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার উপর ছেলেরা বড় হয়েছিল। তাঁরাই তাঁর বেশির ভাগ কাজ-কারবার দেখতো। তিনি গাড়িতেও চড়তেন না, কোনোরকম বিলাসিতাও করতেন না। দশটা কমিটির প্রেসিডেন্ট, কুড়িটা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, আর দান-ধ্যান চ্যারিটির সীমা-সংখ্যা ছিল না।

এ-সব কথা আমাদের পাড়ার সবাই-ই জানতো।

চাঁদা চাইতে গিয়ে কখনও কেউ তাঁর কাছ থেকে জীবনে খালি হাতে ফিরে আসেনি। আর শুধু চাঁদা কেন, যা চাইবেন তিনি তাই-ই দেবেন। কারো ছেলের একজামিন দেওয়া আটকে গেছে টাকার অভাবে, তাঁর কাছে যাও, তিনি জিজ্ঞেস করবেন—কত টাকা দরকার?

আপনি বলবেন—আশী টাকা—

তা শুনে দ্বিরুক্তি করবেন না। পাশের ঘরে তাঁর মুহুরি হরিশবাবু এসে থাকতো। সেই হরিশবাবুকে ডেকে আশীটা টাকা দিতে বলতেন।

তারপর টেলিফোন। তখন এ-তল্লাটে কারো বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। এ তল্লাটের সমস্ত লোকদের কাজে-অকাজে মহেশ্বরবাবুর অফিসে গিয়ে টেলিফোন

PATHAGAR.NET

করতে দেবার ঢালোয়া অর্ডার দেওয়া ছিল। হরিশবাবুর কাউকে সে-ব্যাপারে 'না' বলবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু একবার একটা ব্যাপারে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

সেইটেই বলি।

বাবার কাছে শুনতাম মহেশ্বরবাবুর অবস্থা চিরকাল এমন ছিল না। বাদামতলার টিনের বস্তিতে দু'খানা ঘর নিয়ে মহেশ্বরবাবু আর তাঁর মা থাকতেন। মহেশ্বরবাবুর মা মুড়ি ভাজতেন, আর কাগজের ঠোঙা তৈরি করতেন। সেই ঠোঙা আর মুড়ি মহেশ্বরবাবু দোকানে গিয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় চাল কিনে আনতেন। তবে ভাত রান্না হত।

কী করে সেই লোক এত টাকার সম্পত্তি করলেন সে এক বিচিত্র ইতিহাস। এ গল্পে সে-কাহিনী অবান্তর। বড়লোক হয়েছিলেন এইটেই বড় কথা। ছেলেরা বিরাট বিরাট গাড়ি নিয়ে অফিস ফ্যাক্টিরিতে যেত। কিন্তু মহেশ্বরবাবু আর গাড়ি চড়তেন না।

বলতেন—ওরা বড়লোকের ছেলে, ওরা তো গাড়ি চড়বেই, কিন্তু আমার বাবা গরীব ছিল; আমি গাড়ি চড়বো কোত্থেকে?

বাদামতলায় দু'-দুটো বড় বড় ছেলেদের হাই স্কুল। একটা মেয়েদের। সবগুলোর প্রেসিডেন্ট তিনি। তারপর জমিদার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তারপর কলকাতার রাইস ডিলার্স সিন্ডিকেটের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। আর ক'টা প্রতিষ্ঠানের কী কী ছিলেন তার তালিকা তিনি জানতেন। বাইরের লোকেরা অত জানতেও পারতো না। তবে যে যখন মহেশ্বরবাবুর কাছে গেছে, দেখেছে একগাদা গণ্যমান্য লোক তাঁকে ঘিরে কথাবার্তা বলছে।

তারই মধ্যে সব দিকে নজর ছিল মহেশ্বরবাবুর।

হঠাৎ হয়ত একটা বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

—বলরাম, বলরাম আছো নাকি হে?

বলরামবাবু বাদামতলার কেরানি জাতীয় মানুষ। ছাপোষা গেরস্থ বাঙালি মাসকারবারী মাইনে ভরসা করে ভদ্রতা বজায় রাখে। ডাক শুনে বাইরে এসে অবাক।

বললে, মহেশ্বরবাবু আপনি?

—আমার কথা থাক, বলি তোমার ছেলে কেমন আছে?

বলরামবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। বললে, আমার ছেলের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, তোমার বাড়িতে এসে তোমার ছেলের কথা বলবো না তো কি আমার ছেলের কথা বলবো? রোজ দেখি রাস্তায় বল খেলে। আজকে দেখলুম সবাই আছে, তোমার ছেলে নেই। জিজ্ঞাসা করতেই ওরা বললে, নিরঞ্জনের জ্বর হয়েছে—

বলরামবাবু কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেল।

PATHAGAR.NET

বললে, আজ্ঞে এখনও তো জ্বর রয়েছে—

—ডাক্তার? কোন ডাক্তারকে দেখাচ্ছে?

—আজ্ঞে, এখনও ডাক্তার ডাকিনি। মানে...

মহেশ্বরবাবু বললেন, ও, বুঝতে পেরেছি—

বলে আর দাঁড়ালেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনি আবার রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

জিনিসটা স্পষ্ট হল ঘণ্টা কয়েক পরে। হঠাৎ বাইরে নুটু ডাক্তার এসে হাজির।

বলরামবাবু তখন ছেলের অসুখের জন্যে অফিস থেকে সকাল-সকাল বাড়ি এসেছেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে অবাক।

—ডাক্তারবাবু আপনি?

নুটু ডাক্তার গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে ঢুকে বললে, আরে, নিরঞ্জনের অসুখ আপনি তো বলেননি। বড়বাবু আমাকে টেলিফোন করে করে অস্থির—

—বড়বাবু?

বলরামবাবু বুঝতে পারলে না।

—আরে ওই আমাদের মহেশ্বরবাবু। দুপুরবেলাই আমার বাড়িতে দারোয়ান পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন, বলরামবাবুর ছেলের অসুখ, তাকে গিয়ে দেখে আসতে হবে। আমি তখন একবার শ্যামবাজারে একটা রোগী দেখতে গেছলাম, তারই মধ্যে পাঁচবার তাগাদা এসে গেছে। তা কোথায়? আপনার ছেলে কোথায়? কী হয়েছে, কী?

ছেলেকে দেখে পরীক্ষা করে নুটু ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেল। ভিজিটের টাকাও নিলে না, প্রেসক্রিপশনখানাও দিয়ে গেল না। যথারীতি ওষুধের দোকান থেকে লোক এসে ওষুধের মিকশ্চার দিয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড দেখে বলরামবাবুও অবাক, বলরামবাবুর গৃহিণীও অবাক।

ছেলে যখন সেরে উঠলো, বলরামবাবু তখন একদিন গেলেন মহেশ্বরবাবুর দফতরে। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, অনেক বড় বড় লোক এসে তাঁকে ফিরে বসে কথাবার্তা বলছে।

বলরামবাবুকে দেখে মিটিং থামিয়ে মহেশ্বরবাবু বললেন, এই যে বলরামবাবু, কী খবর? ছেলে কেমন আছে?

বলরামবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, আজ্ঞে সেই কথা বলতেই আমি...

কিন্তু মহেশ্বরবাবু অন্য একজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এই দেখুন মিস্টার ঝুনঝুনলাল, দেখেছেন এই বাঙালির কাণ্ড? নিজের ছেলে অসুখ করেছে, একবার ডাক্তার পর্যন্ত ডাকেনি। শেষকালে যখন...

PATHAGAR.NET

ঝুনঝুনলাল পাগড়ি দুলোতে দুলোতে বললে, আপনিও ভি তো বাংগালি মহেশ্বরবাবু—

মহেশ্বরবাবু বললেন, আরে আমার কথা ছেড়ে দাও ঝুনঝুনলাল, আমি কি একটা মানুষ নাকি? আমি একটা গোমুখ্য, আমি মানুষও না বাঙালিও না—

বলরামবাবু আর সেখানে দাঁড়াননি সেদিন। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে এসে বেঁচেছিলেন।

আসবার সময় মহেশ্বরবাবু বলেছিলেন, আমি না হয় মশাই গোমুখ্য মানুষ, কিন্তু আপনারা তো বিদ্বান, বি-এ পাশ করেছেন সব। তা এই কি তার নমুনা?

স্কুল কমিটির মিটিং হচ্ছে। মেম্বাররা সবাই টেবিলের চরিদিকে ঘিরে বসে আছে। মহেশ্বরবাবু প্রেসিডেন্ট। নানা তর্কবিতর্ক চলছে। হঠাৎ মিটিং-এর মধ্যেই উঠে পড়লেন মহেশ্বরবাবু। বললেন, আমি আসছি হে, তোমরা বসো—

বলে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে কম্পাউন্ডের মাঠে নেমে এলেন। দেখলেন ক্লাস ওয়ানের দুটো ছেলে খেলা করছে।

কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে খেলতে নেবে ভাই তোমাদের সঙ্গে?

ছেলে দুটো তো লজ্জায় জড়োসড়ো। ছেলেরা চিনতো মহেশ্বরবাবুকে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট তাদের সঙ্গে মজা করতে চাইছে। আসলে খেলার ইচ্ছে নেই তার।

কমিটির মেম্বাররা তখন তর্ক লাগিয়েছে অফিস-ঘরের ভেতরে। মাস্টারমশাইদের মাইনে বাড়াতে গেলে ছাত্রদেরও মাইনে বাড়াতে হয়। এই সব নিয়েই আলোচনা। যেদিনই কমিটির মিটিং হয় সেদিনই তর্ক বাধে মেম্বারদের মধ্যে। কেউ বলে ছাত্রদের মাইনে বাড়াতে হবে, কেউ বলে, না। একটা-না-একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে থাকবেই—

মহেশ্বরবাবু বলেন, তোমরা এত ঝগড়া করো কেন বলো তো বাবা? আমি তো জানতুম যারা লেখাপড়া করে না তারাই ঝগড়া করে। ঝগড়া করবো আমরা, যারা লেখাপড়া জানি নে। তোমরা তো সব শিক্ষিত মানুষ হে।

যোগজীবনবাবু বলেন, আপনি জানেন না মহেশ্বরবাবু, আজকাল এডুকেশনটাও একটা ব্যবসা হয়ে গেছে।

মহেশ্বরবাবু বললেন, ওই তোমাদের এক বদ্ অভ্যেস, তোমরা কথায়-কথায় কেবল ইংরাজি বলবে, এডুকেশন মানেটা কী? আমাকে বাংলায় বুঝিয়ে বলো—

তখন সবাই চুপ হয়ে যেত।

মহেশ্বরবাবু বলেন, দেখ বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, তোমাদের মতো ছেলে-ছোকরা নই, ছোটবেলায় মাথায় মোট বয়ে নিয়ে চিড়েহাটায় গিয়ে বেচে এসেছি। লেখাপড়ার নামগন্ধ নেবার সময় পাইনি। কিন্তু মুখ্যসুখ্য মানুষ হয়ে কখনও তো দরদাম নিয়ে

পাইকারদের সঙ্গে ঝগড়া করিনি। পাইকাররা যে-দামে দিয়েছে তাই নিয়ে ট্যাঁকে পুরে মার হাতে এনে দিয়েছি। কই, লেখাপড়া শিখিনি বলে তো তারা আমাকে কখনও ঠকায়নি—

যোগজীবনবাবু বললেন, আপনাদের সে-যুগ অন্যরকম ছিল মহেশ্বরবাবু—

মহেশ্বরবাবু বললেন, আরে বাবা, তখন কি আমাদের চারটে করে হাত-পা ছিল যে সে-যুগ অন্যরকম হতে যাবে? তখন আমরা ভাত খেতাম, এখনও খাই। তখনও দুটো হাত ছিল, এখনও দুটো হাত আমাদের—আমি বলি কি ছেলেদের মাইনে বাড়িয়ে কাজ নেই—

ডাক্তারবাবুও কমিটির মেম্বার। তিনি বললেন, তাহলে মাসে-মাসে সাত হাজার টাকার লস্ কী করে মেক-আপ হবে?

মহেশ্বরবাবু বললেন, ওই আবার তোমাদের এক বদ অভ্যেস, কথায়-কথায় তোমাদের কেবল ইংরাজি। আমি মুখ্যু মানুষ, অত ইংরাজি বললে বুঝবো কী করে? বাংলায় বলো না হে। তোমরা তো বাঙালির ছেলে হে ডাক্তার—

হঠাৎ বুঝি সকলের খেয়াল হল মহেশ্বরবাবু নেই। কোথায় গেলেন? এতক্ষণ বাইরে কোথায় আছেন?

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল মহেশ্বরবাবু কম্পাউন্ডের মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'জন ছেলের সঙ্গে একমনে বল খেলছেন।

যোগীনবাবু নিচেয় নেমে সামনে গেলেন।

PATHAGAR.NET

বললেন, স্যার আপনি এখানে বল খেলছেন, আর এদিকে আমরা কোনো ডিসিশন্ নিতে পারছি না, আপনার জন্যে কখন থেকে ওয়েট করছি—

মহেশ্বরবাবু তেমনি বল লোফালুফি করতে করতেই বললেন, তোমাদের কথা আমি বুঝতেই যখন পারি না তখন আমাকে সভাপতি কেন করলে বাবা? তোমরা তো জানো আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ, তোমাদের ইংরাজি-ফিংরিজি আমার মাথায় ঢোকে না—

ডাক্তারবাবু বললেন, তা কি হয় স্যার, আপনাকে বাদ দিয়ে কি কিছু হয়?

মহেশ্বররাবু বললেন, খুব হয়, হয়। ওসব কাজ আমাকে বাদ দিয়েই ভালো হয়। আমাকে বরং এখানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে বলো, তা আমি খুব পারবো—

বলে ছেলে দু'জনের সঙ্গে তেমনি একমনে আবার বল খেলতে লাগলেন।

কমিটির মেম্বাররা কোনো উপায় না দেখে এর-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

তা এই হলেন আমাদের বাদামতলার মহেশ্বরবাবু। মহেশ্বর আঢ্য। বাদামতলার যাবতীয় লোক এই মহেশ্বরবাবুকে রাস্তায় দেখলে, হাত জোড় করে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করতো।

বলতো—মানুষ নন মহেশ্বরবাবু, দেবতা—দেবতা—

এককালে মাথায় করে মোট বয়ে নিয়ে চিঁড়েহাটায় বিক্রি করেছেন। তখন বিধবা মা নিজের হাতে কাগজের ঠোঙা তৈরি করেছেন। মুড়ি ভেজেছেন। সেই টিনের চালের মাটির বাড়ি থেকেই বলতে গেলে শুরু। তারপর আস্তে আস্তে টাকা হয়েছে। তিনি বিয়ে করেছেন। ছেলেমেয়ে হয়েছে। সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দু'মহলা বাড়ি করেছেন। বেহার-উড়িষ্যায় জমিদারি করেছেন। আসামে চা-বাগান কিনেছেন। শেয়ার মার্কেটে লোহা পাট চায়ের শেয়ার কিনেছেন। তিন ছেলের জন্যে তিনখানা মটর গাড়ি কিনেছেন। নিজেও নানা জায়গায় সভাপতি হয়েছেন, ম্যানেজিং এজেন্ট হয়েছেন। তাঁর নামেও নানা কারবারের লেনদেন চলছে। কিন্তু নিজে তিনি যে-কে-সেই। সেই শার্ট, ফিতে বাঁধা জুতো, আর খাটো ধুতি। হাতে ছাতা। সেই পোশাকে তিনি কোম্পানির ডিরেক্টার-বোর্ডের মিটিং-এ যাচ্ছেন, আবার সেই পোশাকেই তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের দফতরে গিয়ে বসছেন।

বলতে গেলে ওই দফতরটাই ওঁর সব। হরিশবাবু পাশের ঘরে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে নিজের কাজ করে।

ওখানে আসে উমেদাররা। কারো মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা চাই। কারো ছেলের চাকরি। কেউ ইস্কুলে ফ্রি-শিপ চায়। কেউ বা শুধু অর্থসাহায্য। খেতে পাচ্ছি না, পরতে পাচ্ছি না, এমনি আর্জি।

ভবদুলাল বড় ছেলে। কাছে আসতে ভয় পায়। নেহাৎ জরুরি দরকার না থাকলে কাছে আসে না। দফতরে ভবদুলালকে দেখে মহেশ্বরবাবু অবাক।

PATHAGAR.NET

—তুমি? তুমি আবার এখানে কেন? কী চাই?

ভবদুলাল কাঁচমাচু হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে বলে, আসামের একটা টি-গার্ডেন কিনবো, সাতেরো লাখ চাইছে, তাই আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতাম—

—আমার সঙ্গে পরামর্শ?

বলে ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি তোমায় কী পরামর্শ দেব? তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছি, তোমরা এখন লয়েক হয়েছে, তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমাকে ওর মধ্যে টানছো কেন?

তাঁর পাশে বসেছিলেন পলাশবাড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুরলীধর পাণিগ্রাহী সাহেব। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন পাণিগ্রাহীবাবু, ছেলের কথা শুনলেন? সতেরো লাখ টাকা খরচ করবে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করছে। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি পরামর্শ দেব, তবে উনি কারবার করবেন, শুনছেন ছেলের কথা? লেখপড়া শিখে এই বিদ্যে হয়েছে?

মিস্টার পাণিগ্রাহী বললেন, তা জিজ্ঞেস করবে বৈকি, আপনি এতদিনের ঘা-খাওয়া সরকারী—

—অ্যাই, তবেই হয়েছে। আপনি তাহলে আমাকে খুব চিনেছেন! আমি কারবারী কোথায় মশাই? কারবারে খুব টাকা উপায় করলেই কারবারী হয়ে গেলুম? কারবারী বলতে আমি গাধার মতন খেটেছি। গাধার মতন খাটলেই যদি মস্তবড় কারবারী হওয়া যেত তো আর ভাবনা ছিল না। মুখ্যু মানুষ ছিলুম, না খেটে করবোটা কী? তাই কেবল গাধার মতন খেটেই গিয়েছি। আর কোত্থেকে যে হুড়-হুড় করে টাকা এসে গেছে তার টেরও পাইনি। যখন থিতিয়ে একটু বসলুম, দেখি কখন গাদা গাদা টাকা ব্যাঙ্কে জমে গেছে—

মিস্টার পাণিগ্রাহী বললেন, তা বললে শুনবো না মিস্টার আঢ্য, আপনাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, ব্রেন খাটাতে হয়েছে—শুধু টাকা আসে না।

মহেশ্বরবাবু বললেন, আরে রামোঃ, বুদ্ধি পাবো কোথায় যে খাটাবো? লেখাপড়া না জানলে বুদ্ধি হয় মানুষের? নিজের কিছু হয়নি বলেই তো ছেলেদের জন্যে দামী দামী মাস্টার রেখেছিলুম।

তারপর ভবদুলালের দিকে চেয়ে বললেন, কী, দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও যা পারো নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করো গে—

ভবদুলাল তখনও দোনা-মোনা করছিল। বললে, অতগুলো টাকা...তাই...

মহেশ্বরবাবু বললেন, তা অতগুলো টাকা লোকসান যায় যাবে। ও-টাকা তোমারও নয়, আমারও নয়। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই আবার না-হয় নিয়ে নেবেন—এখন যাও—

PATHAGAR.NET

ভবদুলাল অগত্যা আর দাঁড়ালো না, চলে গেল।

সেদিন রাত্রে বাড়িতে গিয়ে মহেশ্বরবাবু গৃহিণীকে ডেকে বললেন, জানো, তোমার বড় ছেলের কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। ভেবেছিলুম, আমি না-হয় মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমার একলারই বুঝি-বুদ্ধি নেই, এখন দেখছি, ভবদুলাল অতগুলো পাশ করেছে, কিন্তু বুদ্ধি-সুদ্ধি একবারে কিস্যু নেই—

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, কেন? ও-কথা বলছ কেন?

মহেশ্বরবাবু বললেন, দেখ, সতেরো লাখ টাকা দিয়ে একটা চা-বাগান কিনবে, তাতেও ভয় পাচ্ছে, যদি লোকসান যায়। আবার আমার দফতরে গেছে আমাকে জিজ্ঞেস করতে—

অথচ এই মানুষেরই আবার কত শোক-তাপ, বিপদ-আপদ গেছে। তখনও লোকে মহেশ্বরবাবুকে দেখেছে। তখনও সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে শাদা সার্ট, খাটো ধুতি, মাথায় ছাতি আর মোজা-পরা পায়ের ওপর ফিতে-বাঁধা জুতো পরে গলির মধ্যে দিয়ে দফতরে দিকে চলেছেন।

পাড়ার রাস্তার ওপর ছোট-ছোট ছেলেরা খেলা করছিল। মহেশ্বরবাবুকে দেখেই তারা খেলা থামিয়ে দিলে।

মহেশ্বরবাবু যথারীতি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, খোকা, আমাকে নিয়ে খেলবে বাবা তোমরা?

ছেলেরা লজ্জায় সঙ্কোচে জড়ো-সড়ো হয়ে খেলা বন্ধ করে দিলে। তিনিও তাদের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আবার নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে চলতে লাগলেন।

একবার বেশি বয়েসে এক মেয়ে মারা গিয়েছিল, সেবারও যা, যেবার গৃহিণী মারা গিয়েছিলেন সেবারও তাই। কোথাও কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। সেদিনও নিয়ম করে সকাল থেকে সমস্ত কাজ করে গেছেন। যারা প্রার্থী হয়ে এসেছিল, হরিশবাবুকে বলে, তাদের টাকা দিয়েছেন। কেউ কখনও তাঁর কাছে কিছু চেয়ে খালি হাতে ফিরে যায়নি।

কিন্তু একদিন শুধু আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনাটা বলবার জন্যেই এই গল্পটা লেখা।

বহুকাল বাইরে কটিয়ে সেদিন আবার বাদামতলায় ফিরেছি। শুনলাম মহেশ্বরবাবু নাকি হঠাৎ একদিন মারা গেছেন। মারা যাবার পর বাদামতলার সমস্ত মানুষ নাকি হাহাকার করে উঠেছিল তাঁর শোকে। মানুষ এ পৃথিবীতে অনেক আসবে যাবে, কিন্তু মহেশ্বরবাবুর মতো মানুষ কোন দেশে কটাই বা জন্মায়।

কিন্তু তখন আমার কেবল মনে পড়ছিল, সেই একদিনের ঘটনা, যখন তিনি একজনকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মনে আছে, তখন আমি কলেজে পড়ি। এক-কথায় বেশ বড়-সড় হয়েছি। স্কুলের ক্লাস নাইনের ছেলে নিরঞ্জনের ভাই পঙ্কজকে নিয়ে আমি মহেশ্বরবাবুর কাছে গেলাম।

মহেশ্বরবাবু আমাকে দেখে বললেন, কী চাই বাবা, এটি কে?

বললাম—বলরামবাবুকে তো চেনেন, আমাদের পাড়ার? তাঁরই ছোট ছেলে—

—বেশ, তা ওর কী দরকার?

বললাম—ও আপনার কাছে লজ্জায় একলা আসতে পারছিল না, তাই আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওকে ক্লাস টেনে উঠতে দিচ্ছে না, অঙ্কেতে ফেল করেছে।

মহেশ্বরবাবু পঙ্কজের দিকে চাইলেন। বললেন, কেন বাবা, অঙ্কেতে ফেল করেছে কেন? দিনরাত বুঝি খেলা করে বেড়িয়েছে?

পঙ্কজ মুখটা করুণ করে বললে, আমার অসুখ করেছিল, পড়তে পারিনি—

মহেশ্বরবাবু রেগে গেলেন। বললেন, অসুখ করলে আর কী করেই বা পড়তে পারবে বাবা! তা তোমার বাবাও যেমন। একটা ডাক্তার দেখাবে না। তা আমাকে খবর দিলেই হত, আমি নুটু ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিতুম।

তারপর বললেন, তা এখন কী করতে হবে আমায়?

বললাম—আপনি স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি একটু হেড-মাস্টারমশাইকে বলে দেন তো ওকে ক্লাসে উঠিয়ে দেবেন।

মহেশ্বরবাবু বললেন, ঠিক আছে, আমি বলে দেব'খন, তুমি আসছে সপ্তাহে একদিন এসো।

বলে আমরা চলে এসেছিলাম। পরের সপ্তাহে একদিন পঙ্কজ একলাই গেল। বললে, জ্যাঠামশাই, আমার কী হল? আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

তখন বোধ হয় মহেশ্বরবাবু খুব ব্যস্ত ছিলেন। কোথাও যাচ্ছিলেন কারো সঙ্গে জরুরি কাজে।

পঙ্কজকে দেখেই বিষয়টা মনে পড়ে গেল তাঁর। বললেন, হ্যাঁ বাবা, তোমার কথা আমি হেডমাস্টারমশাইকে বলেছিলুম। কিন্তু শুনলুম তুমি তো বাবা ম্যাথামেটিক্‌সেও ফেল করেছ। তুমি অঙ্কেও ফেল করেছ, আবার ম্যাথামেটিক্‌সেও ফেল করেছ। দুটো বিষয়ে ফেল করলে আমি কী করে তোমাকে ক্লাসে ওঠাতে বলবো? তুমি আবার মন দিয়ে পড়—

বলে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর দাঁড়ালেন না।

তাই আজ ভাবি এই সব মানুষগুলো গেল কোথায়? এই মহেশ্বরবাবুর মতো মানুষ। আর কি দেশে এ সব মানুষ জন্মাবেন না?

PATHAGAR.NET

অবশেষে

প্রতিভা বসু

সুকুমারবাবু পাড়ার রমণীমোহন। তেরো থেকে তেত্রিশ বছর বয়স অবধি সকল মেয়েদেরই তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

তাঁর নিজের বয়স কত কেউ জানে না—যার যে-যেরকম পছন্দ অনুমান করে নেয়। তেত্রিশ বছর বয়েসের মহিলারা বলেন, 'অন্তত পক্ষে চল্লিশ—' কুড়ি থেকে তেইশেরা বলেন 'কক্‌খনো অত না—বড়ো জোর পঁয়তিরিশ—' আর নিচের মেয়েরা বলে, 'সুকুমারদার আবার বয়স কী, তিনি আমাদের চিরতরুণ বন্ধু।'

শুধু বয়সই না—আরো রহস্য অছে তাঁর। তিনি কি চিরকুমার, না বিপত্নীক? না কি তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন? এ নিয়েও পাড়ায় মাথা খাটানো হয়, কিন্তু এই রহস্যের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কোনো দুঃসাহসী মেয়ে (কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে যার বয়স) তাঁকে এই প্রশ্নটি করেছিল। সুকুমারবাবু হেসে বললেন, 'স্বামী হবার যোগ্যতা আমার আছে নাকি?'

মেয়েটি বলল, 'এত যিনি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনিই যদি কোনো মেয়ের স্বামী না হবেন, তাহলে কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা।'

'প্রেমিক যে, সে প্রেমিকই—সে কারো স্বামী নয়।'

এ-কথা থেকে কী প্রমাণিত হলো? কিন্তু তবু সকলেই ভেবে নিলে, তিনি চিরকুমার। আর বলাই বাহুল্য, অবিবাহিত পুরুষের প্রতি মেয়েদের একটা স্বাভাবিক করুণা আছে। সকলের সমাদরে তিনি স্ত্রীলোকবর্জিত জীবনেও বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গ লাভে ধন্য হলেন।

আসলে সুকুমারবাবুর চেহারাখানা ভারি সুন্দর। লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন—একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটি একেবারে খাঁটি প্রেমিকের মতো! এই চোখ তিনি দরকার-মতো ব্যবহার করেন। যে-বয়েসের মেয়ের উপর যে-ভাবে দৃষ্টিপাত দরকার তা তিনি ঠিক জানেন। মহিলাদের কাছে গেলেই তাঁর চোখ আনত হয়, মুখের দিকে প্রায় তাকানই না বলতে গেলে—যুবতীদের সঙ্গে আবার এই চোখই ঘন-ঘন মিলিত করেন তিনি—আর যারা ছেলেমানুষ তাদের সঙ্গে চটুল, সস্নেহে—যখন যে-রকম করলে কাজ আদায় হয় তা-ই করেন।

থাকেন একটি ছোট ফ্ল্যাটে, একটি চাকর নিয়ে। প্রায়ই চাকরটির রান্না করতে হয় না—

PATHAGAR.NET

এ-বাড়ি থেকে দই-মাছ, ও-বাড়ি থেকে আলুর দম, বিকেলবেলা সিঙাড়া—এ রকম পালাক্রমে রোজই প্রায় কোনো-না-কোনো বাড়ি থেকে কিছু আসেই।

একটি নতুন মেয়ে এলো পাড়ায়। মেয়েরা মুখে-মুখে বলাবলি করতে লাগল তার কথা। কেউ বলল, 'হাজার হোক, মফস্বলের তো, ব্যবহার জানে না।'—কেউ বলল, কিসের! কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন—দেখতে তো ঐ—অহংকারখানা আছে সাড়ে ষোলো আনা।—অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্করা বলল, 'বেশ কিন্তু—দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছে করে।' আর পাড়ার ছেলেরা ঘুরঘুর করতে লাগল বাড়ির তলা দিয়ে।

মেয়েটি নির্বিকার। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে—ছেলেমেয়েদের আনাগোনা আর কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করে না। সে যেন এ-রাজ্যে নেই, এইরকমই তার মুখের ভাব।

'আমাদের পাড়ায় ভাই ও-রকম হাঁড়িমুখো মানুষ আসেনি—' গিন্নিরা আহারাদির পর বলাবলি করলেন। 'কি জানি—আমার কিন্তু বেশি সুবিধের ঠেকছে না—' অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একজন গিন্নি বললেন, 'সধবা মানুষ, তার স্বামী কোথায়? অতবড়ো একটা ধাড়ি মেয়ে নিয়ে অমন একা-একা থাকে কেমন করে?'

'মেয়েটি তো আশুতোষ কলেজে পড়ে। আর ওর মা মৃন্ময়ী গালর্স স্কুলে কাজ করেন।' কোনো গিন্নির অল্পবয়স্ক একটি মেয়ে এ-কথা বলল। 'ও বাবা, তুই আবার এত খবর পেলি কোথায়?' মা আবাক হবার ভান করে বললেন। মেয়েটি গর্বিত ভঙ্গিতে হাসল শুধু।

খবর পাওয়া শক্ত নয়। মেয়েটি যে রোজ সকালবেলা একটি বেঁটে ছাতা আর বই হাতে নিয়ে গটগটিয়ে চলে যায় ট্রাম-লাইনের ধারে, এ আর না দেখে কে! আর, ওরা কে আর কেমন, এ নিয়ে এ-পাড়ায় এত গবেষণা হয় যে তাতে মায়ের মাস্টারির খবরটা সংগৃহীত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

টালিগঞ্জ ব্রিজের ও-পিঠে তখন প্রায় গ্রাম ছিল বললেই হয়। এখন যা বাড়ি-ভাড়া, এর চার ভাগের একভাগও তখন ছিল না। অনেকেই সস্তার লোভে গিয়ে ক্রমে-ক্রমে সেখানে এই পাড়াটির সৃষ্টি করেছেন। আজকাল খোঁজ পেয়েছেন অনেকেই, কিন্তু বাড়ির সংখ্যা এতই অল্প ছিল যে পাড়াটি আর তেমন বর্ধিত হতে পারেনি। সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা বোধ হয় ওই সুকুমারবাবুই। নতুন অধিবাসী কেউ এলে সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গেই সকলের আলাপ হয়। এবারে কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলো। অতি অল্পবয়স্ক এক প্রিয়দর্শন যুবক তাঁকে টেক্কা দিলো এবার।

মেয়েটিকে যদি সুন্দরী বলি, কিছুই বলা হবে না। পল্লবিনী লতা বলতে আমরা কী বুঝি? বর্ষার সজল ঘাসের মতো আভাময় শ্যামল রং আর মেঘের মতো ঘন কালো চুলে ভরা মাথা। ও যখন সোজা তাকিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, সমবয়সী

মেয়েরা অকারণেই বলে ওঠে, 'আহা ঢং!' আর যুবক ছেলেপুলে চটপট ঘুম ছেড়ে জানলায় দাঁড়ায়—বয়স্ক মহিলারা, অর্থাৎ যাদের যৌবন প্রায় যায়-যায়, তাঁরা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সুকুমারবাবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগল। পাড়ায় অমন একটি মেয়ের আবির্ভাব হলো, আর তিনিই কিনা তার নাগাল পেলেন না এখনো? আর সেই তিন দিনের ছোকরা অভিজিৎ—সেই আজ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলো?

ঘন চুলে ব্যাকব্রাশ করে ঐ সকালবেলাতেই দাড়ি কামিয়ে, মুখে পাউডার দিয়ে, চমৎকার ধোপ-দুরস্ত কাপড়জামা পরে সুকুমারবাবু তাড়াতাড়ি ট্রামলাইনের ধারে এসে দাঁড়ালেন। একটু পরেই দেখা গেলো, লম্বা সোজা রাস্তাটি দ্রুত পদক্ষেপে পার হয়ে মেয়েটিও এসে দাঁড়ালো সেখানে। কিন্তু অত বড়ো একটা জলজ্যান্ত সুকুমারবাবুকে সে গ্রাহ্যই করল না। পৃথিবীতে যেন একমাত্র তার নিজের অস্তিত্বই যথেষ্ট—সুকমারবাবু চেষ্টা করলেন দু'-একবার চোখে চোখ ফেলতে, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে এগুলেন তিনি। মনোরম হাস্যে তাঁর মুখ ভরে গেলো—কাছে গিয়ে দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! অ্যাদ্দিন ধরে পাড়ায় এসেছেন, অথচ এখনো আলাপ হয়নি।'

বিনীত হাস্যে মেয়েটি প্রতিনমস্কার করে আবার অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

সুকুমারবাবু বললেন, 'কলেজে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার।'

'বরাবরই এ-কলেজে পড়ছেন?'

'হুঁ—'

আর কী বলবেন সুকুমারবাবু? এত সংক্ষিপ্ত কথার পর কি আর এগুনো যায়! ট্রাম এলো, আর সেদিনের মতো ঐটুকুতেই শেষ করতে হলো আলাপ। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না—কয়েকদিন পরেই দেখা গেলো মেয়েটির সঙ্গে তিনি দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন।

এবার পাড়ার মেয়েরা চঞ্চল হলো। কোনো এক যুবতী বিদ্রূপ করলো, 'সুকুমারবাবু সাবধান, এ কিন্তু স্বখাত সলিল।'

একজন বয়স্ক মহিলা বললেন, 'এবারই সুকুমারবাবুর আইবুড়ো নাম ঘুচবে।' আরেকজন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তা যা-ই বলো বাপু, হালচাল কিন্তু আমার ভালো মনে হচ্ছে না—'

সুকুমার সব শুনে বললেন, 'মেয়েটি চমৎকার।'

PATHAGAR.NET

জ্বলন্ত তেলে ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়ল—সকল বয়সের মেয়েরা চিৎকার করে উঠলেন একযোগে।

'ঐ আপনাদের চমৎকার!'

'আপনার পছন্দের প্রশংসা করতে পারলাম না, সুকুমারবাবু। সত্যি! ঐ তো প্যাকাটি একখানা—'

সুকুমারবাবু মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু একটা ভারি মুশকিল। হয় ট্রামে উঠে, নয়তো ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে ছাড়া অন্যত্র মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবার কোনোই সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না সুকুমারবাবু। কী আর করেন—ভোরবেলার সেই মধুর নিদ্রাটির উপরেই অত্যাচার চলতে লাগলো ঘন ঘন।

মেয়েটি কিন্তু আলাপি মন্দ না। চেহারার মতো তার কথাবার্তাও ভারি মিষ্টি। মাঝে-মাঝে যখন হেসে ওঠে আর গালে টোল পড়ে তখন সুকুমারবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কী যেন মনে পড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটু বেশি আকর্ষিত হন তিনি।

অভিজিৎ (সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি) বলল, 'সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখছি বেশ আলাপ হয়েছে আপনার।' বলাই বাহুল্য তার গলার সুরটা খুব সুখের নয়—আর এ-ও বলা বাহুল্য যে যিনি এত বেশি রমণীমোহন তাঁকে পছন্দ করা নবযুবকদের পক্ষে সহজ নয়।

মল্লিকার ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেলো। বলল, 'ভদ্রলোক চমৎকার।'

অভিজিৎ জবাব দিলো না।

মল্লিকা বলল, 'কথা বলছেন না যে? আপনার ভালো লাগে না ওঁকে?'

'কী জানি—'

অভিজিতের সঙ্গে একমাস হলো আলাপ হয়েছে মল্লিকার—এ পাড়ায় প্রথম বন্ধুই সে। এমন নয় যে সুকুমারবাবুর মতো সচেষ্ট হয়ে আলাপ করেছে অভিজিৎ—আলাপ হয়েছে দৈবক্রমে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু সত্যিই কলেজে থেকে ফেরার পথে ট্রামে উঠতে গিয়ে কাপড় জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মল্লিকা—অভিজিৎ তাকে হাতে ধরে না-তুললে হয়তো একটা দুর্ঘটনা ঘটতো। এও একটা দুর্ঘটনা বইকি। কিন্তু এতে মানহানি হতে পারে—প্রাণহানির তো ভয় নেই।

শুক্রবার সকালবেলা অভিজিৎ পড়তে যায় প্রফেসরের বাড়ি—কাজেই ঐটেই তার ফেরবার সময়—যদি হোঁচটটা মল্লিকা কাল খেতো তাহলে তো আর এ-ঘটনা ঘটতো না! বুকের মধ্যে অভিজিৎ লুকিয়ে রাখলো কথাটা। যে-মেয়েকে নিয়ে পাড়ায় এত কানাকানি—তার সঙ্গে এই রোমান্টিক সংঘর্ষের গল্পটা ফলাও করে বলবার

PATHAGAR.NET

ইচ্ছেটাই ছিল স্বাভাবিক—সব ছেলের মতো সকালবেলা সেও কি ঘুম-জড়ানো চোখে জানলায় দাঁড়ায়নি? মনে-মনে কি সে আলাপ করেনি এই মনোহরিণীর সঙ্গে—আর সে-কথা বলে বন্ধুদের ঈর্ষাভাজন হবার সাধ কি একদিনও হয়নি তার মনে? কিন্তু কার্যকালে তার মনে হলো এ তো বলবার কথা নয়—এ আপন অন্তরের মধ্যে ভরে রাখবার কথা।

তারপর দেখা হয়েছে ঘন-ঘন, কিন্তু অগ্রসর হতে সময় লেগেছে। একসময় দেখা গেলো, সেই অসম্ভব লজ্জা আর সংকোচের গণ্ডী এড়িয়ে তারা একটু-আধটু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। এ রকম একটা চরম মুহূর্তে যদি সুকুমারবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় তাহলে কি হৃদয় আনন্দে নৃত্য করতে পারে? কাজেই মল্লিকার মুখে সুকুমারবাবুর প্রশংসা শেলের মতোই বিঁধলো অভিজিতের বুকে।

কৌতুক বোধ করলো মল্লিকা—আড়চোখে অভিজিতের বিরস মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলুম উনি ইকনমিকসের ভালো ছাত্র ছিলেন, ফার্স্টও হয়েছিলেন এম. এ তে—ভাবছি ওঁর কাছে একটু পড়লে হয়।'

যথাসম্ভব উদাস মুখে অভিজিৎ বলল, 'বেশ তো।' পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'মেয়েরা যে কেন ও-সব ছাই বিষয় পড়ে!' এখানে বলা দরকার অভিজিৎ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

মল্লিকা হেসে বলল, 'তাহলে মেয়েরা কী-বিষয় নিলে আপনি সুখী হন?'

'সুকুমারবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

মল্লিকা কিছু বলবার আগেই ট্রামে থামল—সেই টালিগঞ্জ থেকে আশুতোষ কলেজের দূরত্ব যে মাত্রই এইটুকু, সেজন্য যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে সে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। অভিজিৎ রয়ে গেলো—সে যাচ্ছে এলগিন রোডে তার প্রফেসরের বাড়ি।

PATHAGAR.NET

এদিকে সুকুমারবাবু ভাবলেন, 'দুধের ছোঁড়াটা তো ভারি চালাক হয়েছে। আজকাল কি রোজই ওর প্রফেসরের বাড়ি যাওয়া থাকে নাকি? নাঃ দেখাশোনার ক্ষেত্রটা আর-একটু প্রসারিত না-করলেই নয়। কত আর ট্রাম-লাইনে ছুটোছুটি করা যায়—কত আর পকেটের পয়সা খরচ করে অকারণে ট্রামে বেড়ানো যায়। আর তাছাড়া, ওই ছোড়ার যন্ত্রণায় ট্রামে ওঠাও দুষ্কর!' সুযোগ বুঝে তিনি বললেন, 'আপনার সঙ্গে কি ট্রামে ছাড়া অন্যত্র সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ?' অবাক হয়ে মল্লিকা বলল, 'কেন বলুন তো?'

'তাই তো দেখছি—এই কলেজের সময় ছাড়া আপনি তো আর বেরুবেন না—আর কখনো বাড়ি যেতেও বললেন না।'

লজ্জিত হয়ে মল্লিকা বলল, 'বা রে, তা কেন? আপনি যদি সত্যি কখনো যান আমাদের বাড়ি, সে তো আমাদের সৌভাগ্য।'

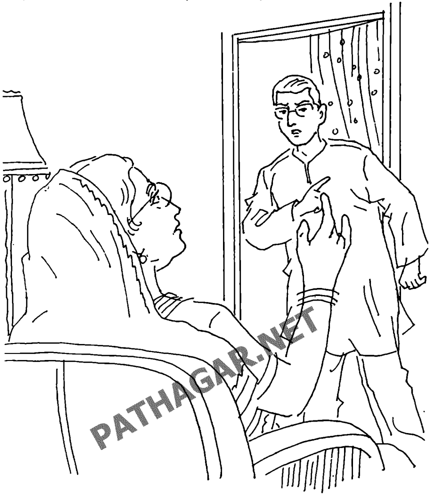
PATHAGAR.NET

'সৌভাগ্যটা আপনার নয়, আমারই। তাছাড়া আপনার মা শুনেছি অত্যন্ত বিদুষী মহিলা—তাঁর সঙ্গে আলাপ করবারও ভারি ইচ্ছে হয় মাঝে-মাঝে।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। আমারই আগে বলা উচিত ছিল—খেয়াল হয়নি।'

বাড়ি ফিরেই সেদিন মল্লিকা মা-কে বলল কথাটা।

আধো-শোয়া অবস্থায় একখানা বই পড়ছিলেন তিনি। মেয়ের কথা শুনে মুখ তুলে বললেন, 'কে রে ভদ্রলোক?'

'আছেন একজন—বেশ লোক!—আসতে চান একদিন—আসুন না, মা!'

আসল কথা কিন্তু অন্যরকম। সুকুমারবাবুর আসা-যাওয়া দিয়ে মল্লিকা অভিজিতের জন্য সেতু গড়তে চায়। সুকুমারবাবুকে আমন্ত্রণ করতে তার কোনো

সংকোচ নেই, কিন্তু মুখ ফুটে মা-কে সে অভিজিতের কথা বলতে পারল না। তবু মনে হল—একজনকে আসবার অনুমতি দিলে মা এদিন আর-একজনকে আসতে দেবেন।

সংযুক্তা দেবী ঈষৎ চিন্তা করলেন। মেয়ের সরল আগ্রহকে বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করলেন তিনি। একটি যুবতি মেয়েকে নিয়ে কোনো পুরুষ অভিভাবক ছাড়া থাকা যে কী বিড়ম্বনা, তা তিনি হাড়ে-হাড়ে জানেন। এক্ষুনি হয়তো একটা কথা উঠবে। কিন্তু তবু বললেন, 'বেশ তো।' মল্লিকা খুশি হয়ে মায়ের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে-করতে বলল, 'এটুকু বলতে তুমি এত চিন্তা করলে, মা?'

'কী করবো, বল। তোকে তিন বছরের শিশু নিয়ে বেরিয়েছি এই সংগ্রামে। আগে ছিল নিজের চিন্তা, এখন হয়েছে তোর চিন্তা।'

'আমার? আমার জন্য কোনো চিন্তা নেই।' পরম নিরুদ্বেগে মল্লিকা মা-র পাশে শুয়ে পড়ল।

মেয়েকে আদর করতে-করতে সংযুক্তা দেবী বললেন, 'আমার শরীরের তো এই অবস্থা। এদিকে ইস্কুলের ছুটিও ফুরালো—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কী করে কী হবে।'

'তখন তো শুনলে না, একটু বেশি মাইনে পেয়েই অমনি কলকাতা এলে—না-এলে কি আর অসুখ করতো। আমরা মৈমনসিং-এই বেশ ছিলুম।'

কথাটা বলল বটে মল্লিকা কিন্তু মনে-মনে অনুভব করলো অন্য রকম। এখানে না-এলে কি অভিজিতের সঙ্গে দেখা হতো?

মা বললেন, 'কলকাতার অপরাধ কী? ওখানে থাকলেও এ অসুখ আমার বাড়তোই। এই হার্টের ব্যারাম কি আমার আজকের? কিন্তু আমি ভাবছি, পড়ে থাকলে উপায় হবে কী?'

'কিচ্ছু হবে না।' অসহিষ্ণু হয়ে মল্লিকা বলল, 'এখন আসল কথাটা বলো তো, ভদ্রলোককে আসতে বলবো নাকি?'

সংযুক্তা দেবী হেসে বললেন, 'বল পাগলি, বল্।' মায়ের এই স্নেহের সুযোগটা এবার নিলো মল্লিকা।—'তাহলে, মা, আরেকজন বন্ধুকেও বলবো কিন্তু।' অন্যমনস্ক হয়ে মা বললেন, 'বেশ তো।'

সামান্য একটু চায়েরও আয়োজন করলেন সংযুক্তা দেবী। বাইরের লোক আসবেন ভেবে শাড়িখানা ছাড়লেন, অনেকদিন পরে মাথায়ও চিরুনি ছোঁয়ালেন।

চিন্তা-ভাবনায় জর্জরিত শরীর একটু অকালেই ভেঙে পড়েছে তাঁর, তবু তার মধ্যেও লাবণ্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। ভাঙা মুখের মধ্যেও একটা সকরুণ সৌন্দর্যের চিহ্ন যাই-যাই করেও একেবারে মুছে যায়নি। মার মুখের দিকে তাকিয়ে মল্লিকার ভারি ভালো লাগল। এত সুন্দর মা তার—অথচ শোনা যায় তার বাবা অন্য-কোনো মেয়ের

PATHAGAR.NET

প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আশ্চর্য ভদ্রলোক। মা-কে সে জড়িয়ে ধরল ছোটো মেয়ের মতো।

ওদিকে সুকুমারবাবু পাঁচটার অনেক আগেই সাজগোজ করে বেরোলেন। খবরটা একটু দেবার মতো বইকি—বিশেষ অভিজিতের কর্ণগোচর তো করতেই হবে!

একজন তরুণী বললেন, 'একেবারে পাকা কথাটাই আজ নিয়ে আসবেন বোধ হয়। কী বলেন?'

সুকুমারবাবু হাসিমুখে বললেন, 'দেখি।'

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আসতে তাঁর একটু দেরিই হলো। মল্লিকা অভিযোগ করল, 'এত দেরি করলেন?'

'কী করি, বলুন! মনটা তো চলে এসেছে ঠিক সময়েরও আগে—এই বাস্তব শরীরটা নিয়েই পড়েছিলুম মুশকিলে—নানা কাজে ঘুরে বেড়াতেও হলো—'

'বসুন, মা-কে ডেকে দি—' হরিণীর গতিতে পাতলা শরীর নিয়ে মল্লিকা অদৃশ্য হল। সেদিকে তাকিয়ে আবার যেন সুকুমারবাবুর কী মনে পড়ল।

একটু পরেই ঘরে এলেন সংযুক্তা দেবী। বজ্রপতনেও কি মানুষ এতখানি চমকায়? সে দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন সুকুমারবাবু—ঠোঁট ফাঁক—শব্দ বেরুলো, 'তুমি?'

সংযুক্তা দেবী বুকের মধ্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলেন, সামনের একটি আসনে তিনি বসলেন চুপ করে। আজ আঠারো বছর পরে পরিত্যক্ত স্বামীকে দেখে তাঁর কেমন লাগল কে জানে। কিন্তু অতীতের সেই তীব্র আত্মাভিমান বোধ আর তাঁর জাগলো না। স্বামী অন্য-কোনো মেয়ের প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন বলে যে-কঠিন দুঃখ তিনি তখন পেয়েছিলেন, হৃদয়ের মধ্যে আজ আর তার কণামাত্র অনুভব করলেন না। শারীরিক অসুস্থতা সামলে ভালো করে তাকালেন সুকুমারবাবুর দিকে, তারপর অত্যন্ত সহজ গলায় বললেন, 'কেমন আছো?'

চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে হাসিমুখে মল্লিকা ঘরে ঢুকলো। সংযুক্তা দেবী বললেন, 'বাবাকে প্রণাম কর, মলি।' সুকুমারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই তোমার মেয়ে।'

মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছবির মতো।

আর সুকুমারবাবুর বিহ্বল গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বেরুলো, 'আমার মেয়ে?' বাইরে অভিজিতের গলা পাওয়া গেলো, 'আসতে পারি?'

মুহূর্তে সুকুমারবাবু নিজেকে মানিয়ে নিলেন অবস্থার সঙ্গে—মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে নিলেন তার চোখের ভাষা, তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'কে, অভিজিৎ নাকি? এসো বাবা, এসো।' অত্যন্ত স্নেহশীল প্রৌঢ়ের মতোই শোনাল সুকুমারবাবুর গলা। নিজের পাশে হাত দিয়ে বললেন, 'এই যে, এখানে বোসো।'

PATHAGAR.NET

নাম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে-বসতে তাগিদ, 'কই, ঝি'র কি করলে? বলে বলে যে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম—' খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি! কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট-দশ টাকা মাসিক মাইনের যদি বা ঠিকে ঝি বার কয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবে না।

আশেপাশে যে কয়েক ঘর কামার আর নমঃশূদ্র প্রতিবেশী আছে, আগে তাদের বিধবা বোন আর মেয়েদের ভিতর থেকেই এসব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আজকাল দিনকাল বদলেছে। পুরুষদের মজুরির রেট হয়েছে এখন দু'-তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান-সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, ঝি-চাকর খাটতে আর কেউ রাজি নয়।

ঘুরে ঘুরে দু'-তিন বাড়িতে গিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা পেড়েও ফেললাম। কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়, নিজের সংসারেই নানান ঝামেলা,' আবার কেউ-বা পরিষ্কার মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তাহলে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করার জন্য একজন মেয়েছেলে না হলে নিতান্তই যে আমাদের নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধমাইল খানেক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুর নিচে নামতে চায়। তাও রাত থাকতে থাকতে, খুব ভোর-ভোর সময় গিয়ে পৌঁছলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হতে হতে তরল কাদায় সেই জল রূপান্তরিত হয়। তিন ননদ-বৌদিতে প্রথম দিন-দুয়েক কলসী-কাঁখে বেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনেই দেখা গেল, তাদের মধ্যে দু'জনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বলবার কিছু নেই। দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয়, অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।

জলের পর আগুন। রান্না করতে গেলে, সুলতার প্রায় চোখ ছলছল করে ওঠে আর কি! শহরের মতো কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোনো রকম জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করা যায়নি। উমা আর রমা দু'জনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো পাতা আর ছিটকে ডাল সংগ্রহ করে এনেছে। আহার্য তৈরির তাই একমাত্র ভরসা। আমি

অবশ্য আশ্বাস পেয়েছি এবং আশ্বাস দিয়েছি যে শিগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিষ্পত্র শুকনো শুকনো ডাল নিয়ে যেসব গাছ এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাই জ্বালানিরূপে সুলতার উনানের পাশে পূঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈতৃক বাড়িতে মাসখানেকের জন্য সপরিবারে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি-চাকরের আর কামলা-কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ করে তুলল।

পাশের গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবন মণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের বার ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভর্তি করে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি করে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্য ভেবো না। তোমার পিসিমা একাই একশো। কাজকর্ম দেখে যদি পছন্দ হয়, তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝি'রা নাকি সব রাজার ঝি হয়েছে।'

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো মুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দু'জনে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা, পিসেমশাই না হয় বুড়ো মানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ কোরও না দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললুম, 'দুই-ই ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধরনের সন্দেহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখ যদি পারো।' বলে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, 'ওগো, একবার এদিকে এসো তো, বাড়ির কর্তা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে বসে জ্বালানির জন্য দা দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলিকে ঝি ছোট ছোট করে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আটহাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার-দুয়েক চেষ্টা করল, কিন্তু কোনোবারেই মাথায় আর তা রইলো না।

সুলতা ফিস ফিস করে বলল, 'চেহারাখানা দেখো একবার।'

এতক্ষণ চেহারার কথা আমার মনেই হয়নি। ঝি'র আবার কেউ চেহারা দেখে

PATHAGAR.NET

নাকি! বিশেষত সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলে না, তার চেহারা কি রকম কে দেখতে যায়!

সুলতার অনুরোধে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই-বা ওরা হাসি চাপতে পারছিল না। বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মতো চেহারা, কোনো অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুঁত কিছু আছে তা নয়। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড়ো মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারি ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাতি দু'খানিও খুব খাটো এবং নিচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারার পুরুষালি ধরনটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝির আঙ্গিক গঠনের এই বৈসাদৃশ্যই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে বুঝতে পারলাম। সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দর হয় এবং গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব করে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজকর্ম সব দেখে নিয়েছ? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এ দেশের মানুষ আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুলতা বলল, 'তা তো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন কদমছাঁটা করেছ কেন? চুলগুলি কি দোষ করল?'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভরে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ করে দিলাম একদিন ছেঁটে!'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগত ভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকনোয়, বেণী কি করবী রচনায় অনেক সময় তার ব্যয় হয়। কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা করে উপভোগ করে। সুলতার জন্য সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুলতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমার বিনা অনুমতিতেই সুটকেস থেকে পুরনো সরু-নকসীপেড়ে ধুতিখানা বের করে আনল। আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ পুরানো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলি পরো দেখি, ওভাবে তুমি তো দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আটহাতি জীর্ণ ময়লা চীর পরে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ-কর্ম করছে।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারি বাধো বাধো ঠেকে। আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছে, দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল, 'থাক তোমার ঘামাচি দেখে আমার আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামুটি উন্নতি হয়েছে।

রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজকর্মে সবাইকেই সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোনো কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোনো অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চির খণ্ড নয়, অবসরমতো বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাব গাছের শুকনো গুঁড়িগুলি রসো চেলা করে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না। মাথায় কোনো কালেই রসোর কাপড় থাকে না। বুকের আঁচল মাজায় জড়িয়ে নেয়। তারপর লোহার মতো শক্ত আমের গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পড়তে থাকে; দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ে পিঠ বেয়ে।

RATHAGAR.NET

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি করে বলে, 'থাক না রসো, এসব পুরুষের কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত করে জবাব দেয়, 'আহাহা কী সোহাগের কথাখানা গো! আমাকে করতে হবে না তো কে করবে শুনি? চাকর-বাকর কামাল-কৃষাণ আছে দু'-চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে বসে করতে পারবে! কোপ দেওয়া দূরে, কুড়ুলখানা যদি ভালো করে ধরতে জানতো তবু না হয় বুঝতাম। গুণের ওই তো একখানা সোয়ামী। এরপর আবার পুরুষের কাজ আর মেয়েমানুষের কাজ বলে বকাবকি করছ বউঠাকরুণ!'

নায়ক-নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি আমার কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে. কিন্তু রসোর কুড়ুলের খট্ খট্ শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। খানিক বাদে এসে রসো আবার আপোস করে সুলতার সঙ্গে।

'সোয়ামীর নিন্দা করলাম বলে রাগ করেছ নাকি বউঠাকরুণ?'

সুলতা হাসি গোপন করে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দা শুনলে রাগ হয় না? তোর হত না?'

জানলা দিয়ে চোখে পড়ল রসো তার বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ধরেছে, 'হু এইটে হত।'

উমা হঠাৎ ধমকের সুরে বলে, 'ছি, ও সব কি?'

রসো পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়। 'কাজের কথা বলছিলে বউঠাকরুণ। কাজের কি আবার মেয়ে-পুরুষ আছে? যে যা জানে তার সেই কাজ? তাই তাকে মানায়।'

রমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের রসরাজ যে আবার বক্তৃতা দিতে জানে দেখছি, বৌদি।'

রসোর পৌরুষকে স্বীকার করে নিয়ে ওরা তার নাম রেখেছে রসরাজ। চাল-চলনে, রুচিতে-প্রসাধনে নিজেদের সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিয়ে মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই সুলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওর বেশ-বাসে আচার-ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কী আছে! ও যে কেবল আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওর মধ্যে কোনো শ্রেণীর কোনো নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাথার চুল সব পেকে যাওয়ার কোনো মেয়ের বাপ রাজি হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার বড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে আসা তিনি শুরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবা খেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানো না, জানতে কতক্ষণ?'

প্রথম দিন কয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু করে রস পেতে লাগলাম, নেশা জমে উঠল।

তবু কবিরাজের মতো জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতাড়ি, ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর অধীরভাবে বললেন, 'না হে, তুমি তো রাত ভোর করে দিতে চললে দেখছি। বসে বসে আমি কি করি বলো তো। অন্তত একটু ধোঁয়া-টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতাম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশাই-এর জন্যে তামাকের ব্যবস্থা করে দিলুম। হুঁকো-কলকে এল, মাটির ভাঁড়ে রইল মাখা তামাকের গুলি, আগুন-মালসায় দগদগ করতে লাগল চেলা চেলা কাঠের আগুন। নবাবী শিষ্টাচারে আরও একধাপ অগ্রসর হলাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোনো কাজ নেই। এখানে কাছাকাছি থাকবি, কবিরাজ মশাই যখন তামাক চাইবেন, ভরে তামাক দিবি।'

রসো হাতমুখ নেড়ে বলল, 'আহাহা কী সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভোর

PATHAGAR.NET

দাবা খেলবেন আর আমি বসে বসে কেবল তামাক ভরে দেব! আমার বুঝি আর মানুষের গতর নয়!'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'বকো না দাদাবাবু, মুখে বললুম বলে, তোমার কথার কি সত্যিই অমান্য করতে পারি! তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশাই-এর তামাক-তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ হতে না হতে আর এক ছিলিম রসোকে ভরতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড়ো বড়ো এক একটা গুলি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি বলি করেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর কটা দিনই বা।

PATHAGAR.NET

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আর তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারিনি। সুলতারা এ নিয়ে অনেকবার অনেক রকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকমের।

একটু বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বারবার আপত্তি করতে থাকায় খেলা অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটলি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড়ো বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকেরই লক্ষণ। সে আঁচল যে রসে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল তা লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো আলোটা একটু ধরো তো, ভারি অন্ধকার রাস্তা।'

বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি থাকুন। পথঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি, হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশাইর তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ পড়ল না কি রাস্তায়! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছন থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। অমন অন্ধকারে যেও না।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশাইর একখানা হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে রসো তাকে হিড়হিড় করে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো?'

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল, 'হাতচ্ছাড়া মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওঁকে। এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই?'

কবিরাজ মশাইর চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখালো। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিতে মনে হল কব্জিটা তাঁর মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ তাঁর হল কি করে? রসোর অন্তরে-বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব বলে কিছু আছে?

মহকুমা শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্যে। রোগটা

PATHAGAR.NET

প্রত্যেকবার এই সময়টায় এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ করে বলতে লাগল, 'সব তো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের।'

সুলতাদের বললাম, 'দোষ কি। নাও না টিকা।'

বারান্দায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হল। পাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে আর তারা এগুলো না।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের অভ্যাসমতো তিনজনেই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রসো এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওর নামটা?'

বললাম, 'ডাকি তো রমা করে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোশাকী নাম উজ্জয়িনী। সুলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারের কাছে ঠিক মধুরেণ সমাপয়েৎ হল না।

রসোর শক্ত শাবলের মতো হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড় কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞাসা করল, 'নাম?'

বললাম, 'রসো!'

রসো একবার আমার দিকে তাকাল, চোখ বুলিয়ে নিল সুলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই, আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আজ আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আটহাতি ময়লা ধুতি। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চলে গেলে বললাম, 'আমরা তো জানতাম না। এ নাম তুই কোথায় পেলিরে?'

রসো ভারি লজ্জায় মুখ নিচু করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'পাবো আবার কোথায়? পোড়ারমুখো কবরেজ সেদিন ওই নামেই ডেকেছিল।'

PATHAGAR.NET

গুণী সম্বর্ধনা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দোনলা বন্দুকের মতন প্যান্ট, নকশা আঁকা শার্ট, মাথায় চুলের ঝে সেই ছেলেটিই এগিয়ে এল।

আমরা নলহাটি সংস্কৃতি সমিতি থেকে আসছি স্যার। আপনার বাড়ি খুঁজতে জান বেরিয়ে গেছে।

পকেট থেকে দোরাঙা রুমাল বের করে ছেলেটি হাওয়া খেতে লাগল। পিছনের ছেলেটির পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চেহারাও অনেক ভব্য।

সে বলল, রাজারহাট থেকে বাসে যেতে হয়। সোজা রাস্তা, কোনো অসুবিধা নেই।

বললাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি? রবীন্দ্রজয়ন্তী?

নকশাকাটা মুখ মুচকি হাসল। আধা বিদ্রূপের হাসি।

রবীন্দ্রজয়ন্তী-টয়ন্তী ওসব সেকেলে হয়ে গেছে স্যার। ওতে আর লোক হয় না। আমরা গুণী সম্বর্ধনা দেব।

গুণী সম্বর্ধনা? কাকে?

এবার নকশাকাটা চটল।

কি যে রসিকতা করেন, স্যার, ভাল লাগে না। আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, আবার কাকে সম্বর্ধনা দেব?

আমাকে?

আমি চেয়ারে কাত হয়ে বসলাম। ছোকরারা লোক ভুল করেনি তো!

কেন, আপনি কি কম লোক নাকি? নকশাকাটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল, এক ডাকে সবাই চেনে আপনাকে। কেন যে পাড়ায় এত ঘুরতে হল বুঝতে পারলাম না। স্যারের বই পড়েনি, এমন লোক আছে বাংলাদেশে? ফট্‌কে, স্যারের বইগুলো তোর তো মুখস্থ?

ফট্‌কে অর্থাৎ ফটিক বলল।

ছিল তো মুখস্থ, যা বাসের ঝাঁকুনি, ভুলে গেছি। কাজের কথাটা সেরে ফেল, আমাদের আবার এতটা পথ ফিরতে হবে তো।

নকশাকাটা এবার গম্ভীর হল।

PATHAGAR.NET

শুনুন স্যার, সামনের শনিবার দেড়টার সময় আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। একেবারে রেডি হয়ে থাকবেন। হাতে বেশি সময় থাকবে না।

দাঁড়াও ভাই, আমাকে একটু বুঝতে দাও।

এর আর বোঝাবুঝি কি আছে স্যার! খবরের কাগজে দেখুন না, গড়ে রোজ দুটো করে গুণী সম্বর্ধনা হচ্ছে কলকাতায়। আপনি সেজে-গুজে গিয়ে বসবেন, আমরা আপনাকে একটা ধুতি আর কলম দেব।

ফটিক সংশোধন করে দিল, দিয়ে ধন্য হব।

হ্যাঁ স্যার, ধন্য হব।

তোমাদের ওখানে আর কে আসবেন?

সভাপতি হাসুমণি বালিকা বিদ্যালয়ের হেড্‌মাস্টার প্রভাকরবাবু।

প্রভাকর সামন্ত। ও তল্লাটে বিখ্যাত লোক স্যার। মেছুনির সঙ্গে পর্যন্ত সংস্কৃতে কথা বলেন। নিন, তাহলে ওই কথাই রইল। শনিবার দেড়টা।

দু'জনে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

সবটা বুঝতে আমার বেশ একটু সময় নিল। সাহিত্যসাধনা করছি অনেক দিন, কিন্তু বিশেষ কোনো শিবিরে আশ্রয় না নেওয়ার জন্য কোনো তরফ আমল দেয়নি। প্রায় না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে আছি।

প্রকাশিত বই আছে গোটা ছয়েক। একটারও সংস্করণান্তর হয়নি। প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরে গোটা তিনেক জুতোয় ছত্রিশটা হাফসোল লাগাবার পর, বইগুলোর গতি করতে পেরেছি।

খুবই আশা ছিল সমসাময়িক সাহিত্যিক আর সমাজ আমাকে চিনতে পারল না, কিন্তু আগামী যুগের মানুষ পারবে। যাদের চোখের তারায় প্রত্যয়ের বহ্নি।

তাই হল। এরাই তো নতুন যুগের ছেলের দল। খুঁজে খুঁজে আমাকে ঠিক আবিষ্কার করেছে।

সংবাদপত্রে দু'-একজন বন্ধুবান্ধব ছিল, তাদের কল্যাণে সংবাদটা ছাপিয়েও দিলাম।

সব একরকম হল, কিন্তু শনিবার দেড়টায় কেউ এল না।

অবশ্য আমি আশা করেছিলাম, শনিবারের আগেই কেউ আসবে আমন্ত্রণলিপি দিয়ে, কিন্তু তাও কেউ আসেনি।

আড়াইটে বাজার পর যখন সযত্নে কাচা পাঞ্জাবিটা খোলবার আয়োজন করছি, তখন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

দরজা খুলেই থমকে দাঁড়ালাম।

অমাবস্যাকে হার মানানো গায়ের রং, দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশি, দুটি চোখ করমচা-লাল। হরিদ্রাভ দাঁতের সার।

PATHAGAR.NET

আপনি?

আমি ফ্যালারাম। নিন চলুন।

আমি বললুম, আপনাদের দেড়টার সময় আসার কথা ছিল না?

ফ্যালা দুটো হাত কোমরে দিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে জরিপ করিল, তারপর বলল, যান না, কথাটা গিয়ে বাস ড্রাইভারকে বোঝান না। নলহাটি ছেড়েছি তো সাড়ে এগারোটায়। ব্যাটা রাস্তায় একটা বাছুরকে খতম করে, একটা ডিমওয়ালাকে ঘায়েল করে, শেষকালে নারকেল গাছের সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলি। লাফিয়ে পড়ে পাঁচুর দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে কোনো রকমে রাজারহাটে পৌঁছেছি। সেখানে থেকে আপনার এখানে। নিন, আর পোজ দেবেন না, চলুন, যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে বললাম, ফটিকবাবু এলেন না?

ফটকে? গুণী লোক হয়ে কি বলেছেন স্যার যা-তা! ফাংশন হবে, আর ডেকরেটর আপনাকে নিতে আসবে সব ফেলে? আপনি বড় না ফাংশন বড়?

একবার ভাবলাম বলে দিই যাব না, কিন্তু সাহস হল না। যা যমদূতের মতন চেহারা, না বললে হয়তো পাঁজাকোলা করেই তুলে নিয়ে যাবে। তাছাড়া মনের মধ্যে একটু যে লোভে ছিল না, এমন নয়। মালার লোভ, ধুতির লোভ, সম্বর্ধনার লোভ।

রওনা হলাম। বাড়ির সামনে কোনো গাড়ি দেখলাম না। মনে করলাম, ফ্যালা হয়তো মোড় থেকে ট্যাক্‌সি নেবে। হাজার হোক গুণীজনকে ট্রামে-বাসে নিয়ে যাবে না।

মোড়ে গিয়ে তাই বললাম।

ফ্যালাবাবু, ট্যাক্‌সি নেবেন নাকি?

ফ্যালা যেন ভূত দেখল। অবাক চোখে আমার দিকে দেখে বলল, ট্যাকসি? এখান থেকে নলহাটি যাবেন ট্যাকসিতে? মানিক আমার, মিটারেতে কত উঠবে জানেন? ক্লাবের চাঁদা উঠেছে চৌত্রিশ টাকা, তাও দোকানীদের বোমার ভয় দেখিয়ে।

আমি আর একটি কথাও বললাম না। এরপর আর কথা বলাও যায় না। বাসে ধর্মতলা, সেখানে থেকে বাস বদলে সোজা রাজারহাট পৈলান ছুঁয়ে।

রাজারহাটে নেমেই চমকে উঠলাম।

একটা টিনের ছাউনি, তার তলায় অনেক লোকের জটলা।

ফ্যালা এগিয়ে গেল।

কি হল কি, এত লোক এখানে?

কে একজন মারাত্মক বার্তা শোনাল।

নলহাটির বাস বন্ধ। যার বাছুর চাপা পড়েছিল, সে দলবল জুটিয়ে ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে গেছে নিজের বাড়িতে। টাকা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।

খবর পেয়ে এ লাইনে আর বাস চলেনি।

PATHAGAR.NET

ফ্যালা ফিরে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। বিরক্তকণ্ঠে বলল, কিছু যদি মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

বলুন।

আপনি স্যার ভয়ঙ্কর অপয়া। বাছুরটা চাপা যেতেই আমার মনে হয়েছিল। মনে মনে ফটকে আর বিন্দেকে গালাগালিও দিয়েছি। ভূ-ভারতে সারা শালা গুণীজন পেল না। যত অখাদ্য—

ফ্যালাকে থামিয়ে বললাম, তার চেয়ে ফ্যালাবাবু আমি বরং এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাই। কখন বাস ছাড়বে, আদৌ ছাড়বে কিনা—

কথা শেষ হবার আগেই ফ্যালা বজ্রমুষ্টিতে আমার একটা হাতে চেপে ধরল। হাড়গুলো মট মট করে উঠল। দু'-একটা বোধহয় স্থানচ্যুতও হল।

মাইরি আর কি! একটা কাজের ভার দিয়ে নিয়ে এসেছি, সেটা না করে ফ্যালারাম ফিরে যাবে না। ভারি তো ছ' মাইল রাস্তা। হেঁটে মেরে দেব।

এবার মনে মনে বিপদ গুনলাম।

আশেপাশের লোকের কান বাঁচিয়ে বললাম, ফ্যালাবাবু হাঁটতে আমি একেবারে পারি না ভাই। ছেলেবেলায় একবার পা মচকে পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে ব্যথাটা বাতে দাঁড়িয়ে গেছে। ছ' মাইল তো দূরের কথা, এক মাইলও চলতে পারব না।

ফ্যালা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে সেই হাতে নিজের বুক চাপড়াল।

কি বলছেন স্যার, আপনি গুণিজন, আপনাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব? তার আগে আমার মৃত্যু হোক। আপনার আশীর্বাদে, যদি রাস্তায় মিরিগি রোগটা দেখা না দেয়, তাহলে এ ক'মাইল আপনাকে কাঁধে নিয়ে যেতে পারব।

নিজের সেই স্কন্ধারূঢ় অবস্থা কল্পনা করে ইতিমধ্যেই আমার সর্বশরীর কাঁপতে শুরু করেছে।

গোঁয়ার ফ্যালারামের কিছুই অসাধ্য নয়। সে সবই পারে।

হঠাৎ ফ্যালারাম কি ভাবল তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, একটু দাঁড়ান স্যার, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফ্যালারাম সোজা ছুটল রাস্তা ধরে। মিনিট দশেক, তারপরই ফিরে এল। একলা নয়, পাশে একটা সাইকেল।

একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে স্যার, উঠে পড়ুন।

আমি, আমি উঠব? আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার দুটো পাই কমজোর, এতটা পথ সাইকেল চালানো—

এবার ফ্যালারাম খিঁচিয়ে উঠল।

এই এক শালার গুণীজন হয়েছে। এবার কিন্তু খিস্তি করব স্যার। আপনাকে কে চালাতে বলেছে, আপনি পিছনে উঠে বসুন। আমি চালাব।

PATHAGAR.NET

অগত্যা আমি উঠে বসলাম। সভয়ে দু'হাতে সবলে সিটটা আঁকড়ে ধরে।

ফ্যালারাম প্যাডেলে পা দিয়েই লাফিয়ে উঠল।

মিনিট কুড়ি কোনো অসুবিধা নেই। মসৃণপথে অবলীলাক্রমে সাইকেল চলল, তারপরেই অসুবিধা শুরু হল।

পিচের শেষ, খোয়া ওঠা রাস্তার শুরু, সাইকেল লাফাতে আরম্ভ করল। ধাক্কা সামলাতে আমি মাঝে মাঝে উঁচু হতে লাগলাম, যাতে চোটটা বেশি মালুম না হয়।

বার কয়েক এ রকম হতেই ফ্যালারাম গর্জন করে উঠল।

যা দেখাবার একেবারে সভায় গিয়েই দেখাবেন স্যার। স্টেজ তো বাঁধাই হয়েছে।

কি আবার দেখাব?

কেন, এখন যা দেখাচ্ছেন, ওরিয়েন্টাল ড্যান্স। আপনার নাচের চোটে সাইকেলের অবস্থা তুফানের মুখে পানসির মতন। একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

না, রাস্তাটা খারাপ কিনা।

খারাপ রাস্তায় নেচে নেচে মাটি বসাচ্ছেন নাকি? প্লেন করছেন? রাস্তা খারাপ তো বসিরপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসে চলুন। আমরা হার মেনে গেছি।

চুপ করে গেলাম। এরপর কথা বলতে সাহস হল না।

চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। রাস্তার দু'পাশের গাছপালায় নীড় ফেরা পাখিদের কাকলি।

একেবারে আচমকা। মনে হল সাইকেলের সঙ্গে কিসের একটা ধাক্কা লাগল। সাইকেল কাত হয়ে আমি জাল চাপা পড়লাম।

তারপরেই ফ্যালার চিৎকার শুরু হল।

রাস্তা চলার সময় চোখদুটো কি ট্যাঁকে গুঁজে রাখ? সামনের কিছু দেখতে পাও না?

লোকটা কাঁচুমাচু কণ্ঠে বলল, আমি তো পাশ দিয়েই চলছিলাম। আপনিই তো পাগাড়ি নিয়ে ঘাড়ের ওপর পড়লেন। এমন এঁকেবেঁকে কেউ পাগাড়ি চালায়?

সাধে চালাই! পিছনে বসে গুণীজন যে কসরত করছেন, ব্যালান্স রাখি কি করে?

ফ্যালারাম পিছনে ফিরে আমার দিকে দেখেই চমকে উঠল।

আমি তখন জালচাপা পাখির মতন ছটফট করছি।

নাও নাও, জাল গোটাও! গুণীজনকে জ্যান্ত আর নিয়ে যেতে দেবে না দেখছি!

লোকেরা জাল খুলে আমাকে উদ্ধার করল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি ভিজে, তাই আঘাত লাগেনি, কিন্তু জামা-কাপড়ে কাদার ছোপ।

মনের দুঃখ মনে চেপে আবার সাইকেলের পিছনে উঠে বসলাম।

মিনিট পনেরো, তারপরেই গোটা দুয়েক হ্যাজাকের আলো দেখা গেল বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। বুঝতে পারলাম সভাস্থলে পৌঁছে গেছি।

PATHAGAR.NET

সত্যিই তাই।

একটা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এবড়োখেবড়ো মাঠ। একটা টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার, সামনের দিকে কিছুটা সতরঞ্চ, বাকিটা খালি।

এধারে-ওধারে লোকেরা জুটলো। কেউ বসেনি, সবাই ঘোরাফেরা করছে।

নামুন স্যার, এসে গেছি।

নামলাম। দুটো পাই বেশ টনটন করছে, এতক্ষণ পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য।

মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন। গায়ে নামাবলী, পরনে আধময়লা ধুতি। ইনিই সভাপতি।

দুটো হাত জোড় করে বললেন, ওঁ আয়াহি। আসুন, আসুন, খুব কষ্ট হল?

কষ্ট যে কি পরিমাণ হয়েছে, তা বলার নয়, তাই আলতো শুধু একটু হাসলাম।

সভা শুরু হল।

প্রথমে গান। গানের ভাষা শুনে মনে হল স্বরচিত। নলহাটির গুণকীর্তন প্রতি ছত্রে।

সভাপতি সামন্ত মশাই ভাষণ দিলেন। সংস্কৃতে নয়, বাংলায়। একেবারে গ্রাম্য বাংলা।

এবার গুণী সম্বর্ধনা।

সামন্ত মশাইয়ের বক্তৃতা থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম, প্রতি বছরই এঁরা একজন করে গুণীজনকে সম্বর্ধনা জানান। আশেপাশের গাঁয়ের প্রাচীন ব্যক্তিকে। এবারেই শুধু বাইরে থেকে সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিগলিত হলাম। পথের দুঃখকষ্ট সব বিস্মিত হতে একটুও বিলম্ব হল না।

সামন্ত মশাই এরপর আমার হাতে একটি ধুতি ও একটি লালরংয়ের বাক্স তুলে দিলেন। বাক্সের গড়ন দেখেই বুঝতে পারলাম, কলমের বাক্স।

মনে আপসোস হল, অজ পাড়াগাঁ না হয়ে যদি শহরের কোনো সভা হত, তাহলে এতক্ষণ ফ্ল্যাশবালবের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেত। পরের দিন অন্তত সিকিকলম জুড়ে বিবরণ প্রকাশিত হত। সবই অদৃষ্ট।

বসে বসে ধুতিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, ভাঁজ খুলেই চমকে উঠলাম।

বস্তাচাপা কাপড়ে যেমন লাল দাগ দেখা যায়, তেমন দাগই শুধু নয়, বেশ কিছুটা ছেঁড়া।

ফ্যালা পাশেই বসেছিল।

তাকে বললাম, কি রকম ঠকিয়েছে দেখেছেন আপনাদের! ছেঁড়া ধুতি দিয়েছে।

ফ্যালা নির্বিকার।

ঠকাবে কেন? আমাদের যে ঠকাবে সে এখনও মাতৃগর্ভে। এ টাকায় আর আস্ত ধুতি হয় না। চাঁদর বেলা তো কারো উপড়হস্ত করার নাম নেই।

PATHAGAR.NET

তারপর হঠাৎই ফ্যালা আমাকে খিঁচিয়ে উঠল।

আপনি আবার বসে বসে ধুতির পাট ভাঙছেন কেন? আদর করে লোক দিয়েছে, মাথায় তুলে নিন, ব্যাস, তা নয়, কেবল ছিদ্র খুঁজছেন। এইজন্যই আপনার কিছু হল না।

তাড়াতাড়ি ধুতিটা কোলের ওপর চেপে ধরলাম। কলমটা বাক্সে খুলে আড়চোখে আগেই দেখে নিয়েছি। খুবই সস্তাদরের জিনিস। শহরের ফুটপাতে ঢেলে যে সব বিক্রি করে, সেই জাতের।

মনকে বোঝালাম জিনিস কিছুই নয়। শ্রদ্ধাই বড়। মানুষের ভালবাসার দাম অনেক।

এবার আমার কিছু বলবার পালা। ক'দিন ধরে মোক্ষম একটা বক্তৃতা মুখস্থ করেছিলাম, সেটা বলতে উঠতে গিয়েই বাধা পেলাম।

অনেক দূরে দূরে আলোর বিন্দু। সঞ্চরমাণ। দূর গ্রামান্ত থেকে আরো লোক আসছে সভায় যোগ দিতে। সম্ভবত আমি যে এসেছি কিংবা আসছি, সেটা দেরিতে জানতে পেরেছে।

লোকগুলো রীতিমত সোরগোল করতে করতে আসছে।

সামন্ত মশাইকে একটু বিচলিত মনে হল। তিনি বিন্দের দিকে ফিরে বললেন, লোচনপুর বলেই যেন মনে হচ্ছে?

বিন্দে উত্তর দিল না। মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল।

বলল, জান দিয়ে গাঁয়ের ইজ্জত বাঁচাব স্যার।

বলে কিন্তু টেনে পিছনের দিকে দৌড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ঝোপঝাড়ের পিছনে অদৃশ্য।

ব্যাপারটা খুব ভাল ঠেকল না। ফ্যালার দিকে ফিরে বললাম, ফেলুবাবু, লোচনবাবু যে দল বেঁধে আসছে। মতলবটা কি?

বুঝতে পারলাম অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

মতলব আর কি স্যার! কথা ছিল, এবার ওদের গাঁয়ের লোককে গুণী সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, কিন্তু চাঁদা দেবার বেলা কেউ নেই, কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না, তাই বাতিল করে আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে। কি আর করবে ওরা!

আর কি করবে ঠিক বোঝা গেল না, তবে আধলা একটা ইঁটের ঘায়ে পিছনের হ্যাজাকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এদিকে পলকে পট পরিবর্তন।

ফ্যালাও অদৃশ্য। সামন্ত মশাই অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় মঞ্চের তলায় ঢুকে পড়েন।

মহাজনের পথই পথ। আমিও তীরবেগে মঞ্চের তলায় ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলাম।

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

এখানে স্থান-সঙ্কুলান, আপনি পুষ্করিণীর দিকে যান।

পুষ্করিণী ঠিক কোন্ দিকে জানি না। জানার কথাও নয়। আন্দাজ মতন পিছনে ছুটলাম। কয়েকটা ঝোপঝাড়, তারপরেই পানাঢাকা পুকুর দেখা গেল।

ঝোপের পিছন করলাম আত্মগোপন।

এদিকে প্রায় দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বাকি হ্যাজাকটিও ইঁটের ঘায়ে খতম। যুদ্ধটা অবশ্য একতরফা। শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন। নলহাটি ধারে কাছে কোথাও নেই।

কার রণহুঙ্কার শোনা গেল।

কই, শহরের গুণী ব্যক্তিটি কোথায়? তার ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে রাখব।

এ হেন সদিচ্ছায় চমকে উঠলাম। ঝোপের পিছনে থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হল না। লোচনপুর একটু এগিয়ে এলেই দেখতে পাবে।

পিছিয়ে পুকুরের ধারে গিয়ে বসলাম। কচুপাতার জঙ্গলে।

ঐ, ঐ দেখা যাচ্ছে। ধর ব্যাটাকে চেপে।

সম্মিলিত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমি এক অদ্ভুত কাজ করে বসলাম। কি করে করলাম তা আজও আমার বিস্ময়।

পুকুরের পাশে বাঁশের একটা মাচা বাঁধা ছিল। বোধহয় মাছ ধরার ব্যবস্থা। বিদ্যুৎগতিতে তার তলায় গিয়ে ঢুকলাম।

আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ আশ্রয় বলেই মনে হল। চারিদিকে আগাছার জঙ্গল। মোক্ষম ক্যামুফ্লেজ।

মিনিট কয়েক পরে বুঝতে পারলাম, শত্রু শুধু লোচনপুর নয়, আরও আছে। বিরাট সাইজের মশা। গঙ্গাফড়িংয়ের কাছাকাছি। একটা দুটো নয়, রীতিমতো বাহিনী। যেখানে বসে আধ লিটার শোণিত শুষে নেয়।

নিরুপায়। মারবার কোনো চেষ্টা করা মানে, নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। আধঘণ্টার মধ্যেই মনে হল যেন মধুপুর থেকে ফিরলাম। এমন স্বাস্থ্য। গালে মাংস এত ফুলে গেল যে, চোখে দৃষ্টি কমে এল।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক পর।

প্রথমে খুব মৃদু, তারপর একটু একটু স্পষ্ট হল শব্দ।

স্যার, স্যার, বেঁচে থাকেন তো একবার সাড়া দিন।

মনে হল ফ্যালারামের কণ্ঠ। লোচনপুরের নয়।

আস্তে আস্তে বললাম, কি?

এই তো বেঁচে আছেন স্যার। সাহিত্যিকের কড়া জান জানি তো, নইলে সৃষ্টি করবেন কি করে? বেরিয়ে আসুন স্যার, ব্যাটারা পালিয়েছে।

কথাটা ফ্যালা এমন সুরে বলল যেন নলহাটি বীরবিক্রমে হটিয়ে দিয়েছে লোচনপুরকে।

বহু কষ্টে বেরিয়ে এলাম। তারপরেই খেয়াল হল।

ধুতিটা কোমরে জড়ানো, নিজের পরনেরটা তো আছেই, সম্বর্ধনার ধুতিটাও, কিন্তু কলমটা নিখোঁজ।

আপনাদের দেওয়া কলমটা হারিয়েছে ফ্যালাবাবু।

আপনি দেখালেন স্যার! সাতচল্লিশ পয়সার কলম খুঁজতে গিয়ে পৈতৃক জানটা দেব? বলা যায় না, লোচনপুর হয়তো ঝোপঝাড়ে অপেক্ষা করছে। চলে আসুন।

চারিদিকে অন্ধকার। একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম ফ্যালারাম সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

নিন, উঠে পড়ুন। আপনাকে রাজারহাট পৌঁছে দিয়ে আসি। এনেছি যখন রেখে আসার দায়িত্বও আমার। ফ্যালার কর্তব্যে ত্রুটি পাবেন না স্যার।

সাইকেলের পিছনে চেপে বসলাম। আগের মতন।

কয়েক গজ গিয়েই ফ্যালা বলল, কি ব্যাপার স্যার? গোলমালে আপনাকে জলযোগ করাতেই পারলাম না, তাও যেন ভারি ভারি ঠেকছে?

ম্লান প্রায় নির্বাপিত কণ্ঠে বললাম, আপনাদের গাঁয়ের মশা শরীর ফুলিয়ে দিয়েছে।

PATHAGAR.NET

মশা নয় স্যার, ডাঁশ। একদিন আমাকে ঘর থেকে টানতে টানতে উঠানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। বোলতাকেও হার মানায়। গিয়ে এক ডোজ আর্নিকা খেয়ে নেবেন স্যার। নইলে নির্ঘাত জ্বর হবে।

কোনো উত্তর দিলাম না। উত্তর দিতে ভাল লাগল না।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তন্দ্রা ভেঙে গেল ফরফর ফরফর শব্দে।

সর্বনাশ, ডাঁশের পাখার আওয়াজ নাকি? শিকারের পশ্চাদধাবন করেছে?

ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম ব্যাপার আরও মারাত্মক। পরনের ধুতিটা সাইকেলের চাকার মধ্যে ঢুকেছে। চাকার আবর্তনের সঙ্গে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হচ্ছে। আমার প্রায় বে-আব্রু অবস্থা।

ফ্যালাবাবু সাইকেল থামান।

আবার কি হল?

ফ্যালারাম সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল পথের ওপর।

কি হয়েছে বললাম।

শুনে ফ্যালারাম চেঁচিয়ে উঠল, তাইতো বলি, সাইকেলে চালাতে এত জোর লাগছে কেন? ভাবলাম স্যার কি ক্রমেই ওজন বাড়াচ্ছেন?

আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম, এখন উপায় ফ্যালাবাবু?

ফ্যালারাম কয়েক মুহূর্তে ভাবল, তারপর বলল, উপায় তো আপনার কোমরে স্যার।

কোমরে?

হ্যাঁ, নলহাটি সংস্কৃত সমিতি জিন্দাবাদ। সম্বর্ধনার ধুতিটা জড়িয়ে নিন।

কথাটা আমার মনে ছিল না। সেই ধুতিটা পরলাম, ছেঁড়া বাঁচিয়ে! পরনের ধুতিটা তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিতে যেতেই ফ্যালা বাধা দিল।

ফেলবেন না স্যার। সিটের ওপর ওটাই ডানলোপিলো করে নিন। বসতে আরাম পাবেন। এত বড় একটা সম্বর্ধনার ঝড় গেল শরীরের ওপর দিয়ে।

তাই করলাম, তবে সুখভোগ অদৃষ্টে নেই। কয়েক গজ গিয়েই ফ্যালরাম সাইকেলে থামাল।

আপনি চলে যান স্যার, ওই রাজারহাট। আমি আর যাব না। গেলেই সাইকেলের দোকানওলা সাইকেল ফেরত চাইবে। সাইকেল দিলে আমি ফিরব কিসে?

কিছু বললাম না, নলহাটি সংস্কৃতি সমিতির গুণী সম্বর্ধনায় পাওয়া ধুতি পরে রাজারহাটের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম।

PATHAGAR.NET

ইদু মিঞার মোরগা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বৌ জোহরা প্রায়ই ঝগড়া করে :

—ওটাকে এবার বিক্রি করে দাও না। দিব্যি তেল চুকচুকে হয়েছে—গোস্ত হয়েছে অনেক। এখন বেচলে কোন্ না চারটে টাকাও দাম পাওয়া যাবে ওর।

কিন্তু ইদু মিঞা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, এখন থাক।

—থাক? কেন থাকবে? খাসি মোরগ—গোস্ত খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে তো লাগবে না। মিথ্যে পুষে লাভ কি?

—ওকে পুষতে তোমার কি খুব খরচ হচ্ছে?—ইদু মিঞা কান থেকে একটা বিড়ি নামায় : ঘরের খুদকুটো আর আদড়ে-পাঁদাড়ে যা পায় কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায়। ওর জন্যে তোমার চোখ টাটায় কেন?

জোহরা বলে, এমনি টাটায় না। আর ক-দিন পরে বুড়ো হয়ে যাবে, পোকা পড়বে গায়ে, শক্ত ছিবড়ে হয়ে যাবে মাংস। আট গণ্ডা পয়সাও কেউ দেবে না তখন।

—দরকার নেই। ও যেমন আছে তেমনি থাক।

শুনে গা জ্বালা করে জোহরার।

—বেশ তো, বেচো না তুমি। একদিন নিজেই আমি ওটাকে কেটে উনুনে চড়াব।

বিড়িটা ধরতে ধরতে শান্ত কঠিন গলায় ইদু মিঞা বলে : তা হলে সেদিনই আমি পাড়া-পড়শী জড়ো করবো সমস্ত। তারপর সকলের সামনে চেঁচিয়ে তিনবার বলবো :তালাক্—তালাক্—তালাক্—

—এতবড়ো কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে! আমার চাইতে ওই খাসি মোরগটাই বড়ো হল তোমার কাছে!—জোহরার চোখে জল আসে : বেশ তাই হোক। আমাকে তুমি তালাকই দাও।

জোহরার চোখের জল অনেকবারই অনেক অঘটন ঘটিয়েছে ইদু মিঞার জীবনে। ডাইনে চলতে গিয়ে অনেকবার বাঁয় ঘুরেছে—যাদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে চেয়েছিল, আপস করে নিতে হয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে ইদু মিঞা কিছুতেই বশ মানতে রাজি নয়। কি যে টান তার পড়েছে ওই খাসি মোরগটার ওপর—নিজেও খাবে না, কাউকে বিক্রিও করবে না।

খরিদ্দার এসে হয়তো বলে, কাল দাওয়াত আছে—তোমার খাসি মোরগটা হলে বেশ কুলিয়ে যায়।

PATHAGAR.NET

—খাসি মোরগটা না হলেও তোমার কুলিয়ে যাবে মিঞা। আরো দশটা তো রয়েছে—যেটা খুশি বেছে নাও না। ওটা আমি বেচবো না।

—বেচবে না? কেন বেচবে না? তিন টাকা দিচ্ছি—

—দশ টাকাতেও বেচবো না।

—হঠাৎ এত দরদ কেন? ধর্মব্যাটা নাকি তোমার?

—আমার যাই হোক, তোমার কি?—ইদু মিঞা চটে ওঠে : আমি ওটা বেচবো না—এই আমার পাকা কথা ব্যাস।

লোক জানাজানি হয়ে গেছে এখন খাসি মোরগটা ইদু মিঞার ধর্মব্যাটা!

শুধু গজগজ করে জোহরা।

—এত হাঁস-মোরগী শেয়ালে-ভামে খেয়ে যায়, ওটাকে তো ছোঁয়ও না! ওটা যমের অরুচি!

ইদু মিঞা বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে। একটা কথা গলার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারে না সেটা। কেমন সঙ্কোচ আসে—কেমন মনে হয় কেউ তাকে বুঝবে না।

সে নিজেই কি বোঝে কেন এমনটা হল?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মুরগি জবাই দিয়েছে সে। আজও দিতে হয়। কিন্তু মাত্র দু'বছর আগে—

বাড়িতে কুটুম এসেছিল। মুরগি কাটতে হবে। প্রথমেই ইদুর নজর পড়েছিল ওটার দিকে। দিনের বেলা মুরগি ধরা সহজ নয়।

পাঁচ-ছ'জন মিলে ওটার পিছনে ছোটাছুটি শুরু করে দিলে। সারা উঠোনময় দৌড়ঝাঁপ চলতে লাগলো। ইদু উঠোনের পেয়ারাতলায় বসে দেখছিল ব্যাপারটা। মোরগটা হয়তো টের পেয়েছিল—যেমন করে সমস্ত প্রাণীই টের পায়। যে কারণে কসাই এসে দড়ি ধরলে গোরু কিছুতেই নড়তে চায় না। যে কারণে ছুরি আনবার আগেই পাঁঠা ব্যা ব্যা করতে থাকে—সেই কারণেই ওটা কিছুতেই ধরা দিতে চাইছিল না। তারপর যখন দেখল আর আত্মরক্ষার কোনো আশাই নেই, তখন পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একেবারে ইদু মিঞার কোলের মধ্যে এসে পড়ল।

ইদু তৎক্ষণাৎ ওর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল হঠাৎ। থর থর করে একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঁপছে মোরগটা—বিচিত্র কাতর প্রার্থনায় তাকাচ্ছে তার দিকে, আর ভয়ার্ত শিশুর মতো আশ্রয় খুঁজছে তার বুকের ভেতরে।

একটা আশ্চর্য করুণায় ইদুর সমস্ত মন ভরে উঠলো। মোরগটা বুকে জড়িয়ে ধরে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, এটা থাক—অন্য মুরগি জবাই হবে আজ।

সেই থেকেই ওটা গোকুলে বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তিতে ইদুর মনে হয়, সংসারে কি একরাশ লকলকে জিভ ছাড়া কিছুই নেই আর? মানুষ যা দেখে তাই

খেতে ইচ্ছে করে তার? একটু স্নেহ নেই, একটু করুণা নেই—একবিন্দু সহানুভূতি নেই কোথাও?

বাইরে থেকে কঁক্ কঁক্ আওয়াজ উঠল একটা। তারপরেই ক্যাঁ ক্যাঁ করে কয়েকটা তীব্র আর্তনাদ, সন্দেহ নেই—ওই খাসি মোরগটারই গলা।

ইদু দাঁড়িয়ে উঠল তড়াক করে। একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়। শেয়াল এসে ধরল নাকি দিনের বেলাতেই?

তারপরেই মুরগির ক্যাঁ ক্যাঁ একটানা আওয়াজ ছাপিয়ে দরাজ গলার হাঁক উঠলো, ইদু শেখ আছ নাকি—ও ইদু শেখ?

একটা তীব্র সন্দেহে এক লাফে ইদু মিঞা বেরিয়ে এল বাইরে।

অনুমান নির্ভুল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দবিরুদ্দিন দফাদার। হাঁড়েলের মতো প্রকাণ্ড মুখে চরিতার্থ হাসি। তার হাতের ভেতরে মোরগটা প্রাণপণে ছটফট করছে আর চিৎকার জুড়ে দিয়েছে তারস্বরে। একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে দবিরুদ্দিন বাঁধছে মোরগের পা দুটো।

ইদু আর্তস্বরে বললে, ওটা ধরেছ কেন দফাদার সাহেব? ছেড়ে দাও ওকে।

দৈত্যের মতো চেহারার দবিরুদ্দিন কাঠচেরার মতো খরখরে আওয়াজ করে হাসল।—বড়ো জবরদস্ত মোরগা মিঞা—এমনটি সহজে দেখা যায় না। ধরেছি যখন আর ছাড়ছি না। কত দাম চাও—বলো।

—খোদার কসম—আমি ওটা বেচব না।

দবিরুদ্দিন কথা বাড়াবার দরকার বোধ করল না। খাকি রঙের সরকারী জামাটার পকেটে হাত দিয়ে দুটো রুপোর টাকা বার করে আনল। তারপর ঠন্ ঠন্ করে ইদুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেড় টাকার বেশি দাম হয় না—এই নাও, পুরো দুটো টাকাই দিলাম।

ইদু প্রায় হাহাকার করে উঠল।

—ওকে ছেড়ে দাও দফাদার সাহেব, আল্লার দোহাই—ছেড়ে দাও ওকে। আমি কিছুতেই প্রাণে ধরে ওটাকে কাটতে দিতে পারবো না।

—শেষে মোরগার ওপর দরদ উথলে উঠেছে নাকি? সোভান্ আল্লা!—আবার কাঠচেরার মতো করকরে আওয়াজ তুলে হাসলো দফাদার। তারপর হাঁটতে শুরু করল গজেন্দ্র-গমনে—মোরগটার কাতর আর্তনাদ যেন ছুরির পোঁছের মতো ইদুর বুকে এসে বিঁধতে লাগল।

ইদু মিঞা শেষবার অসহায় গলায় ডাকল : দফাদার সাহেব!

দফাদার জবাব দিল না। দরকারই বোধ করল না আর।

কয়েক মুহূর্ত ইদু দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে—তারপর চুপ করে বসে পড়ল

ধুলোর ওপর। চোখের জলে দু'-চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে—মোরগের কাতর মিনতি এখনো কানে ভেসে আসছে তার।

ছুটে এল জোহরা! আশ্চর্য, মুরগির ওপরের সমস্ত ক্রোধটা তখন তার দফাদারের ওপর গিয়ে পড়েছে।—জোর করে কেড়ে নিয়ে একি জুলুমবাজি—আকাশের দিকে হাত তুলে জোহরা বললে, ওই মোরগ কখনো ও খেতে পারবে না। খোদা আছেন—তিনিই বিচার করবেন।

গরীবের প্রার্থনা খোদা কখনো শুনতে পান না—তিনি হাইকোর্টের জজের মতো। উকিল-ব্যারিস্টারকে বিস্তর টাকা খাওয়াতে পারলে অর্থাৎ মোল্লা-মৌলবীদের যুতমতো ভেট যোগাতে পারলে তবেই আরজি পেশ করা যায় তাঁর দরবারে। সবাই এ কথা জানে, দবিরুদ্দিন দফাদারও জানত। কিন্তু আজ বোধহয় তিনি বোগদাদের বাদশা হারুণ-অল-রশিদের মতো ছদ্মবেশে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাই জোহরার প্রার্থনা তিনি শুনতে পেলেন। মোরগটা সত্যিই দবিরুদ্দিনের ভোগে লাগল না।

খানিক দূরে হাঁটতেই দেখা হয়ে গেল দীন মহম্মদ দারোগার সঙ্গে। একটা সাইকেলে করে থানার দিকে ফিরছিলেন। অভ্যাসবশে দাঁড়িয়ে পড়ল দফাদার—সজোরে সেলাম ঠুকলো একটা।

দারোগা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঝাঁ করে নেমে পড়লেন হঠাৎ। তাঁর চোখ মোরগের দিকে গিয়ে পড়েছে।

—খাসা মোরগটা তো দফাদার। কিনলে নাকি?

মুহূর্তে দফাদার বুক শুকিয়ে গেল।—জী হুজুর, কিনলাম বৈকি। বিনে পয়সায় আমাদের আর কে দিচ্ছে এসব?

—বড়ো ভালো চিজ, আজকাল এমনটি আর দেখাই যায় না—দারোগা ঠোঁট চাটলেন।

—জী হাঁ। সন্ত্রস্ত গলায় দফাদার জবাব দিলে।

দারোগা আর একবার মোরগটার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন মোটা মোটা পা দুটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা হাঁড়ি-কাবাবে পরিণত হয়ে গেল; রসুন ঘি আর মসলা-জর্জরিত বাদামী রঙের হাঁড়ি-কাবাবটি যেন একেবারে দারোগার নাকের সামনেই দুলতে লাগল। আর ওই সঙ্গে যদি পোলাও হয়—এর পরে আর চক্ষুলজ্জার আবরণ রাখলেন না দারোগা।

—দাও হে দফাদার, ওটা আমার সাইকেলেই বেঁধে দাও।

দবিরুদ্দিন মুখ কালো করে বললে, কিন্তু হুজুর—

দারোগা সংক্ষেপে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আর একটা কিনে নিও। কত দিতে হবে দাম?

PATHAGAR.NET

ক্রোধে হতাশায় দবিরুদ্দিনের চোখ ধক্ ধক্ করে উঠল। মুখের গ্রাস যখন কেড়ে খাবেই, তখন কিসের এত খাতির?

দবিরুদ্দিন শুকনো গলায় বললে, তিন টাকা দেবেন হুজুর।

—তিন টাকা? চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দারোগা। তিনটে টাকার জন্যে নয়—আশ্চর্য হয়ে গেছেন দবিরুদ্দিনের দুঃসাহসিকতা দেখে। কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে এ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম। তাঁরই দফাদার একটা মুরগির দাম দাবি করে তাঁর কাছ থেকে।

পকেট থেকে তিনটি টাকা বের করে দারোগা ছড়িয়ে দিলেন রাস্তার ওপর। দবিরুদ্দিন ইদু মিঞা নয়—সঙ্গে সঙ্গে টাকা তিনটে কুড়িয়ে নিল সে।

দারোগা মনে মনে বললেন, আচ্ছা থাকো। এই তিন টাকার শোধ আমি তুলে নেব।

সাইকেলে মোরগটা ঝুলিয়ে দারোগা চললেন। সেই অবস্থাতেই একবার টিপে দেখলেন মোরগটা—একেবারে সীসের মতো ঠাসা। মোরগ আবার ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দে আর্তনাদ তুলল—দারোগার কানে শব্দটা যেন মধু বর্ষণ করতে লাগল। না—ঠকা হয়নি তিন টাকায়।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্যাডল্ করে চললেন দারোগা। বড়ো বিবি খানদানি ঘরের মেয়ে—ওদের কোনো পূর্বপুরুষ নাকি মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজেদ আলির খাস বাবুর্চি ছিল। সেই পূর্বপুরুষের গুণপনা বড়োবিবির মধ্যে এসেও বর্তেছে। চমৎকার রান্নার হাত বড়োবিবির। খেতেও হয় না—সে রান্নার খোশবুতেই মেজাজ খোস হয়ে যায়।

PATHAGAR.NET

যেন অদৃশ্য সুতোয় বাধা হাঁড়ি-কাবাবটা নাকের সামনে দুলছে এখনো! দারোগা গুন গুন করে 'মোহব্বত—এ দিল্' ছবির একখানা গান গাইতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু থানার কম্পাউন্ডে ঢুকেই চক্ষুস্থির। বারান্দায় একখানা চেয়ার টেনে বসে আছেন ইন্সপেক্টার ইমতিয়াজ চৌধুরী। জমাদার জামান মিঞা পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ইন্সপেক্টারের আর্দালি আব্দুল প্রায় কাঁদি খানেক ডাব নিয়ে কাটতে বসেছে।

দারোগা দীন মহম্মদ ট্যারা হয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টার ইমতিয়াজ চৌধুরী অত্যন্ত প্যাঁচালো লোক—মহকুমার একটি দারোগাও তাঁর জ্বালায় স্বস্তিতে থাকতে পারে না। তার ওপর দীন মহম্মদকে তিনি মোটেই নেক-নজরে দেখেন না—ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাতদিন।

বারান্দায় সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে শশব্যস্ত দারোগা ওপরে উঠে এলেন।

—আদাব স্যার, কতক্ষণ এসেছেন?

ইন্সপেক্টার তখন কুঁজোর মতো প্রকাণ্ড একটা ডাব ধরেছেন মুখের কাছে। গলার

ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছে গর্ গর্ করে। ডাবটা নিঃশেষে করে ইন্সপেক্টার সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, মুখ মুছলেন রুমালে, একটা ঢেঁকুর তুললেন, তারপর গোটা কয়েক নিশ্বাস ফেললেন বড়ো বড়ো। নাক থেকে কোঁত কোঁত করে কেমন যেন শব্দ বেরিয়ে এল খানিকটা।

ইন্সপেক্টার বললেন, এই কিছুক্ষণ হল এসেছি। সাপুইহাটির ডাকাতি কেসটা নিয়ে একটু দরকারী আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে। তা ছাড়া ইন্সপেশন্ও করব।

মনে মনে একটা অশ্রাব্য গালাগালি উচ্চারণ করলেন দারোগা।

ইন্সপেক্টার বললেন, আমার সময় বেশিক্ষণ নেই। জিপ নিয়ে এসেছি, একটু পরেই আমি সদরে ফিরে যাব। অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম, ভাবলাম আপনার এখানেও ঘুরে যাই।

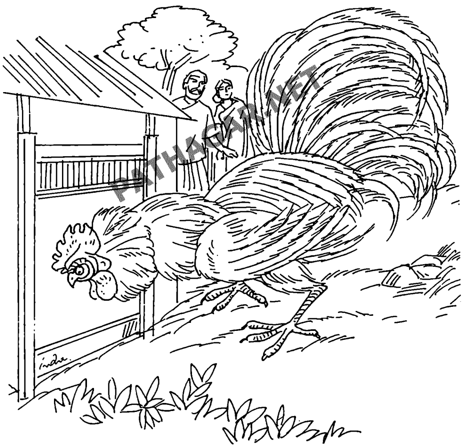

কৃতার্থ ভঙ্গিতে দীন মহম্মদ বললেন, বেশ করেছেন স্যার, ভালোই করেছেন। তাহলে আমার ওখানে খানাপিনার একটু বন্দোবস্ত করি? মনে মনে বললেন, তুমি না সরে পড়া পর্যন্ত মোরগটা আমি জবাই করছি না। তোমার খাওয়া তো আমি জানি—আমাদের জন্য হাড় ক-খানাও পড়ে থাকবে না তা হলে। চিবিয়ে তাও তুমি ছিবড়ে করে দেবে।

ইন্সপেক্টার বললেন, না—না, আমি খেয়েই এসেছি। আমার জন্যে ভাববেন না।

দারোগা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানে সন্ধ্যে হবে এ তো জানা কথা!

অতএব পরক্ষণেই ইমতিয়াজ চৌধুরীর চোখ গিয়ে পড়ল সাইকেলে বাঁধা মোরগাটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ালের চোখের মতো জ্বল জ্বল করে উঠলো তাঁর দৃষ্টি।

বাঃ—বাঃ দিব্যি চিজটি তো! কোথায় পেলেন?

দারোগার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে লাফিয়ে উঠলো। বিরস মনে বললেন, কিসের কথা বলছেন স্যার?

—ওই মোরগটা। বহুদিন এমন জিনিস চোখেও দেখিনি।

দারোগা আর্ত হয়ে উঠলেন।—ও বিশেষ কিছু নয় স্যার। ওর চাইতে ঢের ভালো মোরগা শহরে পাওয়া যায়।

—ক্ষেপেছেন আপনি?—ইন্সপেক্টার উবু হয়ে বসলেন : শহরের মোরগায় কি আর বস্তু আছে নাকি? খালি হাড় আর হাড়—মনে হয় যেন মাছের কাঁটা চিবুচ্ছি। এসব জিনিস শুধু পাড়াগেঁয়েই পাওয়া যায়। তাজা জল হাওয়ায় তেলে-মাংসে জবজবে হয়ে ওঠে।

PATHAGAR.NET

ইন্সপেক্টারের জিভে সুড়ুৎ করে শব্দ হল একটা; খানিক লালা টানলেন খুব সম্ভব।

দারোগা কাষ্ঠ হাসি হাসলেন : বেশ তো স্যার—পরে দু'-চারটে পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

—পরের কথা পরে হবে!—ইন্সপেক্টার আর মোরগাটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না : এটার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। আব্দুল, যা তো মোরগাটা জিপে তুলে নে।

চড়াৎ করে বুকের যেন একটা শিরা ছিঁড়ে গেল দারোগার।

—আমি বলছিলাম কি স্যার—

—আরে মিঞা সায়েব, আপনারা পাড়াগেঁয়ে থাকেন, ও রকম মোরগা বিস্তর পাবেন। আব্দুল, যা—ওটাকে জিপে তুলে দে চটপট। ভালো কথা, কত দিয়ে কিনেছেন মোরগা?

শেষ কথাটা বলবার জন্যেই বলেছিলেন ইন্সপেক্টার—নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই বলা। নইলে একটা মুরগি দিয়ে দারোগা ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে দাম নিতে পারে—কে কল্পনা করবে সে কথা?

মনে মনে দাড়ি ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল দারোগার। নিজের নয় ইন্সপেক্টারের। সদয় ইন্সপেক্টার আবার বললেন, কত দাম ওটার?—এই বলে যে পকেটে তিনি হাত ঢোকালেন সেখানে টাকা ছিল না।

কিন্তু বজ্রাঘাত হল বিনা মেঘেই। নিরুপায় ক্রোধে জর্জরিত হয়ে কালো মুখে দারোগা বললেন, তা হলে চারটে টাকাই দেবেন স্যার।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। জমাদার জামান খাঁ নড়ে উঠলেন, ডাব কাটতে গিয়ে ডাবের কোপটা আর একটু হলে প্রায় আব্দুলের হাতে গিয়েই পড়ত। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

দারোগা মরিয়া হয়ে বললেন, দাম একটু বেশিই স্যার। পুরো দেড়সের গোস্ত হবে—দু'-এক ছটাক বেশি বই তো কম নয়!

অদ্ভুত প্রশান্ত হাসি হাসলেন ইমতিয়াজ চৌধুরী।

—তা বটে। ভালো জিনিস হলে দাম একটু চড়াই হয়। এই নিন—এবার একটা পকেট থেকে দু'খানা দু'-টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখলেন : এই নিন। আব্দুল—

—যাতে হেঁ হুজুর—

আব্দুল মোরগটা খুলে নিলে সাইকেলে থেকে। আর একবার কঁক—কঁক—ক্যাঁ শব্দে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল একটা। দারোগা মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টার বললেন, তাহলে এবার আপনার ডাইরি-টাইরিগুলো নিয়ে আসুন দারোগা সাহেব। হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

—ভাগতা হ্যায় হুজুর, ভাগ যা—তা—আব্দুল চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেও রাখা গেল না। আব্দুলের প্রসারিত হাতে গোটাকয়েক নখের আঁচড় দিয়ে পাখা ঝাপটে চলন্ত জিপ থেকে বাইরে উড়ে পড়ল মোরগটা। দবিরুদ্দিনের আলগা ফাঁস কখন খুলে গিয়েছিল কে জানে।

—থামা, গাড়ি থামা!—ইমতিয়াজ চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠলেন।

গাড়ি ঘ্যাস—স করে থেমে গেল। ছরাৎ ছরাৎ করে একরাশ কাদা ছিটকে পড়ল চারিদিকে।

মোরগ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্যাঁক-ক্যাঁক করে একটা কচুবনের দিকে ছুটছে।

'পাকড়ো—পাকড়ো' বলে উত্তেজনায় ইন্সপেক্টার নিজেই লাফিয়ে পড়লেন নিচে।

কিন্তু পায়ের নিচে এঁটেল মাটির কাদা। লাফিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সড়াক করে

PATHAGAR.NET

হাত তিনেক পিছলে গেলেন ইন্সপেক্টার, তারপর নাচের ভঙ্গিতে বোঁ করে একটা পাক খেলেন, তারও পরে একখানা মোক্ষম আছাড়—একেবারে সোজা চলে গেলেন লাটাবনের ভেতরে।

আব্দুল আর ড্রাইভার ছুটেছিল মোরগের পেছনে—দৌড়ে ফিরে এল তারা। ইন্সপেক্টার তখন আর উঠতে পারছেন না—একটা হাঁটুতে বোধহয় ফ্রাকচার হয়ে গেছে। লাটাবনের কাঁটায় গাল-কপাল ক্ষত-বিক্ষত!

ইন্সপেক্টারকে যখন জিপে তোলা হল, তখন আর পলাতক মোরগটাকে খুঁজে বের করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। খোঁজখবর করার মতো কারো মনের অবস্থাও নয়।

সন্ধ্যা নামছিল আস্তে আস্তে। ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসেছিল ইদু মিঞা। মোরগার শোক এখনও তার বুকে পুত্র-শোকের কাঁটার মতো বিঁধছে। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে শোনা গেল : কঁরর্—কোঁকোর—কোঁ—

ইদু মিঞা চমকে উঠল। সেই ডাক! ভুল শুনছে না তো? নাকি মোরগটার প্রেতাত্মা মায়ার টানে শূন্য থেকে জানান দিয়ে গেল?

আবার সেই ডাক : কঁক্—কঁক্—কোঁকর কোঁ—ওঁ—ওঁ—

উঠোন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জোহরা, সাহেব তোমার মোরগ ফিরে এসেছে। বসে আছে চালের ওপর!

ইদু লাফিয়ে নেমে পড়ল উঠোনে। সত্যিই ফিরে এসেছে। গাঁয়ের মোরগ—বহুদূর পর্যন্ত চড়ে বেড়ায়—মাইল খানেক রাস্তা চিনে আসতে খুব অসুবিধে হয়নি তার।

চালের ওপর বসে তৃতীয়বার মোরগ জয়ধ্বনি করল। তারপর ঝটপট করে উড়ে পড়ল উঠোনে—বিজয়ী সম্রাটের মতো মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল নিজের খোঁয়াড়ের দিকে।

আরও তিনটে ছোট ছোট ঘটনা তারপরে।

কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার জন্যে একমাস পরে দারোগার রিপোর্টে দবিরুদ্দিন দাফাদারের চাকরি গেল।

প্রায় দেড়মাস পরে ভাঙা হাঁটুতে জোড়া লাগল ইন্সপেক্টার ইমতিয়াজ চৌধুরীর।

আরো তিনমাস পর সাপুইহাটির ডাকাতির ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড হয়ে গেলেন দারোগা দীন মহম্মদ।

PATHAGAR.NET

বর্ড ধার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রামজীবনবাবু এককালের নামকরা গল্প-লিখিয়ে ছিলেন। উপন্যাসের না হোক, ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটা স্থায়ী আসন থাকবে। আর উষারঞ্জনবাবু তাঁরই সমসাময়িক তীক্ষ্ণ সমালোচক। একটা সময় ছিল যখন কোনো সাহিত্য-পত্রে অথবা সাহিত্য সংকলনে রামজীবনবাবুর গল্প না থাকলে বহু পাঠক ঠোঁট উল্টে সেই সাহিত্যপত্র বা সংকলন একদিকে সরিয়ে রাখতেন। অন্যদিকে, সমালোচনা সাহিত্য আজকের দিনেই কে কতটুকু পড়ে—সেদিন তো আরও কম পড়ত, তবু সেদিনও উষারঞ্জনবাবুর কিছু বক্তব্য বা মন্তব্য চোখে পড়লে পাঠকের আগ্রহ একটু অন্যরকম হত। তাঁর টীকাটিপ্পুনি আর চুলচেরা বিশ্লেষণে অনেক রসের খোরাক থাকত।

রামজীবনবাবু এখন আর গল্প লেখেন না। বয়েস সত্তরের দিকে গড়িয়েছে, দু'বার দুই চোখের ছানি কাটিয়ে লেখা ছেড়েছেন। বাড়িতে এখন দু'মাস ধরণা দিয়ে পড়ে থাকলেও একটা ছোট লেখা মেলে না। আর উষারঞ্জনবাবু কলম ধরা ছেড়েছেন তাঁরও আগে। তাঁর অঢেল টাকা এবং পৈতৃক সম্পত্তি। জীবিকা অর্জনের জন্যে কোনোদিন লিখতে হয়নি তাঁকে। বরং একালে নিজের টাকায় কাগজ করে অনেক লেখকের উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছিলেন তিনি। শুভার্থী চিকিৎসকরা ব্লাডপ্রেসার রোগটা পাকাপোক্তভাবে তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তিনিও লেখা ছেড়েছেন। দু'জনে এক বাড়িতেই থাকেন। বাড়িটা উষারঞ্জনবাবুর। ওপর তলায় থাকেন, নিচের তলায় বিনা ভাড়ায় রামজীবনবাবু থাকেন। সকাল বিকেল দু'জনে একসঙ্গে বেড়ান, চেঞ্জে যেদিন আসেন—একসঙ্গেই আসেন। বৈঠকে সেদিন ভারি উল্লাস। তাঁরা এলেই তিন-চারজন তিন-চারদিকে ছোটে অনুপস্থিত সভ্যদের খবর দিয়ে ধরে নিয়ে আসতে। ফলে বৈঠক ঘরে সেদিন ঠাসাঠাসি ভিড়। রামজীবনবাবু গল্প আর লেখেন না বটে, কিন্তু গল্প করেন। ভারি মজার গল্প। নিজের জানা গল্প। যে গল্পই বলুন, জমজমাট। এদিকে উষারঞ্জনবাবুরও সমালোচনার স্বভাবটি একেবারে যায়নি। গল্পের শুরুতে হোক, মাঝে হোক বা শেষে হোক, বারকতক গুল ফোটাবেন, আর কিছু না কিছু মন্তব্যও করবেন। আমার বিশ্বাস এই সান্ধ্য বৈঠকে এ পর্যন্ত রামজীবনবাবু যত গল্প বলেছেন, শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই অনায়াসে কেউ মোটামুটি সাহিত্য-খ্যাতি কুড়োতে পারে। আর উষারঞ্জনবাবু বিদ্রূপ ব্যঞ্জনা টীকা-টিপ্পনীর ধারা মক্স করে মোটামুটি সমালোচক হয়ে বসাও সম্ভব।

PATHAGAR.NET

গরমে হাওয়া বদলে আসার পর বৈঠকে সেইদিন প্রথম পদার্পণ তাঁদের। আমরা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে বসে আছি। রামজীবনবাবু গুড়গুড় করে তামাক টানছেন আর আমাদের প্রত্যাশা দেখে মিটিমিটি হাসছেন। একটু তফাতে উষারঞ্জনবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দামী সিগারেট টানছেন। তিনি শৌখিন মানুষ, গম্ভীরও। রামজীবনবাবু মুখে খুললে তাঁর মুখ আদৌ খুলতে না পারে।

কিন্তু রামজীবনবাবু মুখ খুললেন, কারণ ঘরের একদিক থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের কথা কিছু বলবার জন্যে বায়না হয়েছে। তাই শুনেই মিটিমিটি হাসছিলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক্ষায় রেখে গড়গড়ার নলটা একপাশে সরিয়ে সকলের উদ্দেশ্যেই হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, সাহিত্যিক হবার জন্য তোমরা কেউ বউ ধার করেছো কখনো?

প্রথম বলতে এগিয়েই গল্পের আসর মাত। আমরা সাগ্রহে নড়েচড়ে বসলাম। অন্যদিকে মুখ বাঁকিয়ে ক্রিটিক উষারঞ্জনবাবু মন্তব্য করলেন, সূচনা অশ্লীল। শুনব! শুনব! চারদিকে থেকে উৎফুল্ল তাগিদ।

রামজীবনবাবু বললেন, সাহিত্যিক হবার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল, বউ ধারটাই তার মধ্যে বড় ব্যাপার।

উষারঞ্জনবাবু এবারে সরাসরি ভুরু কুঁচকে তাকালেন তাঁর দিকে। ধারের অভ্যাস সহজে যায় না শুনেছি। তোমার গেছে তো?

রামজীবনবাবু বক্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে গড়গড়ার নলটা মুখে ঠেকালেন। নিজের পরিবারকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো, গেছে কিনা!

আবার দমকা হাসি। উষারঞ্জনবাবু আর বাধা সৃষ্টি না করে সিগারেট টানতে লাগলেন। গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখলেন যেন। গল্প আজ ভালোরকম জমবে সেই আশায় উন্মুখ সকলেই।

রামজীবনবাবুর গল্প তাঁর নিজস্ব জবানীতে বলাই ভালো। এর মধ্যে লেখকের কারিগরি ফলাতে গেলে গল্পের রস ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা। গড়গড়ার নল রেখে উষারঞ্জন মুখের ওপর একটা তির্যক নিরীহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি আসরে উত্তীর্ণ হলেন। এক নজরে সকলের প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশাটুকু দেখে নিয়ে প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস ঠোঁটের ফাঁকে আটকে রাখলেন।

—আমাদের সময় ভাই লেখক আজকের মতো এত সহজ ছিল না। সেদিক থেকে তোমরা ভাগ্যবান। লেখার বুলি ফুটাতে লেখকের কাছে তখন সম্পাদক বা প্রকাশক ছুটত না। সকাল দুপুরে বিকেল রাত্তিরে লেখককেই তাঁদের দ্বারস্থ হতে হত। নামজাদা উকিলের সামনে খুদে মক্কেল যেমন মুখ করে বসে থাকে, বা রায় দেবার সময় আসামী যেমন করে বিচারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে—আমাদেরও সম্পাদকের কাছে সেই ভাবে গিয়ে ধরণা দিতে হয়। লেখা সচল কি অচল সেই রায়ের অনিশ্চয়তায় তেমনি করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত। সোনার মতো

নিক্তির ওজনে গল্প বিচার করা হত তখন। একটা শব্দের এদিক-ওদিক হলে সম্পাদকের বিবেচনার নিক্তিতে কম করে দশ রতি তফাৎ।

প্রবীণ সমালোচক ঊষারঞ্জনবাবু সিগারেটের টুকরো অ্যাশ-পটে গুঁজতে গুঁজতে মন্তব্য করলেন, বোরিং।

রামজীবনবাবু কর্ণপাত করলেন না। বলে গেলেন, এই ওজনটা তখন সব থেকে বেশি হত কথাঞ্জলি কাগজে। কথাঞ্জলি নাম তোমরা সকলেই শুনেছ নিশ্চয়। কথাঞ্জলিতে অঞ্জলি না উতরালে লেখকের লেখক হওয়া প্রায় দুরাশা ছিল। ফলে ছোট-বড় সব লেখকই তখন কথাঞ্জলির চারধারে গুনগুনিয়ে ঘুর ঘুর করতেন।

—আমার সময় সেই কথাঞ্জলিতে এক নবীন সম্পাদক জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর নাম-ধাম আর প্রতাপ আরো বেশি ছড়িয়েছিল, কারণ লেখকের লেখা ছাপা হলে তিনি টাকা দিতে শুরু করেছিলেন। এক একটা লেখা প্রতি দশ টাকা পর্যন্ত। ভাবো একবার, অন্য কাগজের সম্পাদকরা নামী লেখকদের কাছ থেকে তখন দু'টাকায় গল্প পেতেন। ছোট লেখকদের টাকা পাওয়া দূরে থাক, বাড়ির কলাটা মুলোটা চুরি করে নিজেদের গাছের জিনিস বলে সম্পাদকদের দিয়ে আসতে হয়।

—এই কথাঞ্জলিতেই লেখা ছাপানোর চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম আমি। সম্পাদক নবীন হলে কি হবে, প্রবীণদের ভিড়ের ঠেলায় তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায়। আর সুযোগ-সুবিধে মতো কাছে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলেও কথা তিনি বড় কইতেন না। বহু আয়াসের এক একটা লেখা বহু লেখার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, দেখব—। কখনো বা লেখা সমেত লেখক ফিরিয়ে দিতেন।—গল্প দরকার নেই এখন,—শেষের দিকে এক মস্ত লেখকের—নাম করব না—চিঠির ফলে সম্পাদক আমার লেখাগুলো একটু-আধটু উল্টে-পাল্টে দেখতেন। তারপর লেখাগুলো ফেরত আসত। কখনো বা সহৃদয় নির্দেশ থাকত, লেখার মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে। আরো অনেক লিখে হাত মকস্ করুন, ভাল লেখা পাঠান ইত্যাদি।

ওইটুকুতেই গলে যেতাম একেবারে। আশার আনন্দে তিন গুণ উৎসাহ নিয়ে লেখা মকস্ করতাম। ক্রমাগত নূতন লেখা দিয়ে পুরনো লেখা ফেরত নিয়ে আসতাম।

কিন্তু কথাঞ্জলিতে কল্কে পাওয়ার মতো লেখা কিছু আর লিখে উঠতে পারিনে। ভাগ্যক্রমে একদিন পত্রদাতা সেই অগ্রজ লেখককে উপস্থিত দেখলাম সেখানে। আরো অনেকে ছিলেন। আমাকে দেখিয়ে তিনি সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কাগজে এ তো আজকাল বেশ লিখছে-টিকছে—আপনি কেমন বুঝছেন?

সম্পাদক জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। সামান্য একটু মাথা নেড়েছেন শুধু। অর্থাৎ আশা আছে।

আমার পত্রদাতা বৃদ্ধ লেখকটি রসিক মানুষ। এবারে আমার দিকে চেয়েই ঠাট্টা করলেন, তোমার বউ অমন সুন্দরী দেখতে, তোমার তো ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প লেখা

PATHAGAR.NET

উচিত। এবার করে বউ নিয়ে রাস্তায় বেরুবে, চারদিকে চোখ রাখবে, আর বাড়ি ফিরে একটা করে গল্প লিখবে। সকলেই হেসে উঠেছিলেন, লজ্জায় আধোবদন হলেও আড়চোখে চেয়ে দেখি কর্মব্যস্ত সম্পাদকও হাসছেন মৃদু মৃদু।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে সস্ত্রীক একদিন রাস্তায় দেখা গিয়েছিল। আমরা প্রণাম করেছিলাম। তারই জের।

এবার ভায়া একটা গোপন কথা ফাঁস করছি তোমাদের কাছে।

নিজের স্ত্রীটিকে আমি তেমন সুন্দরী দেখতাম না। কারণ আমি আরো একটি সুন্দরী দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখতাম। তিনি আমার স্ত্রীর সহোদরা। সুন্দরী বলে সুন্দরী, একেবারে মিষ্টি সুন্দরী। চলন-বলন, রাগ-বিরাগ, ঠাট-ঠমক—সব মিষ্টি। তার ওপর সেইদিনে বি-এ পড়েন, ভাবো একেবারে—নাম করলেই তোমরা চিনে ফেলবে, নাম করব না। আমি একটা নাম দিয়েছিলাম। পদ্মা, পদ্মা দেবী। পদ্মা দেখেছ তোমরা? এমনিতে খুশির ঢেউ, ভ্রূকুটিও রোমাঞ্চকর—কিন্তু ঝড় উঠলে থর থর কাঁপুনি। মোট কথা ও শ্যালিকাটির রূপের জোয়ারে গোপনে আমি দিশেহারা হতাম প্রায়ই। মনে মনে আফশোস হত, সাত তাড়াতাড়ি বিয়েটা না করে বসলে এই পরেরটিকেই ধরা যেত। খেদটা পদ্মা দেবীর কাছে একদিন প্রকাশ্যে প্রকাশও করে ফেলেছিলাম। তার ফলাফল ভয়াবহ হয়েছিল।

আর একটা কথাও এই ফাঁকে বলে নেওয়া দরকার। সেটা আমার ভাগ্যের কথা। বিয়ের পর ভাগ্য ফেরে, এ ধরনের কথা শোনা ছিল। কিন্তু বোন বিয়ে দেবার পর শালার ভাগ্য ফেরে, এ রকমের কথা কখনো শুনিনি। আমার বরাতে তাই ঘটলো। বোন বিয়ে দেবার পরেই শালার ব্যবসায় ভাগ্য বৃহস্পতির উদয়। দু'বছরের মধ্যে তাদের একটা নিজস্ব গাড়ি পর্যন্ত (যদিও সেকেন্ড হ্যান্ড) হয়। গাড়ি চড়ে পদ্মা দেবী কলেজে যাতায়াত করতেন। যাক্, এবারে আসল গল্প। স্মৃতির আমেজে রামজীবনবাবুর দু'চোখ আধ বোজা—দিনটা এত বছরেও চোখের উপর ভাসছে। বেলা তখন তিনটে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশের অবস্থা মুখ ভার করা কালো মেয়ের মতো। আমি পায়ে হেঁটে চলেছি কথাঞ্জলির দপ্তরে। পুরনো গল্প ফেরত নিয়ে যথারীতি নতুন গল্প দিয়ে আমার মুখটা দপ্তরে পৌঁছনোর আগে হাসি হাসি করে নেব।

অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ঘ্যাঁচ করে একেবারে গা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়াল। একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার অবকাশ পেল না। চেয়ে দেখি পিছনের সীটে সমাসীনা পদ্মা দেবী। দরজা খুলে দিয়ে ডাকলেন, উঠে আসুন।

বিনা বাক্যে উঠে আবার গাড়ি চলল। তারপর শ্যালিকার সভাবসুলভ গঞ্জনা, এভাবে হাঁ করে চলেছেন কোথায়? একদিন গাড়ি চাপা পড়বেন দেখছি।

বললাম, পড়লে জ্বালা জুড়তো।

বুক মোচরানো ভ্রূকুটি-সৌন্দর্যে খানিক ডুবে থাকার পর আসল কাজটা মনে

PATHAGAR.NET

পড়ল। বললাম, আমার তো ভাই একটা কাজ সেরে যেতে হবে। ড্রাইভারকে গন্তব্য পথের নির্দেশ দেওয়া হল।

কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতেই অন্তঃস্থলের কি এক অদৃশ্য যন্ত্রণায় বারবার রোমান্টিক হয়ে উঠতে লাগলাম। যত ভাবছি তত মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, আর জলতেষ্টা পাচ্ছে। আশা মরীচিকা, কিছুতেই আর সেই আশার হাতছানি এড়ানো গেল না। হঠাৎ ঘোষণা করলাম, ভয়ানক জ্বর আসছে।

এত জ্বর আসছে যে শরীরটা আর খাড়া রাখতে পারছি না।

মুখ-চোখের অবস্থা দেখে পদ্মা দেবীরও ভালো লাগল না। প্রথমে হাত পরে কপাল পরীক্ষা করলেন।—কই, গা তো ঠাণ্ডা পাথর। বললাম, বেজায় শীত করছে, তাই ঠাণ্ডা বোধ হয়। জ্বরটা খুব তেড়ে আসছে, মাথা তুলতে পারছি না।

বাড়ি চলুন। না, আজকেই লেখাটা দেবার কথা, দিয়েই যাই। সম্পাদক আবার কথা না রাখলে বেজায় চটেন। নামকরা এই সম্পাদকটির নাম উনিও জানতেন। আর বাধা দিলেন না। এদিকে অদৃষ্টও প্রসন্ন, জল চেপে এলো। গাড়িটা সম্পাদকের দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়াতে ঘোষণা করলাম, জ্বরও চেপে আসি আসি করছে, সর্বাঙ্গে কাঁপুনি, আর বসতেও পারছি না।

এ অবস্থায় কি আর করতে পারি? যা পারি তাই করলাম। পদ্মা দেবীর কাছে আবেদন করলাম, এই জলে ভিজলে মরেই যাব, তুমি এক কাজ করবে ভাই—লেখাটা সম্পাদকের হাতে দিয়ে আসবে দয়া করে? আমি গাড়িতে বসে আছি বোলো না যেন, এ পর্যন্ত এসেও দেখা করলাম না। অসুখ বিশ্বাসই করবে না—সম্পাদক কিনা, ভয়ানক রাশভারী, তোমার কিছু ভয় নেই, শুধু অসুস্থ জানিয়ে লেখাটা দিয়ে আসবে। ভয়টা আবার কিসের, এতদিন দিয়ে আসছি।

PATHAGAR.NET

আমার দুরবস্থা দেখেই মনে মনে রাশভারী সম্পাদকের ওপর চটেছেন উনি, তার ওপরে ভয়ের কথা বলতে আরো একটু মেজাজ চড়েছিল। লেখা হাতে করে তিনি বীরাঙ্গনার মতোই গাড়ি থেকে নামলেন। কিন্তু বৃষ্টি যে! শাড়ির আঁচলটা মাথায় জড়িয়ে একছুট।

আমি ঘাড় বাড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে তাড়াতাড়ি সরে এসে একেবারে গাড়ির কোণে মিশে থাকতে চেষ্টা করলাম। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং সম্পাদক। লোক না থাকায় আলসেয় দাঁড়িয়ে জল দেখছিলেন বোধ হয়। বৃষ্টি বিড়ম্বিতা ত্বরিতচরণা রমণী মূর্তিটি ছাড়া আর কিছু তাঁর চোখে পড়েনি, পরার কথাও নয়, জেনেও ভিতরটা আমার ধুকধুক করতে লাগল।

মিনিট আট-দশ বাদে তিনি ফিরে এলেন। আবারও মাথায় কাপড়টি তুলে দিয়ে এক দৌড়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। একগাল হাসিভরা জলেভেজা মুখখানি দেখে আমি যে বেজায় অসুস্থ সেটা নিজেই ভুলে বসার দাখিল। গাড়িটা খানিক এগোতে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম।—কি হল? দিয়ে এলাম, ভদ্রলোক তো খারাপ নয়, আপনি ওরকম বললেন কেন? মাঝখান থেকে আমিই বিচ্ছিরি ঠাট্টা করে এলাম।

সর্বনাশ, কি বলে এলে?

বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি।—আপনি আচ্ছা ভীতু তো? ভয় নেই, আপনার আগের লেখাটা মনোনীত হয়েছে বললেন, আর এ লেখাটাও রেখে দিলেন। জয় গণেশ! জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ! আমার সেই আবেগের মুখ আগলাতে কি ধকল গেল সে তোমরা বুঝতে পারবে না ভায়া। কোনোমতে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি বললেন?

—উনি বললেন, অসুখ যখন কি দরকার ছিল আপনার কষ্ট করে লেখা নিয়ে আসার, পরে পাঠালেই হত।

তুমি কি বললে? আমি বললাম আপনি সম্পাদক, আপনাদের বিরাগভাজন হবার কথা মনে হলেই লেখকের হার্টফেল করার দাখিল। অসুখ থাক আর যাই থাক সময় মতো লেখা পৌঁছে দিতে হবে—তারপর সে লেখা আপনারা ছাপুন বা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটেই ফেলুন।

আমি হাওয়ায় ভাসছি।—তারপর? তারপর?

—তারপর আর কি! আমি তো আর লেখিকা নই যে ভয় করবে! হেসে হজম করলেন, বললেন জল থামলে যেতে, বললেন এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে—আপনি গাড়িতে বসে ধুঁকছেন সে তো আর তিনি জানেন না। আমি গাড়িতে যাব জানিয়েই আবার ছুট। একটু বাদে গবেষণা করে বললাম, তুমি মাথায় কাপড় দিয়ে দৌড়াচ্ছিলে, তোমাকে বিবাহিতা ভেবেছেন বোধ হয়।

আপনার যেমন বুদ্ধি, ওখানেও আমি—

থমকে গেলেন।—খুব যে। বিবাহিতা ভাবুন আর যাই ভাবুন তাতে আপনার কী?

PATHAGAR.NET

...আপনার আর কি। বেফাঁস বলে ফেলে ঢোক গিলেছি। বারান্দার আলসেতে দাঁড়িয়ে সম্পাদক যে তাঁকে ঘোমটা টেনে দৌড়তে দেখেছেন সেটা আর কোন্ সাহসে বলি?

তারপর যথাসময়ে কথাঞ্জলিতে পর পর দুটো লেখা ছাপা হয়েছে। যেটা মনোনীত হয়েছে জানা গেল সেটাও আর যেটা পদ্মা দেবী সমর্পন করে এলেন সেটাও। এরপর দু'দুবার লেখা পাঠানোর আগে—তা প্রায় আট-দশ দিন আগে থাকতেই আবার অসুখ হতে লাগল। আর সেই অসুখের খবরটা যাতে ভাল করে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছয় সেদিকটা ম্যানেজ করতে হল। হার্ট দুর্বল, চলতে ফিরতে মাথা ঘোরে, হাঁটা চলা ডাক্তারের নিষেধ ইত্যাদি। ফলে শালীকে দিয়ে ফল আর সন্দেশ নিয়ে দু'বারই শাশুড়ি আর শালাও জামাইকে দেখে গেছেন। শেষের বার বড় ডাক্তার দেখাতেও পরামর্শ দিয়ে গেছেন তাঁরা। আর এদিকে স্ত্রীও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে খাওয়াদাওয়ার একটু সুব্যবস্থাই করেছেন। লেখা পাঠানোর দিন এলে শ্রীমতীকে ডেকে সেই আবেদন, দিয়ে এসো ভাই, নইলে এই শরীরে নিজেকেই যেতে হয়—কখন মাথা ঘুরে পড়ি ঠিক নেই।

পদ্মা দেবী আপত্তি করেননি। বরং ঠাট্টাই করেছেন, তাঁর লেখা দিয়ে আসার দৌলতেই আমার লেখা ছাপা হচ্ছে—

পাপ লাঘবের সুযোগ পেয়েই একবাক্যে স্বীকার করেছি তাই বটে, তাই বটে। উনি লেখা দিয়ে এসেছেন। দিয়ে এসে অত অল্পবয়সী নামকরা সম্পাদকের বিনয় ব্যবহারের সুখ্যাতিই করেছেন। ভদ্রলোক নাকি যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। বিনয়ী ভদ্রলোককে অমি শুধু পত্রের দ্বারা অসুস্থতার কথা জানিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছি। যদিও জানাবার দরকার ছিল না। তিনি অসুস্থতার দরুন উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রের জবাব দিয়েছেন।

তৃতীয় বারে ফেঁসে গেলাম।

লেখা পৌঁছে দিয়ে শ্রীমতী একেবারে চণ্ডী মূর্তিতে সরাসরি আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তাঁর তপ্ত প্রশ্ন, আপনার কি অসুখ, কে দেখছে?

আমি হতভম্ব, কেন? কি হয়েছে?

অসহিষ্ণু অগ্নি উদ্‌গিরণ আবার, কি অসুখ? কে দেখছে?

—ইয়ে—হার্টের অসুখ, এক বন্ধু ডাক্তার—

—ওষুধ কই? প্রেসক্রিপশন কই?

বোনের মূর্তি দেখে স্ত্রীর মুখে এতক্ষণ কথা সরেনি। এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, হল কিরে তোর? কর্ণপাতও করলেন না। আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করলেন, আবার, জবাব দিচ্ছেন না কেন, কি ওষুধ খাচ্ছেন? ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন কই? আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা আমার—ওষুধ দেননি, মানে একটু ভাল খেতেটেতেই বলেছেন—ভালো

খেতেটেতে বলেছেন? দুই চোখে আগুনের কণা।—আপনি মিথ্যেবাদী! আপনি জোচ্চর, আপনি অভদ্র, আপনি ইতর, আপনি ছোটলোক। আত্মপরিচয় লাভ করে করে নির্বাক আমি। কিন্তু অতটা তাঁর ভগ্নীরই বরদাস্ত হল না বোধ হয়। তিনি প্রতিবাদ করলেন, তোর মাথা খারাপ হল নাকি! কি হয়েছে? তোমার ওই লোকটাকে তোমার চিনতে ঢের দেরি এখনো—আমাকে ওই সেই সম্পাদক তুমি বলে জানে—

স্ত্রীর দুর্বোধ্য বিস্ময়।—তোকে আমি বলে জানে! কি বকছিস আবোল-তাবোল? এবারে ভগ্নীর ওপরেই ক্রুদ্ধ সহোদরা। এই তো বুদ্ধি তোমার, সব জেনে শুনে কি—বার বার আমাকে দিয়ে লেখা পাঠায়—লেখা যাতে ছাপা হয়, অসুখ না ঘোড়ার ডিম! অনুনয়-বিনয় করে, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে বসাতে চেষ্টা করলাম এদিকে যা হয়েছে হয়েছে, ওদিকে কতটা সর্বনাশ করে এলো কে জানে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর জেরায় প্রকাশ, কে না কে এক ভদ্রলোক ছিলেন কথাঞ্জলির দপ্তরে, তাঁর কাছে সম্পাদক শ্রীমতীর পরিচয় দিয়েছেন অমুকের স্ত্রী বলে, তাই শুনে জ্বলতে জ্বলতে তাঁর এখানে পুনরাগমন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু স্ত্রীর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোকে দেখেও উনি ওরকম ভাবতে গেলেন কেন? জবাবে আমিই তাড়াতাড়ি নিজের দোষ স্খালনের পথ করতে ব্যস্ত। বললাম, প্রথম দিন দোতলায় আলসে থেকে উনি তোমায় মাথায় কাপড় দিয়ে দৌড়ে ঢুকতে দেখেছিলেন। এবারে ঝলসে উঠে পদ্মাদেবীর চার আঙুল জিভ বার করে আমায় যথার্থ চণ্ডিকা মূর্তি দেখিয়ে এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন।

ফলে নিজের অপরাধ যথাসম্ভব লঘু করে স্ত্রীকে ব্যাপারটা বোঝানোর একটু সুবিধে হল। শুনে তিনিও অবশ্য রাগতেই চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমার বরাতক্রমে রাগটা পেকে ওঠার আগেই তাঁর মুখে হাসি এসে গেল।

কিন্তু সত্যিকারের বিপদ সেই বিকেলে। দোতলায় বারান্দা থেকে দেখি ঝকঝকে একটা গাড়ি থামল বাড়ির দরজায় আর সেই গাড়ি থেকে নামলেন কথাঞ্জলির তরুণ সম্পাদক। আমি দিশেহারা। ঘরে সবে এসে বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আছি। চাকর এসে খবর দিল, আমার অসুখ শুনে কাগজ অফিস থেকে এক বাবু দেখতে এসেছেন। প্রথমেই স্ত্রীর শরণাপন্ন। ভালো করে চা-জলখাবার সাজাতে অনুরোধ করে সটান বিছানায় আশ্রয় নিলাম। তারপর চাকরের প্রতি ভদ্রলোককে নিয়ে আসার নির্দেশ। সেই সাক্ষাতের প্রথম দৃশ্যটা তোমরা কল্পনা করে নাও ভায়া, আমি বিস্ময়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত। আর, সম্পাদকের কর্তব্যের বিনয়, অসুখ চিকিৎসার প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ। শেষে আমার ইদানিংকালের লেখার উন্নতি প্রসঙ্গের দু'-চার কথা। সেই সঙ্গে কাকে যেন দেখবেন আশা করছেন অথচ দেখছেন না। তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশংসা—আপনার লেখার প্রতি আপনার স্ত্রীর ভারী দরদ, নিজে কষ্ট করে লেখা দিয়ে আসেন, খুব ভালো—এই সুযোগ হেলায় হারালে ভরাডুবি। রাজ্যের

PATHAGAR.NET

বিস্ময় আমার গলায়, আমার স্ত্রী! ও আপনি আমার শালীর কথা বলছেন, তাই তখন এসে হেসে গড়িয়ে তার দিদির কাছে কি বলছিল...তার তো বিয়েই হয়নি এখনো, বি-এ পড়ছে। যাতায়াতের পথে পড়ে বলে ওই নিয়ে যায়...তবে আমার লেখার ওপর ওর সত্যি খুব দরদ।

সম্পাদকের মুখের সেই কারুকার্য আমি জীবনে ভুলব না। স্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন চা-জলখাবার নিয়ে। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। পরিচয় আর সৌজন্য বিনিময়। কিন্তু যতক্ষণ ছিলেন ভদ্রলোক, আর এক মুহূর্তও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। কলহৈ, গল্প শেষ করেই যেন রামজীবনবাবু হাই তুললেন একটা, এবারে তার একটু তামাক-টামাকের ব্যবস্থা করো—

তামাকের বদলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পাঁচ-সাতজন।—কিন্তু আপনার লেখা কি হল, কথাগুলির কাগজে আপনার বন্ধ হয়ে গেল?

পাগল নাকি! উল্টে রামজীবনবাবুই বিস্মিত যেন—লেখা বাড়ল আরো, কিছুদিন বাদে সম্পাদক নিজে উপন্যাস চেয়ে নিয়ে ছেপেছেন।

আর একজন খুঁতখুঁত করে উঠল, কিন্তু গল্পটা শেষ হল না, আপনার শালির কি হল?

জবাব না দিয়ে রামজীবনবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

আমরা উসখুস করছি। ওদিকে ক্রিটিক উষারঞ্জনবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ততক্ষণ যেন ঘুমুচ্ছিলেন। আড়মোড়া দিয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করলেন তিনি। মন্তব্যের আশায় সকলেই এবারে তাঁর দিকে চেয়ে। কিন্তু তাঁকেও নীরব দেখে একজন তাগিদ দিল, আপনি বলুন না—গল্পটার শেষ কিরকম যেন হল, সম্পাদক উপন্যাস চেয়ে ছেপেছেন অথচ উষারঞ্জনবাবু গম্ভীর মুখে রায় দিলেন, বাজে গল্পের শেষ ওরকমই হয়। আর বউ ধার করা লেখক সম্বন্ধেও আমার কোনো বক্তব্য নেই—সে সম্বন্ধে ওঁর শালিই ওঁকে যা বলবার বলেছেন, মিথ্যেবাদী বলেছেন, জোচ্চর বলেছেন, অভদ্র বলেছেন, ছোটলোক বলেছেন—ভদ্রমহিলার সেই সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে আমি একমত। রামজীবনবাবু বললেন, ভদ্রমহিলার সেই সুচিন্তিত মতামত পরে আরো একটু প্রসারিত হয়েছিল। কাপড় কাচা পেশা যাদের তারই যে ভারবাহী জীব পেয়ে, সেই তরুণ সম্পাদকের সঙ্গে তারই একটা বিশেষ সাদৃশ্য দেখেছিলেন পদ্মা দেবী!—কখখনো না! উষারঞ্জনবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন, এ তোমার বানানো কথা, আমি আজই ওকে...

থমকে গেলেন। অপ্রতিভ।

রামজীবনবাবু তাঁর মুখোমুখি ঘরে বসে হাঁ করে চেয়ে রইলেন খানিক। নিরীহ বিস্ময়—এ গল্পে তুমি আবার কে হে!

রামজীবনবাবুর গল্পের শেষ মিলতে সকলের ঘর ফাটানো হাসি।

আমি

বিমল কর

আজ সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ধোয়ার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। কুলকুচো করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ডান হাতের তালুর উপর টলটলে জলের মধ্যে কালো মতন কি একটা ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জলটা বেসিনের মধ্যে ফেলে দিলাম। আমি খুব ভীতু মানুষ, শরীর নিয়ে আমার খুঁতখুঁতুনির অন্ত নেই। খালি চোখ, চশমাটা বালিশের তলায় পড়ে আছে; জলের মধ্যে কী ভেসে উঠেছিল, বুঝতে পারলাম না। সকাল বেলায় এইরকম একটা কাণ্ড হওয়ায় সামান্য চমকের মতন হল। তারপরেই আমার মনে পড়ল, আরে ওটা আমার ডান হাতের তিলটা নয় তো? হাত ভরতি কুলকুচোর জল থাকায় খালি চোখে ওই রকম দেখিয়েছিল? ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলাম। আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আমার ছেলেমানুষের মতন মজা লাগল; কিংবা সাধারণ এক কৌতূহল হল, পরিষ্কার জলের মধ্যে হাতের তিলটা কী ওই রকম দেখায়? বার কয়েক পরীক্ষাও করলাম; কিন্তু সচেতন হবার পর আগের মতন চোখের ভ্রমটা আর ঠিক হল না।

ঘরে এসে চোখ-মুখ মুছে চশমাটা পরার পর আর একবার হাতটা দেখলাম— তিলটা যথাস্থানেই আছে।

স্ত্রী চা নিয়ে এল। জানলার কাছে বসেছি ততক্ষণে। একবার মনে হল, সকালের মজার কথাটা স্ত্রীকে বলি। বললাম না, মেয়েরা সকালে এমনিতেই ব্যস্ত থাকে, তার ওপর আমার স্ত্রীর তার স্বামীর শরীরের খুঁতখুঁতুনির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ। আমার মতন ভীতু মানুষেরও মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে; অভিমানও বলা যায়। এই সকালে সেটা নষ্ট হতে দিতে ইচ্ছে হল না।

বাসি খোঁপা খুলতে খুলতে স্ত্রী চলে গেল। ছেলেমেয়ের গলাও কানে আসছিল। চা খেতে খেতে সিগারেট ধরালাম। কাগজ এসেছে হয়ত, অরণ্যদেবের পালা শেষ হয়ে আমার কাছে পৌঁছতে দেরি হবে। ইংরাজি কাগজটাও দেখছি না। সকালে কাগজ খোলার সময় মনে মনে আমি অঙ্ক করি, তিন পাঁচ না সাত? আগে এক দুই তিন-এর বেশি ভাবতাম না। আজকাল দশ-বারো পর্যন্ত উঠি। খুনের সংখ্যা বাজার দরের মতন বাড়তির দিকে যে আমাকেও বেশি বেশি ভাবতে হচ্ছে। আগে, বেশ কয়েক বছর আগে, আমি সারাটা গরমকাল কাগজে কলেরা রোগীর হাসপাতালে

PATHAGAR.NET

ভরতি হওয়ার সংখ্যা দেখতাম, অনুমান করতাম, আর ভয়ে ভয়ে শুকিয়ে যেতাম। আজকাল খুনের সংখ্যা দেখি!

আজ অবশ্য অকারণেই আমার মনে ওই তিলের কথাটা আসা-যাওয়া করতে লাগল। বার কয়েক হাতটা ওঠালাম, দেখলুম।

হাতটাত দেখার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছু নেই। তিল যব—এইসব চিহ্নের অর্থটর্থ কী, তাও আমি জানি না। কাশীতে থাকার সময় সদ্যযৌবনে হাত দেখা নিয়ে দিন কয়েক খুব মেতেছিলাম। তারপর আমার পছন্দসই মেয়েটির সঙ্গে প্রেমট্রেম ভেঙে গেলে ও ব্যাপারে আর কোনো উৎসাহ হয়নি। তবু আমি শুনেছি, হাতে তিল থাকা খারাপ। নানা ধরনের খারাপের মধ্যে থাকতে থাকতে এই প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ছোটখাটো খারাপের কথা বড় করে ভাবি। কিন্তু ওটা তিল না যব, না অন্য কিছু তা আমার জানা নেই।

আজ সকালে সবই অন্যরকম হল। চা, সিগারেট, শিবপুর-হাওড়া মিলিয়ে ন'জন খুন, মোহনবাগানের হার, মনুমেন্টের তলায় সভা—ইত্যাদি কোনো কিছুই আমার মন থেকে তিল-চিন্তাটা ধুয়ে দিতে পারল না। বাচ্চা চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার গেলাম, ফিরলাম। দু'-একটা টুকটাক কাজ সেরে দাড়ি কামাতে বসলাম, স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে শেয়ারের ট্যাক্সিতে অফিসে এলাম—তবু দেখি তিল আমার মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। তখনও সরে যাচ্ছে হয়ত, আবার যেন জলের নাড়া-চড়ায় ওপরে উঠে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন চমকে উঠে ফেলে দিচ্ছি। দিলেও সেটা আবার চোখে এসে পড়ছে।

আমাদের বিভূতি দুপুর গড়িয়ে অফিসে এল; বলল, তাদের পাড়া রণক্ষেত্র হয়ে আছে। নানা জনে নানান খবর নিতে লাগল বিভূতির কাছে। আমি তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

পালিত বিকেলের শেষাশেষি আমার পাশে এসে বসে গল্প জমাবার চেষ্টা করল, মুখ খারাপ করল, তারপর আমার তরফ থেকে তেমন সাড়াশব্দ না পেয়ে বলল, 'তোমার হল কী রায়, বুড়ো বয়েসে কিছু ঘটিয়ে ফেলেছ নাকি!' বলে চোখ টিপলে, 'তোমার রোগা হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছ যে!'

পালিত উঠে গেল। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে, পাখার বাতাসে অফিসের দেওয়ালে ঝোলানো লম্বা ক্যালেন্ডারটা উড়ছে দেখতে দেখতে বাঁদিকের জানালা দিয়ে শেষ বর্ষার দল ছাড়া মেঘের ঘুরে বেড়ানো নজর করতে লাগালাম। বিশু ছেলেটি নতুন বিয়ে করেছে, এই অফিসেরই মেয়েকে; বিশু আমার কাছে এসে বলল, 'নন্দদা আজ একবার টালিগঞ্জ যেতে হবে, মানে ইয়ের ব্যাপারে, ওদিকে যাওয়া খুব রিস্ক। আমি একটু আগে যাচ্ছি।' বিশু যদিও 'আমি' বলল কিন্তু ওটা 'আমার' হবে; ওরা দু'জনেই পালাচ্ছে, টালিগঞ্জে ওর শ্বশুরবাড়ি। বিয়ের সময় রিস্ক ছিল না; এখন রিস্ক। পুরো মিথ্যে কথা বলল। বলুক। এই বয়েসে সবাই বলে!

PATHAGAR.NET

অফিস থেকে ছুটির পর বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড চলে এলাম। সঙ্গে আমাদের মিসেস চৌধুরী ছিলেন; মেজসাহেবের স্টেনো। তিনি ট্রাম গুমটির দিকে চলে গেলেন। আমি একলা। সমস্ত এলাকা জুড়ে অফিস-ফিরতি মানুষের ছুটোছুটি, ব্যস্ততা, কলবর। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি যে যার মতন উর্ধ্বশ্বাসে চলে যাচ্ছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ ভিড় এড়াতে কার্জন পার্কের টুকরো টুকরো মাঠে গিয়ে বসেছে, এক জায়গায় ঘোড়ার গল্প জমেছে, দু'-চারটি ছেলেমেয়ে প্রেম-ভালবাসা করতে করতে হাওয়া খেতে গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে।

আমার মতন নির্জীব মানুষের পক্ষে আপাতত বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। এতটা সকাল সকাল আমি সচরাচর বাড়ি ফিরি না। ভিড়-টিড় যথাসম্ভব এড়িয়ে পশ্চিম-দিকের মাঠের একটু পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বসলাম। ওপর আকাশটা যে বদলে আসছে এই প্রথম খেয়াল হল আমার; টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার আকাশও যেন আজকাল চোখে পড়ে, হালকা নীলের ভাব এসেছে আকাশে, বেলা ছোট হয়ে গেছে, ভেজা বাতাসে বর্ষার গন্ধ শুকিয়ে আসছে।

সিগারেট ধরিয়ে, আলস্য এবং আরামের সঙ্গে টানতে টানতে মানুষজন গাছপালা, ঘাস, আকাশ দেখছিলাম। আবার আমার মনে তিলের কথা ভেসে উঠল। এবার আর আমি হাত তুলে তিল নজর করলাম না। সারাদিনে অনেকবার দেখা হয়েছে, আর নয়। অনর্থক দাগটা দেখে লাভ নেই! যতবার দেখি, ততবার যেন মনে হয় তিলটাও আমায় দেখেছে। বিরক্তি হয়, বিশ্রী লাগে।

এই তিলটা হতে হতে; মানে আমার প্রথমে চোখে পড়ার পর, ক্রমে ক্রমে বেড়ে আজকের মতন হয়ে আসতে বছর খানেক কি তার সামান্য বেশি সময় লেগেছে। প্রথম যখন আমার নজরে পড়ল তখন আমার মনে হয়েছিল, কাঠকুঠোর চোঁচ কিংবা ময়লা-টয়লা কিছু চামড়ার তলায় ঢুকে গেছে। ভাল করে সাবানে হাত ধুয়ে রগড়ে ওটা তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম। ভাঙা মেথির মতন কালচে দাগটা উঠল না। একদিন স্ত্রীকে দেখালাম। সে বলল, তিল। হাতের পাতার তিল তুলে ফেলার কোনো প্রক্রিয়া আমার জানা ছিল না। শুনেছি, কোনো কোনো বাড়ন্ত আঁচিল শেষ পর্যন্ত ক্যানসারে গিয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু তিল থেকে ক্যানসার হয় এ আমি শুনিনি। শরীরের নানা জায়গায় আমার অসংখ্য তিল রয়েছে, তার খুব কমই আমার চোখে পড়ে। ওসব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়! আমিও ঘামাতে চাইনি। কিন্তু ডান হাতের পাতায় এই ছোট্ট তিলটা বাড়তে লাগল, আর বাড়তে বাড়তে এখন বেশ স্পষ্ট, কালো প্রায় গোল হয়ে এসেছে। একে ডান হাত, তাও আবার তালুর গর্তের মধ্যে দিব্যি বসে আছে বলে তিলটা দিনের মধ্যে কতবার যে নজরে পড়ে। নজরে পড়লেই যে লক্ষ্য করি তা নয়, মাঝে মাঝে করি।

আজ সকালে ওই রকম একটা কাণ্ড হয়ে যাবার পর কেন জানি না তিলটা আমার

PATHAGAR.NET

মনে মধ্যে বিশ্রী এক অস্বস্তি জাগাচ্ছিল। একেবারেই অকারণে আমি ঘুরে-ঘুরে তিলটার কথা ভাবছিলাম। শেষে একটা বাতিকের মতন দাঁড়িয়ে গেল।

সিগারেটটা প্রায় যখন শেষ, তখন হঠাৎ আমার মনে হল, একটা হিসেব করা যাক, গত এক-দেড় বছর আমি কী কী করছি। হাতের পাতায়, রেখার ওপরে হোক, কিংবা আশেপাশে কোথাও হোক, তিল হওয়া খারাপ, মানুষের নানারকম পাপকর্ম বোঝায়—এটা আপাতত মেনে নিয়ে দেখা যাক না আমি কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম ইদানীং করেছি।

নিজেকে নিয়ে মানুষ বাস্তবিক তেমন করে ভাবে না। শরীর-স্বাস্থ্য, টাকা-পয়সা, অফিসে প্রমোশন—এইসব ভাবনা ছাড়া সে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে বা ভাবতে বড় একটা রাজি হয় না। আমিও যে হই, তাও নয়। তবু আজ একবার ভাবা যাক, ক্ষতি কি! এখনও এমন কিছু সন্ধে যায়নি, চারপাশে এখনও ভিড়, ট্রামে লোক ঝুলছে, পার্কের কিছু বাতি জ্বলে উঠেছে, কিছু ওঠেনি, বাতাসটা বেশ চমৎকার, আকাশটাও বৃষ্টি-বাদলা হবার মতন নয়।

আমার আপাতত পরিচয় কী এটা আমি প্রথমে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ভেবে নিলাম। আমি একেবারে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি; উত্তর কলকাতার শহরতলি ঘেঁষে থাকি, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, চাকরি-বাকরি মোটামুটি রকমের, বাড়িতে স্ত্রী আছে, তিনটি ছেলেমেয়ে, মেয়ে বড়, কলেজে ঢুকেছে সবে। আমার পিতৃদত্ত অর্থ নেই, শ্বশুরও কিছু দানধ্যান করেননি। শরীর-স্বাস্থ্য আমার বরাবরই দুর্বল, নানা বাতিক আছে, আমি নিজেও সেজন্য লজ্জিত। সাংসারিকভাবে আমি অখুশি নই।

আমার মতন একজন গৃহস্থ পুরুষ কী কী অন্যায় করে থাকতে পারে আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম। যৌবনে কোথায় কী করেছি সেসব কথা আসে না। হাতের তিলটা বয়েসে বছর খানেক কি দেড়েকের। অঙ্কের হিসেব মতন আমি আরও খানিকটা সময় পিছিয়ে নিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব করতে পারি।

গত দু'বছরের মধ্যে আমার যা যা হয়েছে ভেবে দেখতে গিয়ে একটা হিসেব করে ফেললাম। চাকরিতে সামান্য উন্নতি হয়েছে, মাইনেপত্র কিছু বেড়েছে; টাকা-পয়সা জুটিয়ে কাঠা আড়াই মতন জমি কিনেছে বাঙ্গুরে। চাকরির উন্নতিতে, আমি কাউকে ধরাধরি, কাউকে টপকে আসিনি; ওটা স্বাভাবিক উন্নতি! জমি কেনার সময় যৎসামান্য পুঁজিতে হাত দিয়েছি, ধার করেছি অফিস থেকে, অফিসের যোগেশ আমায় হাজার দুয়েক টাকা ধার দিয়েছে। আমার চাকরিতে ঘুষ নেই, বাইরে উপরি নেই। কাজেই ও কথা ওঠে না। তা হলে?

এবার নিজের চরিত্রের দিকে তাকানো যাক। ন'মাসে ছ'মাসে বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধবার মদ্যপান করেছি। মদ আমার সয় না। অল্পস্বল্প খেয়েই ক্ষান্ত হয়েছি। রেস, ঘোড়া, আমি জানি না। অফিসের যারা মাঠে আসা-যাওয়া করে তারা আমায় মাঠে

বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েও পারেনি। আমার নেশার মধ্যে চা, সিগারেট, এক-আধটা পান। মাঝেমাঝে হরতাল হলে বাড়িতে বসে তাস খেলি। আমার বউ আমার চেয়ে বুদ্ধি ধরে, টুয়েনটি নাইন খেলতে বসেও হেরে যাই। সিনেমা দেখি কদাচিৎ সময় কাটাতে। বাস্তবিকই আমার মনে পড়ছিল না, গত দু' বছরে আমি কী কী অপরাধ করেছি। চুরি করিনি, বাড়ির ঝিচাকর তাড়াইনি, অফিসে কারও কোনো ক্ষতি করিনি। আমার বাড়িতে ফলস্ রেশন কার্ড নেই, লোকজন এসে পড়লে এক-আধদিন ব্ল্যাকে চাল কিনতে হয়েছে অবশ্য, কিন্তু এই অন্যায়ও আমার স্বহস্তে নয়, বউ চাকর পাঠিয়ে কিনে আনিয়েছে।

নিজের কোনো বড় রকমের দুষ্কর্ম আমার মনে না আসায় আমি খানিকটা খুশি হলাম। তারপর আচমকাই আমার মনে ধর্মাধর্মের কথা এল। হিন্দুর ছেলে আমি, পুজোপাঠ করি না, ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি-অভক্তি কোনোটাই নেই, স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে গেলেও গঙ্গার ধারে বসে থেকেছি, স্ত্রী মন্দিরে গিয়েছে! পাড়ায় দুর্গাপুজোর সময় একদিন গিয়ে একটু সময় আরতি দেখে আসি। আমার মনে হল না, এটা কোনো অধর্ম? তবে?

আশেপাশে তাকালাম। সন্ধে হয়ে এল। উত্তরের দিকে কয়েকটা বাতি খারাপ হয়ে নিভে রয়েছে। মাঝে-মাঝে চমক মারছে। নেভা বাতিগুলো চমক মেরে বার কয়েক জ্বলল, নিভল, শেষে নিভেই থাকল। এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে এদিকটায়। রোজগারী দুটি মেয়ে সেজেগুজে মাঠের মধ্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ আমার স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার-ট্যাপার মনে এল। বিয়ের আগে নমিতা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বসাবসি ছিল। প্রেমট্রেম নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ফনড্ল—আমার সঙ্গে নমিতার বসাবসির মধ্যে তার বেশি করার কিছু ছিল না। একবার আমরা জনাচরেক বন্ধু মিলে মেমসাহেব মেয়েছেলে দেখতে গিয়েছিলাম। এসব বিয়ের আগে, আজ উনিশ-কুড়ি বছর পরে নিশ্চয় তার জন্যে হাতে তিল হবার কথা নয়। বিয়ের পর আমার রমণী বিষয়ে উৎসাহ আছে বলেও তো মনে হয় না। একটা রোগাসোগা মেয়ে আমাদের অফিসে কাজ করতে এসে মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার পথে আমার সঙ্গী হত। ট্যাক্সি করেও কখনো-সখনো আমাদের ফিরতে হয়েছে। একবার ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে রিকশা করে ফেরার সময় আমি তার পা হাঁটু উরুর চাপ ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করিনি। খবুই দুঃখের কথা মেয়েটি মারা গেছে, তার নাম ছিল রেখা।

আমার আর কিছু মনে পড়ছিল না। চারপাশ হাতড়াতে গিয়ে আরও যে দুটি অশোভন কর্মের কথা মনে পড়ল, একটি অন্তত তিন বছর আগে ঘটেছে। আমরা সপরিবারে দীঘায় বেড়াতে গেলে আমার বন্ধু মণিন্দ্রর স্ত্রীকে একদিন সিক্ত বসনে দেখেছিলাম। এবং চোখ সরিয়ে নিতে দেরি হয়েছিল। আর অন্যটি ঘটেছে তার কিছু

পরে, আমার চটপটে এক শ্যালিকা, স্ত্রীর মামাতো বোন, তার বিয়ের ব্যবস্থা করে আমার কাছে সাহায্যের ব্যাপারে এসেছিল। আমি তাকে একটি বৃহৎ চুম্বন করে বলেছিলাম, 'এটা হল নমস্কারী বুঝলে। এবার সম্মুখে সমরে নেমে পড়ো।' বিজু তার গাল মুছে আমায় একটা প্রণাম করে চলে গেল। বিজু খুব চমৎকার মেয়ে। একটানা বারো-চোদ্দ বছর লড়ে উঁচু মাথায় তিরিশ বছর বয়েসে সে বিয়ে করে চলে গেছে। বিজুকে স্নেহ করি আমি।

এত রকম ভাবার পরও আমার এমন কিছু মনে পড়ল না যা আমার কাছে ভয়ঙ্কর একটা পাপ বলে মনে হল। গত দেড়-দু' বছরে বাস্তবিকই আমি কিছু করিনি, একেবারে ছা-পোষা গৃহস্থ মানুষ হিসেবে দিন কাটিয়েছি। প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে দিনটা শুরু করেছি, আর রাত্রে শোবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক কথা-বার্তা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। অফিসে কিংবা বাড়িতে যেসব তুচ্ছ অশান্তি, রাগারাগি হয়েছে তা সব মানুষেরই জীবনে নিত্য হয়ে থাকে, ওটা ধরার নয়। আমি এখন প্রায় নিশ্চিত হতে পারি যে ইদানিং এমন কোনো অন্যায় বা পাপ করিনি যে হাতের পাতায় একটা কালো তিল দেখা দিতে পারে! ওটা ভবিষ্যতের কোনো অশুভ ইঙ্গিত হতে পারে কিন্তু অতীতের নয়।

প্রসন্ন মনে এবার একটা সিগারেট ধরালাম। এখন ওঠার সময় হয়ে এসেছে। মানুষজন কমে গেছে, হালকা ভিড়ের ট্রাম আসছিল, মাঠ থেকে লোকজন প্রায় উঠে গেছে, সন্ধে হয়েছে অনেকক্ষণ। সিগারেট খেয়ে উঠে পড়ব। আস্তে আস্তে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছি, নজরে পড়ল প্যান্টট্যান্ট পরা দোহারা চেহারার একটি লোক আমার দিকে আসছে। কাছাকাছি এলে মনে হল, তার পা ঠিক মতন পড়ছে না, মাথা ঘাড়ের পাশে হেলে রয়েছে, টলে টলে আসছে। লোকটা আমার কাছে এসে দাঁড়াল, একটু দেখবার চেষ্টা করল, পকেট থেকে হাত বের করে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিল, অনর্থক আমায় 'শালা' বলল। নিতান্তই মাতাল। তারপর আবার টলতে টলতে খানিকটা গিয়ে মাঠে শুয়ে পড়ল, একবারে হাত-পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ বের করে। মদের গন্ধ আমার নাকে না লাগলে আমি নিশ্চয় ভয় পেতাম। ভাবতাম লোকটা ছোরাছুরি খেয়ে পালিয়ে এসে এখানে মরছে। কিন্তু হারামজাদা যে প্রচণ্ড মদ খেয়েছে সেটা তার সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরেছি। লোকটা এখন শুয়ে থাকুক মাঠে বেহুঁশ হয়ে, রোজগারী মেয়ে, কেটমার, এখন ওকে নিয়ে যা করার করুক।

চোখ ফিরিয়ে গুমটির দিকে তাকাতে আমি অবাক। মেট্রো সিনেমার দিক থেকে চাঁদটা কখন উঠে এসেছে। বেশ বড় চাঁদ। টুকরো টুকরো দুটো পেঁজা মেঘ খুব নিচু হয়ে একে অন্যকে ধরার জন্যে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, পেছনের মেঘটার চেহারা ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, যেন সে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে, পেছনের পা লম্বা হয়ে গেছে দৌড়তে দৌড়তে।

চাঁদের আলোটা এতক্ষণে আমার নজরে এল। জ্যোৎস্নাও কত আড়ষ্ট হয়ে আসে আজকাল। কলকাতাকে সকলেরই কী ভয়!

এবার ওঠা যেতে পারে। আজকাল কলকাতা বড় নিরাপদ নয়। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিরিবিলি এই বিশ্রামটুকু আমার ভালই লাগছিল। বিশেষ করে আমি এখন নিশ্চিত, সকাল থেকে মনের মধ্যে যেটা খচখচ করছিল বাস্তবিক আমি সেটা তুলে ফেলেছি। আমার ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম সমস্ত যথা-সম্ভব বিচার করে এমন কোনো অপরাধের কথা আমার মনে পড়ল না যাতে আমি গ্লানি বোধ করতে পারি।

তবে ওঠা যাক ভেবে উঠতে গিয়ে দেখি চারপাশ ঝপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আরে, এ কি? সমস্ত এসপ্লানেড জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পার্কে বাতি জ্বলছে না, ট্রাম গুমটি অন্ধকার, রাস্তাঘাট কালো হয়ে গেছে। কলকাতা অন্ধকার হয়ে গেলে বড় ভীষণ দেখায়, মনে হয় যেন যে কোনো দিক দিয়ে চোর, গুণ্ডা, খুনে বদমাশ ছুটে আসছে। আমার ভয় হল। আর দেরি না করে উঠে পড়লাম। মাতালটা দিব্যি শুয়ে আছে, হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছে। অন্ধকার চোখে সয়ে যাবার পর চাঁদের আলোটা এতক্ষণে একরকম পরিষ্কার হল।

পার্ক থেকে উঠে আসার সময় আমার খুবই বিরক্ত লাগছিল। আজকাল ইলেকট্রিসিটি নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে। যখন তখন, যেখানে সেখানে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমরা যে কী রাজত্ব চালাচ্ছি আজকাল!

PATHAGAR.NET

চৌরঙ্গীর দিক দিয়ে গাড়ির হেডলাইটের আলো বড় বড় চোখ করে ছুটোছুটি করলেও আমি ওদিকে যাবার চেষ্টা করলাম না। গাড়ির আলো ভীষণ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওদিকটা আরও বিপজ্জনক।

ট্রামগুলো সার সার দাঁড়িয়ে গেছে। মানে ট্রামের তারেও কারেন্ট নেই। বাঃ চমৎকার!

খুঁজে খুঁজে একটা এক নম্বর ট্রামে বসা গেল। দু'-চারজন মাত্র লোক একেবারে সামনের সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। বিশ-পঁচিশ কি, আধঘণ্টা দেরি হতে পারে, ট্রামটা ঠিকই ছাড়বে। পা তুলে, পেছনের সিটে মাথা হেলিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুঁজে থাকলাম। এই সময় আমার মনে মনে একটা গান আসছিল, হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো...

গায়ের পাশের ঠেস দিয়ে কে যেন বসছে আমার, কেমন একটু শব্দ হল। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বা বিরক্তিতে চোখ খুললাম। অবাক! কী সর্বনাশ, এ যে...

'কী হল?'

'আরে বিজু তুমি কোথ্থেকে? কী কাণ্ড!'

'বসে বসে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?'

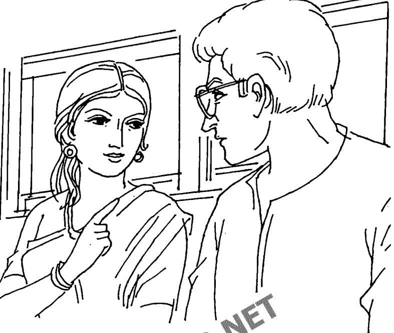

'না, হরি দিন তো গেল গাইছিলাম...'

'এখনই? আরও দিন পড়ে আছে গাইবার।'

'আরও পড়ে আছে—? পঞ্চাশ হয়ে এল, বিজু। এবার মানে মানে...'

'এদিকে কোথায়?'

'এই একটু বেড়াতে। মাঠে বসেছিলাম। ট্রাম ফাঁকা না হলে যে উঠতে পারি না। তুমি কোত্থেকে?'

'আমিও এদিকে এসেছিলাম। আলোটালো সব বন্ধ হয়ে গেল, ট্রামে উঠব, হঠাৎ আপনাকে চোখে পড়ে গেল!'

'এত অন্ধকারেও আমাকে চোখে পড়ে? আমার এখনও সেই চোখ আছে?' আমি একটু হাসলাম!

'তা আছে।' বিজুও যেন হাসল।

'বেশ করেছ! অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আজই তোমার কথা ভাবছিলাম।'

'আমারও আপনার কথা মনে পড়ছিল।'

'কেন বলো তো?'

'আপনি বলুন না আগে, আপনার কেন মনে পড়েছিল।'

খানিকটা ভেবেচিন্তে খাটো গলায় বললাম,...'তোমায় বলা যেতে পারে। আশেপাশে লোকজন আছে নাকি?'

PATHAGAR.NET

বিজু মাথা-ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বলল, 'না, একেবারে পেছনে জনা দুই বসে আছে। কন্ডাক্টার লেডিস সিটে বসে বসে ঘুমোচ্ছে।'

'যাক তাহলে কেউ শুনবে না।...বুঝলে বিজু আজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—।' কাণ্ডটা বিজুকে সংক্ষেপে বললাম। 'ডান হাতের তিলটা নিয়ে সারাদিন বড় অশান্তিতে কেটেছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু মনের মধ্যে কেমন একটা খচখচ করছিল। নিজের একটু হিসেব-নিকেশ করছিলাম। কিছু করিনি; নাথিং সিনফুল...'

বিজু আমার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলল। ট্রামটা এমন করে দাঁড়িয়ে আছে যে আমাদের দিকে চাঁদের আলোটুকুও নেই। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

'বুঝলে বিজু, আমার শেষ সুকীর্তি কিংবা অপকীর্তি যাই বলো সে হল তোমার বিয়ের আগে তোমায় সেই চুমু খাওয়া—' বলে রগড় করে আমি একটু হাসলাম।

বিজু চুপ করে থাকল। তারপর বললে, 'আপনার অপকীর্তি নেই?'

'না। মনে করতে পারছি না।'

'আমি বলব?'

'তুমি, তুমি কী করে জানবে?'

'জানি।'

আমি কেমন অবাক হয়ে বিজুর দিকে তাকালাম। আমার খেয়ালই হয়নি বিজু একবারে নিরলঙ্কার নিরাভরণ, গায়ের শাড়িটা পর্যন্ত সাদা। বিজুর এই অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছিল।

বিজু বলল, 'আমার বিয়ের পর আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। সে প্রায় দু' বছর হতে চলল।'

'তুমি আর আসো-টাসো না। তাছাড়া—'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিজু বলল, 'আমি কেন যাই না সেটা আপনি জানেন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনিও কি আমার খোঁজ নিয়েছেন? চাননি? আপনি যে জন্যে চাননি, আমিও সেইজন্যই যাইনি।...ও কথাটা থাক। আপনি অপকীর্তির কথা বলছিলেন। আচ্ছা জামাইবাবু আপনি বেচারী অভয়কে অফিসের ক্যাশ-বেয়ারা থেকে নামিয়ে ডাকবেয়ারা করে দিয়েছিলেন কেন?'

'অভয় পয়লা নম্বরের চোর। ও দু'-তিনবার অন্যের টাকা-পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করেছে।'

'অভয় চোর? বেশ অভয় না হয় চোর হল। কিন্তু সুশান্ত কী অন্যায় করল?'

'কোন সুশান্ত? মিত্তির না চক্রবর্তী?'

'আপনি পুজোর প্রসাদ খান না কিন্তু বামুন-কায়স্থ জ্ঞানটা আপনার আছে, জামাইবাবু। বাজারে গিয়ে আপনি দরাদরি করেন না, ফিরতি পয়সা গুণে নেন না,

PATHAGAR.NET

তা বলে আপনি অত বেহিসাবী আত্মভোলা নন। ভদ্রলোক বলে আপনার যতটা অহঙ্কার, তার চেয়েও বেশি আপনার লোকদেখানো মর্যাদা। তা যাক গে, আমি সুশান্ত চক্রবর্তীর কথা বলছি। ওই ছেলেটাকে আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে মিত্তিরকে এনে বসালেন কেন? সে তো কাজকর্ম জানে না ভাল, ফাঁকিবাজ।'

'বিজু, এ সব অফিসের কথা। আমায় নানা দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। চক্রবর্তীটা পলিটিক্স করে। পলিটিক্স করা ছেলেগুলোকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। দেশটার কী হাল করেছে দেখছ?'

'জামাইবাবু, সুশান্ত মিত্তিরের বাবার যদি পাতিপুকুরে বাড়ি না থাকত আর কায়স্থ না হত, আপনি তাকে আপনার আওতায় এনে বসাতেন না। দিদি আপনাকে বলে না যে মালা সুশান্তর সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে যায়?'

'বিজু তুমি আমার মেয়ের সম্পর্কে যা বলেছ, তোমার সম্পর্কেও তো আমি সেটা বলতে পারি। তুমি তো নিজেই নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলে।'

'করেছি তো। কিন্তু আপনি যে আপনার মেয়ের জন্যে বারো আনা সাজিয়ে দিচ্ছেন। নিজের ভালবাসার জোরে ও কতটুকু আর করছে।'

'তুমি তা বলতে পার। আমি বলি না। বাবা হিসেবে আমার কিছু কর্তব্য আছে, সেইটুকুই করছি।'

বিজু যেন হাসল। 'তা হলে করুন। কর্তব্য করা ভাল। এই তো আপনি জমি কেনার সময় কেদারবাবুর অফিস-লোনটা চাপা দিয়ে রেখে নিজের লোনটা নিয়ে নিলেন। বলবেন আপনি আপনার সংসারের ওপর কর্তব্য করতে জমি কিনেছেন—এই তো?'

'আচ্ছা! তুমি দেখছি আমার অফিসের সব হাঁড়ির খবরই রাখ? কেদারবাবুকে তুমি চিনলে কি করে?'

'চিনি।'

'এক পাড়ায় থাক নাকি?'

'থাকতে পারি!'

'বাঃ বেশ জুটেছ তো সব! তুমি, সুশান্ত চক্রবর্তী, কেদারবাবু, অভয়—সকলেই এক পাড়ায়।'

'আরও আছে।'

'আবার কে?'

'রেখা!'

'সে তো মারা গেছে!'

বিজু হেসে উঠল। আমি চমকে উঠলাম।

'হাসছ যে?'

PATHAGAR.NET

'মরে যাওয়া লোকও থাকে জামাইবাবু। আমিও তো মরে গেছি।'

'তুমি? কি বলছ?'

'বাঃ, আমি মরলাম না! সেই যে বিয়ের আগে আপনার কাছে গেলাম, আপনি পাঁচশোটা টাকা দিলেন চুপি চুপি। খুব আদর করে চুমু খেলেন, তারপরই তো আমি আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মরে গেলাম।'

'বলেছ বেশ—' হাসতে হাসতে বললাম, 'বুকের তলায় টাকাগুলো নিয়ে গাড়ি চাপা পড়লে নাকি?'

'আপনি তো তার আগেই আমার চাপা দিয়ে গেছেন।'

চমকে বিজুর দিকে তাকালাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাদা বিজু বসে আছে। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। মনে হল, আমি কতকাল ধরে অন্ধকার এই ট্রামের মধ্যে লুকিয়ে কোনো জন্তুর মতন বসে আছি। তাই কি নয়? এই জগৎটা যেখানে নিবে অন্ধকার হয়ে আছে। সেখানে আমি খুব একা। আমাকে আমি শুধু অনুভব করতে পারি। দেখতেও পাই না। আমি সেখানে কত যে ভীতু। লুকিয়ে থাকা ছাড়া পথ নেই।

'বিজু?'

'উঁ!'

'তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

বিজু চুপ। তার সাড়াশব্দ নেই। শেষে ফিসফিস করে বলল, 'জামাইবাবু। একটা কথা আপনাকে বলি। আপনি অফিসের বড়বাবু হয়ে তারিখের হিসেবটা ভালোই শিখেছেন। কিন্তু একটা জিনিস শেখেননি। ক্যালেন্ডারের পাতায় ছাপা লাল তারিখগুলোই সব নয়। কালোগুলোই বেশি। তাই নয়? আপনি শুধু লাল তারিখগুলো এতক্ষণ খুঁজে মরছিলেন।'

এমন সময় দপ্ করে বাতি জ্বলে উঠল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর বাতিগুলো জ্বলে উঠতে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। সামান্য পরে চোখ খুলে দেখলাম, আমার পাশে পার্কের সেই জোড়া মেয়ের একটা বসে আছে। ট্রাম গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠতে সে নেমে গেল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তাকে।

তারপর ট্রাম কখন চলতে লাগল, এসপ্ল্যানেড্‌ময় বাতি জ্বলে উঠছিল। আমি ট্রামের সিটে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে খুব সাহসী হয়ে বসে থাকলাম।

যেতে যেতে, বিষণ্ণ উদাস অসহায় হয়ে আমি শুধু নিজের কথা ভাবছিলাম। আমার হাত থেকে তিলটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা ধুয়ে যাক—আমার হাত স্বাভাবিক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোক। কিন্তু তা হয় না—। হবার উপায় নেই।

ট্রামটা যেন আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে পরমানন্দে নাচতে নাচতে নিজের দরজায় পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল।

PATHAGAR.NET

এক সের বেগুন

রমাপদ চৌধুরী

বীরভূম জেলার রায়মঙ্গল কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা আবুল হাসান হায়াত সাহেব কেন মাত্র সতেরোটি ভোট পেয়ে নির্বাচনে শোচনীয় পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর ভোট-বাক্সের উপর কেন একটি হাস্যকর উপহার পাওয়া যায়, সে রহস্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই উপহার-সামগ্রীর মধ্যেই তাঁর পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

হায়াত সাহেব সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এ সংবাদ পাঠ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাই স্তম্ভিত হয়েছেন, যদিও রাজনৈতিক দলবিশেষ ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হায়াত সাহেবের পরাজয় ও তাঁদের প্রার্থীর আশাতীত জয়লাভকে তাঁদের দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর জয়লাভের পিছনে রাজনৈতিক দলের কিংবা দলীয় প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই কার্যকরী হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী আব্দুল করিম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ইতিপূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিল এবং ঘোড়দৌড়ের ভাষায় যাকে আপসেট বলা চলে, তেমনই একটি নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য এবং এই নির্বাচনী ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই নির্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমি যখন স্বয়ং করিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কোনো উল্লাস প্রকাশ করা দূরের কথা, স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

PATHAGAR.NET

স্মরণ থাকতে পারে, হায়াত সাহেব এ অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং গত দুটি নির্বাচনেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি, বা তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেননি এমন সন্দেহও করা সম্ভব নয়। কারণ বিধানসভার অধিবেশনকালীন সময়টুকু ব্যতীত সারা বৎসরই তিনি স্বগ্রামে বসবাস করেন এবং আপন চেষ্টায় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা ছাড়া বিধানসভাতেও তাঁর নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক

সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, হায়াত সাহেব যে মাঝে মাঝেই স্বদলের গ্রামবিরোধী ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে দলীয় প্রধানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে অজ্ঞাত নেই। তৎসত্ত্বেও কেন যে হায়াত সাহেব এভাবে পরাজিত হলেন তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিচিত্র সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোনো জননেতা এই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, এমন কি দুই-একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ খবরও জানা গেছে। কিন্তু হায়াত সাহেবের মতো জনপ্রিয় প্রার্থীর মাত্র সতেরোটি ভোট পাওয়ার সংবাদ বোধ করি সমগ্র নির্বাচনের ইতিহাসেই একটি দুর্বোধ্য রহস্য হিসাবে স্বীকৃত হবে।

গত পরশুর সংবাদপত্রে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবং সে ফলাফলের তালিকায় দেখা গেছে, করিম সাহেব সতেরো হাজার তিনশো বাষট্টিটি ভোট পেয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু পেয়েছেন দু' হাজার একশো একান্নটি ভোট, এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও হায়াত সাহেবের বাক্সে মোট সতেরোটি ভোট পড়েছে। গতকালের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং হায়াত সাহেবের পরাজয়কে অনেকে দলীয় জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে এসে জানা গেল যে, হায়াত সাহেবের বাক্সে কেবলমাত্র সতেরোটি ভোটপত্রই পাওয়া যায়নি, এ ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। অফিসার নাকি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে গল্পচ্ছলে জানান যে, হায়াত সাহেবের বাক্সের উপরে কোনো এক ভোটদাতা একটি বেগুন রেখে যান। উক্ত ভোট-কেন্দ্রের উভয় রাজনৈতিক দলের এজেন্টরাই এ কাহিনী সমর্থন করেন, এবং পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্বে কোনো একটি পোলিং বুথে ভোট-বাক্সের উপরে কেউ একটি বেগুন রেখে যায়, এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এ সংবাদে কোন প্রার্থীর বাক্সের উপরে বেগুনটি পাওয়া যায় উল্লেখ করা হয়নি। এবং বলা বাহুল্য, সে সময়ে খবরটি পাঠ করে সকলেই কৌতুকবোধ করেছিলেন।

PATHAGAR.NET

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত সংবাদটি কৌতুকর মনে হলেও ঘটনাটির পিছনে কি গভীর তাৎপর্য ও করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার কিছুটা হদিস বোধ হয় পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল কাব্যের ভোটার-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার। তন্মধ্যে তেরো হাজার মুসলমান ও সাতচল্লিশ হাজার হিন্দু। সুতরাং কোনো কোনো মহলে যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনে এবার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে করিম সাহেব তেরো হাজার ভোট পেয়ে থাকলেও স্বীকার করতে হবে, অন্তত চার হাজার হিন্দু ভোটও তিনি পেয়েছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর

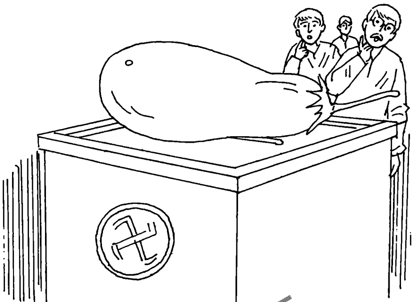

বসু হিন্দুদের ভোট অধিক সংখ্যায় পেতেন, এবং মুসলমানদের ভোট পেতেন হায়াত সাহেব। কারণ হায়াত সাহেবের পিতা এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মৌলবী ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান চাষীদের উন্নতির জন্য হায়াত সাহেব প্রাণপাত করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অন্য পক্ষে করিম সাহেব কিঞ্চিৎ সাহেবী ভাবাপন্ন, দরিদ্র মুসলমান চাষীদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই তিনি রাখতে পারেননি, কারণ ব্যারিস্টারি পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকতে হয়। সুতরাং এই বিস্ময়কর ঘটনাটির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে অকারণে দায়ী করা চলে না।

আরেকটি মহলের গবেষণায় প্রকাশ, জমিদারী উচ্ছেদের পক্ষে হায়াত সাহেব যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন, তার ফলেই নাকি তিনি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারগুলির ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং করিম সাহেব প্রাক্-নির্বাচন সফরে ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধিতা করে যেসব বক্তৃতা দেন, তা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে এবং সেটেলমেন্ট আপিসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের মাত্র সাতশো পরিবার জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আওতায় পড়েন এবং আইন-অন্তর্ভুক্ত একুশ হাজার বিঘা জমির মালিক পাঁচ-ছয় জনের অধিক নয়। সুতরাং নীতিগত কারণে হায়াত সাহেব সাত-শো পরিবারের পরিবার-পিছু পাঁচজন করে ধরলে সাড়ে তিন হাজার ভোট হারাতে পারেন, এবং করিম সাহেবও পাঁচ-ছয়শো পরিবার থেকে ক্যানাল ট্যাক্স বিরোধী বক্তৃতার দৌলতে

বড়জোর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ভোট পেতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে করিম সাহেব পেয়েছেন সতেরো হাজারেরও বেশি ভোট, এবং হায়াত সাহেব পেয়েছেন মাত্র সতেরোটি। অথচ গত নির্বাচনে হায়াত সাহেব তেইশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

অবশ্য হায়াত সাহেব মাত্র সতেরোটি ভোটই পাননি, উপরন্তু তাঁর বাক্সের উপরে পাওয়া গেছে একটি বেগুন। এই বেগুনটি অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হলেও আমার মনে হয়, হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই।

কলকাতা শহরে বসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা শূন্যের পরিবর্তে যেমন 'রসগোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে, তেমনই একটি বেগুন দান করে কোনো ভোটার হায়াত সাহেবের বাক্সকে শূন্য করবার পক্ষপাতী ছিল বা প্রতিপক্ষেরই কেউ বেগুন দিয়ে কোনো তুকতাক করতে চেয়েছিল এমন মনে করা যেতে পারতো। এমন কি হায়াত সাহেব নিজেও এই রহস্যটির এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে জানান যে, রায়মঙ্গলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকার কোনো চেষ্টাই করেননি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারও কারও তুকতাকে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাটাও তিনি আমাকে জানান। এ-হেন পরাজয় সত্ত্বেও সহাস্য কৌতুকে বলেন যে, কোনো চাষী ভোটার হয়তো বেগুনটি তাঁকে খাবার জন্যে দান করে গেছে, বা ভোট দিতে এসে ভুলক্রমে বাক্সের উপর নামিয়ে রেখে গেছে।

PATHAGAR.NET

এই সূত্রে কথোপকথন করতে করতে তিনি নির্বাচনের কথা ভুলে বেগুন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেন, এবং জানান যে, তাঁর বাড়ির উঠোনেও কয়েকটি বেগুনচারা ছিল এবং তাতে এক সের ওজনের বেগুনও ধরতো। হায়াত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিধানসভায় যেতে হত এবং দীর্ঘদিন কলুটোলার একটি হোটেলে বাস করতে হত। সে কারণে বেগুনের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেগুলির পরিচর্যা করতে পারতেন না, এ কথা জানিয়ে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বলেন যে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাঁর উপকারই হয়েছে, কারণ এখানে আর তাঁকে কলুটোলার নোংরা হোটেলে বাস করতে হবে না, পরম আনন্দে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ভিটাবাড়ির সামনের বাগানে বেগুনের পরিচর্যা করতে পারবেন।

হায়াত সাহেবের এই বেগুনপ্রীতির বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যখন সন্দিহান হয়ে উঠছিলাম, এবং এর সঙ্গে ভোট-বাক্সের কোনো সম্পর্ক আছে কি না মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশ করেন। তিনি বলেন

যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে তিনি একবার বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর গ্রামে ফিরছিলেন, এমন সময় গ্রামের হাটে একজনকে ঝুড়ি-ভরতি বড় বড় বেগুন বেচতে দেখে এত দূর প্রলুব্ধ হন যে, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কিছু বেগুন কিনতে তাঁর ইচ্ছে হওয়ায়, বেগুনওয়ালা এক সের বেগুনের জন্যে তিন আনা পয়সা চায় এবং হায়াত সাহেব কোনো দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সা দিয়েই বেগুনগুলি নিয়ে চলে আসেন। ঘটনাটির উল্লেখ করে হায়াত সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জানান যে, সে-রাত্রে পেঁয়াজ সহযোগে তিনি শুধু বেগুনপোড়া দিয়েই ভাত খেয়েছিলেন।

এই সূত্রেই তাঁর হঠাৎ স্মরণ হয় যে, তিনি যখন বেগুন কিনছিলেন, তখন পিছন থেকে কে যেন মন্তব্য করে, হায়াত সাহেবের দেখি আজকাল এক সের বেগুন না হলে চলে না।

এই স্থানীয় অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী সাফল্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ এবং ভোট-বাক্সে রাখা বেগুনটির সব রহস্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারী উচ্ছেদ, ক্যানাল ট্যাক্স—বহুজনের বহু মতামত হয়তো প্রচার করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে কোনো দলবিশেষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হদিস পাবেন, কিন্তু দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সায় এক সের বেগুন কেনার ফলে যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা গদিচ্যুত হতে পারেন, এ খবর অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি।

এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে আমি ইতিপূর্বে বিস্ময়কর বলেছি। তার কারণ হায়াত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবং তাঁকে আমি স্টেশনের পথটা দেখিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করি। পরিবর্তে সে প্রশ্ন করে জানতে চায়, আমি গ্রামে কার বাড়ি গিয়েছিলাম। উত্তর শুনে চাষীটি উপহাসের হাসি হাসে এবং বলে যে, সে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, আমি নবাবজাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। 'নবাবজাদা' বলতে সে কাকে বোঝাতে চায় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি হেসে বলে যে, গ্রামে নবাবজাদা তো একজনই আছেন। ইতিমধ্যে আরো দু'-চারজন লোক এসে জড় হয় এবং হাসতে হাসতে বলে যে, এখন তারা হায়াত সাহেবকেই নবাবাজাদা বলে সম্বোধন করে। এবং তাঁর পরাজয়ে যে তাঁরা খুশি হয়েছে তাও প্রকাশ করে।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের উল্লাসের কারণ জানতে চাই। তখন একজন সহাস্যে বলে যে, হায়াত সাহেব মানুষটি ভালো ছিলেন বলেই তার তাঁকে মাথায় করে রেখেছিল। কিন্তু বিধানসভার সদস্য হয়েই তিনি নাকি ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেন। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বলি যে, তাদের ধারণা ভুল, হায়াত

সাহেব যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বলা বাহুল্য, তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার জন্যই আমি হায়াত সাহেবের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে লোকগুলি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জানায় যে, হায়াত সাহেবের কথা বলতেও তাদের লজ্জা হয়। তিনি নাকি হাটে বেগুন কিনতে গিয়ে দরদস্তুর করেন না। তিন আনাই দিয়ে দেন। এবং যিনি বাড়ির গাছের বেগুন খেতেন তাঁর নাকি বর্তমানে এক সের বেগুন না কিনলে চলে না।

এরপর আমি সমগ্র অঞ্চল সফর করে হায়াত সাহেব সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জানবার চেষ্টা করি, এবং জানতে পারি যে শুধুমাত্র এক সের বেগুনের দরদস্তুর না করে কেনার সময় যারা তাঁর আশেপাশে ছিল তারা ক্রমে ক্রমে হায়াত সাহেবের পরিষ্কার জামাকাপড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এইভাবে নানান গুজব চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। এবং অনেকের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে ধারণা হয় যে বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয় খুব বড়লোক হয়ে গেছেন। অন্যথায় হায়াত সাহেবের মতো একজন দরিদ্র জননেতা এক সের বেগুন কিনবেন কেন, এবং কিনলেও দরদস্তুর না করে তিন আনা দাম কেন দেবেন?

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো গুজব রটনা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা কত সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর হতে পারে পরবর্তী ঘটনাটি থেকেই তা প্রমাণ হবে। হায়াত সাহেব যখন বৎসর দুই আগে প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেন সরকার ও সাধারণের সাহায্য নিয়ে, তখন সকলেই বলতে শুরু করে যে তিনি এখান থেকেই দু'-পয়সা রোজগার করেছেন।

PATHAGAR.NET

কিন্তু তাঁর জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কদর্থ করা হয় বৎসরখানেক পূর্বে তিনি যখন রায়মঙ্গলে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হন। কারণ, এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আরেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু বালিকাদের জন্য নয়।

এ পর্যন্ত হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের নানা কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও তাঁর চরিত্রের উপর কেউ কোনো কটাক্ষ করেনি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হয় এবং প্রশ্ন করে যে হায়াত সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ বালিকাদের উপর পড়েছে কেন। ফলে তাদের সুপ্ত আক্রোশ পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হতে শুরু করে এবং হায়াত সাহেবের মতো জননেতাও অল্প দিনের মধ্যেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। এ কারণেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যদিও তাঁর মতো অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবকের শোচনীয় পরাজয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছে তথাপি রায়মঙ্গল কেন্দ্রের জনসাধারণ এই পরাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

চতুর্থ গল্প

গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)

সুনীত ঘোষ বললে, থামুন মশাই, আপনি তো কন্‌ফার্মড ব্যাচেলার, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য শুনতে চাইনে। বিয়ে-থা আগে করুন—

বাধা দিয়ে সুনীল বোস বললে, দু'দিনের বৈরাগী হয়ে ভাই ভাতকে মহাপ্রসাদ বলতে শুরু করেছে। তোমাকে আর বলব কি। বিয়ে করলেই যদি মেয়ে-চেনার সাবজেক্টে অনার্স পাওয়া যেত, তাহলে তো দুনিয়াটা বেহস্ত হয়ে উঠত। মেয়েদের চেনা কি অতই সহজ!

চিনবেন কি করে? যদুদা অমায়িক হেসে মন্তব্য করলেন, ওঁরা স্বরূপে কি কখনও ধরা দেন? সব সময় ছদ্মরূপে বিরাজ করছেন। ঐজন্যই তো মহাজন ব্যক্তিরা ওঁদের নাম দিয়েছেন বিচিত্ররূপিণী। মেয়েদের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা—

শিবেরও অসাধ্য, মানুষ তো কোন্ ছার। বজ্রদা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন।

বললেন, শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবিনে, তিন সপ্তাহ এক তাঁবুতে দিনরাত কাটিয়েও তিন তিনটে জাঁদরেল লোক আমরা টেরই পাইনি যে, আমাদের সঙ্গে রয়েছে ওয়ালর্ড্ ফেমাস এক মহিলাও। বৃটিশ সরকার যাকে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার গিনি বকশিশ করবে বলে ডিক্রেয়ার করেছিল।

হাঁ হয়ে যাবার মতোই অভিজ্ঞতা বটে। বজ্রদা থামলেন। একটু পরে বললেন, গল্প-কথা নয়, একবারে ট্রু ফ্যাক্ট। স্বয়ং আমি তার সাক্ষী। মাতাহারির নাম শুনেছিস তো? ফেমাস জার্মান স্পাই? আমরা সেই মাতাহারির সঙ্গে তিন সপ্তাহ একনাগাড়ে এক মিলিটারি ক্যাম্পে বাস করেছি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে সেও আমাদের সঙ্গেই ঘুরছে ফিরছে আসছে যাচ্ছে, এমন কি কখনো কখনো একই বিছানায় আমাদের সঙ্গে শুচ্ছেও। আর হোল্ মিলিটারি সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, মেয়ের মতো মেয়ে বটে মাতাহারি। ঐ যে তোরা যা বললি, বিচিত্ররূপিণী, এ একেবারে তাদেরই মহারানি। আমি তো আমার লাইফে আর সেকেন্ড মাতাহারি দেখলুম না। যেমন চোখ-কানা-করা রূপ আর তেমনি ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। অমন দুঁদে যে এলায়ড ফোর্স তাকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। একদিকে মাতাহারি একা আর অন্যধারে গোটা এলায়েড ইনটেলিজেন্স। তাও ওকে এঁটে উঠতে পারেনি। বার বার এদের টপ সিক্রেট আউট করে দিয়েছে।

PATHAGAR.NET

এলায়েড ফোর্স যতবার জার্মানদের মোক্ষম মার দেবার প্ল্যান এঁটেছে ততবারই দেখা গেছে সে-সব প্ল্যান আগেভাগে জার্মানদের হাত গিয়ে পড়েছে। আর জার্মানরা রাম-প্যাঁদান পেঁদিয়েছে এদের।

বৃটিশরা বুঝতে পেরেছিল তাদের স্ট্র্যাটেজিক কোনো জায়গায় জার্মান স্পাই এসে থানা গেড়েছে। কিন্তু কে যে স্পাই, কোথায় তার আস্তানা, কি কৌশলে সিক্রেট আউট করছে, সেটা আর কিছুতেই ধরতে পারেনি। পারতও না, যদি এই শর্মা সে কাজটা না করে দিত। বলেই ব্রজদা নিজের বুকে আঙুল দেখালেন।

ব্রজদা খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, সে কি আজকের কথা! বোধ হয় নাইনটিন সেভেনটিন-টেভনটিন হবে। ফার্স্ট গ্রেটওয়ার তখন পুরোদমে চলছে। খুঁটিনাটি সব মনেও নেই ভাল করে। বৃটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের পুরনো রেকর্ড হাতড়ালে দেখতে পাবি 'অপারেশন ব্রজদা' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাতে আছে। আর যদি লর্ড কিচেনারের অরিজিন্যাল ডায়েরিখানা পাস, তাহলে তো কথাই নেই। পুরো হিস্ট্রিটাই তাতে পাবি। তবে এখন তার মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারি।

শোন তাহলে :

আই. এফ. এ. শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের হয়ে খেলে বাড়ি ফিরছিলুম। আমার তেমন খেলবার ইচ্ছে ছিল না এবার। বাঁ-হাঁটুর মালাটা ভেঙে একদম চুরমার হয়ে গিয়েছিল কিনা। হাঁটতেও কষ্ট হত। কিন্তু গোরাদের সঙ্গে খেলা তো, রিসক্ নেওয়া যায় না, গোষ্ঠ একা সাহস পায় না। বার বার করে বললে, ব্রজদা, তুমি না খেললে এবারে গেলুম। তাই রাজি হয়েছিলাম। হেরে গেলে তো ন্যাশনাল প্রেস্টিজটি একেবারে ডকে উঠবে, বুঝলিনে। তাছাড়া সন্তোষের মহারাজার পার্সন্যাল রিকোয়েস্ট, কিছুতেই না করতে পারলুম না। গোটা চারেক নিক্যাপ পরে মাঠে নামলুম। গোষ্ঠ ব্যাক। আমি রাইট ইন। গোষ্ঠ লাইন থেকে শট্ ঝেড়ে বলে কর্নারে পাঠায় আর আমি সেই ডান দিকে বল বাঁ পা দিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কোনাকুনি নিচু শটে নেট করি। হাফ টাইমের আগেই পর পর চারবার। ওদের গোলি আমার এই নতুন কৌশল ধরে ফেলার আগেই দেখা গেল, ফোর টু নিল।

যাই হোক বাড়ি ফিরতেই এক চিঠি পেলুম। ছোটলাটের চিঠি। পত্রপাঠ এসে দেখা করুন। জরুরি। বড্ড বিরক্ত হলাম। ম্যাচ খেলে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। এখন কোথায় একটু রেস্ট নেব, না এই ঝামেলা। কিন্তু লাট মানুষ, দেখা করতে চেয়েছে, কি আর করা, সেইভাবেই বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় নামতেই কে যেন পিছন থেকে ফিসফিস করে বললে, রাস্তার মোড়ে কালো গাড়ি আপনার জন্যে ওয়েট্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চাইলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ব্যাপারটাতে একটা রহস্যের গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়ল।

PATHAGAR.NET

ভাবলুম, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কারো কারসাজি আছে নাকি? নাকি কেউ মজা করছে?

তোরা আজকালকার জেনারেশন তো, কি করতিস কে জানে? কিন্তু আমি ব্রজরাজ কারফর্মা, কোনো জিনিসে হাত দিলে তার শেষ না দেখে ছাড়িনে। ভারত মাতার তৈরি ছেলে, পিছু হটতে জানিনে! গটগট করে গাড়িতে গিয়ে চাপলুম।

শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবের বাড়িতেই গেলুম। লাটসাহেব নিজে এসে আমাকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। অসময়ে ডিস্টার্ব করার জন্য অ্যাপলজিও চাইলেন। তারপর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে বললেন, মিঃ কারফর্মা, ব্যাপারটা টপ্ সিক্রেট। শুধু আমি জানি আর আপনি জানবেন। তাই এরকম গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। তবে ব্যাপারটা শুনুন। আপনাকে আজই ফ্রান্সে রওনা দিতে হবে। এখুনি। লর্ড কিচেনারের হেড কোয়ার্টার্সে। তিনিই আপনাকে তলব করেছেন। এই দেখুন তাঁর চিঠি। লাটসাহেব ড্রয়ার থেকে সীল করা একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলুম ডিপ্লোমেটিক কভারের চিঠি। চিঠিখানা খুলে পড়লুম! মিলিটারি আদমী তো। বেশি ধানাই-পানাই নেই। লর্ড কিচেনার সোজসুজিই লিখেছেন : মাই ডিয়ার ব্রজদা, আমি তোমার সাহায্য চাই। ভেরি আর্জেন্ট। অবশ্য সাধারণ বাঙ্গালীর মতো গুলিগোলা খেয়ে মরতে যদি ভয় না পাও, তাহলেই এস। প্রয়োজনের কথা সাক্ষাতে বলব। ইওরস্ লাভলি—কিচু।

ঐ যে খোঁচাটা কিচেনারে, মরতে যদি ভয় না পাও, ওতেই কাজ হল। আমি রাজি হয়ে গেলুম। না হলে এমনি প্লেনলি যদি বলত তাহলে যেতুম কিনা সন্দেহ। কারণ আমাদের সেকশানের বড়বাবু আমার পিছনে খুব লেগেছিল তখন। উইদাউট নোটিশে কামাই করলে শালা চাকরিই হয়ত খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু জাতের গায়ে খোঁচা মেরেছে, এ চ্যালেঞ্জ তোদের ব্রজদা অ্যাকসেপ্ট না করে পারে! ভাবলুম যায় চাকরি যাবে, তা বলে জাতের মুখে চুনকালি লেপতে কাউকে দেব না। দেশের জন্য যদি দরকার হয়, চাকরি খুইয়ে না হয় শহীদই হব।

লাটসাহেবকে বললুম, অলরাইট, যাব আমি। তবে দুটো কোয়েশ্চন আছে।

লাটসাহেব বললেন, বলুন আপনার কি জানবার আছে?

PATHAGAR.NET

বললুম, এক নম্বর কথা, আপিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করতে চাই। নইলে মাইনে কাটাবে, বড়বাবুটি বেশ টেটিয়া আছে। চাই কি চাকরিও গন্‌ হতে পারে। আর দু' নম্বর কথা, কবে যেতে হবে, কি করে যাব?

লাটসাহেব আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবই আগে দিলেন, এখনই যেতে হবে, জাস্ট নাও। কি করে যাবেন, সেজন্য আপনি ভাববেন না। বৃটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্নমেন্ট সে ব্যবস্থা করবেন। এবার প্রথম প্রশ্নে আসি। আপনি একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখে আমার হাত দিয়ে যান। আমি সেটা ম্যানেজ করব।

ব্যস, হয়ে গেল ফয়সালা। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ শরীরে লর্ড কিচেনারের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলুম। কি পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট! একেবারে তাক লেগে যায়। সাবমেরিনে করে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উঠলুম আর নামলুম ক্যালেতে। কোথায় গঙ্গা আর কোথায় ইংলিশ চ্যানেল। বিজ্ঞানে কি না করতে পারে!

লর্ড কিচেনারের তাঁবুতে পৌছতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, ব্রজদা, তুমি আমায় বাঁচালে। জানতুম তুমি খবর পেলে আসবেই। তবু তোমায় না দেখা পর্যন্ত অশান্তিতে ছিলুম।

সেই রাত্রেই ডিনারের টেবিলে তিনি ফরাসী স্থলবাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ফুসফুসিয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, হিয়ার ইজ মাই ফ্রেন্ড ব্রজদা। কামিং ফ্রম ক্যালকাটা।

জেনারেল ফুসফুসিয়ে আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌ হয়ে ফরাসী ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

বললেন, মঁসিয় ব্রজদা, আমরা ফরাসীরা ইউরোপের বাঙালি বলে গর্ব অনুভব করি। একটা হিস্ট্রিতে পড়েছি নাপলিয়ঁর (তোরা যাকে গাড়লের মতো নেপোলিয়ান বলিস) রক্তেও বাঙালিত্ব ছিল।

জেনারেলের ভুলটা শুধুরে বললাম, বাঙালিত্ব নয়, বাঙালত্ব ছিল। বাঙালি আর বাঙাল দুটো সেপারেটস স্পিসিস কিনা। আমার মধ্যেও বাঙালত্বই বেশি। আসলে আমরা বিক্রমপুরের অরিজিন। ক্যালকাটাতে ডোমিসাইল্‌ড্‌।

এমন সময় কোত্থেকে অপূর্ব সুন্দরী এক মাদি কুকুর এসে কুঁই-কুঁই করে আমার বাঁ হাতটা চেটে দিলে। কুকুরটার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই চমকে উঠলাম। জেনারেল ফুসফুসিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বার বার তাঁর কুকুরটার বেয়াদবির জন্য মার্জনা চাইতে লাগলেন।

ধমকে বললেন, জেন জেন, ও-ঘরে যাও।

কুকুরটা চলে গেল। বাঁ হাতটা তুলে দেখি একটা লাল ছোপ লেগে গেছে। অনেকটা আলতার ছোপের মতো।

PATHAGAR.NET

জেনারেল বললেন, ও কিছু নয়। জেনের লিপস্টিক খাবার অভ্যাস আছে। সোসাইটি বিচ্ কিনা। এটা ওর অদ্ভুত অভ্যাস। আমার জামাকাপড় প্রায়ই নষ্ট হয় ওর জন্য। আই অ্যাম সরি।

জেনারেলের কৈফিয়ৎ শুনে হাসি পেল, ফরাসী কুকুরও লিপস্টিক মাখে! শা-রা জাতই আলাদা।

ডিনারের পর আসল কথা শুরু হল। ওঁরা দু'জনে যা বিবরণ দিলেন তার অনেক কথাই টপ্ সিক্রেট। এমন কি এখনও তোদের বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, জার্মান স্পাইরা এক কম্যান্ডের সব সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে। ফলে গভর্নমেন্টের কাছে লর্ড কিচেনার এবং জেনারেল ফুসফুসিয়ে খুবই বেইজ্জত হচ্ছেন। আর কিছুদিন এমনিভাবে চললে ওঁদের দু'জনের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে 'নো বডি ক্যান সে'। লর্ড কিচেনার জানালেন, ওঁদের তরফের স্পাইরা যে যে খবর এনেছে তাতে জানা গেছে ক্যাপটেন থ্রি এক্স্ বলে একজন স্পাই এদের সব খবর ফাঁস করে দিচ্ছে। তার পরিচয়ও জানা গেছে। ক্যাপটেন থ্রি এক্স্ যার নাম, তারই আর-এক নাম মাতাহারি। পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। ছদ্মবেশে সর্বদা থাকে বলে কেউ তাকে স্বরূপে এ পর্যন্ত দেখেনি। (ঐ যে তোরা যাকে বিচিত্ররূপিণী বলিস তাই আর কি!) সব রকম ছদ্মবেশ ধরতে সে নিদারুণ ওস্তাদ। আরও জানা গেছে সে-ই এই ক্যাম্পে আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কেমন করে এ সব খবর বাইরে পাঠাচ্ছে কেউ তা ধরতে পারেনি।

তোমার কথাই ধর না, লর্ড কিচেনার বললেন, তুমি যে আসবে, সে কথা শুধু আমি জানি আর জেনারেল ফুসফুসিয়ে জনেন। আর তো কেউ জানে না, জানার কথাও নয় কারো। তবুও এ খবর ফাঁস হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ওরা যে কি সাংঘাতিক রকমের অ্যাকটিভ বুঝে দ্যাখ। এখন ব্রজদা, মাতাহারির হাত থেকে তোমাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ওকে খুঁজে বের কর। জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে বৃটিশ ক্রাউন পঞ্চাশ হাজার গিনি পুরস্কার দেবেন।

ভাবনায় পড়লুম। ছোটলাট কন্‌ফিডেন্সিয়াল চিঠিতে লিখেছেন তিন হপ্তার বেশি কোম্পানি আমাকে একদিনও ছুটি দেবে না।

তিন সপ্তাহ প্রায় কেটে যায়—অফিসের ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু মাতাহারির কোনো ট্রেসই করতে পারলুম না। শালা ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবার জো হল। লর্ড কিচেনার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফরাসীরা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। আমার রাতের ঘুম নষ্ট হল।

সেদিন গভীর রাত্রে আকাশ-পাতাল ভাবছি শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ দেখি জেন নতুন একটা লিপস্টিক ঠোঁটে করে জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জেনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। আমি ডাকলেই ও ছুটে আমার কোলে এসে বসে। গাল চেটে দেয়। রাত্রে কখনও কখনও আমার কোলের মধ্যে ও শুয়েও থাকে।

PATHAGAR.NET

জেনের সঙ্গ পেলে আমার মধ্যে কেমন একটা ফুর্তি চাগিয়ে উঠত। কেন, তা পরে বুঝেছিলাম। জেন সেদিন আর আমার কাছে এল না। কেমন হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এর আগেও যে দু'-একবার এ রকম ঘটনা না দেখেছি তা নয়। কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনো প্রশ্নই জাগেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, জেন যাচ্ছে কোথায় দেখি তো। তড়াক করে উঠে রবার সেলের জুতো পরে ওর পিছু পিছু চললাম। দেখি ওয়ারলেসের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওয়ারলেস অপারেটরের কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতেই সে তের মিটার ব্যান্ডের একটা সেট খুলে দিলে। সেটা থেকে সুঁই সুঁই আওয়াজ বেরুতেই জেন কড়কড় কড়কড় করে নানান ছন্দে লিপ্‌স্টিকটা চিবোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে সব রহস্য দিনের আলোর মতো ফুটে উঠল। ওঃ আমি কী গাড়ল! কালবিলম্ব না করে জেনারেলের ঘরে গিয়ে ওকে টেনে তুললুম। লর্ড কিচেনারকে ডাকলুম। বললুম, জেনের জন্য যে লিপ্‌স্টিক এনেছ দেখি, কুইক। জেনারেল প্রথমে অবাক হল। তারপর দুটো লিপ্‌স্টিক বের করে দিল। এক্সরের আলো ফেলে দেখলুম প্রতিটি লিপ্‌স্টিকের ভিতরে খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর তার গায়ে লেখা মেড ইন জার্মানি। এখন সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এইসব যন্ত্র দিয়েই মাতাহারি তাহলে এতদিন বাইরে খবর পাঠিয়েছে।

আমরা তিনজনে যখন সব ব্যবস্থা পাকা করে আবার ওয়ারলেসের ঘরে গেলাম তখনও জেন পুরো লিপ্‌স্টিক চিবিয়ে শেষ করতে পারেনি। এদিকে প্রায় ভোর হয়ে আসছে।

রিভালবার বার করে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললুম, গুটেনমর্গেন মাতাহারি। ওটা জার্মান ভাষা বুঝলি, মানে মাতাহারি সুপ্রভাত। জেন সুট করে পাশের বাথরুমে ঢুকে পড়ল। জেনারেল গুলি করতে গেল। বাধা দিলুম। একটু পরে বাথরুমকে উদ্দেশ করে বললুম, ও পথে পালাবার সুবিধে নেই মাতাহারি। বাইরে পাহারা মোতায়েন আছে। ধরা এবার দিতেই হবে।

এই প্রথম বাথরুমের ভিতর থেকে অপূর্ব সুরেলা নারী-কণ্ঠ বেজে উঠল, ব্রজ তুমি একটা আস্ত ঘুঘু। তোমার চোখে বেশিদিন ধুলো দিতে পারব না, জানতুম। বাঙ্গালিদের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়! তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন দয়া করে পরার কিছু দাও, নইলে বের হই কি করে?

লর্ড কিচেনার বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি আর্দালীকে ডাকতেই আমি হুকুম করলুম, যাও, আমার ড্রেসিং-গাউনটা নিয়ে এস।

ব্রজদা চুপ করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমনে টানতে লাগলেন।

হঠাৎ সুনীল বোস বলে উঠল, ও, তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি জেনের সঙ্গ পেলে আপনার ফুর্তি অত—

বাধা দিয়ে ব্রজদা মুচকি হেসে বললেন, স্টুপিড!

PATHAGAR.NET

অনবরত-র অবিশ্বাস্য

মহাশ্বেতা দেবী

অনবরত বাগচি বললেন, 'একবার মনের দুঃখে আমি হিমালয় চলে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'শান্তির আশায়।'

তিনি শূন্যপানে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'নিজেকে ভুলে বছরের পর বছর কাটিয়ে যাই মশায় কিন্তু তাতে মনের ভেতরের মন ভোলে কি? মাঝে মাঝে হঠাৎ যন্ত্রণার ভিসুভিয়াস ফেটে পড়ে।'

রাজেনবাবু বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভিসুভিয়াস বহুদিন ধরে স্বদেশী গানের ভারতললনাদের মতই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু অনবরত বাগচী বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'আমি এবং ভিসুভিয়াস কেউই ঘুমোই না। মাঝে মাঝে ফেটে পড়ি।'

'যা হোক, হঠাৎ মনে হয়েছিল সব মিথ্যে সব ঝুট হ্যায়। আমার জীবন কবে বয়ে গিয়েছে আর আমি তা জানতে পারিনি।'

'তাই হিমালয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। শান্তির আশায় গিয়েছিলাম আর শান্তিরাম বলে একটা লোক বেজায় বাগড়া দিয়েছিল। তাছাড়া আরো অভিজ্ঞতা সব!'

'নারীঘটিত নিশ্চয়।'

'মশায়, পথে বেরিয়েছি অথচ সুন্দরী রমনীরা এসে ঝামেলা বাধায়নি এ কখনো হয়েছে? বঙ্কিম সেই যে নবকুমারকে ভির্মি খাইয়েছিলেন সেই থেকে তো বাঙালি সাহিত্যিক মানেই...আমিও পাল্লায় পড়েছিলুম বটে, আর তা হিমালয়ের পথেই।'

'কি রকম?'

'দক্ষপিসীর হাতে। তিনি নারী না পুরুষ অনেকক্ষণ অবধি আমিও বুঝিনি। ছাঁটাচুল, গেরুয়া পরে পদ্মাসন হয়ে পায়ের নিচে হাত বুলুচ্ছিলেন, লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। হিমালয়ের দিকে যাচ্ছি, গেরুয়া দেখে পেন্নাম করতে গেলাম। উনি বললেন তুই আমাদের অমুক না? পেল্লায় গলা হাঁকড়ালেন, টি.টি. বললে বাইজোভ! তখনই বুঝলাম উনি আমাদের দক্ষপিসী। বছর ত্রিশেক আগে বাঘ বেঁধে রেখে মেডেল পেয়েছিলেন, সরকার রায়বাঘিনী খেতাব দিয়েছিল, কবজিতে খুব জোর। তা ছাড়া নিজে কানে শুনতেন না বলে গলা তুলে কথা বলতেন, সুবিধে ছিল খুব।'

PATHAGAR.NET

'তারপর?'

'দক্ষপিসী বললেন আমার দুই বেয়ানকে নিয়ে হিমালয় যাচ্ছি। তারা আমার মতো অথর্ব নয়। কামরা রিজার্ভ করতে গিয়েছে। বাহান্ন তিপ্পান্ন বয়স, দিব্যি সমর্থ আছে। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

'আমি বললাম।

'দক্ষপিসী বললেন, ঠিক আছে তুই আমাদের সংগে চ'! শুনেছি পথঘাট নোংরা হয়। তাছাড়া পাণ্ডাগুলো হিন্দী বলে। মশায়, ভেবে দেখুন তিনজনই জাঁহাবাজ মহিলা। একজন রায়বাঘিনী, আর তাঁর বেয়ানরা দু'বোন চোর ধরে থানায় দিতেন। হিমালয়ে বেরুলে পথের মোড়ে মোড়ে সবাই না কি সুন্দরীদের দেখা পায়। দু'জনে পাশাপাশি পোনি চড়ে। দক্ষপিসীরা আমাকে নিয়ে পোনিছুট করালেন একমাস। কেদার দেখে বললেন আরে রাম! এটা কি একটা মন্দির না কি? পাণ্ডাদের সে কি তর্জন গর্জন! কে চান করেনি। কে এঁটো হাত কাপড়ে মুছেছে! এমনি করে বাবার সেবা করতা হ্যায়? বলে পাণ্ডা পুরুত ঠেলে দিয়ে কেদারনাথকে সোজাসুজি সে কি শাসন! কোন দুঃখে এখানে এয়েছ বাবা? এই অনাচারের রাজত্বে? পুরুত বললে শংকরাচার্যের কথা। তা দক্ষপিসী বললেন সে সব কথায় কি কাজ বাছারা, তোমাদের যদি ঠাকুর সেবা করতে হয় তবে দক্ষর কাছে গিয়ে শিখে এসো।

'শেষে বললেন ওরে! এবার চ'! অমরনাথটা সেরে আসি। শান্তি কোথায় মশায়! তিনবুড়িতে কুটোকুটি, এ রাঁধলে ও বলে অম্বল হল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, অন্য যাত্রীদের সংগে কুটোকুটি। এখন বুঝলাম কেন কবিরা হিমালয়ে শান্তি নেই বলে এমন ধারা পদ্য লিখেছিল।

'যা হোক, তিনবুড়িকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি যখন ভাবছি কোথায় যাই, কোথায় যাই, সেই সময়ে সিজানগড় থেকে নয়নের নেমন্তন্ন পেলাম।

'এখন, নয়নের নেমন্তন্ন নেবার আগে আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে মেয়ে তিনপুরুষে রাজপুত, বয়স পঁচিশ, চেহারায় কৃষ্ণকলি, সে কদাপি প্রতিহিংসা ভোলে না।'

'প্রতিহিংসা?'

'হ্যাঁ মশায়। নয়নের স্বভাব অনেকটা ক্লিওপেট্রার মতো তা কি আমি তখন জানি? ভালবাসার সময়ে সে নায়িকা, মৌশুম ফুরোলেই বাঘিনী, এত কথা জানি না। আমি শুধু জানতাম ও বিধবা, সিজানগড়ের রানি, কারো সংগে লভ্ টভ্ আছে। জানবে ওর ভাসুরপো ওৎ পেতে আছে তো আছেই। সে অমনি হই-চই তুলে দেবে।

'সিজানগড়ে যখন গেলাম তখন বসন্তকাল। মশায় আমি যতই রোমান্টিক হই না কেন, বাড়াবাড়ি যাকে বলে আধিক্য তা আমি সইতে পারি না। সিজানগড়ে যখন দেখলাম হাজার হাজার গাছে পলাশ ফুটেছে, লক্ষ লক্ষ পাখি ডাকছে, কাতারে

PATHAGAR.NET

কাতারে মৌমাছি গুন্‌গুন্ করছে, ভয়ানক মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কেমন একটা হ্যা হ্যা ভাব, কেমন একটা আদেখলাপনা, দেখে এমন রাগ হল যে বলতে পারি না।

'যা হোক, ভাগ্যে নয়নকে দেখলাম মণ মণ মহুয়া ফল ওজন করে পাইকারদের বেচতে, তাছাড়া নয়ন তার কলকারখানার হ্যানো ত্যানো সব দেখালে ঘুরে ঘুরে। আমি বললাম আমাকে কেন ডেকেছ নয়ন?

'নয়ন বললে তুমি আমার সেক্রেটারির কাজ কর।

'আমি বললাম সেক্রেটারি?

'নয়ন বললে হ্যাঁ। আমার সেক্রেটারি ছিল। সে আবার আর একটি মেয়ে সেক্রেটারি রাখলে। এর সংগে ও, ওর সংগে সে, সে কি গোলমেলে ঝামেলা, কি বলি! শেষ অবধি লয়লাকে সরিয়ে দিতে হল।

'যাই হোক, শেষ অবধি সিজানগড়ে সময় আমার ভালই কাটল। যাবার আগের দিন নয়ন বললে তোমাকে আমার নিজের প্লেনে করে কলকাতা পৌঁছে দেব।

'আমি বললাম চালাবে কে?

'ও মুচকি হেসে বললে গঞ্জালেস্।

'গঞ্জালেস্?

'ও বললে গঞ্জালেস আমার পাইলট এবং বক্সার।

'আমি বললাম সে যাই হোক। এখন আমরা কি করব নয়ন? এই শেষ দিনের শেষ সন্ধ্যায়?

'নয়ন তার চোখ দুটি তুলে বললে :

'আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে
শুধু এবারের মতো বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দু'জনে কুড়াতে।'

'ফুল কুড়োতে গেল বেলা। রাতে নয়ন আমাকে প্লেনে তুললে। গঞ্জালেস্ আর নয়ন, মাঝামাঝি আমি। কলকাতার দিকে যাচ্ছি বলেই জানি। তাই চোখ তুলে আর চেয়ে দেখিনি। খুব ঘুমোচ্ছিলাম। বোধহয় নয়ন পানের সঙ্গে কিছু দিয়েছিল মশায়। নইলে অমন ঘুম তো আমি ঘুমোই না।

'অজ্ঞানের মতো ঘুমিয়েছিলাম। জ্ঞান যখন হল তখন কি দেখলাম জানেন? আমি পড়ে আছি একটি দ্বীপে, পাশে একটি ব্যাগ। নয়ন চিঠি লিখে রেখেছিল, পড়লাম। নয়ন লিখেছে তোমাকে এরপরেও বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে বিপদজনক। অতএব মনে যত ব্যথাই পাই না কেন তোমাকে সরিয়ে দিতে হল দ্বীপে, যে দ্বীপে একদিন লয়লাকে ফেলে দিতে হয়েছিল। দ্বীপটি সাপের জন্য বিখ্যাত। তাই, আশা করি তুমি আর ফিরবে না। আশা করি তুমি আমায় ভুল বুঝবে না। ইতি নয়ন।

'নয়নের সে প্রতিদ্বন্দ্বিনী বেঁচে আছেন কিনা জানি না। আমার আয়ু বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। অতএব, সেই নির্জন দ্বীপে, সূর্যের দিকে চেয়ে আমি গায়ত্রী পড়ব ঠিক করলাম। কিন্তু দুটো তিনটে ভ দিয়ে শুরু করেছি কি করিনি, কে যেন চেঁচিয়ে এই যে, এই যে আমি!

'তারপর দেখলাম কালো হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জী পরনে সে এক অভিনব কপালকুণ্ডলা।

'আমার দিকে চেয়ে সে বললে হোমো স্যাপিয়েনস?

'আমি বললাম দেবী, আমি তোমারই শরণাগত।

'তারপর শুরু হল আমাদের দ্বৈত এবং দ্বৈপ জীবন। ঝর্ণাতে নাইতাম আমরা, তীর ধনুক নিয়ে হরিণ শিকার করতাম। আবার, খিদে পেলে সেই হরিণ ঝল্‌সে পুড়িয়ে খেতাম। নোনা বাতাসে গায়ে চটা পড়ে গেল, দাড়ি হল বুক অবধি।

'লয়লা না থাকলে অবশ্য আমি মরেই যেতাম কেন না, লয়লার হাতের গুলি, বাহুর

শক্তি, গলার গর্জন, যে কোনো কনস্টেবলের চেয়েও বেশি ছিল। হরিণ দেখলে সে গলা তুলে এমন এক গর্জন করত যে ভয়েই হরিণ মরে যেত। ঝর্ণাতে মাছ দেখলে গর্জন করতে করতে ঝাঁপ দিত। জ্বালানী কাঠের দরকার হলে সেই গাছ-টাছ ভেঙে আনত। মাঝে মাঝে শুধু নয়নের নাম করে বলত ধরতে পারলে ফেঁড়ে টুকরো টুকরো করব। এমনি ভাবে বেশ চলছিল হয়তো চলেও যেত বেশ, কিন্তু এক পূর্ণিমার রাতে সে আমার প্রেমে পড়ে গেল।

'সেই যে প্রেমে পড়ল, সেই আমার দুঃখ হল শুরু। কেননা লয়লার এনার্জি, শক্তি, মনোবল, সবই তখন একই দিকে ধাবিত হল।

'একসংগে আমরা চাঁদ ওঠা আর চাঁদ ডোবা দেখলাম। গাছের ডালে দোলনা টাঙিয়ে ঝুল খেয়ে খেয়ে কতদিন গেল। ফুলের গয়না পরে লয়লা নাচল আর আমি গান গাইলাম। সকালে আমি ওকে কবিতা শোনালাম, দুপুরে ও।

'লয়লার ছিল না কল্পনা, তাই কবিতা ওর আসত না। ছন্দ তাল জ্ঞান ছিল না কিছু তাই নাচ দেখলে আমারও কষ্ট হত, পাখিগুলো অধিক ভয় পেয়ে চ্যাঁচাত।

'তাছাড়া প্রসাধনে এমনই মন গেল ওর, যে শিকার করা, আগুন জ্বালা, পাথর ভাঙা প্রতিটি কাজই আমার ওপর এসে পড়ল। তাতেও স্বস্তি নেই। চিনেজোঁক পা থেকে ছাড়িয়ে বগল থেকে কাঠপিঁপড়ে সরিয়ে, সবে একটা হেলান দিয়ে বসতাম, আর লয়লা আমাকে চিমটি কেটে দুষ্টু, আমায় ধরো! বলে ধুপধুপিয়ে ছুটত।

ক্রমেই চাঁদ দেখলে আমার ভয় হত, প্রেমে এল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্থির করলাম আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু মহাপাপই করব। প্রেমে না পড়েও আমি পাগল, অর্থাৎ মজনু হলাম। কিন্তু লায়লী নহী ছোড়তি।

এমনি সময় একদিন, কি আশ্চর্য এক জাহাজ এসে উপস্থিত।'

আমরা বললাম, 'তারপর?'

অনবরত বাগচী বললেন, 'জাহাজের কাপ্তেনকে আগেই বুঝিয়ে ছিলাম লায়লী একটি পাগলী। ওকে হাত পা বেঁধে কেবিনে পুরে দিয়েছিলাম, আর আমি যে কি করে দেশে ফিরেছিলাম তা আর নাই বা শুনলেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন, 'প্রেম করবেন কলকেতায় মশায়। যেখানে মিনিটে ট্রামবাস মেলে। নিমেষে উধাও হয়ে যেতে পারবেন, ইচ্ছেমত গা ঢাকা দিতে পারবেন। সদাসর্বদা একসংগে থাকলে প্রেম-ট্রেম টেঁকে না মশায়, এ আমার জীবন দিয়ে শেখা।'

আমরা বললাম, 'লয়লার কি হল!'

'লয়লা তো সেই কাপ্তেনকে বিয়ে করেছিল। শুনেছি নিজেই জাহাজ-টাহাজ চালায়, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। শুধু শুধু আমারই কিছু হল না।'

বলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে অনবরত বাগচী বেরিয়ে গেলেন।

PATHAGAR.NET

ওয়াটসনের বোকামি

হিমানীশ গোস্বামী

গোয়েন্দা দে তাঁর পড়বার ঘরের জানালার পাশে একটি রকিং চেয়ারে বসে একখানি পুরনো গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিলেন। কাহিনীটি তিনি এর আগে পড়েননি, শার্লক হোমস্-এর কিছু কিছু কাহিনী তিনি ছোটবেলায় পড়েছিলেন, কিন্তু তারপর আর ওসব গল্প-কাহিনী পড়বার সময়ও পাননি, আগ্রহও হয়নি। গল্পের গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে তাঁর প্রথম থেকেই কিছুটা বিতৃষ্ণা, তার কারণ তারা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় পরিচিত, তারা বাস্তব জগতের অধিবাসী না হয়েও যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা উপভোগ করেন তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন গল্পের গোয়েন্দা যে চটপট রহস্যের সমাধান করে ফেলেন তার কারণ আর কিছুই নয়, লেখক যে রহস্যগুলি সৃষ্টি করেন সেগুলি লেখকেরই সৃষ্ট নায়ক অথবা গোয়েন্দাপ্রবর বহু জল ঘোলা করবার এবং প্রচণ্ড ন্যাকামি করার পর সেটার সমাধান করেন। গোয়েন্দা দে-র কাছে তাই গোয়েন্দা-কাহিনীগুলো ছিল অতিরিক্ত রকমের আর্টিফিশিয়াল। এসব কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। আর যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই সেগুলো পড়ার অর্থ হচ্ছে সময় নষ্ট করা। কিন্তু সময়ের যেখানে অভাব নেই, আর সময় কাটানোর জন্য যখন কোনো লাভজনক কর্মের হদিশ নেই তখন বই, তা সে গোয়েন্দা-কাহিনীই হোক আর যাই হোক, না পড়ার কোনো অর্থ হয় না।

বইটির নাম, অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস্। বইটি তিনি পড়েছিলেন তাঁর এক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে উনিশশো চৌত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে। ভোজনগরের মহারাজা রামভোজ বাহাদুরের প্রিয় কুকুর তেন্ তেন্ চুরি হয়ে যায়। সেই কুকুর উদ্ধারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয় দু' হাজার টাকা। তখনকার আমলে দু' হাজার টাকার অন্য অর্থ ছিল। যাই হোক, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তেন্ তেন্‌কে উদ্ধার করেন পুরীর সমুদ্রের ধার থেকে। কৃতজ্ঞ রামভোজ বাহাদুর নিজের হাতে বইটি তাঁকে দিয়েছিলেন সেই কবে। এখনও কিন্তু বইতে নতুনের গন্ধ যেন লেগে আছে। তাঁর সম্পর্কে যদি কেউ লিখত তাহলে এরকম কত কাহিনীই যে তিনি দিতে পারতেন লেখককে, কিন্তু তাঁর কাহিনী লিখবার কোনো লেখক ছিল না, কোনো সম্পাদক কিম্বা প্রকাশকও ছিল না। থাকলে সে-কাহিনীর গুণে তিনিও আজ পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু কী করলে কী হত সে নিয়ে আর তিনি চিন্তা না করে শার্লক হোমস্-এর একটি কাহিনী, দ্য স্পেকল্‌ড ব্যান্ড পড়তে শুরু করলেন। কয়েক লাইন

PATHAGAR.NET

পড়তে না পড়তেই আকাশে ঘনঘটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। কাঁচের জানালা বন্ধ করে দিলেন তিনি। ডানদিকের সাইড টেবিলে ছোট্ট একটা ল্যাম্প ছিল, সেটাকে জ্বেলে দিলেন। তারপর আবার আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন গল্পটি।

গল্পটি অবশ্য বহু ইংরিজি ও বাংলা পাঠকের জানা। একটি ভয়াবহ কাহিনী। কেমন করে একজন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর আগের পক্ষের দুই যমজ মেয়ের একজনকে সাপের কামড় খাইয়ে মেরে অন্যটিকেও শেষ করতে গিয়ে অবশেষে সেই সাপের কামড়ে নিজেই মারা পড়লেন, তার কাহিনী পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ডাক্তারের নাম হচ্ছে গ্রাইমস্‌বি রয়লট। রয়লট একদা ছিলেন কলকাতায়।

এই যমজ দুই বোনের একটি নাম জুলিয়া। জুলিয়া সাপের কামড়ে মারা যায়, যদিও করোনারের তদন্তে তা ধরে পড়েনি। অন্যজনের নাম আমরা জানি হেলেন। সারের স্টোক মোরানে একটি বিশাল বাড়িতে ডক্টর রয়লট থাকতেন। তিনি খুব বড় জমিদারবংশের লোক হলেও তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না। যা টাকা তিনি ভারতবর্ষে জমিয়েছিলেন তা খরচ হয়ে গিয়েছিল মোকদ্দমায়। তিনি রাগের বশে ভারতবর্ষে তাঁর বাটলারকেই খুন করে ফেলেছিলেন। ফাঁসির হাত থেকে কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

কাহিনীটি পড়ে গোয়েন্দা দে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। শার্লক হোমস্‌ না থাকলে হেলেন মারা পড়ত, এবং হেলেন এবং জুলিয়ার বরাদ্দ টাকা ডক্টর রয়লট ভোগ করতেন। এমনিতেও এই টাকাগুলো রয়লটই ভোগ করছিলেন, কিন্তু জুলিয়ার বিয়ের ঠিকঠাক হবার পর জুলিয়া মারা পড়ে। দু'বছর পর হেলেনের বিয়ে যখন ঠিক হয় তখন হেলেনও বুঝতে পারল তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শার্লক হোমস্‌ই হেলেনকে বাঁচিয়ে দিল এবং তা অতি আশ্চর্যভাবে। কী আশ্চর্য কাহিনী এটি! গোয়েন্দা দে এটি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের মনেই বললেন : বাঃ বেশ বেশ, বেড়ে ডিটেকটিভ!

এই সময় হঠাৎ দরজায় ঝন্‌ ঝন্‌ করে ঘণ্টা নাড়ার আওয়াজ হল। তিনি নিজে গিয়েই দরজা খুলে দিলেন। এই বৃষ্টির মধ্যে যদি কোনো ক্লায়েন্ট আসে মনেমনে সে দুরাশাও হয় তো ছিল। দরজা খুলতেই কিন্তু ঢুকে পড়লেন গোয়েন্দা দাঁ। বললেন, বাপরে বাপ্‌ রাস্তায় বেরিয়েছি আর কী বৃষ্টি! রিক্‌শোয় করে আসতে হল, এইটুকু পথ, নিল পঁচাত্তর পয়সা। ডাকাতি—ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে আজকাল, উঃ।

গোয়েন্দা দে বললেন, আসুন, আসুন। একা একা সময় কাটানোর জন্য গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিলাম। খাসা কাহিনী মশাই—শার্লক হোমসের সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। পড়েছেন?

অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই করত বটে লোকটা। উঃ কী অসম্ভব বিচ্ছিরি লোকটি ওই ডক্টর রয়লট! বললেন গোয়েন্দা দে।

PATHAGAR.NET

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনিও ঠকেছেন তাহলে?

গোয়েন্দা দে বললেন, তার মানে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ওয়াটসনও ঠকেছিল, আপনিও ঠকলেন।

—ওয়াটসনও ঠকেছিল? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা দে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাই তো ওয়াটসনকে ঠকানোর জন্য। ডক্টর রয়লট অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁকে খুন করা শার্লক হোমসের রীতিমত অন্যায় হয়েছে।

গোয়েন্দা দে আঁৎকে উঠে বললেন, ডক্টর রয়লটকে তো সাপে কামড়াল। ডক্টর রয়লটের নিজের সাপ—শার্লক হোমস্ কেমন করে খুন করল তাঁকে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি একজন যাকে বলে গেঁয়ো, ভালো কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সরল। সাপটা ডক্টর রয়লটের এ ধারণাটা আপনার কোত্থেকে হল?

—সাপটা তাহলে কার? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা দে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সাপটা যে হোমসের পোষা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, অবশ্য সাপের কামড়েই যে ডক্টর রয়লট মারা পড়েছেন সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। আমার ধারণা যে সাপটির কামড়ে ডক্টর রয়লট বা জুলিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য সাপ নয়। হয় সেটা একটা অতি নিরীহ সাপ, অথবা সেটি একটা রবারের সাপ। আমার দৃঢ় ধারণা সাপটি রবারের।

—তার মানে? গোয়েন্দা দে জিজ্ঞেস করলেন।

গোয়েন্দা দাঁ একটি ইজিচেয়ার টেনে নিলেন। এতক্ষণ গোয়েন্দা দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে গোয়েন্দা দাঁকে বসতে পর্যন্ত বলা হয়নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, এই দেখুন কথায় কথায় আপনাকে যে বসতে বলব তাও ভুলে গেলাম।—চা?

—চা। বললেন গোয়েন্দা দাঁ।—চা আসবার আগে আপনার আগের প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে নিই। ডক্টর রয়লটকে হোমসের বান্ধবী হেলেন সাপের বিষভর্তি সিরিঞ্জ দিয়ে কুপোকাৎ করেছিল।

—হোমসের বান্ধবী হেলেন? হোমসের বান্ধবী?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, হোমসের বান্ধবীই তো। ইন ফ্যাক্ট আমার থিয়োরি হচ্ছে এই যে বহুদিন যাবৎই হোমসের সঙ্গে হেলেনের একটা ইয়ে চলছিল। যদি জুলিয়াকে এবং সৎ-বাবা ডক্টর রয়লটকে পৃথিবী থেকে সরানো যায় তাহলে হেলেন তার মায়ের সমস্ত সম্পত্তি পেতে পারে। বছরে, বুঝে দেখ তখনকার আমলে, গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ডের অর্থ কী। ওই টাকার উপর ছিল হোমসের নিদারুণ লোভ। ফলে সে হেলেনের সঙ্গে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে সে তার যমজ বোনকে খতম করে হোমসের সাহায্যে। একটি অদ্ভুত বিষের সাহায্যে, যা কিনা

সাপের বিষ কিছুতেই নয়। সাপের বিষ হলে করোনার নিশ্চয়ই ধরতে পারত। কিন্তু গল্পে দেখতে পাচ্ছি সেটা যে বিষ তা পোস্ট মর্টেমেও ধরা পড়েনি।

প্রথম খুনটিতে সাফল্য লাভ করার পর হোমস বেশ কিছুদিন চুপচাপ রইল। পরপর খুন হলে ওই অঞ্চলে নিদারুণ চাঞ্চল্য হত এবং ফলে সমস্ত দেশের দৃষ্টি সেই দিকে যেত। দু'বছর পার হল। তখন হোমস ঠিক করল এবার বুড়ো রয়লটের মরার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথম মৃত্যুটা প্রচণ্ড রহস্যময় ছিল, কিন্তু হেলেনের উপর কারও সন্দেহ হবার কথা নয়—যা সন্দেহ তা হত ওই বুড়োটির উপর। তার কারণও ছিল। বুড়ো লোকটি ছিল প্রচণ্ড একগুঁয়ে—এবং বদরাগী। সে রাগের মাথায় তার বাটলারকে প্রচণ্ড আঘাত করে, ফলে সে মারা যায়। যে লোক বদরাগী সে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ভেবেচিন্তে কাজ করে না। যাই হোক, বুড়ো একদা একটি লোককে খুন করেছিল এই ঘটনাটা জানা থাকায় যা কিছু সন্দেহ তার সমস্তটাই ওর উপরই হয়েছিল। কিন্তু বুড়ো একগুঁয়ে এবং বদরাগী ছিল, কোনো লোক তাকে পছন্দ করত না, তার কারণ বুড়ো কাউকে কেয়ার করত না। এখানেই আমার প্রথম মনে হয় বুড়ো নির্দোষ, কেন না যে অপরাধী সে স্বভাবতই তার স্বভাবকে ভালোমানুষের মতো করে আনে। অর্থাৎ, যার মনে যত প্যাঁচ সে তত শান্ত। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করবার মতো চরিত্র রয়লটের নয়। তাছাড়া ডক্টর রয়লট ছিল সত্যিকারের একজন খেয়ালি লোক। সে দুনিয়ার অদ্ভুত জাত, বেদেদের নিজের জমিতে আশ্রয় দিয়েছিল। যদি সে তার মেয়েকে খুন করতেই চাইবে তাহলে বেদেদের সাহায্যে সে সহজেই সেটা করাতে পারত। অথবা কোনো অসুখ হলে চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটানো তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। অসুখ না হলে অসুখ সৃষ্টি করাও তার পক্ষে সহজ ছিল।

ডক্টর রয়লটের খেয়ালিপনার আর একটা উদাহরণ : সে একটি বেবুন এবং একটি চিতা পুষত। যদি সে খেয়ালি না হত তাহলে এরকম অদ্ভুত জানোয়ার পুষবার কথা সে ভাবতে পারত না। কেবল টাকাই যদি তার ধ্যানজ্ঞান হত তাহলে চিতা এবং বেবুনকে সে কিছুতেই পুষত না এটা ঠিক, কেন না, একটা চিতা এবং একটা বেবুন পুষতে কম খরচ হবার কথা নয়। না, দে মশাই, শার্লক হোমস্ খুব সোজা লোকটি ছিল না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর রয়লট কখনই সাপ পোষেনি। সাপটি যদি সত্যি সাপই হয়—রবারের না হয় তাহলে সেটা পুষেছিল হেলেন। হেলেন কোত্থেকে সাপ সংগ্রহ করবে? সেটা অত্যন্ত সহজ—বাড়িতেই একদল বেদে থাকে, তারা তাদের সাপ বিক্রি করতে পারে। ডক্টর রয়লট বাড়ির মাঠে বেদেদের আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তার মেয়ে হেলেনের সঙ্গে বেদেদের আলাপ পরিচয় কথাবার্তা, এমনকী ষড়যন্ত্র হবে না তা সম্ভব নয়। তবে অতটা করবার তার প্রয়োজন ছিল না।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরের মধ্যে ছোট ঘুলঘুলি হেলেনই নিশ্চয় রাজমিস্ত্রিদের দিয়ে করিয়েছিল। সেটা করেছিল যাতে দোষটা শেষ পর্যন্ত ডক্টর রয়লটের ঘাড়ে চাপানো যায় তাই ভেবে। ডক্টর রয়লটের পক্ষে কাউকে মেরে ফেলা অত্যন্ত সহজ ছিল। অসুখ হলে ভুল ওষুধ দেওয়া বা কোনো ওষুধ ঠিক সময়ে না দেওয়াতে যে-কাজ হতে পারত তার জন্য বিরাট সব কাণ্ডকারখানা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা না করে একটি সাপকে শিখিয়ে পড়িয়ে অন্য লোককে কামড়ানোর জন্য তাকে উত্তেজিত করার হাঙ্গামা কি কম নাকি? তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়।

গোয়েন্দা দে বললেন, আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, বেজায় লক্ষণীয়। আপনি কি লক্ষ করেছেন যখন হেলেন শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এল তখন সে কাঁপছিল?

গোয়েন্দা দে বললেন, কাঁপবে না? সে কি বলছিল শুনুন—"আমি ঠাণ্ডায় কাঁপছি না, আমি কাঁপছি ভয়ে।" অর্থাৎ তখন ঠাণ্ডা ছিল।

ইংল্যান্ডের এপ্রিল মাসে কম ঠাণ্ডা পড়ে না—বিশেষ করে লন্ডনের বাইরের কাউন্টি সারের অবস্থা অত্যন্তই খারাপ হয় তখন। এই ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যায়, গরম পোশাক ছাড়া চলা যায় না।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আমিও তো তাই বলতে চাই—ওই সময় হেলেন তার কথামতো, সকাল ছ'টার আগে উঠে, ট্রেন ধরে লন্ডনে সত্যিই এসেছিল কি? আমার বক্তব্য এই যে হেলেন প্রথম রাত্রিটা কাটিয়েছিল লন্ডনেই এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শার্লক হোমসের সঙ্গেই। তারপর রাত্রিটা সে কোনো হোটেলে কাটিয়ে সকালে তার অভিনয় ক্ষমতা দেখাতে আসে বেকার স্ট্রিটে।

PATHAGAR.NET

—অভিনয় ক্ষমতা দেখাতে আসে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সমস্তটাই তো হেলেনের অভিনয়। সমস্তই শার্লক হোমসের কাছে শেখা। সমস্তই বোকা ওয়াটসনকে বুদ্ধু বানাবার জন্য করা।

গোয়েন্দা দে হাঁ করে রইলেন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, অত হাঁ করবেন না, আসল কথাটা এখনও বলিনি। আপনি কখনও শুনেছেন কি ঠাণ্ডায়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের ওই ঠাণ্ডায় ধরা যাক হেলেন বেরুতে পারে—সে মেমসাহেব, ও দেশের মেয়ে, তার পক্ষে সম্ভব—কিন্তু হেলে সাপের পক্ষে কি তা সম্ভব?

—হেলে সাপ?

—সাপের নামটি তো বইতে পড়লেন সোয়াম্প অ্যাডার। ওর বাংলা কি হবে তা আমি জানি না, সর্পবিদ্‌দের কাছ থেকে সেটা জেনে নিলেই হবে—আমি সুবিধের জন্য নাম দিয়েছি হেলে। এখন কোনো হেলের পক্ষে কি ইংল্যান্ডের ওই দারুণ ঠাণ্ডায় চলে বেড়ানো সম্ভব? শীতকালে সাপেরা জানেন তো দারুণ ঘুমোয়—মাসের পর মাস

PATHAGAR.NET

ঘুমোয়। আসলে ওটা মোটেই সাপ কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। আমি আগেই বলেছি আমার ধারণা ওটা একটা রবারের নকল সাপ।

গোয়েন্দা দে বললেন, তাইতো—ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডায় একটা ভারতীয় সাপ, যারা শীত পড়লে আর রা—করে না, দুম দাম দড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে, কামড়াচ্ছে—সত্যিই ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলবারই মতো।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ভাবুন ভাবুন, ভাবিয়ে তুলবার জন্যই তো কথাগুলো বললাম। আরও একটা জিনিস ভাবুন, অন্ধকার ঘরে ওয়াটসন কিন্তু সাপটিকে দেখেনি, কেবল তার হিস্ হিস্ আওয়াজ শুনেছিল! কই চা কোথায়—গলা যে শুকিয়ে এদিকে কাঠ?

গোয়েন্দা দে উঠলেন। দু'-এক মিনিট ঘুরে এসে বললেন, কেবল চা নয়, সঙ্গে আরও কিছু টা আসছে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ওই সকালে দেখা গেল কি, না—হেলেন এসেছে বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে হোমসের কাছে। কিন্তু হোমস্ ওয়াটসনকে অতি অভদ্রের মতো ঘুম থেকে তুলবার জন্য ব্যগ্র। ওয়াটসন ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে হোমস্ তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওয়াটসন যখন বলছে, বাড়িতে আগুন লেগেছে নাকি? তখন হোমস্ বলছে, না একজন মহিলা-মক্কেল উত্তেজিত ভাবে এসেছে। এত সকালে কোনো মহিলা যখন খুব উত্তেজিতভাবে ভদ্রলোকের ঘুম

ভাঙায় তখন কেসটা সাধারণ কেস না হওয়ারই কথা। তা আপনি যদি ব্যাপারটা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করেন তাহলে গোড়া থেকেই দেখা উচিত আপনার। আপনাকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি।

গোয়েন্দা দে বললেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন—হোমস্ তাই বলেছিল বটে। গোয়েন্দা দাঁ বললেন, বোকা ওয়াটসন! আসলে হোমসের একজন সাক্ষী দরকার ছিল। ভদ্র সাক্ষী, যার কথা কেউ বিশেষ অবিশ্বাস করবে না এরকম একজন সাক্ষী। ওয়াটসনের অভ্যেস ছিল হোমস্ কাহিনী লিখে প্রকাশ করা, অতএব হোমসের একটা অদ্ভুত সুবিধে ছিল। ওয়াটসনের কথাই লোকে বিশ্বাস করত। এই কেসে মনে হয় শার্লক হোমস্ ধরা পড়বার ভয় করছিলেন, তাই হেলেনকে ভোরে পাঠানো নাটক সৃষ্টির জন্যই হোমস্ ওই সকালে ওয়াটসনকে ডেকে তুলেছিল।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এর পরের সমস্তটাই নাটক। ওয়াটসনকে নিয়ে হোমসের সারে-র গ্রামে যাওয়া, সেখানে একটা হোটেলে থাকা, রাত্রে হেলেনের ঘরে থাকা, এবং হেলেন যখন তার বাবাকে মারছে তখন অমানুষিক চিৎকার করানোর ব্যবস্থা করা...।

গোয়েন্দা দে বললেন, হেলেন তার বাবাকে কীভাবে মেরেছিল?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, অত্যন্ত চুপি চুপি এক সিরিঞ্জ সাপের বিষ নিয়ে ঘুমের মধ্যে ইনজেকশন করে দেয় নির্দয় হেলেন। মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ। কোনও আওয়াজ হয় না। কিন্তু তাতে নাকি জমে না। তাই চিৎকার করানোর জন্য হোমসের দ্বিতীয় সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। হোমসের কোনো অভিনেতা বন্ধু—যার গায়ে বিপুল শক্তি। প্রচণ্ড লম্বা। এরই মাথায় ছিল টপ হ্যাট, ফ্রক কোট। লোকটি বেশ মোটাও বটে—বড় মুখ, হাজার হাজার রেখায় সেটা ভরা, রোদে পোড়া, আর নানা বিকৃত কামনার খনি। নাকটা বিরাট লম্বা—যেন একটা শকুন।

গোয়েন্দা দে বললেন, কিন্তু এ যে ডক্টর রয়লটের বর্ণনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ডক্টর রয়লট সেজে একজন অভিনেতা এসেছিল হোমসেরই আদেশে। ওয়াটসন একটা বোকা—ডক্টর রয়লট যদি হেলেনকে 'ফলো'ই করবে তাহলে তাকে হেলেন একবারও দেখতে পেল না? আর যদি হেলেনকে হোমসের বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে কি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি করছিল? ওই রকম দাম্ভিক এবং খ্যাপা লোকের পক্ষে তা কি করা সম্ভব নাকি? আসল রয়লট হলে সে হেলেনকে ধরে জোর করে হোমসের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু লোকটি আসল রয়লট নয়—কারণ আসল রয়লট একটু খেয়ালি এবং আপনভোলা মানুষ। দে মশাই, যে লোকটা রয়লট সেজে এসেছিল, সে হচ্ছে হোমসের কোনো অভিনেতা বন্ধু। আমরা যেমন টাকার জন্য অনেক কিছু করি—তেমনি অভিনেতাও টাকার জন্য এটুকু অভিনয় করতে পারে।

PATHAGAR.NET

গোয়েন্দা দে বললেন, তা পারে বটে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এই অভিনেতা স্টোক মোরানেও কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকে, যাতে ওয়াটসন তাকে দেখতে না পায়। হয়তো হেলেন যে-ঘরে ছিল সে ঘরেই ছিল, কিংবা ছিল ডক্টর রয়লটেরই ঘরে, হোমসের সঙ্কেত শুনেই সে প্রচণ্ড চ্যাঁচায়। এই চ্যাঁচানোটা দরকার ছিল। সে চেয়ারে বসে থাকে রবারের সাপ মাথায় জড়িয়ে। এমন সময় শার্লক হোমস্ এবং ওয়াটসন ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শার্লক হোমসের অভিনেতা-বন্ধুকে। আসল রয়লট তখন বিছানায় মরে রয়েছেন। লেপঢাকা থাকায় আর দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া ওয়াটসনের সেদিকে তখন চোখ নেই। থাকবার কথাও নয়। ওয়াটসনকে যা দেখানো হল, তাই সে দেখল।

সাপটাকে তার খাঁচায় পুরে ফেলা হয়। লোহার খাঁচায়। রবারের সাপটিকে ঢোকানো মোটেই কঠিন হয়নি হোমসের পক্ষে। কিংবা হয়তো সত্যি একটা সাপ রাখা ছিল খাঁচার মধ্যে। রবারের সাপটা পকেটে পুরে নিয়ে গিয়েছিল অভিনেতাটি, আসল সাপের উপর দোষ চাপিয়ে! যাই হোক, এর পর লোকজন আসতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত ঘরটি অন্ধকার থাকে নিশ্চয়ই। সেই সময়ের মধ্যে অভিনেতাটি চটপট উঠে পোশাক পরে লোকজনের সঙ্গে মিশে যায়, এবং এক ফাঁকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে ওই সময়ে গ্রামে কোনো বৈদ্যুতিক আলো ছিল না কোথাও। হোমস্-এর সমস্ত প্যাঁচালো বুদ্ধির জয় জয়কার হয়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, হোমস্ কতবড় শয়তান তা ওয়াটসনের মতো সরল, গেঁয়ো লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই ফাঁসির মঞ্চে না পাঠিয়ে ওয়াটসন তাঁকে মহান লোক হিসেবে চিত্রিত করছেন। কিন্তু দোষ ওয়াটসনের নয়—ওয়াটসন লোকটি ছিলেন অতি সরল।

গোয়েন্দা দে বললেন, আপনি আমাকেই কিন্তু ওই বিশেষণে খানিক আগে ভূষিত করেছেন!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সারল্য তো দোষ নয়, গুণ। দুঃখ এই যে দেশে সরল লোকই বেশি, বদমাইশই কম, তা নইলে এমন একটা কালো বিশ্রী বর্ষাকালে আজ পর্যন্ত একটা ভালো মতো অপরাধ হল না। আমাদের বাঁচাবার জন্য কারও কি কোনো দায়িত্ব নেই!

গোয়েন্দা দে বললেন, আশা রাখুন দাদা, আশা রাখুন—ভাগ্য সকলের কি একই রকম যায়? হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন? কালই হয় তো দেখবেন সকালের কাগজে দামি কেউ নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কিংবা হয় তো খুনই হয়েছেন। আশা—আশা রাখুন, দেখবেন দুঃখের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই নিন চা-টা এসে গেল।

চা-এর কথায় গোয়েন্দা দাঁ একটু নড়ে চড়ে বসলেন, কোনো কথা বললেন না। বৃষ্টি আরও জোরে এল।

PATHAGAR.NET

ছেলের ম্যাও বাবার হ্যাপা

সমরেশ বসু

'না, এভাবে তোমাকে আমি চুপ করে থাকতে দেব না।'

গায়ত্রীর স্বরে রীতিমতো ঝাঁজ, মুখে ক্ষুব্ধ উত্তেজনার অভিব্যক্তি। খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটাকে তুমি গায়ে মাখছো না, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না। যেখানেই যাই, এক কথা। বাড়িতে যে আসে সেও একই কথা জিজ্ঞেস করে, আর বলে, চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। আমি আর কান পাততে পারি না।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, গায়ত্রী দম নেবার জন্য থামলেন। মাধবের ফর্কে গাঁথা ডিম পোচের টুকরো, প্রায় মুখের কাছে, কিন্তু মুখে তোলবার অবকাশ পাচ্ছেন না, অর্ধেক হাঁ করে গায়ত্রীর কথা শুনছিলেন। গায়ত্রীর কথা থামতেই তিনি পোচের টুকরো মুখের মধ্যে পুরে চিবোতে চিবোতেই বললেন, 'কিন্তু আসলে ব্যাপারটা—'

'আসল-নকল জানি না।' গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। 'যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো শিবের বাবারও কম্মো নয়। এ কথা তুমি বলতে পারবে না যে, তুমি কিছু জানো না, তোমাকে কিছু জানানো হয়নি। ব্যাপার তোমার সবই জানা।'

মাধব বুক-খোলা পাঞ্জাবিটার হাতা গুটিয়ে, বাটার টোস্ট হাতে নিয়ে, কামড় বসাবার আগে বললেন, 'সবই জানা মানেটা কী? আমি কি করে সব জানবো? আমার মনে হয়, তুমিও সব জানো না।'

বলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই টোস্টে কামড় বসালেন। গায়ত্রী অর্থাৎ মাধবের স্ত্রী যতোটা উত্তেজিত, এবং ওঁর স্বর যতোটা উচ্চ, তুলনায় মাধব অনেকখানি শান্ত, এবং তাঁর গলার স্বর যথেষ্ট অবিচলিত ও নরম। গায়ত্রী ঝাঁজে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

ওঁর চোখে এখন রীতিমতো একটা কুটিল সন্দেহ। এখনো চল্লিশে পৌঁছোননি, পৌঁছাব-পৌঁছাব করছেন। চুল এখনো কৃষ্ণ কালো এবং ঘন। সিঁথি একটু চওড়া হয়ে গিয়েছে, দীর্ঘকাল একভাবে আঁচড়ে এবং সিঁদুর লাগিয়ে। দাঁতে সব ক'টি অটুট, এবং শরীরে কিছু মেদের ঢল নামলেও, স্বাস্থ্য খারাপ না। সংসারে কারুর যৌবনেই স্থির বিজুরি না, গায়ত্রীর যৌবনেরও সেই ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু একটা ঝলক থাকে। তা প্রখর

কিরণ না হোক, একটা লাবণ্য থাকে। গায়ত্রীর এখন সেইরকম দেহসৌষ্ঠব। চোখ নাক মুখ ভালো, একটা ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে।

মাধব সেই তুলনায় চুলটা বেশ পাকিয়ে ফেলেছেন। দাঁত দৃষ্টি দেহ অবশ্যি অটুট রেখেছেন। কিছু মেদ সঞ্চয় করেছেন, জায়গা বিশেষে অর্থাৎ পেটের দিকে। সেটাও দাঁড়ালে বা চলাফেরা করলে, তেমন বোঝা যায় না। বয়স পঁয়তাল্লিশ। একটা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থার, তেমন একটা কেষ্টবিষ্টুর পদ না হলেও পদটি দেবভাগ্যের মতোই। আয়করের বাহুর গ্রাসে যা দেবার দিয়েও মাসে হাজার তিনেক বেতন পান, কোম্পানির গাড়িও পেয়েছেন। তিনি দাঁতে-জিভে টোস্টের টুকরো সামলাতে সামলাতে বললেন, 'মানে ওরা কী করে তা কি আমাদের পক্ষে সব জানা সম্ভব? আমরা কি দেখতে যাচ্ছি, ওরা কখন কোথায় কী করছে না করছে?'

গায়ত্রীর স্বর আরো তীব্র এবং ঝাঁজালো হল, বললেন, 'সে কথা হচ্ছে না, ওরা কি করে না করে। জীবনে যেন আমাকে তা কোনো দিন দেখতেও না হয়, তার আগেই যেন আমি চোখ বুজি।'

তাঁর স্বরে বাষ্পের একটু ভ্যাপসানি টের পাওয়া গেল। মাধব ফর্কসুদ্ধ হাত নেড়ে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'আহা অমন করে বলো না। ভবিষ্যতে কী হয় না হয়, কিছুই বলা যায় না, এখন থেকেই চোখ বোজাবুজির কথা আসছে কেন। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে—মানে যাতে ঠিকমতো ব্যবস্থা করা যায়।'

গায়ত্রী এর মধ্যে গলার বাষ্পটুকু সামলে নিয়েছেন, অভিযোগের সুরে বললেন, 'সে তো তুমি অনেক দিন ধরেই করছো! এতদিন ধরে যে বারে বারে বলে আসছি, তুমি একবারও ছেলেকে ডেকে শাসন করেছ? এক ফোঁটা ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সবে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়েছে, সে এইসব কেচ্ছা-কেলেংকারি করে বেড়াবে, আর তা সইতে হবে? তার মানে, তুমিও ছেলেকে আজকালকার এইসব মড ছোকরার চোখে দ্যাখো, তা না হলে চুপ করে থাকার মানে কী?'

মাধব গায়ত্রীর কথার ফাঁকে একটু ডিম পোচ খেয়ে নিয়েছেন। একটু হাসলেও তার মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, 'আহা খুকু (ডাক নাম) শোন, তোমার ছেলে অনার্স নিয়ে বি. এসসি পাশ করেছে। যতোই দুধ খাইয়ে থাকো, নাক টিপলে তা আর এখন বেরোবে না। শাস্ত্রে বলে, ষোড়শ বর্ষেই ছেলে সাবালক, সে তখন বাবা-মায়ের সন্তানও যেমন, বন্ধুস্থানীয়ও বটে।'

'তবে আর কী, ছেলেকে নিয়ে এখন বাবা-ছেলে মুখোমুখি বসে সিগারেট খাও। আরও যদি কিছু থাকে, তাও করো।' গায়ত্রী বিদ্রূপে ঝাঁজলেন, এবং আবার বললেন, 'কিন্তু দোহাই আমাকে বাদ দাও, আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না।'

গায়ত্রী সরে যাবার উদ্যোগ করতেই মাধব তাঁর একটি হাত টেনে ধরলেন, বললেন, 'শোন শোন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। তোমার ছেলে মড ছোকরা না, রকবাজ-

PATHAGAR.NET

টকবাজও না, আমি তা ভাবতে যাবো কেন। আমি চুপ করে থাকি বলে কি সেটা ছেলের প্রতি অবহেলা? মোটেই তা না। কাজকর্মে কী রকম ব্যস্ত থাকি, দেখেছ তো? তেমন খেয়াল থাকে না।'

গায়ত্রী যেন একটু ঠাণ্ডা হলেন, 'খেয়াল না করলে কি চলবে?'

'তা কেমন করে চলবে।' মাধব বললেন, 'নিশ্চয় খেয়াল করতে হবে। আমার ছেলে, আমি খেয়াল করবো না? আসলে, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর, ধরতে পারিনি। আচ্ছা? মেয়েটা কে বলো তো? কার মেয়ে, কোথায় থাকে? আমাদের চেনাশোনা?'

গায়ত্রী বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি কান দাওনি। মেয়েটা থাকে বড় রাস্তায় ট্রাম লাইনের ওপারে। পাকা ঝিক্কুটি মেয়ে।'

মাধব ইতিমধ্যে খেতে আরম্ভ করেছেন, এবং খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চেনো নাকি? মানে আলাপ আছে?'

গায়ত্রী বললেন, 'আলাপ-টালাপ নেই, তবে চিনি।'

'কী নাম? পড়াশোনা করে?'

'শুনেছি এ বছর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। নাম বন্যা।'

'বন্যা?' মাধব ডিম চিবোতে চিবোতে যেন বিষম খেয়ে বললেন, 'বাবা! নাম শুনলেই মনে হয়, রোখা যাবে তো?'

গায়ত্রী ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোখা যাবে মানে?'

মাধব হেসে বললেন, 'নাম বন্যা বললে কী না, তাই বলছি। তা কার মেয়ে জানো-টানো? মানে ভদ্রলোকের মেয়ে তো, না কী?'

গায়ত্রী বললেন, 'ভদ্রলোক কি ছোটলোক জানি না। শুনেছি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইনকাম ট্যাকস্, ল-ইয়ার, নিজের অফিস-টফিস গাড়ি-ফাড়ি আছে। তা থাকুক গে, যাদের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আমি ভদ্রলোক বলি না।'

'সেটা আর বাবা কী করবে, কিন্তু—।'

গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাবা কী করবে মানে? বাবা-মা মেয়েকে শাসন করবে না? খবর রাখবে না, মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে।'

মাধব শান্ত ভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তা রাখবে কিন্তু কতোটা বলো। তাদের তো কাজকর্ম সংসার আছে। যেমন তোমার বা আমার। আমরাই বা আমাদের মেয়ে নীপার জন্য কী করতে পেরেছিলাম! সেই অভিজিৎকে বিয়েই করলো, আমরাও হেসে-খেলে দিলাম। কে জানতো আমাদের মেয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে?'

'চুপ করো।' গায়ত্রী প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথা বলবার সময় ভাষাটা একটু মার্জিত করো।'

মাধব বললেন, 'ওহ্ তাও তো বটে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া কথাটা—থাকগে,

এখন যে কথা হচ্ছিল। লোকটা সি. এ ল-ইয়ার, তার মানে নিশ্চয়ই চশমখোর। এতো কাছাকাছি থাকে, নামটা জানি না?'

গায়ত্রী বললেন, 'অশনি মিত্তির।'

'কায়েত?' মাধবকে যেন আচমকা ঘুম থেকে ঠেলে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গায়ত্রী বললেন, 'তবে আর তুমি শুনছো কি?'

মাধব প্রায় এক মিনিট নিঃশব্দে চা পান করলেন, তারপরে বললেন, 'এতে অবিশ্যি আজকাল কিছুই এসে যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, বামুনের গোয়ালেই গরু আজকাল বেশি। তার থেকে অনেক কায়েত অনেক বেশি ভালো।'

গায়ত্রী রুষ্টস্বরে বললেন, 'সে সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কী। আমরা তো আর আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি না।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' মাধব পায়জামা পরা পায়ের পর পা তুলে, সিগারেট ধরালেন, এবং বেশ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা খুকু, আমাদের শামু আর কী বললে নামটা—বান—না, বন্যা, হ্যাঁ, কী করে ওরা বলো তো? ঠিক কী শোনা যায় ওদের নামে?

গায়ত্রী বললেন, 'কী আবার? মেয়েটার সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রেস্টুরেন্ট সিনেমায় পার্কে ময়দানে। আমার দাদা সেদিন দেখেছেন, লেকের কাছে তোমার ছেলে, মেয়েটার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সিগারেট টানছে।'

মাধব বললেন, 'শামু বোধ হয় জানতো না, ওর মামা সে সময়ে লেকে যাবে, তা হলে অন্তত মেয়েটার হাত ধরতো না, সিগারেটও খেত না।'

'জানি না।' অসীম বিরক্তির ঝাঁজে গায়ত্রী বললেন, 'আমি তো দাদাকে বললাম, ধরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে না কেন?'

মাধব হেসে বললেন, 'তা কী করে সম্ভব, তা তো সম্ভব না। গায়ে হাত তোলা কি এতোই সহজ! তাও আবার পাবলিকলি? বাবা হয়ে আমিই পারতাম না, তবে আবার মামা।'

গায়ত্রীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হল, বললেন, 'কেন, বাবা-মামা মারতে পারে না?'

'পারবে না কেন, মারবার একটা বয়স আর স্থান-কাল আছে তো।' মাধব বলেই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে পিছলে চলে গেলেন, 'যাক গিয়ে, ব্যাপারটা বুঝেছি আমি আর ব্যাপারটা আমার মোটেই ঠিক লাগছে না। সে কোথায়, শামু?'

বলতে বলতে মাধবের মুখ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠলো। গায়ত্রীও যেন একটু সন্ত্রস্তই হলেন। বললেন, 'এই তো একটু আগে বাড়িতে এসেছে, বোধ হয় পড়ছে-টড়ছে কিছু।'

'হুম!' মাধবের মুখ আরো গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

PATHAGAR.NET

এখন প্রায় আটটার সময়, মাধব সন্ধ্যাকালীন জলযোগ করলেন, রাত্রের খাবার খেতে প্রায় বারোটা। এসময়ে সাধারণত বাইরে বা বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, বা পার্টি-টার্টি থাকলে যান। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন থেকে গায়ত্রী বললেন, 'তোমার অল্প কথাতেই কাজ হবে, বেশি কিছু বলো না। রাগারাগি করো না, তোমার প্রেশারটা আবার বাড়বে।'

'হুম।' শব্দ করে, মাধব খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গায়ত্রী সঙ্গে যাবেন ভাবলেন, কিন্তু গেলেন না, রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

মাধব এলেন শামুর ঘরের দরজায়, ডাকলেন, 'শামু আছিস?'

শামুর প্রায় চমকানো স্বর শোনা গেল, 'কে বাবা? আছি।' বলতে বলতে দরজার সামনে এলো। শামু বাবা মেশানো চেহারা পেয়েছে। ঠিক কোমল বলা যাবে না, ইতিমধ্যে যেন যৌবনের প্রখরতা আর গাম্ভীর্য এসে গিয়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি গভীর এবং কোমল। জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ বাবা?'

মাধব গম্ভীর মুখে শামুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, দরজাটা ভেজিয়ে এসো।'

তুই থেকে তুমি এবং গম্ভীর স্বরে দরজা ভেজানোর নির্দেশ শুনেই শামুর মুখের চেহারা বদলিয়ে গেল। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, বাবার দিকে তাকালো। মাধব খাটের মাথার কাছে, টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে, আঙুল দিয়ে খাট দেখিয়ে বললেন, 'এখানে এসে বসো।'

শামুর মুখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে এবার একটু ভয় দেখা দিল, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। ও বাবার দিকে মুখ করে খাটে বসলো। মাধব তাকালেন শামুর চোখের দিকে। শামু তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে আবার তাকালো। মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্যা কে?'

প্রশ্নটা এমনই ঝটিতি এবং আকস্মিক, শামু থতিয়ে গিয়ে, নামটাই কেবল উচ্চারণ করলো, 'বন্যা!'

'হ্যাঁ বন্যা।' মাধব গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?'

শামুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে লাগলো। বললো, 'ইয়ে মানে একটা মেয়ে।'

'সেটা আমি জানি, একটা মেয়ে।' মাধব একটু ধমকের সুরে বললেন, 'সে তোমার কে?'

'আমার?' শামুর স্বর একেবারে শুকিয়ে গেল, গলা কাঠ!

মাধব সিগারেটে টান দিয়ে, নিজেই বললেন, 'বোধহয় তোমার বন্ধু?'

'মানে—' শামু ঢোক গিলছে।

মাধব অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'এর আবার মানে, মানে কী আছে? এ তো সোজা

ব্যাপার। মেয়েটি তোমার বন্ধু, তুমি আর সে সিনেমায় যাও, রেস্তোরাঁয়, গঙ্গার ধারে. ময়দানে, লেকে ঘুরে বেড়াও। তাই তো, না কী?'

শামু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো, তারপরে বললো, 'হাঁ।'

মাধব কঠিন চোখে শামুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধু কি ভদ্রলোকের মেয়ে?'

শামু একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'তুমিও নিশ্চয় ভদ্রলোকের ছেলে?' জিজ্ঞেস করলেন মাধব।

শামু আর একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাধব ঠোঁট ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা বন্ধু হলে, তারা যে কেবল রাস্তায়-ঘাটে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, তা জানতাম না। কেন, বন্ধুকে বাড়িতে ডাকা যায় না? বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না? ঘরে বসে কথা বলা যায় না? এটা কী ধরনের বন্ধুত্ব আমি বুঝি না। লজ্জা করে না, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার বন্ধু, আর তুমি তাকে কোনোদিন বাড়িতে আসতে বলো না?'

শামুর গভীর কোমল চোখ একেবারে গোলাকার হয়ে উঠেছে, চক্ষু তারকা বাবার চোখে নিবদ্ধ। একটি কথাও বলতে পারছে না।

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি আমাদের আলাপ হতে নেই—?

শামু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ—থাকবে তো।'

'থাকবে তো, তা করোনি কেন?' মাধব ধমকে উঠলেন, 'যতো বাজে লোকের মুখে সব বাজে কথা শুনতে হয়? লেখাপড়া শিখে একটা বাঁদর হয়েছিস, না? জানিস না, না দেখলে জানলে খালি লোকের মুখে শুনলে মেজাজ খারাপ হয়! তোর মায়ের মেজাজ কি সাধে খারাপ হয়েছে? তা ছাড়া, আমাদেরও তো ইচ্ছে করে, আমাদের ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে, তারা কেমন, সেটা জানি। তুই কখনো বন্যাদের বাড়ি গেছিস?'

শামু লজ্জা পেয়ে বললো, 'গেছি।'

'তুই একটা আদ্যান্ত অসভ্য।' মাধব বলে উঠলেন, 'নিজে গেছিস ওদের বাড়িতে আর নিজেদের বাড়িতে আসতে বলিসনি।'

মাধব উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'শুধু শুধু একটা সহজ ব্যাপারকে জটিল করে তোলা। লোকজনের কাছে যেন আর কিছু শুনতে না হয়, বলে দিলাম।'

বলে বেরিয়ে গেলেন, বারান্দা দিয়ে, জামাকাপড় বদলাবার জন্য নিজের ঘরে গেলেন। গায়ত্রী সেখানে রীতিমতো উৎকণ্ঠিত মুখে বসেছিলেন। মাধব ঘরে ঢুকতেই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বললে? খুব রাগারাগি করোনি তো?'

PATHAGAR.NET

মাধব বললেন, 'না না, রাগারাগি করবো কেন? তা বলে বকাঝকা একটু না করলে হয়? একটু বকুনিও দিলাম, ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলাম। এর পর থেকে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গায়ত্রীর মুখের উদ্বেগ কাটলো, তিনি হাসলেন, বললেন, 'এবার বুঝেছ তো, কেন তোমাকে বলতে বলেছি? হাজার হলেও, ছেলেদের কাছে, মা-ও মেয়েই। বাপের কথা আলাদা। মা বললে যা হয় না, বাপ বললে তা হয়।'

মাধব বললেন, 'চলো তা হলে আজ, দু'জনে একটু বেরোই।'

গায়ত্রী বললে, 'চলো। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বোঝা গেল, গায়ত্রী শামুর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। এখন মন বেশ নিরুদ্বেগ, প্রফুল্ল, অতএব স্বামীর সঙ্গে বেরোতে আপত্তি নেই।

মাধব পরের দিন বিকালে পাঁচটার সময়, অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এ সময়ে একটা টেলিফোন এলো। রিসিভার তুলে, তিনি কিছু বলবার আগেই, গায়ত্রীর উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন, 'আমি গায়ত্রী বলছি। তুমি শামুকে সেই মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ?'

মাধব কথাটা শুনেই থমকে গেলেন, এবং নিজেকে প্রস্তুত করে বললেন, 'কেন কী হয়েছে?'

গায়ত্রীর উত্তেজিত স্বর প্রায় কান্নারুদ্ধ শোনালো। 'শামু সেই মেয়েটাকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, এতো বড় সাহস! এখন কী না আবার, ঘরে বসে মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছে! তুমি বাড়ি এলে তোমার সঙ্গেও নাকি আলাপ করিয়ে দেবে! কী আস্পর্ধা!'

গায়ত্রীর স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল। মাধব টেলিফোনে কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি, ব্যাপারটা এরকম হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। অথচ তিনি ভালো ভেবেই, শামুকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বললেন, 'শোন খুকু— ।'

'না শুনবো না।' গায়ত্রী টেলিফোনে ফুঁসে উঠলেন, 'আমি শামুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বললো তুমিই নাকি মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ। সত্যি?'

মাধবের মনে হল জিজ্ঞাসাটা উদ্যত খড়গের মতো তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'মানে, আমি—হ্যাঁ—আমি।'

'হ্যাঁ?' গায়ত্রীর প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল, 'তুমি তা হলে বলেছ?'

'শোন খুকু— '

'কিছু শুনবো না। এই তোমার শিক্ষা, ছেলেকে একটা মেয়ের সঙ্গে— ।'

'খুকু— ।'

PATHAGAR.NET

'চুপ! উহ ভগবান, বাপ ছেলেকে এই শিক্ষা দেয়? আমি দাদার বাড়ি যাচ্ছি। এখুনি এই মুহূর্তেই। তোমার সংসারে আমি আর নেই।'

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। মাধব কয়েকবার ডাকলেন, 'খুকু খুকু!' কোনো জবাব না পেয়ে, মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে ভাবতে বসলেন। অফিসের কাজকর্ম মাথায় উঠে গেল, ভাবতে লাগলেন, কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে। কোনো ভুলই খুঁজে পাচ্ছেন না। যা বলা উচিত ছিল তা-ই বলেছেন। মনে মনে তিনি শামুর ওপরে চটে উঠলেন। ভাবলেন, হতভাগাটা গোড়াতেই ভুল করে বসেছে। ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে, এখন তাঁকে খেসারত দিতে হচ্ছে।

এমন সময়ে তাঁর সহকর্মী অবনী সমাদ্দার দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মাধবদা, আর কতক্ষণ? বাড়ি যাবেন না?'

মাধব বললেন, 'বাড়ি তো যাবো, এদিকে এক কেলেংকারি হয়ে গেছে।'

'কী ব্যাপার?'

'বসো, বলছি।'

অবনী চেয়ারে বসতে মাধব তাঁকে ঘটনাটা সব বললেন। অবনী সব শুনে, হেসে বললেন, 'দাদা, ছেলের মতো আপনিও গোড়ায় গলদ করে বসে আছেন!'

মাধব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম?'

অবনী বললেন, 'আসলে তো ব্যাপারটা বৌদিকে নিয়ে। আপনি ছেলেকে সুনীতি শেখাতে গেলেন, বৌদিকে ঠাণ্ডা করবেন বলেই তো?'

মাধব বললেন, 'হ্যাঁ।'

অবনী বললেন, 'সেইজন্যই আপনার উচিত ছিল, বিষয়টা আগে বৌদিকে বলা, আর তাঁকে কন্‌ভিন্‌স করা। সব মায়েরাই, যেকোনও মেয়ের সম্পর্কে সন্দিহান, এটাও সেই চিরন্তন, বুঝেছেন তো, বিশেষ করে সে যদি আবার ছেলের বৌ বা বান্ধবী হয়, তাঁর সুপ্রিমিটি, তাঁর ইগো তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। তাঁর কাছে এসে সবাইকে নত হতে হবে।'

মাধব বললেন, 'সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছিল।'

অবনী বললেন, 'হচ্ছিল, কিন্তু ওই গোড়ায় গলদ! বৌদির অনুমতি না নিয়ে, তাঁকে না জানিয়ে, হঠাৎ ছেলের বান্ধবীকে দেখে ক্ষেপে গেছেন। ক্ষেপে তো আগেই ছিলেন।'

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে এখন কী করা যায় বলো তো?'

অবনী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাবতে হবে। যে ভাবেই হোক, বৌদিকে বোঝাতে হবে, আপনি ভুল করেননি, কিন্তু বৌদিকে আগে না বলাটা অন্যায় হয়ে গেছে। এখন এটা খুব কঠিন টাস্‌ক।'

দুই সহকর্মী গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, অবনী বললেন, 'আচ্ছা দাদা, বাড়িতে সবাই আপনাকে কী করকম লোক বলে জানে?'

'কী রকম লোক মানে?' মাধব ভ্রূকুটি করলেন।

অবনী বললেন, 'মানে আপনার মেজাজ সম্পর্কে সবাই কীরকম ভাবে। বাড়িতে কি আপনি খুব রগচটা?'

'মোটেই না।'

অবনী বললেন, 'সেটা আমি জানি। আপনি বেশ খোশ মেজাজের ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু রাগ-টাগ করেন না?'

মাধব বললেন, 'করি বৈকি। আমি একবার রাগলে সবাই থরহরি কম্প।'

'বৌদিও?'

'নিশ্চয়, তখন তোমার বৌদিরও কাঁপ্ ছটকে যায়।'

PATHAGAR.NET

অবনী চোখে ঝিলিক দিয়ে বললেন, 'তা হলে দাদা, বৌদির কাঁপ্ ছটকেই দিতে হবে। এখন আর নরম হলে চলবে না। গরমে গরম তাল দিতে হবে। মানে আপনাকে একটি অভিনয় করতে হবে। বৌদিকে খালি শুনিয়ে দিতে হবে, আপনি যা বুঝেছেন, তা করেছেন, তিনি কোন্ সাহসে অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন—এই সব। ঠিকমতো বলতে হবে, যাতে বৌদি ফিল করেন, আপনার ওপর দিয়ে তাঁর যাওয়া উচিত হয়নি। তারপরে তো পরে দেহি পদপল্লব মুদারম্ আছেই।'

মাধব একটু ভাবলেন, এবং মনে মনে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'ছেলের ম্যাও সামলাতে গিয়ে, বাপের হ্যাপাটা একবার দ্যাখো।'

অবনী বললেন, 'সবই ঠিক ছিল, একটুখানি ভুল হয়ে গেছে।'

মাধব বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথানুয়ায়ী কাজ করে দেখি। আমার সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়িতে গেছেন তোমার বৌদি! সেখানে একটা টেলিফোন করি।'

'কিন্তু দাদা, খুব সামলে।'

মাধব রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওদিকে রিঙ করার শব্দ হল। তারপরেই রিসিভার তোলার শব্দ হল এবং মহিলা স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মাধব প্রথমেই চড়া সুর ধরলেন, 'কে বলছেন, গায়ত্রীর বৌদি?'

জবাব এলো, 'হ্যাঁ আপনি—?'

'আমি মাধব বলছি।' মাধব যেন হুমকে ওঠার মতো বললেন, 'ওখানে গায়ত্রী গেছে?'

মহিলার ভীরু উৎকণ্ঠিত স্বর, 'হ্যাঁ।'

'ডেকে দিন এখুনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপারে 'দিচ্ছি' বলেই চিৎকার শোনা গেল, 'ঠাকুরঝি, শিগগির এসো। মাধববাবু তোমাকে ডাকছেন।'

কিছুক্ষণ নীরব। মাধব অবনীকে চোখ টিপলেন। ওপার থেকে গায়ত্রীর গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'কে, হ্যালো।'

মাধব ঝলকে উঠে বললেন 'কে, গায়ত্রী?'

ইচ্ছা করেই 'খুকু' বললেন না। একটু ত্রস্ত জবাব এলো, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি মনে করো নিজেকে, অ্যাঁ?' মাধব বললেন হুমকানো স্বরে, 'তুমি কি মনে করো, তুমি যা বোঝ, তার উপরে আর কিছু বোঝার নেই? (গায়ত্রী কিছু বলবার চেষ্টা করলেন) থামো, তোমার কথা আমি পরে শুনবো। তোমার ছেলের জন্য তোমার দুশ্চিন্তা আছে। তেমনি আমার ছেলের জন্য আমারও আছে। বোঝ না কিছুই, আবার রাগ করে বাড়ি ছেড়ে দাদার বাড়ি গিয়ে বসে আছো! (গায়ত্রী আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন) চুপ করো, আমাকে বলতে দাও। তুমি আগে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করবে, তারপরে যা খুশি তাই করো গে, আপত্তি নেই। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি,

PATHAGAR.NET

আর কেন করেছি, তা যদি বুঝতে, তুমিও ছেলের মতো ছেলেমানুষি করে এভাবে বাড়ি থেকে চলে যেতে না। মনে রেখো, আমারও আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে। যাই হোক, আমি অফিস থেকে বেরোচ্ছি। তোমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো। আমি তোমার দাদার বাড়িতে ঢুকবো না, গাড়ির হর্ন শুনে চলে আসবে, বুঝেছ?'

গায়ত্রীর স্তিমিত আবার রুদ্ধস্বর শোনা গেল, 'আচ্ছা।'

মাধব রিসিভারটা জোরে শব্দ করে নামিয়ে দিলেন। অবনী ব্যগ্র জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন। মাধব বললেন, 'মনে হয় ঢিলটা ঠিকই লেগেছে।'

অবনী হেসে বললেন, 'এখন পাটকেলটা না ফিরে আসে, সেটা দেখুন। আড়াল থেকে টেলিফোনে একরকম, সামনাসামনি খুব সাবধান।'

মাধব চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেখা যাক, এখন বেরোই।'

মাধব গাড়ি নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়ির সামনে গিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার হর্ন বাজালেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই, গায়ত্রী বেরিয়ে এলেন। দরজায় প্রিয়নাথের স্ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া। গায়ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠা, অথচ অভিমানের ছায়া। তিনি এসে দরজা খুলে বসলেন। মাধব গাড়ি স্টার্ট করলেন। গম্ভীর মুখ থম্ থম্ করছে।

গায়ত্রী নিচু বিমর্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদার বাড়ি কী দোষ করেছে, একবার নামলেই হত।'

মাধব গম্ভীর সুরে বললেন, 'দাদার বাড়ি কিছু দোষ করেনি, কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। তুমি কি বুঝবে, আমার মাথায় এখন কী দুশ্চিন্তা?'

গায়ত্রী একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কিসের দুশ্চিন্তা?'

'কিসের দুশ্চিন্তা!' মাধব প্রায় ধমকে উঠলেন, 'আমি কোথায় ভেবেছি, ছেলে যা করুক, আমাদের চোখের সামনে থাক। আর তুমি কী না, তাদেরই একসঙ্গে বাড়িতে রেখে চলে এলে? এর যদি কোনো ব্যাড কনসিকোয়েন্স হয়, কে দায়ী হবে?'

গায়ত্রীর মুখ যেন উদ্বেগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'জানি।' মাধব যেন চাপা গর্জন করলেন, এবং গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

ওঁরা যখন বাড়ি এসে পৌঁছলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাইরে গাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকে, ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হতেই মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'শামু কোথায়?'

ভৃত্য বললো, 'ঘরে।'

'আর কে আছে সেখানে?'

'এক নতুন দিদিমণি আর রামু ভাই!'

রামু শামুর ছোট, বছর দশেক বয়স। মাধব শামুর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

PATHAGAR.NET

দেখলেন, শামু ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে, জল রঙ দিয়ে ছবি আঁকছে, বন্যা আর রামু গভীর অভিনিবেশে দেখছে। তাঁর জুতোর শব্দে সবাই ফিরে তাকলো। শামু বলে উঠলো, 'ওই বাবা, এসেছ? এর নাম বন্যা।'

বন্যা নামে মেয়েটাকে এখনো কিশোরী বলা যায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ একহারা মেয়েটির চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখখানিও মিষ্টি। ও উঠে এসে মাধবকে প্রণাম করলো। মাধব বললেন, 'থাক থাক বসো। তুমি কী পড়ো?'

বন্যা বললো, 'ফিজিকস্ অনার্স, ফার্স্ট ইয়ার।'

মাধব বললেন, 'বাহ্! সায়ান্স পড়ছো? ভেরি গুড!'

গায়ত্রীও এসে মাধবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শামু জিজ্ঞাসা করলো, 'মা তুমি হঠাৎ কোথায় গেছলে?'

মাধব জবাব দিলেন, 'তোর মাকে টেলিফোনে করে ডেকেছিলাম। একটু দরকার ছিল। নে, তোরা যা করছিস কর।'

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে গেলেন। শামু বললো, 'মা আমাদের কিছু খেতে দেবে?'

গায়ত্রী বললেন, 'দেব। দিচ্ছি, তোরা বোস।'

গায়ত্রী মাধবের ঘরে এলেন। মুখ এখনো অন্ধকার, ছলছল চোখে অভিমান। মাধব বললেন, 'এবার বুঝতে পেরেছ, আমি কী চেয়েছি? বাইরের দশ জায়গায় যাবার থেকে, আমাদের চোখের সামনে বাড়িতেই থাকুক, তাতে ওদেরও মন স্বাভাবিক থাকবে, আমরাও নিশ্চিন্ত। এটাই ভালো না?'

গায়ত্রী রুদ্ধ স্বরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কি এসব জানতাম? তা বলে তুমি আমাকে এরকম করে বকলে?'

মাধব গায়ত্রীকে হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। গায়ত্রীর চোখ জলে ভরে উঠলো। মাধব বললেন, 'অবিশ্যি তোমাকে আমার আগে বলা উচিত ছিল। কাজকর্মে ছাই কিছু মনে থাকে নাকি?' বলে তিনি গায়ত্রীকে বুকের কাছে নিয়ে তাঁর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এলেন। গায়ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, 'বুড়ো বয়েসে আর এসব ভালো লাগে না, ছাড়ো, আমি ওদের খেতে দেবো।'

বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। মাধব বললেন, 'বন্যা মেয়েটি তা দেখছি ভালোই।'

গায়ত্রী মাধবের দিকে তাকালেন। মাধব তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

গায়ত্রী বেরিয়ে গেলেন। মাধব মাথায় হাত দিয়ে বসে বললেন, 'বাব্বা! খুব জোর সামলানো গেছে।'

অষ্টাবক্র এবং প্রিন্স অ্যালবার্ট

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ডাক্তার সুরপতি ব্রহ্ম বললেন, 'প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর নামে নাম। সেই যাঁর নামে চুলের ছাঁট ছিল আমাদের ছেলেবেলায়। আসলে খুব শৌখিন পুরুষ ছিলেন নাকি। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে শুনেছি...'

কী শুনেছেন আর বললেন না ডাক্তার ব্রহ্ম। একটু ঝুঁকে গেলেন গোলাপ গাছটার দিকে। মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'একটু লক্ষ্য করুন, তাহলে বুঝবেন। ফুলটা এখনও ফোটেনি! কিন্তু এখনই তার শেপটা দেখুন। কী দেখছেন?'

'ব্রিটিশ ক্রাউনের মতো।'

ডাক্তার ব্রহ্ম ছিলা ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে খিখি করে হাসতে লাগলেন। 'এই হল সাহিত্যিকারের চোখ। ব্রিটিশ ক্রাউনের মতো। তাও তো এখনও ফোটেনি। পুরো ফুটলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

'কখন ফুটবে?'

ডাক্তার ব্রহ্মের দু'চোখে উদাসীন দৃষ্টি। বাগানের দূরবর্তী কুয়াশা সকালের রোদের গায়ে গা ঘষছে, পিছনে নীল ধূসর আকাশ। সেইদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বরে বললেন, 'সন্ধ্যার দিকেই আশা করছি—সাতটা নাগাদ। একটু সময় নেয় প্রিন্স অ্যালবার্ট।'

বাড়ির পেছনে পুকুরের পাড়ে এই ফুলের বাগান। ডিসপেনসারিতে যাবার মুখে আমাকে বাগান দেখাতে এনেছেন ডাক্তার ব্রহ্ম। স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এসে আমি তাঁরই অতিথি। আমি ফুল ভালবাসি, কে না বাসে—কিন্তু কোনটা কী ফুল, কিংবা বাগান-সাজানো গাছপালার কার কী পরিচয়, কিছুই জানি না। ডাক্তার ব্রহ্ম এই গ্রামের মানুষগুলির সঙ্গে যেভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাঁর বাগানের সব বৃক্ষলতা ও ফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। ভদ্রতাবশে আমি কখনও বিস্ময়, কখনও মুগ্ধতা, কখনও আনন্দ প্রকাশ করছিলাম। অবশ্য সবই কপটতা। উনি বলছিলেন, 'শ্বশুরমশাই দুটো জিনিস আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। ডাক্তারি আর গার্ডেনিং। দেখছেন তো? বাগানে কোনো মালি নেই। সব আমি নিজের

PATHAGAR.NET

হাতে করেছি। শ্বশুরমশাই তাই করতেন। একেই বলে সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলিতেছে।'

ডাক্তার ব্রহ্ম খুব হাসছিলেন নিজের রসিকতায়। কিন্তু কথাটা হয়তো সত্য। ডিসপেন্সারিটি কাল এসেই দেখা হয়েছে। এই গ্রামাঞ্চলে রীতিমতো একটা ক্লিনিক বলা চলে। প্যাথলজি, অপারেশন কক্ষ, কয়েকটি বেড এবং অনুসাঙ্গিক সবকিছু আছে। ডাক্তার ব্রহ্ম তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের মতোই জনদরদী এবং জনপ্রিয় ডাক্তার। সারাদিন রোগীর ভিড়। প্রতিবন্ধী আশ্রিত কয়েকজন আছে। তারা যে যতটুকু পারে, ওঁকে সাহায্য করে।

তেমনি এক মানুষ অষ্টাবক্র। বয়স অনুমান করা কঠিন। বেঁটেখাটো চ্যাপ্টা গড়নের যেন এক বনমানুষ। ডাক্তার ব্রহ্ম তাকে রেলস্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। সে ওরাংওটাঙের মতো হাঁটে কারণ তার পা দুটো দু'পাশে বেঁকে যাচ্ছে ক্রমশ। ডাক্তার ব্রহ্ম বলেছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত কিছু করা গেল না বেচারার। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ওর শরীরটা বেঁকে দুমড়ে এমন হয়ে যাবে, আর ও চলাফেরা করতে পারবে না। বড় ট্রাজিক ব্যাপার!'

কিন্তু সেই অষ্টাবক্র মানুষটি বড় আমুদে। কথা বলতে জড়তা, হাঁটতেও তাই, তবু সে কথা বলে, অসংখ্য কথা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প শোনাতে চায়। এই বাগানের এককোনায় একটা ছোট্ট খড়োঘর। সেই ঘরে সে থাকে। তার কাজ বাগান পাহারা দেওয়া। কাল সে আমাকে কয়েকটা ভূতের গল্প শুনিয়েছিল। বাগানের ঘরে বসে সে নাকি আকাশ-পথে উড়ন্ত পরীদের দেখতে পায়। কখনও নিঝুম রাতের আকাশে সে দেখে দ্রুতগামী আগুনের গোলা। সে বলছিল, 'ওটা বাণ, বুঝলেন তো? গুণিন কাউকে বাণ মেরেছে। সেই বাণ ছুটে যাচ্ছে। আমি বাণ আটকাতে পারি না যে। একজন পারত।'

বুঝতে পারছিলাম, বাইরের বাস্তব পৃথিবীতে নিজের জায়গা না পেয়ে সে এক অলীক পৃথিবী খুঁজে নিয়েছে। সেই অলীক পৃথিবীর খবর কেউ শুনতে চায় না তার কাছে। আমাকে সে আগ্রহী শ্রোতা পেয়েছিল। উড়ন্ত গোলার গল্প শুনে আমি বলেছিলাম, 'ফ্লাইং সসারও হতে পারে! হয়তো সত্যি দেখেছে।'

ডাক্তার ব্রহ্ম হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'মাথা খারাপ? অষ্টাবক্রের ব্যাপারটাই এরকম। খানিকটা সাইকিক হয়ে গেছে, বুঝলেন না?'

এখন সকালে বাগানে এসে তার কথা মনে পড়ল। বললাম, 'আপনার অষ্টাবক্রকে দেখছি না যে?'

ডাক্তার ব্রহ্মের অন্যমনস্কতা কেটে গেল। চোখের উদাসীন ভাবটা ঘুচে ফুটে উঠল কৌতুকের ঝিলিক। কোনার দিকে সেই কুঁড়েঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ডাকলেন, 'কী রে অষ্টু, ঘুমোচ্ছিস নাকি এখনও?'

অষ্টাবক্র নড়বড় করে বেরিয়ে এল, হাতে একটা লাঠি। বাঁকা শরীর দুমড়ে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করতে ছাড়ল না। বললাম, 'কী হে? আজ রাতে কী সব দেখলে, বলো!'

তার মুখ দেখে মনে হল, সারারাতের খবর দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। শিশিরভেজা ঘাসের ওপরেই বসে পড়ল সে। ডাক্তার ব্রহ্ম বললেন, 'তাহলে ওর গল্প শুনুন। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার এখন ডিসপেন্সারিতে যাবার তাড়া পড়েছে।'

কয়েক পা এগিয়ে ফের ঘুরে বললেন, 'অষ্টু, আজ তোর ছুটি নেই কিন্তু। আজ সারাদিন কড়া পাহাড়া দিবি। প্রিন্স অ্যালবার্ট ফুটবে—বুঝলি তো?'

অষ্টাবক্র লাজুক হেসে বলল, 'সনজেবেলা যে যাত্রা হবে। দেখবনি?'

'সে তো রাত্তিরে।' বলে চলে গেলেন ডাক্তার ব্রহ্ম। যাবার পথে সেই দুর্লভ প্রজাতির স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের দিকে একবার সস্নেহে তাকিয়ে গেলেন।

অষ্টাবক্র খিকখিক করে হাসছিল। পাশেই বেদীর মতো উঁচু শান বাঁধানো ছোট চত্বরে বসে বললাম, 'হাসছ যে?'

'একটা কথা মনে পড়ল ছ্যার, তাই হাসছি।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল অষ্টাবক্র। 'আমাদের গাঁয়ে একটা পীরের কবর ছেল। সেখানে ছেল এক ফকির। আমি তেনাকে চাচা বলতুম। একদিন চাচা বললে, রেতের বেলা একটা পরী এসে বড্ড জ্বালায়। আমি বললুম, ও চাচা, আমি পরী দেখব। চাচা বললে, দেখিস। তাপরে ছ্যার, রেতের বেলা চাচার কাছে জেগে বসে আছি—কখন সেই পরী আসে। কখন আসে, কখন আসে...'

'এল না বুঝি?'

ফিক করে হাসল অষ্টাবক্র। 'এল, কিন্তুক পাইলে গেল। চাচা বললে, কাউকে—কাউকে পরী সয় না আসে বটে, পেইলে যায়।'

'তোমার কাছে তো আসে বললে।'

'হুঁ, আসে। এসে পেইলে যায়।' অষ্টাবক্র গম্ভীর হয়ে গেল। একটা ঘাস ছিঁড়ে কুচিকুচি করতে লাগল।

'কাল রাতে পরী এসেছিল কি?'

আমার প্রশ্ন শুনে অষ্টাবক্র করুণ হাসল। তারপর মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, 'হুঁ, এয়েছিল।'

'পেইলে গেল বুঝি? ধরতে পারলে না কেন?'

আমি হাসছিলাম না। অষ্টাবক্র গলার ভেতর বলল, 'আমার শরীলটা যে বেঁকে যাচ্ছে। সেই দেখেই বুঝি পরী পেইলে যায়। পেইলে যায়, তমু আসতে ছাড়ে না। তমু আসে।'

'কেন তবু আসে?'

PATHAGAR.NET

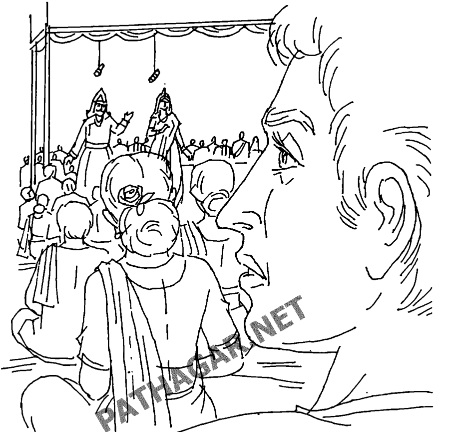

PATHAGAR.NET

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে অষ্টাবক্র বলল, 'ফুল ভালবাসে যে। তাইতে আসে। বাগানে কত ফুল দেখছেন?'

'সে কী ফুল চায় তোমার কাছে?'

'চায় বৈকি। বলে কী, আপন হাতে করে ফুল ছিঁড়ে দাও, তমে পরব।'

'বলে বুঝি?'

'হুঁউ। বলে।'

'তুমি তাই দাও না কেন?'

আবার করুণ হাসল সে। দু'পাশে মাথা দুলিয়ে বলল, 'তা কি পারি? ডাক্তারবাবুর ফুল। যত্ন করে ফুটিয়েছেন। আমাকে চিকিৎসা করেছেন। খেতে পরতে দিচ্ছেন। তা কি আমি পারি? আমি বলি, তুমি আপন হাতে করে তুলে লাও। সে বলে, উঁহু। তা লেবনি। তুমি দাও। দিই না। তখন পেইলে যায় গাল দিতে দিতে।'

শীতের সকালে ডাক্তার ব্রহ্মের ফুলের বাগান বসে বিশুদ্ধ সুন্দর রোদে এই অদ্ভুত

প্রহরীর সঙ্গে এই সব কথা বললাম—কথাগুলিও নিশ্চয় অদ্ভুত। তবু প্রকৃতির করতলগত এই বাগানে কিছুই অদ্ভুত মনে হয় না।...

বিকেল সন্ধ্যা ছটা অব্দি একদফা অনুষ্ঠান হল স্কুল প্রাঙ্গণে। ডাক্তার ব্রহ্ম আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। চা খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম, তাঁর মুখে চাপা উত্তেজনা। বরাবর ঘড়ি দেখছিলেন। চা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন। সভায় ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে প্রিন্স অ্যালবার্টের জন্মতিথিতে একজন সাহিত্যিক উপস্থিত আছেন। ইনঅগারেশন তাঁকে দিয়েই হবে।'

ডাক্তার গৃহিণী এবং জনাকতক গণ্যমান্য উপস্থিত ছিল ঘরে, হাততালি দিলেন। খুব হাসাহাসি পড়ে গেল। তারপর দল বেঁধে আমরা বেরোলাম। ডাক্তার ব্রহ্মের হাতে টর্চ, তিনি আগে। পেছনে আমরা। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুরপাড়ে গেলাম। সেই কুঁড়েঘরের দিকটায় একটা আলো জুগজুগ করছিল। ডাক্তার ব্রহ্ম হাঁকলেন, 'অষ্টু! অষ্টাবক্র! আছিস তো?'

কোনো সাড়া এল না। ডাক্তার ব্রহ্ম প্রিন্স অ্যালবার্টের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'পৃথিবীর এক বিস্ময়কর এবং ঐতিহাসিক কীর্তি...' তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

ডাক্তার গৃহিণী বললেন, 'এ কী? কই তোমার প্রিন্স অ্যালবার্ট?'

ডাক্তার ব্রহ্মের মুখের ওপর অন্ধকার, সামনে আলোর ছটায় কোনো গোলাপ ধরা পড়েনি। তারপর তাঁকে দুদ্দাড় শব্দে দৌড়ে যেতে দেখলাম কুঁড়েঘরটার দিকে। আগড়ে লাথি মেরে গর্জন করলেন, 'আই অষ্টা!'

ফিরে এসে ধরা গলায় বললেন, 'শুওরের বাচ্চা নেই। নিশ্চয় যাত্রা শুনতে গেছে আলো জ্বেলে রেখে।'

আবার আলো পড়লে দেখতে পেলাম কী ঘটেছে। ফুলটা কেউ মুচড়ে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে। আমার শরীর শিউরে উঠল। তাহলে কি আজ সন্ধ্যারাতেই বড় অসময়ে পরী এসেছিল এবং...

ডাক্তার ব্রহ্ম হাহাকার করার মতো বললেন, 'আমার কত যত্নের কত সাধের...উঃ! কতদিন ধরে প্রতীক্ষায় ছিলাম এই সময়টার জন্য।'

তাঁর স্ত্রী তাঁকে ধরলেন। আস্তে বললেন, 'আবার ফুটবে। বাড়ি চলো!'

একটা ফুলের জন্য এমন করে মানুষ ভেঙে পড়তে পারে, জানতাম না। সঙ্গের ভদ্রলোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার ব্রহ্মের স্বাস্থ্যের কথা বলছিলেন চাপা গলায়। সন্তানাদি নেই। এসব নিয়েই থাকেন ডাক্তার ব্রহ্ম। টর্চ নিভে গিয়ে বাগান জুড়ে শীতকালীন হিম অন্ধকার আর কুয়াশা। আমার ভয় হচ্ছিল, ডাক্তার ব্রহ্মের পক্ষে আঘাতটা যেন খুবই বড় রকমের এবং পরিণামে বেচারা অষ্টাবক্রের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে, তাছাড়া প্রিন্স

অ্যালবার্ট-এর এমন অন্তর্ধান রহস্যের পিছনে সত্যি কোনো অলীক, অলৌকিক ঘটনা আছে—নতুবা এ বাগানে আরও কত মনোহারিণী ফুল ফুটে রয়েছে!

শোকদগ্ধ ডাক্তার ব্রহ্ম আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ওপরের ঘরে গেলেন। মনে হল, শুয়ে থাকবেন এখন। ভদ্রলোকবৃন্দ বললেন, 'বরং চলুন স্যার, যাত্রা দেখবেন। স্কুল টিচাররাই অভিনয় করছেন।'

যাত্রা শুরু হতে আটটা বেজে গেল। বিশাল ভিড়। গ্রামের মানুষের জীবনে এ এক দারুণ উপভোগ্য রাত্রি। ক্রমাগত লোক আসছে আর আসছে। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে যেখানে যে পারছে ঢুকে পড়েছে। আমাকে চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। সামনে মেয়েদের দঙ্গল। আমার দু'পায়ের ফাঁকেও গ্রামকন্যারা এসে গুটিসুটি ঢুকে গেল।

আসরে কনসার্ট শেষ হলে নাচ তারপর পাত্রপাত্রীরা ঢুকল। মাইকের যুগ এখন। কানে তালা ধরার দাখিল। কতক্ষণ পরে সামনে মেয়েদের ভিড়ে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ওটা কি একটা সত্যিকার গোলাপ ফুল দেখছি? আমার দিকে পিছু ফিরে কেউ বসে আছে, তার মাথায় আলগোছে বাঁধা খোঁপা এবং সেই খোঁপায় গোঁজা ওই গোলাপটাই কি প্রিন্স অ্যালবার্ট? আলো যা আছে তা যথেষ্ট। আমার একাগ্র দৃষ্টির সামনে সব মুছে গিয়ে অন্ধকার-বর্ণ চুল, তার ভেতর ব্রিটিশ ক্রাউন—কিংবা ওটা অন্য কোনো সাধারণ গোলাপ কিন্তু আমি ব্রিটিশ ক্রাউনকেই দেখছিলাম। নিচের দিকটা সরু, তারপর ক্রমশ চওড়া উঠেছে। পাপড়িগুলো উল্টোদিকে—ঠিক এমনি বিবরণই দিয়েছিলেন ডাক্তার ব্রহ্ম। আমি প্রিন্স অ্যালবার্ট ছাড়া আর কোনো গোলাপ দেখছি না। কিন্তু ওই কি সেই আকাশচারিণী পরী, মেয়েমানুষের ভিড়ে মেয়েমানুষটি হয়ে বসে আছে নিরুদ্বিগ্ন, ভয়হীন, নির্বিকার এক পরী? কে তাকে গোলাপ দিল ছিঁড়ে ডাক্তার ব্রহ্মের বাগান থেকে? কে এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? নাকি ওই অলীক প্রকৃতিকন্যার সাহস হয়েছে প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে গোলাপ ছেঁড়ার? তবে যে সে বলেছিল, 'তুমি আপন হাতে করে ছিঁড়ে দাও, তবে পরব!'

আমি মনে মনে মাথা কুটছিলাম একবার যেন পরীর মুখখানি দেখি। দেখতে পেলাম না। দেখার জন্য ক্লান্তি, কষ্ট দম-আটকানো উত্তেজনা নিয়ে, আর ওই উৎকট মাইক-তাণ্ডব, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে রইলাম। আসর ভাঙতেই ভিড় হল ছাত্রখান তাসের ঘরের মতো। প্রিন্স অ্যালবার্ট খোঁপায় নিয়ে মিলিয়ে গেল আকাশচারিণী পরী, বিশৃঙ্খল মেয়েমানুষের ভিড়ে। ভয়ে-ভয়ে ভাবছিলাম, তাহলে আমিও কি ওই অষ্টাবক্রের মতো এক অলীক জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম? অবশ্য অষ্টাবক্র বলেছিল, পরী কাউকে কাউকে সয় না। পেইলে যায়।...

PATHAGAR.NET

বাবা যখন বাউণ্ডুলে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না। বাবা-মা আমাদের ক'ভাইবোন সম্বল করে এদেশে পাড়ি জমালেন সত্য, কিন্তু থিতু হয়ে তাঁরা বসতে পারছিলেন না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—কখনো কোনো প্ল্যাটফর্মে অথবা ভাঙা মন্দিরে, পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা গভীর বনের ভেতরে বাবা তাঁর সঠিক আস্তানা খুঁজে বের করলেন।

আমাদের কাজ ছিল সকাল হলে জমির জঙ্গল কাটা, আগাছা সাফ করা, মানুষের নতুন ঘরবাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে। অথবা সেই প্রাচীনকালের মতো, কোথাও জল এবং জমিতে উর্বরা শক্তি থাকলেই যেমন জনপদ গড়ে উঠত, আমরাও তেমন একটা জনপদের আদি বাসিন্দার মতো জায়গাটাতে এসে পড়েছিলাম।

দু' বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে থিতু হয়ে বসার আশায় বাবা খুশি। বাবা বলতেন, জমি খুবই উর্বরা। রাজরাজড়ার পতিত জমি, নানা রকমের জীবজন্তুর বাস, এই সবই হয় জমিটার উর্বরাশক্তির উৎস। জমি খুব উর্বরা বলতে বাবা বোধহয় এ-সবই বোঝাতে চাইতেন। বাবা খুব খুশি থাকলে মাঝে মাঝে বলতেন দু'ক্রোশ হেঁটে গেলে শহর, আড়াই ক্রোশের মাথায় একটা কাপড়ের মিল, বড় মাঠ, পার হয়ে গেলে পুলিশ ব্যারাক, জলের অভাব নেই, খাবারের অভাবও হবে না।

PATHAGAR.NET

এত বড় বনটা কতদূর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছু বোঝার উপায় নেই। বনটার সামনে একটা বড় শস্যবিহীন মাঠ, তারপর দিঘির মতো কালো জল টল টল করছে, একটা পুকুর এবং আমবাগান ছড়িয়ে ব্যারাকবাড়ি। হেস্টিংসের আমলের জীর্ণ প্রাসাদ সংলগ্ন সব বেড়া দেওয়া প্ল্যাটফর্মের মতো লম্বা খুপড়ি ঘর।

জায়গাটা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বাবার কতটা উৎসাহ থাকবে মা বুঝি টের পেত। সংশয় ছিল হয়তো আবার কোন নবর বাবার খবর পেয়ে বাবা উধাও হতে চাইবেন। প্রশংসায় মা বেশি রা করত না। প্রায় সময় চুপচাপ শুনে যেত। কিছু বলত না। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয়।

হেস্টিংসের আমলের সেই পুরনো বাড়িটাতেই ছিল পুলিশের আরমারি। বিরাট গম্বুজয়ালা বাড়িটার সামনে মাঠ। সকালে বিউগিল বাজলে শ' দুই রিক্রুট ফল ইনে

দাঁড়াত। তারপর পিটি প্যারেড আরম্ভ হয়ে যেত। মাঠের ভিতর রেলগাড়ির মতো সব লম্বা খুপড়ি ঘর, আমবাগানের ভেতর সেই কুঠিবাড়ি, পুকুরের টলমলে জল আর মানুষজনের সাড়াশব্দে বনটাকে বাবার কাছে মানুষজনের আবাসযোগ্য মনে হয়েছিল হয়তো। বাবা এখানেই শেষবারের মতো থিতু হয়ে বসতে চাইলে।

বাবার কাছেই পরে জেনেছি এই বনভূমির পশ্চিমে রয়েছে কারবালার মাঠ। পুবে ব্যারাকবাড়ি এবং বাদশাহী সড়ক, উত্তরে রাজরাজড়ার পুরোনো শ্যাওলা-ধরা প্রাসাদ। বাবা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এসে খবর দিতেন। অথচ প্রথম দিন এখানে এসে বাবার কথায় মনে হয়েছিল আমাদের সবাইকে একটা গভীর বন দেখাতে নিয়ে এসেছেন। এই যে বনটা দেখছ, এখানে আছে সব বিষধর সর্প। বাবার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় এলে সাধুভাষার ব্যবহার বিষধর সর্প, একদা ব্যঘ্র দেখা যেত। তরুলতা বলতে শাল, শিমূল। উত্তরে-দক্ষিণে এর বিস্তার ক্রোশের ওপর। রাজরাজড়ার পতিত জমি বিনা পয়সায় বলতে গেলে মিলে গেল। উর্বর জমিতে চাষাবাদ হলে তখন দেখবে এর চেহারা কত আলাদা।

বনটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার কিংবা পিলুর হয়নি। শুধু বাবা বলেছেন, বনের শেষে আছে রাজবাড়ি। পিলখানা আছে। একটা হাতি বাঁধা থাকে। একদিন তোমাদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাব।

দেশ ছেড়ে আসবার পর এই নিয়ে বাবা চারবার জায়গা বদল করলেন। কিছুদিন এখানে বসবাস করতে করতে কি কখন মনে হবে বাবার, লোটা-কম্বল গুটিয়ে ফের রওনা। তার আগেই রাজবাড়িটা দেখে আসতে হবে। অনেকদিন পর আবার হাতি দেখার এই মৌকা। বাবার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজাবার আগেই আমি এবং পিলু কাজটা সেরে ফেলব ভেবেছি।

আসল আমাদের অন্নকষ্ট আরম্ভ হলেই বাবা এমন একটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতেন, যেখানে দু'বেলা পেট পুরে আহার পাওয়া যায়—সদলবলে তার খোঁজ করবেন, দেশের লোক কে কোথায় এসে উঠেছে, কি ভাবে বেঁচে আছে। এবং কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব তাঁর ছিল না। সেই জায়গাটাতে যাবার আগে যা কিছু অসুবিধা ঘটাত আমার মা! মাকে সহজে তিনি বাগে আনতে পারতেন না। মা বলত, এখানেই কোথাও কিছু জোটাতে পার কিনা দ্যাখো। ঘুরে ঘুরে আর পারছি না।

বাবার কৃতবিদ্যা বলতে যজন যাজন। এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন। পুজো-আর্চা করতেন। এখানে এসে তেমন একটা উপযুক্ত কাজের সন্ধানেই আছেন। যদি কোথাও পাওয়া যায়। একবার খবর এল গুপ্তিপাড়াতে সব বনেদী মানুষের বাস। সেখানে গেলে এমন একজন সৎ ব্রাহ্মণের কিছু একটা হয়ে যাবেই। গুপ্তিপাড়াতে আমরা একটা ভাঙা মন্দিরের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাবা খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো চলাফেরা করলেন কিছুদিন। ঘাটে স্নানের

PATHAGAR.NET

সময় শব্দই ব্রহ্ম—এমন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করতেন যে মাঝে মাঝে মনে হত প্ল্যাটফরমে রেলগাড়ি পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়েছে, আর নড়তে পারছে না।

বাবার বোধ হয় আশা ছিল, ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে—লাইনবন্দি হয়ে আসবে মানুষজন। যাবতীয় পূজা-পার্বণে ডাক পড়বে মানুষটার। এমনি বোধহয় সব মনে হত তাঁর। অথচ গাড়ি যায় ট্রেন আসে। বাবুদের সব কাজকাম হয়ে যায়, ভাঙা মন্দিরে সাপ খোপের উপদ্রব বাড়ে। বাবা তারপর রেগেমেগে কোথায় চলে যান! আহার আমাদের কমে আসে। মন্দিরের চাতালে আমরা উপোসী মানুষ, কখন বাবা আসবেন এবং না বলে না কয়ে তিনি কোথায় যে চলে যেতেন—তারপর একদিন ফিরে এসেই যেন একেবারে সদরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—ওঠো ওঠো। সব ম্লেচ্ছর বাস। মানুষ এখানে থাকে না। গলসীতে নবর বাবা আছে। সে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে! গোপালির বাবুরা ওখানে বিরাট খামার করেছে। নবর বাবা চালের আড়ত করেছে বর্ধমানে শহরে। না খেয়ে আর মরতে হবে না। স্টেশনে নবর বাবার সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল।

বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হত চালের আড়তটা আসলে নবর বাবার নয়, আমার বাবার। আর অন্নকষ্ট থাকবে না। কেবল খাও আর খাও। সারাদিন আহ্‌ সে কি স্বপ্ন! যখন তখন খেতে বসে যাব! বাবা কত সহজে সব কিছু নিজের বলে ভাবতে পারতেন। বলতেন, এতবড় আড়ত নবর বাবার—চার-পাঁচটা পেটের সংস্থান হবে না সেকি হয়! এবং রওনা হবার আগে ধুমধাড়াক্কা লেগে যেত। এটা নাও ওটা নাও। কিছু পড়ে থাকল না তো। স্নান-আহার সবুর সইত না বাবার। রওনা হতে পারলেই হল।

পিলু আর আমার তখন কাজ ছিল স্টেশনে বসে দুর্লভ হাঁড়ি পাতিল, ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া শিতলপাটি পাহারা দেওয়া। চারপাশের মানুষজনের মনে হত চোর বাটপাড়। কে কি ভেবে ঠকিয়ে শিতলপাটি কিংবা ভাঙা বাক্সটা মাথায় করে ভাগবে কে জানে।

আর ট্রেনে সেই পকেটমার হইতে সাবধান—এমন সব বাক্য জোরে জোরে পড়তে আমাদের ভাল লাগত। আর তখন এই গাড়িতে কে পকেটমার নয়—সেটা ঠিক করাই ছিল বড় দুরূহ কাজ। মনে হত সবাই পকেটমার। গাড়িতে সবাই সবাইকে বুঝি পকেটমার ভাবছে। আমাদের যা চেহারা এবং যা অবস্থা সহজেই সবাই পকেটমার ভেবে ফেলতে পারে। গাড়িতে উঠে ভয়ে আমরা দু'ভাই কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকতাম। কারণ আমার আর পিলুর যা পোশাক-আশাক, ওতে অন্তত চোর-বাটপাড় না ভাবুক, চোর-বাটপাড়ের আণ্ডা বাচ্চা ভাবতে পারে।

মার মুখ তখন আরও করুণ। একে বিনা টিকিটের যাত্রী তার ওপর ট্রেনের গায়ের ও-সব লেখা, মা বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলবে! এত ভয় যে বাংকে না বসে নীচে বসে পড়ছে। বিনা টিকিটের যাত্রী।—কখন কোথায় নামিয়ে দেবে—তার চেয়ে নীচে বসে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। নীচে তো আর কেউ বসে না। কারো জায়গা দখল

PATHAGAR.NET

করেও মা বসে নেই। কিছুতেই কারো কোনো অসুবিধা হোক মা চাইত না। আমরাও পাশে গোল হয়ে লটবহরের মতো গাদা মেরে পড়ে থাকতাম। বাবার অবস্থা একবারে অন্য রকমের। যেন সংকীর্তনের দল নিয়ে বের হয়েছেন গাঁয়ে-গঞ্জে ঈশ্বরের নাম দেবেন তার আবার ভাড়া কি। এবং সহজেই এত ভাল মানুষ হয়ে যেতেন তখন, যে আমার মা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যেত।

আর আমার বাবা তখন একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে কখন কি দেখতেন। কখনও দরজায়। কোনো স্টেশনে প্ল্যাটফরমে নেমে ঘোরাঘোরি করতেন। যেন বাবার জমিদারি এটা। কার কি বলার আছে! আর চেকার বাবুকে দেখলেই মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে যেত। কিন্তু কাছে এলে একবারে তিনি দু' পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলতেন। বাবার হাসি দেখলেই বোধহয় টের পেত নির্ঘাত রিফিউজি।

বাবা তখন সব সামলে-সুমলে একেবারে অন্তরঙ্গ মানুষের মতো কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন চেকবাবুর সঙ্গে। যত বাবাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে তত বাবা মনে যেন বেশি জোর পাচ্ছেন। এবং সব সময়ে একটা লোককে স্যার স্যার করলে যা হয়, একসময় চেকার বাবুটি যথার্থই সহৃদয় হয়ে উঠতেন। আর যেই না সামান্য সহৃদয় হয়ে ওঠা, বাবার সেই প্রথম আপ্তবাক্যটি মুখ ফসকে বের হয়ে আসত— স্যার আপনার দেশ ছিল কোথায়?

বাবার সাহস দেখে চেকারবাবুটি তাঁর কাজকর্মের কথা ভুলে যেতেন। বোধহয় বিরক্ত হতেন। আচ্ছা ফিচেল লোক তো! তোমার কি এত দরকার আমার দেশ-বাড়ির খবরে!

আবার নানা জায়গায় বাবার সঙ্গে ঘুরে এই আপ্তবাক্যটির মূল ভাবার্থ ততদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছি। ঢাকা জেলার মানুষ আমরা। এতটা সগৌরবের জেলা বাংলাদেশে আর যেন একটাও নেই। বাবার অহংকার, ঢাকা জেলার লোক দেশবন্ধু, ঢাকা জেলার লোক বিজ্ঞানী জগদীশ বসু। আর সেই জেলার লোক বাবার ডাকসাইটে জমিদার দীনেশবাবু। এই তিন ব্যক্তি বাবাকে তাঁর জেলা সম্পর্কে আমাদের এই দুঃসময়ে খুব অহংকারী করে রাখে মাঝে মাঝে। চেকারবাবুর-টাবুর সঙ্গে দেখা হলেই সেটা তাঁর যেন আরও বেশি করে মনে হয়।

বাবার বুঝি খুব ইচ্ছে হত, চেকারবাবু যদি ঢাকা জেলার লোক হন। ঢাকা জেলার লোক হলেই নিশ্চিন্ত। একই জেলার মানুষ, সুতরাং ভাই ব্রাদারের মতো। এবং সেই প্রথম আপ্তবাক্যটির পর বাবা আর কি বলবেন, তাও জানা থাকত। ঢাকা জেলার লোক হলেই বাবার পরের আপ্তবাক্যটি হচ্ছে, দীনেশবাবুকে চেনেন?

চেকারবাবু যদি জবাব না দিত তাতেও তাঁর কিছু আসত যেত না। বাবা ঠিক পরের

PATHAGAR.NET

তিন নম্বর আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করতেন, কি দেশ ছিল বলুন। কত বড় পাপ করলে সে দেশ ছেড়ে মানুষকে আসতে হয়। আমাদের আর কি থাকল!

চেকারবাবুটি হয়তো তাঁর একটা কথাও শুনছেন না। কিন্তু বাবার কথার কামাই নেই। চার নম্বর আপ্তবাক্যটি আবার বের হয়ে আসত। দীনেশবাবুকে চেনেন না? ঢাকা জেলার লোক হয়ে তাঁর নাম শোনেননি? আমার মনে হত, দীনেশবাবু হচ্ছে বাবার দেখা পৃথিবীতে সব চেয়ে সেরা মানুষ। সে মানুষটার নাম জানে না ঢাকা জেলাবাসী চেকারবাবু—কি তাজ্জব! লোকটা আসলে তখন ঢাকা জেলার কিনা বাবার সংশয় হত। তাঁর পাঁচ নম্বর আপ্তবাক্যটি আর মুখ ফসকে বের হয়ে আসত না, কেমন দমে যেতেন একেবারে।

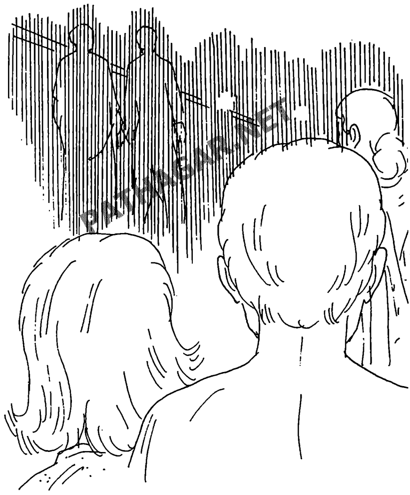

মুড়াপাড়া কত বড় গ্রাম—শীতলক্ষার পাড়ে দীনেশবাবুর সেই প্রাসাদের মতো বাড়ি, দীনেশবাবুর নুন খায়নি অথচ ঢাকা জেলার মানুষ বাবার বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। আর কি বৈভব! পূজা-পার্বণে, দোল, দুর্গোৎসবে তিনি ছিলেন সে বাড়ির প্রাণ। দীনেশবাবু এমন মানুষ যাঁর পরিচয় মিলে যাবে। এবং বাবার মুখ দেখলেই আমরা টের পেতাম, তাঁর ছ'নম্বর এবং শেষ আপ্তবাক্যটি এবারে বের হয়ে এল বলে, আমাদের এমন দিন ছিল না মশাই, যা দেখেছেন বুঝেছেন আমরা তা নাই।

তখনই আমার মা নড়েচড়ে বসত। বাবার এই অসহায় উক্তি এতবার মা শুনেছে যে আর সহ্য করতে পারত না। বাবার এই দীনহীন উক্তি মাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলত। এবং তখনই মনে হত, বাবার ডাক পড়বে এবার। দ্যাখ তো বিলু লোকটার সঙ্গে তোদের সেনাপতি কি করে এত ব্যাজর ব্যাজর করছে।

আমি উঠে গিয়ে বললাম, বাবা, তোমাকে ডাকছে।

কে ডাকছে, কেন ডাকছে বাবার সব জানা। বলতেন, যাচ্ছি যাচ্ছি, কিন্তু যতই তিনি চড়া গলায় কথা বলুন না কেন, তাঁর আর এক দণ্ড দেরি করার সাহস থাকত না। পৃথিবীতে এখন একমাত্র যাকে সমীহ করার সে হচ্ছে আমার মা। পাশে চলে এসে বলত, ডাকছ কেন?

কি অত ব্যাজর ব্যাজর করছ?

বাবার রক্ত বোধ হয় গরম হয়ে যেত। এবং সেই এক কথা।—আরে রণসাজে আছি! এখন কে কোথায় কি করে বসবে তার আমরা কতটুকু জানি। সবাইকে খুশি না করলে চলে!

রণসাজে কথাটা বাবা খুব ইদানিং ব্যবহার করছেন। আর মাও বাবাকে সেই সুবাদে সেনাপতি আখ্যা দিয়েছে। এখন আর মা তোদের বাবা না বলে, বলে, তোদের সেনাপতি কোথায় গেল রে।

বাবা আবার লাফিয়ে কামরার দরজার ছুটে গেলে মা বলল, দ্যাখ তোদের সেনাপতি কার সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে গেল।

আমরা বুঝতে পারি মার ভয়টা কোথায়। এমন একটা যুদ্ধের ফ্রন্টে বাবা বোধ হয় তাঁর স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারছেন না। মার ভয় সেই চেকারবাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো সামনের স্টেশনেই নেমে পড়বে। নেমে পড়বে না নামিয়ে দেবে কে জানে। কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই—কি যে হবে। কিছু বললেই রেগে মেগে বলবে, যুদ্ধক্ষেত্রে রণসাজে আছি। কখন কি হবে কিছু বলা যাবে না।

মার তখন আর কোনো উপায় থাকে না।—মতিভ্রংশ হয়েছে তোমার। মা খুব বেশি গালাগাল দিলে বাবাকে এমন সব নিষ্ঠুর কথা বলত।

মা কোনো উপায় না দেখে বলল, যা তো, কি বলছে শোন।

PATHAGAR.NET

খুব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রেন তেমনি দ্রুত আমাদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে।

কাছে যেতেই বাবা বললেন, তোর মাকে বল সামনের স্টেশনে নামব। মার কাছে ফিরতে না ফিরতেই দেখলাম বাবাও ফিরে এসেছেন। সেই আমাদের হাঁড়ি-পাতিল, শেতলপাটি, একটা পেতলের কলসি, বালতি দুটো এবং জীবনধারণের যা কিছু প্রয়োজন কারণ আমাদের সঙ্গে এমন সব মহামূল্য সামগ্রী রয়েছে যে একটা ফেলে গেলে প্রচণ্ড সর্বনাশ হবে। বাবা শুনতে থাকলেন, আমি গুণে দেখলাম। পিলু টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক নিয়েছে কিনা মা একবার গুণে দেখল একটা শেষ পর্যন্ত কম পড়ে যাচ্ছে—কি গেল খোঁজ খোঁজ—যা চোর-বাটপাড়ের দেশ, কোনটা কে নিয়ে যাবে—খুঁজে পাওয়া গেল, একটা ছেঁড়া চটের বস্তা। বাবা মহা খুশি কিছুই খোয়া যায়নি দেখে। তাঁর ছেলেরা যে ভীষণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ভেবে হয়তো গানই ধরে দিতেন—কিন্তু স্টেশনে ট্রেন তখন থেমে গেছে। বাবার আর গান গাওয়া হল না। হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। যেন স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন, নবর বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে মহামান্য মানুষের মতো স্টেশনে নিতে এসেছে নবর বাবা।

কেউ স্টেশনে ছিল না। বাবা স্টেশনে নেমেই খোঁজাখুজি করলেন। কোথায় নবর বাবা, কোথায় সেই গোপালদি বাবুদের খামার। যাত্রীরা চলে গেলে শুধু ফাঁকা প্ল্যাটফরম পড়ে থাকল। অথচ এমন একটা অচেনা নির্বান্ধব জায়গায় বাবা এতটুকু ঘাবড়ে গেলেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কোথায় আর অন্ধকারে খোঁজাখুজি হবে। স্টেশনেই থাকার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্টেশনের কল থেকে জল নিয়ে এল বাবা। প্ল্যাটফরমের এক পাশে ছোট মতো একটা শেডও আবিষ্কার করা গেল। শেডটা পাওয়ায় জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। নবর বাবা কোথায় থাকে, নবর বাবা এবং তার উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়ে দু'-একজনের কাছে খোঁজখবরও নিলেন। সবাই বাবার কথবার্তা শুনে মাথার কোনো গোলমাল আছে ভাবল। যত বললেন, নবর বাবা শ্রীশ পাল এখানে বাড়ি করেছে, বর্ধমানে চালের আড়ত আছে তার, তত তারা বুঝে শুনে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয় মনে করল। কেউ আর দাঁড়ায় না। বাবার কথা শুনলেই পালায়। অন্ধকারে অদৃশ্য জনতার দিকে তখন বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন।

গোপালদির বাবুরা আছেন এখানে, কোন দিকটায়—তারও খোঁজখবর পাওয়া গেল না কিছু। বাবা কি বুঝে আর আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। ঠায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মার বোধ হয় মায়া হল। বলল, ডেকে আন।

ফিরে এসে খুব নম্র গলায় বাবা বললেন, ধনবৌ, আজকের মতো এখানেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

মার কোনো যেন এতে আর আপত্তি নেই। অথবা মার চোখ-মুখ দেখে বোঝা

PATHAGAR.NET

গেছিল, বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না। শুধু বলল, শ্রীশ পাল এখানে কোথায় থাকে না জেনেই চলে এলে!

—সেই তো বর্ধমান স্টেশনে দেখা। সব বললাম! শুনে বলল, আমাদের দিকে চলে আসুন, বামুনের অভাবে পুজো-পার্বণ সব ভুলে যাচ্ছি।

পিলু ইতিমধ্যে কিছু খুড়কুটো সংগ্রহ করে ফেলছে, ওর খাবার ঠিক না থাকলে মাথা গরম হয়ে যায়। বাবার ওপর ভরসা করে থাকতে সে বোধ হয় আর রাজী নয়। সে আর মায়া কিছু শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠও নিয়ে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি কাঠগুলো লুকিয়ে ফেলল। শিতলপাটি দিয়ে সেই কাঠগুলো ঢেকে রাখা হল, আর প্ল্যাটফরম পার হলে বর্ষার জল, নালা-ডোবা। ডোবা থেকে পিলু অন্ধকারেই কিছু কলমি শাক তুলে এনেছে। মা সবই সযত্নে রেখে দিল। কুপি জ্বালানো হল।

বাবা ফের স্টেশনমাস্টারের কাছে হাজির হয়ে সব একেবারে খুলে বলেছেন। শুনতে চায় না তবু বাবা বার বার বোঝাচ্ছিলেন, শ্রীশ পাল আমাকে কি বিপদে ফেললে বলুন তো। এখন এই ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় উঠি।

ফিরে এসে বাবা খুব মিনমিনে গলায় বললেন, বুঝলে ধনবৌ, একটা চিঠি দিয়ে এলে ভাল হত। ও জানবে কি করে আমরা এসে বসে আছি। আমাকে তিনি বললেন, মার যা লাগে এনে-টেনে দিস। আমি একটু খোঁজাখুজি করে দেখি কে কোথায় আছে।

মা বলল, কোথাও যেতে হবে না। সকালে দেখা যাবে।

আমিও বললাম, সকালেই দেখা যাবে বাবা।

মা কোলের ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। খুব জোরে কথা বলতে পারছে না। পারলে যেন বলত, পুনু ঘুমোচ্ছে। ওকে আর জাগিয়ে দিও না। জেগে গেলেই খেতে চাইবে।

—সকালে কি আর সময় পাব! যেন কত কাজের মানুষ বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ বাবা কোথাও গোটা তিন-চার ইঁট পাস কিনা। কিছু তো খেতে হবে।

মেটে হাঁড়িতে চাল আছে এখনও কিছুটা! চাল থাকলে মার অন্য দুঃখ বড় একটা বেশি থাকত না। চাল ফুটিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক ভাত না। ফ্যান ভাতও নয়। সবটাই জল, কিছুটা চাল। জাউ। খুবই পাতলা। এনামেলের থালায় ঢেলে পাখার হাওয়া! আমাদের খিদে এত প্রবল থাকে যে ভাঙা পাখার শনশন শব্দ একদম সহ্য হয় না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত গরমই হোক মুখে দিয়ে হাঁ করে বসে থাকা। আর প্রবল শ্বাসে তাকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া। মুখের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পেটে গেলে আরও ঠাণ্ডা! বাবা আমাদের খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, তোরা বড় হা-ভাতে। এমনভাবে খাস যেন জীবনেও ভাত খাসনি। আস্তে খা। গাল, গলা পুড়ে গেলে ডাক্তার পাব কোথায়! সময় যা যাচ্ছে!

প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাবার সময় কাউন্টারে দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই ঝুঁকে

PATHAGAR.NET

কি লিখছেন। একবার অফিস ঘরটার পাশে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। দু'-তিনজন বাবু মতো মানুষ বসে গল্প করছে। টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে। কেমন আশ্চর্য স্বপ্নের মতো পৃথিবী। আমি বড় হয়ে স্টেশনমাস্টার হব ভাবলাম। এবং এটা প্রায়ই দেখছি, যখন কোনো মানুষ বাবাকে ধমকে কথা বলত, অথবা বাবা যাদের সমীহ করে কথা বলতেন তাদের ওপরওয়ালা হবার মনে মনে বাসনা জাগত। তখন বাইরে অন্ধকার মতো একটা রাস্তায় বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন! কাছে যেতেই বললেন, সাবধান থাকিস। আমি একটু ঘুরে আসছি।

রাতে সত্যি বাবা আর ফিরলেন না। আমাদের বাবা মাঝে মাঝে এভাবে হারিয়ে যেত। কলমি শাক সিদ্ধ আর জাউ ভাত খেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। অথচ বাবা নেই। মনটা ভার হয়ে গেল। অবশ্য জানি বাবা আবার ঠিক এক সময়ে ফিরে আসবেন। এ ক'দিন কিভাবে যাবে আমরা জানি না। মাও জানে না। আমাদের কথা মনে হলে, মার কথা মনে হলে বাবা কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না।

অনেক রাত এ-ভাবে পরিত্যক্ত আবাসে অথবা প্ল্যাটফরমে আমাদের কেটে গেছে। আমি, পিলু, মায়া কখনো চুপচাপ প্ল্যাটফরমে বসে থাকতাম, ঘুরতাম। কখনো আকাশে জ্যোৎস্না থাকত, কখনো অন্ধকার। কিছু কুকুর-বেড়াল ছিল তখন আমাদের সঙ্গী। ওরাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরত। বাবা আমাদের কোথায়, কতদূরে—বাবার জন্য আমাদের ভারী কষ্ট হত তখন। আমরা তবু কিছু খেয়েছি, বাবা কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেল। একটা মালগাড়ি টং লিং টং লিং ঘণ্টা বাজিয়ে চলে আসত। অন্ধকারে কোনো দূরবর্তী ছায়া এগিয়ে আসতে থাকলে মনে হত বাবা বুঝি ফিরছেন। সবার আগে ছুটে যেত পিলু, পেছনে আমি। সবার শেষে মায়া। কিন্তু সে অন্য মানুষ। মাঠের অন্ধকারে মেঘলা আকাশের নীচে আমরা বাবার জন্য এভাবে অপেক্ষা করতাম। বাবা বুঝি ফিরছেন। মাথায়-হাতে বাবার রকমারি পোঁটলা-পুঁটলি। ভেতরে পূজা-পার্বণের চাল-ডাল। মার জন্য লালপেড়ে শাড়ি। হাত দিয়ে বললেন, ওটা তোমার মার। ধরো না।

এতবড় পৃথিবীতে আমাদের বাবা বাদে আর কিছু নেই। মানুষের ঘরবাড়ি থাকে, আমাদের তাও নেই। চুপচাপ থাকলে মায়া বলত, দাদা দ্যাখ, দূরে কেমন একটা বাতি জ্বলছে। সিগন্যালের লাল বাতিটা গাড়ি আসবে বলে নীল হয়ে গেছে। সাইডিং-এর মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে। ইচ্ছে হত ইঞ্জিনের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে থাকি। সে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাক। আমি তো বড় হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমি নিজেও কিছু একটা করতে পারি।

PATHAGAR.NET

বিরুদ্ধ পক্ষ

প্রফুল্ল রায়

মাঝারি মাপের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার পর পোপটলাল পারেখ বললেন, 'কি, পছন্দ তো?'

মাস চারেক আগে এক বিরাট মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে চাকরি পেয়ে বম্বে এসেছি। এখানে আসার পর বাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বম্বে শহরে আকাশের তারা খসিয়ে আনাটা বাড়ি পাওয়ার চাইতে ঢের সহজ ব্যাপার।

চারটে মাস আমি একটা গেস্ট হাউসে আছি। এখানে এই বম্বে শহরে সাতটায় সানরাইজ। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টায় অফিসে অ্যাটেনডান্স। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে সাবার্বন ট্রেনের দম আটকানো ভিড়ে নিজেকে গুঁজে দিয়ে চলে যাই প্রপার বম্বেতে।

সাড়ে ন'টা থেকে একটানা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আফিসে আর মাথা তুলতে পারি না। ঘাড় গুঁজে ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তারপর এক ঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক। উদিপি সিন্ধি কি ইরানি হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে দেড়টায় আবার ব্যাক বেরিক্রামেসনের বাইশতলা বিশাল স্ক্রাইস্ক্রেপারে গিয়ে ঢুকি। ওখানেই আমার অফিস। দেড়টায় ঢুকবার পর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে না, অগুনিত ফাইল বিরাট হাঁ করে আমাকে তার ভেতর পুরে নেয়।

পাঁচটার পর অফিস ছুটি হলে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। বাবা-মা আর দুটো ছোট ভাই কলকাতায় রয়েছে। দু'বছর হল বাবা রিটায়ার করেছেন। ছোট ভাই দুটো বি-কম পাস করে বসে আছে। এই অবস্থায় বম্বেতে গেস্ট হাউসে থেকে নিজের খরচ চালিয়ে আবার কলকাতায় সংসার টানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটা বাড়ি-টাড়ি পেলে সবাইকে নিয়ে আসা যায়। তাতে খরচটা আমার মাপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারব। তাছাড়া সিন্ধি কি উদিপি হোটেলে খেয়ে পেটের বারোটা বেজে যাচ্ছে। মা এলে পাকস্থলীটাকে অন্তত রক্ষা করা যাবে।

কিন্তু বম্বে শহরে বাড়ি কোথায়? প্রপার বম্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। চার মাস ধরে গোটা আউটস্কার্ট চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু এক কামরার একটা ঘরও খুঁজে বার করতে পারিনি।

ঘর কি পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু কীভাবে যায়, বারো'শ মাইল দূরের

PATHAGAR.NET

কলকাতা থেকে আসা আমার মতো একটা নতুন ছেলের পক্ষে তা জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির ব্যাপারে কিছুই করতে না পেরে পোপটলাল পারেখকে ধরেছি। আমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করি পোপটলাল সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট। মধ্যবয়সী এই গুজারাটি ভদ্রলোক মানুষ হিসাবে অত্যন্ত হৃদয়বান। আমি যেদিন এই অফিসে রিপোর্ট করলাম সেদিন থেকেই তাঁর স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করে আসছি।

পোপটলাল বম্বে শহরের অন্ধিসন্ধি সব চেনেন। তিনিই খোঁজাখুঁজি করে লোক লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রপার বম্বে থেকে বারো-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে সান্তাক্রুজ ইস্টে একটা পাঁচতলা বাড়ির একেবারে মাথায় একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট বার করেছেন। আর সেটাই তিনি আমাকে এই মুহূর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো শেষ করলেন।

ফ্ল্যাটটায় দু'-খানা বড় বেডরুম, একটা হল, তাছাড়া আলাদা কিচেন, বাথরুম ইত্যাদি ইত্যাদি তো রয়েছেই। সব চাইতে সুবিধাজনক যেটা তা হল সাবার্বন ট্রেনের স্টেশনটা বাড়ির গায়েই, দু'মিনিট হাঁটলেই ঘোড় বন্দর রোডে গিয়ে প্রপার বম্বের এক্সপ্রেস বাস পাওয়া যায়। এর চাইতে ভাল বাড়ি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বাড়িটা পোপটলাল পারেখের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের, তাঁর নাম ভরতনাম ঢোলাকিয়া। তিনিও এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আমি পোপটলালকে বললাম, 'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?'

'আড়াই শ! তবে—'

'কী?'

'পাঁচ হাজার টাকা পাগড়ি (সেলামী) দিতে হবে।'

ভরতরাম হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'মানে বুঝতেই পারছেন, বাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে খেতে হয়। নইলে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে এসেছেন, বুঝি পাগড়িটা নেওয়া উচিত না—'

পাগড়ি ছাড়া বম্বেতে এক ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যায় না। যে ফ্ল্যাটটা এইমাত্র দেখলাম কম করে তার পাগড়ি হওয়া উচিত পনের হাজার টাকা। পোপটলাল পারেখের খাতিরে পাঁচ হাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর চাইতে সস্তায় খুঁজতে গেলে বম্বে শহরে এ জন্মে আর বাড়ি মিলবে না। বললাম, 'ঠিক আছে, পাঁচ হাজারই দেব।'

কথাবার্তা পাকা করে আমরা তিনজন ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই পোপটলাল আর ভরতনাম সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কেননা এই পাঁচতলা বাড়িটার প্রত্যেক ফ্লোরে দুটো করে মুখোমুখি ফ্ল্যাট। আর এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা থেকে মাধুরী বেরিয়ে আসছে।

তিন বছর পর মাধুরীকে কলকাতা থেকে বারো শ মাইল দূরে আরব সাগরের

পাড়ের এই শহরে দেখব, কে ভাবতে পেরেছিল! অবাক বিস্ময়ে পলকহীন তাকিয়ে রইলাম।

মাধুরীও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার চোখেও অগাধ বিস্ময়। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর সে-ই প্রথম বলল, 'সঞ্জীবদা না?'

মাধুরীর বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ খুব ফর্সাও না, আবার কালোও না। দুয়ের মাঝামাঝি। মসৃণ ত্বক। লম্বাটে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বাদামী সিল্কের মতো চুল, ভাসা ভাসা মাঝারি চোখ, মেলে দেওয়া পাখির ডানার মতো টান টানা ভুরু, পাতলা ফুরফুরে নাক। পরনে প্রিন্ট-করা নাইলেক্স শাড়ি আর স্লীভলেস ব্লাউজ, পায়ে উঁচু হিলের স্লিপার।

তিন বছর আগে কলকাতায় থাকতে মাধুরী ছিল বেশ মোটাসোটা, তুলতুলে নরম চর্বি দিয়ে তখন তার শরীরটা ছিল তৈরি। বাজে চর্বি ঝরে গিয়ে এই তিন বছরে তার চেহারায় ঝকঝকে ইস্পাতের মতো একটা ভাব এসেছে, একেবারে স্ট্রিমলাইনড যেন।

তার চেহারার মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য একটা আকর্ষণ ছিল। সেটা এই তিন বছরে অনেক বেড়েছে। মাধুরীর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি এখানে!'

মাধুরী বলল, 'আমরা তো এখানেই থাকি।'

'ওই ফ্ল্যাটটায়?'

'হ্যাঁ।'

পোপটলালরা সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় ল্যান্ডিং-এর কাছে গিয় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখান থেকেই পোপটলাল গলা তুলে বললেন, 'কী হল চ্যাটার্জী, যাবে না?'

একটু চমকে উঠলাম। মাধুরীকে দেখার পর পোপটলালদের কথা খেয়াল ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'আপনারা নামতে থাকুন। আমি আসছি।'

চোখের কোণ দিয়ে মাধুরীকে দেখিয়ে পোপটলাল বললেন, 'চেনাশুনা বুঝি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে ঘাড় কাত করলাম।

পোপটলাল আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, ভরতরামকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

মাধুরী এবার বলল, 'তুমি এখানে কি করো সঞ্জীবদা?'

কী উদ্দেশ্যে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসেছি মাধুরীকে জানিয়ে দিলাম।

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তা হলে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মাধুরীর মা আর ছোট বোন সুব্রতা, ওদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর মা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে মাধু?' বলতে বলতেই আমার ওপর তাঁর চোখ এসে পড়ল, 'কে, সঞ্জীব নাকি?'

এক মুহূর্তে দ্বিধা করলাম, তারপর দু'পা এগিয়ে মাধুরীর মাকে প্রণাম করলাম।

PATHAGAR.NET

তিনি আমার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। এসো, ভেতরে এসো—'

বললাম, 'আজ আর যাব না মাসিমা, এক্ষুনি আমাকে ব্যাক বেরিক্লামেসনে দৌড়তে হবে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তোমাকে বোম্বাইতে দেখব ভাবতে পারিনি।'

'আমি এখানে একটা চাকরি নিয়ে এসেছি মাসিমা।'

'ও মা তাই নাকি? কদ্দিন আগে এসেছ?'

'মাস চারেক।'

'ওই দেখ, আমরা কিচ্ছু জানি না। জানবই বা কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসার পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই। দেখাসাক্ষাৎও নেই।'

মাধুরী এই সময় বলে উঠল, 'জানো মা, সঞ্জীবদা ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তাই নাকি? বাঃ খুব ভাল। আবার এক জায়গায় থাকা যাবে।'

মাধুরীর বোন সুব্রতার বয়স সতেরো-আঠার। সে হঠাৎ রগড়ের গলায় বলে উঠল, 'আবার মজাসে ঝগড়া শুরু করা যাবে।' মাধুরীর মা আর আমি, দু'জনেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম।

মাধুরীর মা ধমকের গলায় সুব্রতাকে বললেন, 'বাঁদর মেয়ে, চুপ কর।'

মাধুরী কিন্তু এতটুকু বিব্রত হয়নি। সে ঠোঁট কামড়ে হাসতে লাগল।

মাধুরীর মা আমার দিকে ফিরে এবার বললেন, 'ওই দেখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?'

বললাম, 'ভাল।'

'ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছ, ওঁদের নিয়ে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

এরপর বাড়ির অন্য সবাই কে কেমন আছে, কে কী করছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাসিমা। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, 'আজ যাই মাসিমা।'

'এসো।'

মাধুরী আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নেমে এল। নামার সময়ই ও ওদের বাড়ির তিন বছরের সব কথা তিন মিনিটে জানিয়ে দিয়েছে। মাধুরীর বাবা হরিনারায়ণবাবু এখনও কাস্টমসে চাকরি করছেন, তবে এটাই তাঁর রিটায়ারমেন্টের বছর। মাধুরী কলকাতা থেকে বি-এ পাশ করে এসেছিল। এখানে সে এল-আই-সিতে একটা চাকরি পেয়েছে। সুব্রতা অফিস সেক্রেটারিশিপ পড়ছে। ওর কোনো ভাই-টাই নেই।

PATHAGAR.NET

ঝগড়া ছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হত না। দেখা হলেই দু'পক্ষ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

এইভাবে মাধুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পুরো দশটা বছর কেটে গেছে। তারপর একদিন ওর বাবা বদলি হয়ে বম্বে চলে গেলেন। নিচের তলাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা তারপর আর ওটা ভাড়া দেয়নি। তার গেঞ্জির কল ছিল, নিচের তলায় গোডাউন করেছে। মাধুরী চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ঝগড়া নেই, চিৎকার নেই। কাকেরা চড়ুইয়েরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছিল। টানা দশ বছর যুদ্ধের পর শান্তি নামলেও কেমন যেন সব কিছু ফাঁকা লাগতে শুরু করেছিল।

সকালবেলা ঝগড়া করতে করতে আমরা উঠতাম, রাত্তিরে ঝগড়া করতে করতে ঘুমোতে যেতাম। মাধুরীরা চলে যাবার পর দশ বছরের সেই অভ্যাসটায় দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল।

মা বলতেন, 'মাধুরীরা ছিল, সময়টা বেশ কেটে যেত। এখন আর ভাল লাগে না।'

বাবা এবং ভাইরাও সেই কথা বলত। আসলে দিনরাত একটানা দশ বছর যুদ্ধ করলেও তলায় তলায় কোথায় যেন একটা টানও ছিল। মাধুরীরা চলে যাবার পর সেটা টের পাওয়া গেছে।

যাই হোক, সময় তো হাঁটু গেড়ে বসে থাকে না। সেটা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

দেখতে দেখতে কটা বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন, ভাইরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে। আমি এম-কম পাশ করে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে বম্বে চলে গেছি। আর কি আশ্চর্য, এতকাল পর আবার মাধুরীদের সঙ্গে দেখা হল। কলকাতার মতো এবার আর ওপরে-নিচে নয়। একবারে মুখোমুখি থাকতে হবে।

পরের দিনই পোপটলালের আত্মীয়টিকে পাগড়ি এবং ভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিলাম। তারপর একটা মাসও কাটল না। মা বাবা ভাইদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলাম। ওরা মাধুরীদের দেখে অবাক। কি অদ্ভুত কাণ্ড, মা বাবা আর ভাইরা মাধুরীদের এত কাছে পেয়েও যুদ্ধ ঘোষণা করল না। শুধু বলল, 'যাক বাবা, এক ঘর চেনা-জানা মানুষ পেয়ে বাঁচলাম।'

তারপর দেখা যেতে লাগল, আমার মা-বাবা মাধুরীর মা-বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে গীতপাঠ শুনতে যাচ্ছেন। আর আমরা অর্থাৎ মাধুরী, সুব্রতা, আমি আর আমার দুই ভাই তপু এবং তনু কোনো ছুটির দিনে চলে যেতাম পুণা, কখনও এলিফ্যান্টা কেভে, কখনও জুহু বীচে, কখনও বা দু'-তিন দিনের জন্য গোয়ায় কি অজন্তা-ইলোরায়।

তা ছাড়া যদিও মাধুরী এবং আমার অফিস বম্বে শহরের দক্ষিণে এবং উত্তরে,

PATHAGAR.NET

একেবারে পরস্পর উল্টোদিকে, তবু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ছুটির পর আগে থেকে একটা জায়গায় ঠিক করে আমরা দেখা করি।

মাধুরী বলে, 'দেখ এভাবে ঠিক জমছে না।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি, 'কিভাবে?'

'এই ঝগড়া-ঝাঁটি করে জাস্ট লাইক গুড নেবারস আমরা যে আছি, এতে কোনো চার্ম নেই। কলকাতার দশ বছর ঝগড়া করে করে হ্যাবিট এরকম হয়ে গেছে যে—'

'ঠিক বলেছ। লোকসভায় অপজিশন না থাকলে সেশান জমে না।'

'ওয়ারটা ডিক্লেয়ার করব কী নিয়ে? কল, জল, ইলেকট্রিক মিটার, সবই তো আলাদা।'

'তাই তো।'

ভেবে বললাম, 'এক কাজ কর। ঝগড়ার কোনো সাবজেক্ট বার করা যায় কিনা সেটা খুঁজে বার কর। আমিও বার করতে পারি কিনা দেখি।'

মাধুরী বলল, 'ঠিক আছে।'

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার মতো কোনো বিষয়বস্তু খুঁজে বার করতে পারিনি আমরা। তবে আমার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে।

PATHAGAR.NET

একদিন ছুটির পর ব্যান্ড স্ট্যান্ডে সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'দেখ মাধুরী, তুমি যদি হেলপ্ কর, ঝগড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

মাধুরী দু'চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল, 'কী সাহায্য চাও?'

বললাম, 'যদি সাহস দাও, বলব।'

'দিলাম সাহস।'

'তুমি এক ফ্ল্যাটে থাক, আমি আরেক ফ্ল্যাটে। কল জল ইলেকট্রিসিটি কিছুই কমন নয়। যদি পার্মানেন্টলি আমাদের ফ্ল্যাটে আস তা হলে, মানে কাছাকাছি থাকলে ঝগড়া কি আর একটা বাধানো যাবে না?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাধুরী। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তার ফর্সা মুখে ধীরে ধীরে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল। ঠোঁট কামড়তে কামড়াতে আমার কাঁধের কাছে পিঁপড়ের কামড়ের মতো কুট করে চিমটি কাটল সে। তারপর আবছা ফিসফিসে গলায় বলল, 'এই মতলব?' তার চোখে জোনাকির মতো হাসি ঝিকমিক করতে লাগল।

আমি দু'হাত জোড় করে বললাম, 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে আমি বাঁচব না। বল রাজি কিনা?'

একটু চুপ করে থেকে মাধুরী বলল, 'রাজি।' বলেই কুট করে দ্বিতীয় চিমটিটি কাটল।

কেষ্টপুরের জামাইবাবু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম আমাদের জন্য কেউ থাকবে স্টেশনে। জয়দীপ আর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলুম। অবশ্য আমাদের যদি কেউ নিতেও আসে, সে আমাদের চিনবে কী করে? আমরা দু'জনেই তো এই প্রথম এলুম ব্যাঁকা কেষ্টপুরে।

অবশ্য পেন্টুলুন পরা যাত্রী শুধু আমরাই দু'জন, আর বাকি সব ধুতি-লুঙ্গি-পায়জামা। সুতরাং আমরা একটু সাহেব-সাহেব করে থুতনি উঁচিয়ে রইলুম।

গেটে টিকিট নেবার জন্য কোনো কালো-কোট বাবু নেই, গেট দিয়ে কেউ যায়ই না। অন্য যাত্রীরা ডান দিক-বাঁ দিক-পেছন দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, শুধু পা-জামার ওপর ফতুয়া পরা একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ফুঁকছে আর আমাদের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছে।

জয়দীপ বললো, তা হলে ঐ লোকটাই হবে।

এগিয়ে গেলুম সেদিকে। কাছাকাছি যেতেই লোকটা মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

জয়দীপ বললো, এই যে, শুনছেন!

লোকটা আবার মুখ ফেরালো। তারপর ভুরু উঁচু করলো। তারপর কয়েক সেকেন্ড পজ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মোশাইদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বর্ধমান থেকে ট্রেন বদলে ব্রাঞ্চ লাইনে এদিকে আসতে হয়, সুতরাং এরকম প্রশ্ন স্বাভাবিক। তাই আমরা বললুম, কলকাতা থেকে।

লোকটি বললো, অ।

জয়দীপ ওর সুটকেসটা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তা কলকাতা থেকে হঠাৎ এখেনে...কোনো কারবার আছে বুঝি?

এ লোক আমাদের জন্য নয় বুঝতে পেরে জয়দীপ সুটকেসসুদ্ধু হাতটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে বললো, না, এমনিই...বেড়াতে।

লোকটি বললো, অ! তা কলকাতাতে এখন চটার দর কত চলছে?

আমি আর জয়দীপ চোখাচোখি করলুম। চটা জিনিসটা কী তাই-ই আমরা জানি না, তার দরের খবর জানবো কী করে? কিন্তু লোকটি এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো যেন কলকাতার সব লোকেরই চটার খবর রাখা উচিত।

জয়দীপ আন্দাজে বললো, এখনো দর বেশ তেজি!

লোকটি বললো, মাঝখানে একটু মন্দা গিয়েছিল না?

PATHAGAR.NET

—হ্যাঁ, গত মাসে বেশ মন্দা ছিল, তারপরেই আবার হু হু করে উঠতে লাগলো...

—তবে কট্‌কার দর নিশ্চয় আরও অনেক চড়েছে...

জয়দীপ আবার আমার চোখের দিকে তাকালো। এবার আমি ওকে সাহায্য করার জন্য বললুম, ওরে বাবা, কট্‌কার যা দাম তা তো ছোঁয়াই যায় না। ক'টা লোক কিনতে পারে!

এরকম কথাবার্তা আর বেশি চালানো যায় না বলে আমি জয়দীপের হাত ধরে টেনে রওনা দিলুম। আমাদের নিজেদেরই পৌঁছোতে হবে।

বাইরে খান চারেক সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। চালকরা বিড়ি খেতে খেতে গল্প করছিল, আমাদের তারা প্যাসেঞ্জার হিসেবে পছন্দ করলো না। তারা কেউ যেতে রাজি নয়, প্রত্যেকেরই নাকি সওয়ারি ঠিক করা আছে।

আমি বললুম, এখানকার রিকশা যে কলকাতার ট্যাক্সির মতন!

জয়দীপ একটু গোঁয়ার ধরনের। সে হার স্বীকার করতে চায় না কোথাও। সে একজনকে একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেন, যাবে না কেন? আর তো কোনো প্যাসেঞ্জার দেখছি না।

একজন এবার অবহেলার প্রশ্ন করলো, কোথায় যাবেন?

—থানায়!

চারজন রিকশাচালক এবার একসঙ্গে হেসে উঠলো। থানার নাম শুনলে যে কারুর হাসি পায় এই প্রথম দেখলুম।

একজন রিকশাচালক অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললো, দারোগাবাবুর জামাই এসেছেন, রিকশা করে থানায় যাবেন। হে—হে—হে!

আমি বুঝতে পারলুম জয়দীপের অ্যাপ্রোচটা ভুল হয়েছে। হুট করে কারুকে থানার কথা বলতে নেই। রিকশাচালকটি আন্দাজে কিন্তু প্রায় ঠিক কথা বলে ফেলেছে। আমরা কেউ দারোগার জামাই নই, কিন্তু এখানকার দারোগা জয়দীপের জামাইবাবু। ওরা ভেবেছে আমরা বুঝি ভয় দেখবার জন্য থানার নাম বলছি।

আমি মোলায়েম করে বললুম, ভাই, আমরা দারোগাবাবুর আত্মীয়, আমাদের একটু থানায় পৌঁছে দিন না, যা ভাড়া লাগে দেবো।

একজন রিকশাচালক বেশ মৌজ করে বললো, আজ অবদি কেউ এখানে এ স্টেশন থেকে রিকশা চেপে থানায় যায়নি! না কি না?

অন্য একজন বললো, কানা-খোঁড়া হলেও কথা ছিল!

এদের সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। ব্যাঁকা কেষ্টপুরের লোকেদের কথাও দেখছি ব্যাঁকা ব্যাঁকা। রিকশায় চেপে কেউ থানায় যায় না, ঠিক ভাড়া দিলেও?

মালপত্তর বেশি নেই, আমরা হেঁটেই চলে যাবো।

জয়দীপকে বললুম, চল।

PATHAGAR.NET

স্টেশনের বাইরে একটাই মাত্র দোকান, সেখানে পান-বিড়ি আর রসগোল্লা বিক্রি হয়। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলুম, ভাই, এখানকার থানাটা কদ্দূর?

সে হাত দেখিয়ে রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

এরকম একটা বিচ্ছিরি বাড়িতে থানা? একতলা একটি টালির চালের বাড়ি, বাইরে পুলিশের পাহারা-টাহারা কিচ্ছু নেই।

রাস্তা পার হয়ে সেদিকে যাবার সময় রিকশাওয়ালাদের খিক্ খিক্ হাসি শুনতে পেলেও আর সেদিকে তাকালুম না। না হয় স্টেশনের পাশেই থানা, তা বলে থানা সম্পর্কে ওদের একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

থানার ভেতরে ঢুকে মনে হল সেখানে শোকসভা বসেছে। একটা বড় টেবিলে বসে আছেন বড়বাবু, একটা মাঝারি টেবিলে বসে আছেন মেজোবাবু, আর যিনি শুধু একটা টুলের উপর বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই ছোটবাবু। দু'দিকেই দেয়াল ঘেঁষে দু'খানা বেঞ্চিতে বসে আছে দু'জন দু'জন চারজন কনস্টেবল।

বড়বাবু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে! বেশ চকচকে নতুন টেলিফোন।

আমরা ঢুকতেই বড়বাবু যেন বেশ চমকে উঠে বললেন, কে? কী চাই? জয়দীপ বললো, ছোট জামাইবাবু, আমরা! আপনি আমার চিঠি পাননি?

থানার বড়বাবুর পক্ষে ছোট জামাইবাবু হওয়াটা যেন ঠিক মানায় না। বড় জামাইবাবু হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু উনি বিয়ে করেছেন জয়দীপের ছোড়দিকে।

বড়বাবু বললেন, ও জয়ন্ত!

—জয়ন্ত না, জয়দীপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়দীপ। তোমার চিঠি পেয়েছি বৈকি! তোমাদের তো বার্নপুর লোকালে আসবার কথা!

—সেই ট্রেনেই তো এলুম!

—বার্নপুর লোকাল তো কোনোদিন সাড়ে তিনটের আগে আসে না। এক একদিন সাড়ে পাঁচটা-ছটাও হয়!

—আজ তাহলে রাইট টাইমে এসেছে। একটা চল্লিশই তো রাইট টাইম!

—আশ্চর্য ব্যাপার, বার্নপুর লোকাল রাইট টাইমে? বলো কি?

জয়দীপ বললো, স্টেশনের এত কাছে থানা, আপনারা ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পাননি?

বড়বাবু বললেন, ট্রেনের আওয়াজ শুনলেই যে সেটা বার্নপুর লোকাল হবে, তার কোনো মানে আছে? কোনোদিন যে ট্রেন ঠিক টাইমে আসে না...তা যাক গে যাক...ভালো মতন এসে পৌঁছেচো এই যথেষ্ট...ইটি তোমার বন্ধু বুঝি? তা তোমরা

PATHAGAR.NET

ভেতরে যাও, আমি তো এখন ডিউটিতে আছি, উঠতে পারছি না। দরোয়াজা! সাহেবদের নিয়ে যাও!

বড়বাবুর কোয়ার্টার থানার পেছন দিকেই। একজন কনস্টেবল সেখানে পৌঁছে দিল আমাদের।

ছোড়দি ঘুমোচ্ছিলেন, আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, ওমা, তোরা এর মধ্যেই পৌঁছে গেছিস? আমি তো ভেবেছিলুম, বেলা গড়িয়ে যাবে! যা পোড়ার দেশ, কোনোদিন ঠিক সময়ে ট্রেন আসে না...মুখ শুকিয়ে গেছে কেন, খেয়ে আসিসনি বুঝি?

আমরা আমতা আমতা করতে লাগলুম।

ছোড়দি বললেন, জামাকাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে নে, আমি তোদের পরোটা করে দিচ্ছি। মা কেমন আছে রে? কতদিন চিঠি পাই না—

কোয়ার্টারে তিনখানা ঘর, তার মধ্যে একখানা আমাদের জন্য আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছিলেন ছোড়দি। একটা বড় খাটে দু'জনের বিছানা। জয়দীপ উঠোনের কুয়োতলায় স্নান করতে গেল, আমার অত চান করার বাতিক নেই, বিশেষত শীতকালে, তাই আমি গড়িয়ে পড়লুম বিছানায়।

একটি ছ' সাত বছরের মেয়ে আর একটি ন' দশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়ালো খাটের পাশে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো আমার দিকে। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়লুম! ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার একটা কায়দা আছে, কেউ কেউ পারে, কেউ পারে না।

আমি প্রথমে তাদের নাম জিজ্ঞেস করলুম। তারপর কোন্ ইস্কুলে পড়ো, কোন্ ক্লাসে, আজ ইস্কুলে যাওনি কেন...এই কটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরই আমার স্টক ফুরিয়ে গেল। আর কিছু মনে পড়ছে না।

ছেলেটির নাম চিত্তরঞ্জন আর মেয়েটি র নাম অম্বাপালিকা। আমার প্রশ্নের তারা কাটাকাটি উত্তর দেয়। আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

আমি চুপ করতেই ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, আমাদের জন্য কি এনেছো?

মেয়েটি বললো, আমাদের জন্য কলকাতার চকলেট আনোনি?

লজ্জায় আমার একেবারে কুঁকড়ে যাবার মতন অবস্থা। ছি, ছি, ছি, জয়দীপের ছোড়দির যে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, তা আমার আগে মনেই পড়েনি! সত্যিই তো, ওদের জন্য কিছু আনা উচিত ছিল। জয়দীপ কি কিছু এনেছে? ওর বাড়ি থেকে আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি, পথে তো ওকে কিছু কিনতে দেখিনি। তবে জয়দীপের মা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাঠিয়েছেন নাতিদের জন্য।

সময় নেবার জন্য আমি বললুম, হ্যাঁ আনা হয়েছে, মানে তোমাদের জয়দীপ মামার সুটকেসে আছে, সে আসুক—

—কোন্টা ছোটমামার সুটকেস?

একটু আগেই জয়দীপ তার সুটকেস খুলে তোয়ালে বার করে নিয়ে গেছে। ডালাটা খোলা। ছেলেমেয়ে দুটি ঝাঁপিয়ে পড়ে সুটকেসটা একে-বারে তছনছ করে দিল।

জয়দীপের মা নাতি-নাতনির জন্য প্যান্ট আর ফ্রক পাঠিয়েছেন।

ছেলেটি বলল, কই, চকলেট নেই তো? লজেঞ্চুসও নেই!

মেয়েটি বললো, তোমার বাক্স কোন্‌টা?

আমি সুটকেস আনিনি, একটা বড় হ্যান্ড ব্যাগ, তাতে তালা-ফালা কিছু নেই। হ্যান্ড ব্যাগটা খাটের নিচে রাখা ছিল, ওরা সেটা বার করে টেনে খুলে শুরু করে দিল ঘাঁটাঘাঁটি।

এইসময় জয়দীপ এসে পড়ায় আমি বাঁচলুম।

জয়দীপ বললো, এই হাঁদু আর কাঁদু, তোরা কেমন আছিস রে?

আমি বললাম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে। বাচ্চাদের জন্য টফি বা চকলেট কিছু আনা উচিত ছিল।

জয়দীপ লজ্জা পেল না! সে বললো, হ্যাঁ, আনা হয়নি বটে...ঠিক আছে, এখান থেকে কিনে দেবো!

—এখানে চকলেট পাওয়া যায় না।

—আমরা তো যাবো সিউড়ির দিকে, যেখানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে নিয়ে আসবো!

তারপর ভাগ্নে-ভাগ্নীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে জয়দীপ বললো, এই কাঁদুকে কিন্তু খুব সাবধান। কখন যে কাঁদতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। একবার মেজবৌদি বলেছিলেন, কাঁদুকে ঠিক পুতুলের মতন দেখতে, তাই শুনেই ওর হাত-পা ছুঁড়ে কী কান্না, কেউ থামাতে পারে না...কী রে, তুই এখনো সেই রকম ছিঁচকাঁদুনে আছিস?

হাঁদু বললো, হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! ও কাঁদে, আমি কাঁদি না।

একটু বাদে জয়দীপ যেই রান্নাঘরে ছোড়দির সঙ্গে গল্প করতে গেছে, অমনি ছেলেমেয়ে দুটো আবার খাটের দু'পাশে এসে উপস্থিত।

হাঁদু বললো, এখানে ছানার গজা পাওয়া যায়।

কাঁদু বললো, পয়সা না দিলে দেয় না। তিরিশ পয়সা দিলে একটা দেয়।

হাঁদু বললো, তোমার কাছে পয়সা আছে?

ছোট ছেলের হাতে টাকা-পয়সা দেওয়া উচিত নয় বলে আমি বললুম, ঐ স্টেশনের পাশের দোকানটায় তো? আমি বিকেলে কিনে এনে দেবো।

হাঁদু বললো, আমরাও কিনে আনতে পারি। পয়সা দাও!

ততক্ষণে কাঁদু আলনায় ঝোলানো আমার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি হা-হা করে উঠতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে পড়লো, এ মেয়ে ছিঁচকাঁদুনে। এ যদি এখন ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে তা হলে আমি নাজেহালের একশেষ হবো।

PATHAGAR.NET

ভাগ্যিস জামার পকেটে দুটো টাকা আর আট-দশ আনার বেশি পয়সা ছিল না। সেই সব পয়সা চেটেপুটে নিয়ে দুই ভাইবোন একছুটে বেরিয়ে গেল।

এ যে বর্গীর এলাকায় এসে পড়লুম দেখছি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিষয়ে বাবা-মায়ের কাছে নালিশ করা চলে না! জয়দীপকেও কি বলা যায়?

একটু পরে খাবারের ডাক এলো।

মেঝেতে আসন পেতে ছোড়দি আমাদের পরোটা আর বেগুনভাজা দিলেন। বেশ খিদে পেয়েছিল, সবে খেতে শুরু করেছি, এর মধ্যে ছোট জামাইবাবু এসে উপস্থিত।

—ঘিয়ের গন্ধ পেলুম! ঘি দিয়ে পরোটা ভেজেছো, ঘি কোথায় পেলে!

ছোড়দি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, সে যেখানেই পাই না কেন? তুমি তো আর জোগাড় করে দেবে না!

—খাঁটি ঘি-এর গন্ধ! এর তো অনেক দাম। টাকা কোথায় পেলে? নিশ্চয়ই তোমার কাছে লুকানো টাকা ছিল!

—থাকলেই বা, তাতে তোমার দরকার কি!

—কাল এক প্যাকেট সিগ্রেট কেনার জন্য তোমার কাছে পয়সা চাইলুম, তুমি দিলে না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দারোগাবাবু পায়ে বুট জুতো এবং কোমরের বেল্টে বাঁধা রিভালবার সমেত মেঝেতে বসে পড়ে বললেন, দাও, আমায় দু'খানা দাও, অনেকদিন খাঁটি ঘিয়ের জিনিস খাইনি। আজ তবু শালার দৌলতে...।

ছোড়দি বললেন, দু'খানার বেশি পাবে না। এই তো কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছো!

ছোট জামাইবাবুর শরীরটা গামা পালোয়ানের মতন না হলেও তার তিন-চতুর্থাংশ বলা যায়। দারোগাবাবুদের চেহারা একটু ভারিক্কি না হলে মানায় না।

দু'খানা পরোটা একসঙ্গে নিয়ে তার মধ্যে দু'খানা বেগুনভাজা দিয়ে মুড়ে রোল বানিয়ে ছোট জামাইবাবু প্রায় চোখের নিমেষে শেষ করে বললেন, আর দু'খানা দেবে না?

ছোড়দি বললেন, ঐ তোমার দোষ। ও বেচারিরা না খেয়ে এসেছে...

—হাঁদু-কাঁদু কোথায়, তাদের তো দেখছি না?

হাঁদু আর কাঁদু কোথায় তা একমাত্র আমিই জানি। কিন্তু এখানে আমার কিছু বলা শোভা পায় না।

ছোড়দি বললেন, আছে কোথাও এদিক-ওদিকে। ওরা তোমার মতন অত লোভী নয়! পরোটা দিলেও খেত না...দুপুরে পেট ভরে খেয়েছে...। হ্যাঁ শোনো, আজ কিন্তু ওবেলা মাছ আনতে হবে, দীপু আর নীলু এই প্রথম এসেছে, আজ তো ছোট গোলোকপুরে হাট আছে, না?

ছোট জামাইবাবু বললেন, মাছ? অ্যাঁ? ও হাঁ, ওরা এসেছে, মাছ তো আনতেই হবে, তোমার লুকানো টাকা থেকে কিছু দিও—

PATHAGAR.NET

—মাছ কেনার টাকাও আমায় দিতে হবে?

কথাবার্তা একটু অপ্রিয় দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কথা ঘোরাবার জন্য জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ছোট জামাইবাবু, চটা আর মট্‌কা মানে কী?

আমি সংশোধন করে দিয়ে বললুম, মট্‌কা নয়, কট্‌কা।

দারোগাবাবু অবাক হয়ে চোখ গোল করে তাকালেন আমাদের দু'জনের দিকে। তারপর বললেন, এ আবার কী রকম প্রশ্ন, ভাই? আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, চংক্রমণ কিংবা অকৈতব মানে কী, তোমরা বলতে পারবে? এ তো লোক ঠকানো প্রশ্ন?

জয়দীপ বললো, না না, সে জন্য বলিনি, স্টেশনে একটা লোক জিজ্ঞেস করলো কি না কলকাতায় চটা আর কট্‌কার দর কত...

আমি সংশোধন করে বললাম, কট্‌কা না মট্‌কা?

—স্টেশনে একটা লোক? কী রকম চেহারা বলো তো? বেশ লম্বা-চওড়া ডান হাতে রুপোর তাগা?

—চেহারা ঐ রকমই, তবে হাতে রুপোর তাগা ছিল কিনা লক্ষ্য করিনি।

—মাথায় অল্প টাক?

—হ্যাঁ।

—হলদে ফতুয়া?

—তাও ঠিক।

—ও তো দাসু! ও শালা তো নামকরা ডাকাত!

আমি আর জয়দীপ দু'জনেই চমকে উঠলুম। জলজ্যান্ত একটা ডাকাত দিন-দুপুরে রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে! আগে জানলে আর একটু ভালো করে দেখে নিতুম। এর আগে আমি কোনো ডাকাতকে স্বচক্ষে দেখিনি।

জয়দীপ বললে, লোকটা ডাকাত? আপনারা ওকে ধরবেন না?

ছোট জামাইবাবু বললেন, ব্যাটা মহা ধড়িবাজ! ওকে ধরা কি সহজ!

—বুঝলাম না ঠিক। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু তাকে ধরতে পারছেন না কেন?

—হারামজাদা কি কম শয়তান! আমার সঙ্গে চালাকি করবার জন্য গত তিন বছরের মধ্যে একটাও কেস করেনি! সেই আমি এখানে বদলি হওয়া এস্তক! সবাই জানে ও ব্যাটা এক নম্বরের ডাকাত, এখন যেন একেবারে সাধু হয়ে গেছে।

আমি একটু রসিকতা করবার জন্য বললুম, সব ডাকাতদেরই মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল থাকে। ওর মাথায় টাক পড়ে গেছে বলেই বোধহয় ও ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে।

আমার রসিকতা দারোগাবাবু পছন্দ হল না। তিনি হতাশ ভাবে বললেন, চোর-ডাকাতরা যদি বন্ধ করে তা হলে আমরা কোথায় যাই বলো তো? ঐ দাসু হারামজাদা যে ডাকাতি ছেড়ে দিল, ও এখন সংসার চালাচ্ছে কী করে তাই বা কে জানে!

ছোড়দি বললেন, আর আমি যে কী সংসার চালাচ্ছি, তাই-ই বা ক'জন বোঝে?

PATHAGAR.NET

দু'আড়াই বছর ধরে একটা কেস নেই, এতে সংসার চালানো যায়? থানা না যেন নাটমন্দির, বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে!

দারোগাবাবু বললেন, একটা খুন পর্যন্ত হয় না! আমি কি করবো বলো, রাধু হালদারকে দাসু ভুঁইমালির এগেনস্টে কত করে তাতালুম, তা পরশু দিন রাধু এসে কী বললে জানো? বললে, স্যার, আমি দাসুকে ক্ষমা করে দিয়েছি! একেবারে চৈতন্য অবতার!

আলোচনা আর বেশিদূর গড়ালো না। এই সময় একজন কনস্টেবল মহা উত্তেজিত ভাবে দৌড়ে এসে খবর দিল, স্যার টেলিফোন বেজেছে, টেলিফোন স্যার, এক্ষুনি আসুন।

টেলিফোন! বলেই জামাইবাবু অতবড় চেহারাটা নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তড়িৎ গতিতে ছুটে গেলেন।

জয়দীপ ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করলো, খুব জরুরি কল্ আসবার কথা আছে বুঝি?

ছোড়দি বললেন, ছাই! গত তিনমাস আগে টেলিফোনটা বসিয়ে দিয়ে গেছে, এই প্রথম বাজলো!

ছোট জামাইবাবু ফিরে এসে বললেন, রং নাম্বার! চালকলের নাড়ু দাসকে চাইছে। দাও, আর একখানা পরোটা আর বেগুনভাজা দাও!

হাঁদু আর কাঁদুও ফিরে এলো এই সময়। হাত ফাঁকা। কেউ সদ্য কোনো জিনিস খেয়ে এলে মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। অন্তত আমি ঠিকই বুঝতে পারলুম যে আড়াই টাকার ছানা গজা ওরা বাইরে বসেই সাবাড় করে দিয়ে এসেছে।

আমাদের খেতে দেখে ওরা হুড়মুড়িয়ে এসে মায়ের দু'পাশে বসে পড়ে বলতে লাগলো, আমাদেরও দাও! আমাদেরও পরোটা দাও!

PATHAGAR.NET

ব্যাঁকা কেষ্টপুরের মতন এমন শান্তিপূর্ণ জায়গা আর হয় না। একেবারে রাম রাজ্য বললেও চলে। খুন ডাকাতি তো দূরের কথা, এখানে সামান্য ছিঁচকে চুরি পর্যন্ত হয় না। কেউ অন্যের বউকে ফুঁসলে নিয়ে পালায় না, অপরের জমিতে কেউ জোর করে ধান কাটে না।

এই তল্লাটে সবাই খুব সুখী! একমাত্র থানার বড়বাবু এবং তাঁর অধস্তন কর্মচারী ক'জনের পরিবারই অতি কষ্টে রয়েছে। কনস্টেবল চারজন রোগা হয়ে গেছে একেবারে, তাদের গলার আওয়াজ চিঁ চিঁ করে। এস. আই দু'জনের মধ্যে একজন কীর্তন গান করে মনের দুঃখ ভুলে থাকে আর একজন সর্বক্ষণ গুম, যেন কথা বলতেই ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু সে রোষকশায়িত লোচনে বড়বাবুর দিকে তাকায়। যেন বড়বাবুই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী।

অথচ বড়বাবুর অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। সামান্য টাকা মাইনে, তাতে কি এতবড় সংসার চলে? ছেলেমেয়ের পড়াশুনা, বউয়ের শাড়ি-গয়না, লাইফ ইনসিওরেন্স, ভালো-মন্দ খাওয়া, ডাক্তার-কোবরেজ এসব মেটাতে গিয়েই মাসের মাঝখান থেকে টানাটানি।

কাজকর্ম নেই বলে বড়বাবু এ-বছর থেকে কোয়ার্টারের সামনের উঠোনে আলু-বেগুনের চাষ শুরু করেছেন। যতদূর বুঝতে পারলুম, এ বাড়িতে মাছ-মাংস খুব কম আসে, আমরা এসেছি বলে ছোড়দি আধুলি জমাবার মাটির ভাঁড়টা ভেঙেছেন। এই লজ্জাতেই বোধহয় ছোড়দি গত তিন বছরে একবারও বাপের বাড়ি যাননি।

পাশের থানা রাধিকাপুরেরই তো কত রবারবা। খবরের কাগজে রাধিকাপুরের প্রায়ই নাম বেরোয়! জোতদার খুন, নাবালিকা ধর্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষকের কানকাটা, পোস্ট অফিসে ডাকাতি, পুকুর চুরি এরকম কত কি লেগেই আছে। রাধিকাপুরে বড় বড় কাগজের রিপোর্টার আসে, পুলিশের বড় কর্তারা আসে, এমনকি মন্ত্রীরাও আসে। এ জন্য রাধিকাপুরের লোকদের কত গর্ব। দু'-একমাস একটু ঝিমিয়ে পড়লেই রাইফেল লুট কিংবা হরিজন বস্তিতে আগুনের মতন রোমহর্ষক কিছু আবার ঘটিয়ে দেওয়া হয়। আবার মন্ত্রী ও রিপোর্টারদের আগমন, আবার কাগজে বড় বড় অক্ষরে নাম।

সেই তুলনায় ব্যাঁকা কেষ্টপুরের নাম কেউ জানে? একেবারে ম্যাড়মেড়ে, নিরীহ জায়গা, কোনো ঘটনা নেই। জয়দীপের ছোট জামাইবাবুর ধারণা, এসবই তাঁকে জব্দ করবার জন্য খোনকার লোকদের ষড়যন্ত্র। জায়গাটা তো বরাবর এরকম ছিল না, এক সময় ব্যাঁকা কেষ্টপুরও টগবগে, তেজি ছিল, ছুরি-ছোড়া রক্তারক্তির কারবার হত, তখন এখানে থানা ছিল না, পাশের থানা এত বড় এলাকা সামলাতে পারতো না বলেই বছর তিনেক আগে নতুন থানা বসেছে। ব্যস, অমনি সব্বাই ঘাপটি মেরে সাধু সেজে বসে আছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এরা থানার সঙ্গে ফেরেব্বাজিও করে।

এই তো গত মাসেই একজন লোক চুপি চুপি এসে বড়বাবুকে খবর দিয়ে গিয়েছিল, স্যার আজ সন্ধ্যেবেলা হরি মণ্ডলের বাড়ি লুট হবে।

তাই শুনে মহা উৎসাহে বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু আর কনস্টেবলরা অর্থাৎ গোটা থানাই পুরোদস্তুর সাজগোজ করে গিয়ে হরি মণ্ডলের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে রইলো। সন্ধেবেলা দলে দলে লোকও ধেয়ে এলো সে বাড়ির দিকে, চিৎকার-চ্যাঁচামেচিও শোনা গেল, তারপর বড়বাবু যেই সদলবলে সেখানে হানা দিলেন, অমনি ব্যাটাদের কি হাসি, কেউ কেউ গড়াগড়ি দিতে লাগলো মাটিতে।

হরি মণ্ডলের বাড়িতে সেদিন হরির লুট। প্রথম নাতি হয়েছে বলে হরি মণ্ডল ফুটকড়াই আর বাতাসা বিলোচ্ছে। দারোগাবাবুরা কয়েকখানা বাতাসা খেয়ে ফিরে এলেন।

রাধিকাপুরের থানার বড়বাবুর তিন নম্বর ছেলের পৈতেতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ছোড়দিরা। সেই গল্প শোনালেন ছোড়দি।

—জানিস, সে কি এলাহি ব্যাপার! অন্তত শ' পাঁচেক লোক এসেছে, অথচ একটা পয়সা খরচ নেই। কেউ দিয়েছে মাছ, কেউ দিয়েছে দই-মিষ্টি, কেউ দিয়েছে মুরগি, ওখানে তিন তিনটে চালের কল, চাল-ডালের তো কোনো ভাবনাই নেই। উঠোনে দেখলুম তিনটে ছাগল বাঁধা, ওগুলোও একজন দিয়েছে, কিন্তু একস্ট্রা হয়েছে, অত

PATHAGAR.NET

মাংস কে খাবে? তোদের জামাইবাবু আজ অবদি আমাকে একটা সিল্কের শাড়ি কিনে দিলে না, অথচ ও থানার বড়বাবুর গিন্নি নাইলন-জর্জেট ছাড়া পরেই না! আমায় হ্যাটা করার জন্যে মুক্তোর সেট দেখালো। তিনটে রিস্টওয়াচ। এনার ছেলেমেয়েদের মুখে নাকি সন্দেশ-রসগোল্লাও রোচে না। বলে কিনা কেক চাই!

—রাধিকাপুরে কেক পাওয়া যায়?

—না পাওয়া গেলেই বা, লোকে সিউড়ি থেকে নিয়ে আসে। খাতিরের যোগ্য লোক তাই সবাই খাতির করে। পরেশ হালদারের সঙ্গে ডি এস পি, এস পি-র পর্যন্ত দহরম মহরম। প্রায়ই সদরে ডাক পড়ে। তোদের জামাইবাবুকে কে পোঁছে? কেউ নয়!

—জামাইবাবু ট্রান্সফার নেবার ব্যবস্থা করেন না?

—করবে না কেন? চেষ্টা করে করে তো হেদিয়ে গেল। কেউ কানে তোলে না ওর কথা।

আমি বললুম, ছোট জামাইবাবু নিজের এলাকা এতদিন শান্তিপূর্ণ রেখেছেন এটা ওঁর কৃতিত্বও তো বটে। সেইজন্যই গভর্নমেন্ট ওঁকে এখান থেকে সরাতে চায় না।

ছোড়দি মুখ নাড়া দিয়ে বললেন, কৃতিত্ব না ছাই! এই থানার কথা ভুলেই গেছে ওপরওয়ালারা। বড় বড় দু'-একটা কেস এলে তবে না নাম হয়। রাধিকাপুরের পরেশ হালদারের প্রথম নাম ছড়ালো কিসে জানিস! চৌধুরীরা ওখানকার পুরনো জমিদার বংশ, এখনো দু'-তিনটে মাছের ভেড়ি আছে, সেই বাড়ির এক ছেলে খুনের মামলায় জড়ালো। একটা খুন না, জোড়া খুন!

জয়দীপ বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলুম বটে। হাইকোর্টেও কেস উঠেছিল।

—শেষ পর্যন্ত সেই জমিদারের ছেলে বে-কসুর খালাস পেল আর পরেশ হালদারেরও আঙুল ফুলে কলাগাছ হল। লোকে বুঝলো যে, হ্যাঁ, ক্ষমতা আছে বটে দারোগার, অতবড় মামলার আসামীকেও খালাস করতে পারে। আর তোমার জামাইবাবু? আগে যে থানায় ছিলুম, সেখানে এক পার্টি ওয়ার্কারকে ধরে একটা ফালতু খুনের দায়ে চালান করে দিল। গ্রামের লোকে ভাবলো দারোগাবাবুর কোনো মুরোদ নেই, পার্টির লোকেরাও চটলো, এস পি সাহেব ডেকে বললেন, চুরি-ডাকাতির বদলে এদিকে তোমার নাক-গলানো কেন! ব্যস, করে দিল এই পচা জায়গায় ট্রান্সফার! তোদের জামাইবাবুর ঘটে তো এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই। এর চেয়ে আমি দারোগা হলে ঢের ভালো কাজ চালাতে পারতুম।

জয়দীপ বললো, এখানে চুরি-ডাকাতি নাই বা হল! এমনিই দু'-চারটে লোককে ধরে মাঝে মাঝে চালান করে দিলে হয় না? দু'-চারদিন জেলে থাকলে ঠিকই ওসব শিখে যাবে। একটু ট্রেনিং-ও তো দরকার।

ছোড়দি বললেন, তার কি উপায় আছে এখানে। একবার হাটের দিনে একটা ছোঁড়া একজন পেয়ারাওয়ালার কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়েছিল। তাকে ধরে নিয়ে এসে রাখা হল থানায়। ওমা, একটু পরেই একদঙ্গল মানুষ এসে উপস্থিত, সঙ্গে সেই

পেয়ারাওয়ালা। সে এক ধামা পেয়ারা নামিয়ে রেখে বললো, ওকে ধরবার কি এক্তিয়ার আছে আপনাদের? ইচ্ছে হয়েছে, ছেলেটা খাক না যত খুশি পেয়ারা। যদি লাগে তো আরও এক ধামা দেবো! তবেই বোঝ! ব্যাঁকা কেষ্টপুরের মানুষগুলো একেবারে হাড় বজ্জাত!

তিন-চারদিন থেকেই আমি জয়দীপের ছোড়দির বাড়ির নিরানন্দ পরিবেশে একেবারে হাঁপিয়ে উঠলুম। এদিকে আমারও নিরানন্দ হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আমার দুটো কলম হাত-সাফাই হয়ে গেছে, তিনটে রুমাল অদৃশ্য, প্যান্টের বেল্ট খুঁজে পাচ্ছি না, বুট জুতোর ফিতে নেই, পকেটে খুচরো পয়সা রাখলেই হাওয়া। পারতপক্ষে আমি হাঁদু আর কাঁদুর সঙ্গে একা থাকতে চাই না, কিন্তু ওরা ঠিক সুযোগ খুঁজে নেয় আর ফিসফিস করে আমাকে নানান কু-প্রস্তাব দেয়। একদিন মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে গোপনে হাঁদুকে একটা রাম চিমটি দিতেই কাঁদু এমন জোরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো যে তক্ষুনি ওকে চুপ করবার জন্যে আমায় দুটো টাকা খসাতে হল।

যতদূর বুঝতে পারছি, গোটা ব্যাঁকা কেষ্টপুরে দুষ্কৃতকারী বলতে এই দু'জনেই আছে, কিন্তু তাদের গ্রেফতার করবার কোনো উপায় নেই!

ছোট জামাইবাবু একদিন আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল, রাস্তার লোকজনরা আমাদের দেখে আড়ালে মুচকি মুচকি হাসছে। সামনাসামনি অবশ্য কেউ কিছু বলে না। দারোগাকে দেখে কেউ শরীর বাঁকিয়ে নমস্কার পর্যন্ত করে না। এ সত্যি বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

এক একজন লোকের দিকে চোরা ইঙ্গিত করে ছোট জামাইবাবু বলেছিলেন, ঐ লোকটাকে দ্যাখ, চোখের চাউনিটাই চোর চোর নয়? ও ব্যাটা নির্ঘাৎ চোর কিন্তু সাধু সেজে আছে। আর ঐ লোকটার গোঁফ দেখেছিস? ঐ রকম লোকেরা বরাবর পরের বউদের ফুঁসলে এসেছে, আমি মানুষ চিনি। কিন্তু তোরা গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ, একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! এ-সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!

ছোট জামাইবাবুর খুব ভরসা ছিল দাসু ডাকাতের ওপর। সে এ-পর্যন্ত ছ'বার ডাকাতি করে মাত্র একবার ধরা পড়ে ছ'বছর জেল খেটেছে। একবার জেল খাটলেই আগের অপরাধগুলো তামাদি হয়ে যায়। এখন ওর চুপচাপ থাকবার কোনো মানে হয়? যে ছ'বার ডাকাতি করেছে, সে কি ইচ্ছে করলেই সাতবার পারে না?

সে-সব না করে দাসু থানার সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়।

আমরা থাকতে থাকতেই ভগবান বোধহয় ছোট জামাইবাবুর কাতর প্রার্থনা শুনে দাসুকে সুমতি দিলেন।

একজন কনেস্টেবল পাকা খবর এনে দিয়েছে, গত দু'দিন ধরে দাসুকে নাকি দেখা গেছে সন্ধ্যের পর চুপি চুপি একটা শাবল হাতে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তের একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকতে। নিশ্চয়ই সেখানে তার ডাকাতির মাল লুকানো আছে। আজ সন্ধ্যেবেলাতেও একটু আগে সে সেখানে ঢুকেছে।

PATHAGAR.NET

ছোট জামাইবাবু ধড়া-চুড়ো পরে রেডিই ছিলেন, তক্ষুনি নিজের বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। আমি আর জয়দীপ সঙ্গে যাবার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিলাম, কিন্তু ছোট জামাইবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। এরকম গুরুত্বপূর্ণ গভর্নমেন্ট ডিউটিতে ছেলেমানুষি চলে না।

পুরো বিবরণটি আমরা পরে জেনেছিলুম।

ছোট জামাইবাবু আগে পুরো বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেললেন সেই পোড়ো বাড়িটা। তারপর এক হাতে রিভালবার, এক হাতে টর্চ নিয়ে তিনি নিজে একা ঢুকলেন বাড়ির মধ্যে। টর্চের আলোয় দেখলেন সেখানে সত্যি অন্ধকারের মধ্যে একা বসে আছে দাসু। একটা পেয়ারা গাছের নিচে বাঁধানো বেদীতে বসে হাঁটু দোলাতে দোলাতে বিড়ি টানছে।

ছোট জামাইবাবু বললেন, হ্যান্ডস আপ্। হাতে যা আছে ফেলে দাও, আমায় গুলি চালাতে বাধ্য করো না দাসু!

দাসু বললো, আসুন বড়বাবু, আসুন! ভাবছিলাম বুঝি আপনার দেরি হবে। এখানে বড্ড মশা!

—তুমি এখানে কি করছো, দাসু?

—আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি বললুম যে! আমি লোক লাগিয়েছিলুম, যাতে ঠিক সময়ে আপনার কানে খবর তোলে।

—চালাকি করো না দাসু। তুমি পরের বাড়িতে ট্রেসপাস করেছো, তোমায় আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য।

—তা তো করবেনই। আপনার সঙ্গে কি মস্করা করবার জন্য এখানে ডেকে এনেছি?

—তোমরা যা পাস্ট রেকর্ড, তাতে তোমার হাতে হাতকড়াও পরাতে হবে।

—তা যদি ইচ্ছে হয় পরান!

—মালপত্তর কোথায় রেখেছো?

—মালপত্তর? এর মধ্যে আবার মালপত্তরের কথা এলো কোথা থেকে?

—তুমি এমনি এমনি এখানে এসেছো? শাবল এনেছো সঙ্গে?

—শাবল এনেছি...এখানকার ঝোপঝাড়ে গন্ধবাদালির গাছ আছে শুনেছিলুম। আমার গন্ধবাদালির শেকড় দরকার, কিছুদিন ধরে পেটটা ভালো যাচ্ছে না।

—ফের চালাকি? আমি কিন্তু তোমায় টর্চার করে পেট থেকে কথা আদায় করবো।

—পেটে কথা থাকলে তো আদায় করবেন! বললুম না পেট খারাপ। নিন চলুন!

—তুমি হয় এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছো, অথবা তোমার ডাকাতির মাল এখানে কোথাও পুঁতে রেখেছো!

—গুপ্তধন আছে নাকি এখানে? তা হলে আসুন, আপনাতে-আমাতে দু'জনে মিলে খুঁজি।

ছোট জামাইবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। কোথাও কোনো

PATHAGAR.NET

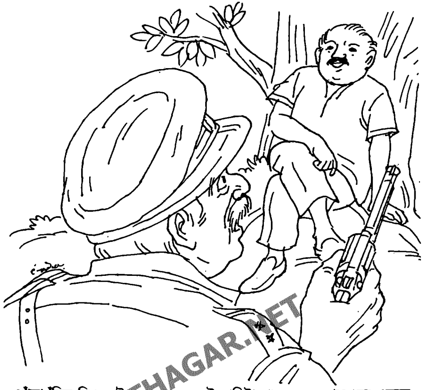

PATHAGAR.NET

খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন নেই। সরকারদের এই বাড়িটা প্রায় বছর দশেক ধরে এরকম জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো ঘরের দরজা-জানলা নেই, বারান্দায় পর্যন্ত আগাছা। এখানে সাপ-খোপ থাকাও বিচিত্র কিছু নেই।

ছোট জামাইবাবু গর্জন করে বললেন, লায়ার! তুমি যে বললে গন্ধবাদালির শেকড় খুঁজতে এসেছো, তা-ই বা খুঁড়েছো কোথায়?

দাসু বললো, পরে ভাবলুম, অত ঝঞ্ঝাটে দরকার কী, সিউড়িতে যাচ্ছিই যখন, ওখানে ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবো।

—সিউড়ি যাচ্ছো মানে?

—বাঃ আমাকে ধরার পর আপনি সদরে চালান করবেন না? চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখলে আপনিই ফ্যাসাদে পড়বেন!

—সদরে তো পাঠাবোই। তোমায় এমন কেসে জড়াবো যে জেলের ঘানি তোমায় ঘোরাতেই হবে।

—আজকাল আর জেলে গেলে ঘানি ঘোরাতে হয় না। অন্তত সিউড়ি জেলে সে ব্যবস্থা নেই, সেটা আমি ভালোই জানি!

—তুমি তা হলে জেলেই যেতে চাও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

—সে আমার ব্যাপার আছে। আপনি আপনার কাজ করুন।

ছোট জামাইবাবু টর্চ নিভিয়ে কাছে এসে দাসুর কাঁধে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললেন, শোনো দাসু, তুমি আমায় একটু দ্যাখো, আমিও তোমায় দেখি। এসে পড়েছি যখন, তোমায় গ্রেফতার তো আমায় করতেই হবে। আবার আমিই ইচ্ছে করলে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি। কি, পারি কি না বলো? তুমি দেখতে চাও, আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারি কিনা?

—কি মুশকিল, আমি তো ছাড়া পেতে চাইছি না এবারে। আমায় সিউড়ি জেলে পাঠিয়ে দিন!

—ছিঃ ওকথা বলতে নেই। তুমি নিরপরাধ, তোমায় কেন জেলে পাঠাবো? আমি শুধু বলছি, একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে। তোমায় না হয় হাতকড়া দিয়ে ধরেই নিয়ে গেলুম থানায়। তুমি ইদানিং কোন্ পার্টির সঙ্গে আছো, সেটা বলো, আমি পার্টি অফিসে খবর পাঠাই, তারা এসে তোমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যাক। তাতে তোমারও নাম হল আর আমারও তো একটু পার্টির নেকনজরে আসা চাই!

—পার্টি-ফার্টি কী বলছেন! ওসব ঝক্কি-ঝামেলায় আমি নেই। দু'-চারদিনের জন্য একটু জেলে যাবো, তার জন্য আবার অত!

—দু'-চারদিনের জন্য জেলে যাবে? মুখের কথা বললেই হল! জেলে যাওয়া অত সোজা? ঠিক মতন কেস সাজাতে না পারলে হাকিম তোমায় তো খালাস দেবেনই, উল্টে আমাদেরও বকুনি দেবেন। বামাল কোথায়?

—বামাল আবার কোথায় থাকবে? দেখেছেন, কতদিন হল হাতে কোনো কাজকর্ম নিইনি।

—তা হলে জেলে যেতে চাইছো কেন? বাড়িতে ভাত জুটছে না?

—আসল কথাটা তা হলে বলি শুনুন। সিউড়ি জেলে আমার মেজো ভায়রা আছে, তার সঙ্গে গোটা কতক ব্যাপারে আমার পরামর্শ করার দরকার। সাতদিন কিংবা এক মাসের জন্য আমায় ঠুসে দিন!

—ঠুসে দেবো অমনি অমনি?

—তা হলে আর কী করতে হবে, বলুন না ছাই?

—উঠোনে গর্ত খোঁড়োনি, মালপত্তর ছড়িয়ে রাখোনি! হাকিমদের মেজাজের কথা বললুম না? অন্তত দু'-চারবার চ্যালা সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বেলে হৈ হৈ করে ছুটে আসতেও তো পারতে—।

—তা হলে তাদের আবার মজুরি দিতে হবে। ওসব খরচ-খরচার মধ্যে আমি নেই।

—তা হলে অন্তত আমার রিভালবারটা কেড়ে নাও! কিছু একটা করো। আমি তোমায় হেল্প করবো, আর তুমি আমার জন্য কিছু করবে না?

PATHAGAR.NET

—না, না, না! ও-সব আমি পারবো না। কি সে কী হয়ে যায় বলা যায় না। এক মাসের বদলে যদি দু' বছর ঠুকে দেয়? তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

—তুমি কি তাহলে কিছুই করবে না? এই তোমার উচিত হল?

—ভালো জ্বালা। আমি সেধে ধরা দিচ্ছি, তার ওপর আপনি বায়না ধরেছেন, এটা করো সেটা করো!

এই সময় মেজোবাবু মুখ বাড়িয়ে বললেন, স্যার, বড্ড দেরি করে ফেললেন! গ্রামের লোক খবর পেয়ে বাইরে এসে জমায়েত হয়েছে। তারা জানতে চাইছে কোন দোষে দাসুকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।

বড়বাবুর আগেই গলা ধরে এসেছিল, এবারে আর সামলাতে পারলেন না। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, এবারেও হল না। আমার কপাল! কেউ আমার ভালো চায় না, কেউ আমার জন্য চিন্তা করে না...

দাসু পর্যন্ত বিচলিত হয়ে বললো, এ কি বড়বাবু, আপনি কাঁদছেন! আরে রাম, আপনি ব্যাটাছেলে হয়ে...শুনুন আমার কথাটা...।

বড়বাবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন কথা বলব না। তোমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক...।

দাসু বললো, কী মুশকিল, আপনি অমন করে কাঁদলে...আচ্ছা দিন। আপনার মালটা দিন। না হয় আমার এক মাসের বদলে ছ'মাসই হবে, দেখবেন যেন তার বেশি না হয়...।

বড়বাবুর কাছ থেকে রিভালবারটা নিয়ে দাসু চলে এলো বাইরে। সেখানে শ'খানেক গ্রামের লোক হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

দাসু হাতটা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, ভাইসব, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। দারোগাবাবু অন্যেয্য কিছু করেননি। আমাকে গোরেপতার করার ওনার হক্ আছে। এই দেখুন আমি ওনার পিস্তল কেড়ে নিয়েছি, এই দেখুন আমি এবার দৌড়ে পালাচ্ছি—।

এরপর সে পুরনো কালের মতন একটা হুংকার দিল, ইয়া হু! হা রে—রে—রে।

তারপর ছুট লাগালো দাসু—তার পেছনে পুরো পুলিশ বাহিনী। দাসুই আগে এসে পৌঁছে গেল থানায়।

রিভালবারটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে ধপাস করে মেজোবাবুর চেয়ারে বসে পড়ে বললো, ওঃ দম ছিটকে গেছে একেবারে, এতখানি রাস্তা...কই এক গেলাস জল খাওয়ান।

বড়বাবু ততক্ষণে চোখের জল মুছে ফেলেছেন। একগাল হেসে বললেন, শুধু জল কেন, ওরে দাসুবাবুর জন্য ছানার গজা নিয়ে আয়, চা বসাতে বল, আজ এমনি শুভদিন...।

PATHAGAR.NET

বত্রিশ পাটি দাঁত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

চোদ্দ বছরের পুরনো দম্পতি শুয়ে আছে চোদ্দ বছরের পুরনো খাটে, চোদ্দ বছরের পুরনো বিছানায়, ঢাউস একটা লেপ গায়ে দিয়ে। লেপের অন্তঃকরণটি প্রাচীন, বাইরের খোলটি নবীন, মারকিন। খুব কম পাওয়ারের নীল একটা আলো পায়ের দিকে দেওয়ালের গায়ে জ্বলছে। ক্রীম রঙের দেওয়ালের গা বেয়ে সবুজ ধারায় গড়িয়ে এসে একটা ফটোর কিনারায় আটকে গেছে। তলার দিকে গভীর একটা ছায়া! ছায়া ফেলেছে ওই নিদ্রিত দম্পতি। রাগ রাগ মুখ করে ডান পাশে বিকাশ, বাঁ পাশে অল্প একটু ঘোমটা টেনে আরতি। আরতির মুখে ঠিক হাসি নয়, হাসির ওয়ারে চাপা বিজয়িনীর মুখ। ফটোগ্রাফার বিকাশের বুকের একপাশে আরতির কাঁধটা লেপ্টে দিয়ে অন্তত ওই ছবিটা যতদিন না ধূসর হয় ততদিন এই প্রমাণ রেখে গেছেন—তোমরা দু'জনে দু'জনের কাছের মানুষ। কাছাকাছি, পাশাপাশি থেকে লেপটা-লেপটি করে সংসার কর। কমলি যখন পাকড়েছে মিঞা, সহজে নেহি ছাড়েগা। দরকোচা মারা, ফোড়ার গায়ে তোকমারির পুলটিনের মতো আটকে থাকবে। সম্পর্ক যত শুকোচ্ছে তত আঁটোসাটো হবে। ছবিটা বছর সাতেক আগের যে রাতে, যে মেজাজে তোলা তাতে ছবির ফ্রেমে একজন থাকলে আর একজনের থাকা উচিত ছিল না। থাকলেও দু'জনে দু'পিঠে থাকলে উচিত বিচার হত। ছবি তোলা নিয়েই সন্ধের ঝগড়া রাত আটটা নাগাদ কাপ-ডিশ ছোঁড়াছুড়ির পর্যায়ে এসে যখন আরো বড় কিছুর দিকে ঝুঁকছিল ঠিক তখনই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, সমরেশের আগমন। সমরেশ দু'পক্ষকে সংযত করে বিকাশকে ফ্রয়েড শেখালো। ফ্রয়েড সাহেবের কায়দা। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একদিনই একটু খিটিমিটি হয়েছিল অতি সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে—মুরগির মাংস। তারপর সেই রণক্ষেত্রে সমরেশ নিজের উদাহরণ হাজির করেছিল। সে নাকি প্রতি সপ্তাহের গোটা রবিবারটাই বৌয়ের পায়ে জবাফুলের মতো উৎসর্গ করে দিয়েছে। ছোটো এক কামরার ফ্ল্যাটে দু'জনে মুখোমুখি বসে থাকে। আদর-টাদর করে। পাকা চুল তুলে দিয়ে সাহায্য করে। উকো দিয়ে গোড়ালি মেজে দেয়। পেটিকোটের দড়ি পরিয়ে দেয়। কখনো গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়। টানা ট্যাকসিতে লেকে নিয়ে গিয়ে ঝালমুড়ি খাওয়ায়। পিঠের মাশবুম স্পঞ্জ দিয়ে সাফ করে দেয়। সামান্য একটি ছবি নিয়ে দক্ষযজ্ঞ! মিটসেফ থেকে নতুন কাপডিশ বের করে তিনজনে চা-চানাচুর খেয়ে রাত নটা নাগাদ আই ভি স্টুডিওতে গিয়ে বিকাশ বৌ নিয়ে ফ্লাশলাইটের সামনে

PATHAGAR.NET

বসেছিল। ফটোগ্রাফার কানু পকেট থেকে চিরুনি বের করে দিয়েছিল। দু'জনের সেই মুহূর্তে সাগর প্রমাণ মানসিক ব্যবধান থাকলেও দৈহিক ব্যবধান কমতে কমতে বুটির বুকে কৃপণের মাখন করে দিয়েছিল। একটুও হাসি হাসি মুখ হয়নি। দেরিতে আসা কেরানির দিকে অফিসের বড়বাবুর তাকানো মুখের মতো হয়ে গিয়েছিল।

সেই মাল দুটি এখন লেপের তলায়। মশারির বাইরে মেঝের ওপর পৌষের শীত হামা দিচ্ছে। বন্ধ জানলার বাইরে শীত হি-হি শব্দ করছে। বিকাশ এমনিই একটু ঘুমকাতুরে তার ওপর শীত, তার ওপর লেপটা সারাদিন ছাদে রোদ খেয়ে আরতির প্রথম যৌবনের মতো মোলায়েম গরম হয়েছে, তার ওপর নতুন ওয়াড় পড়েছে। আগের রাত পর্যন্ত যে ওয়াড় ছিল তাতে সারারাতে পালা করে হয় স্বামী না হয় স্ত্রী হারিয়ে যেত! দরকারের সময় গলা শুনতে পেলেও কেউ কাউকে খুঁজে পেত না। বেশ ঘুলঘুলি সাইজের গোটা কতক ফর্দাফাঁই ছেঁড়া। সেই গবাক্ষ দিয়ে ঘুমের ঘোরে হয় বিকাশ না হয় বৌ লেপের খোলের গভীর জগতে সেঁদিয়ে বসে থাকতো। কখনো সখনো খোলের মধ্যে দু'জনের দেখা হয়ে যেতো। সেটা অবশ্য চান্স। বেশির ভাগ একপক্ষ বাইরে, একপক্ষ ভেতরে। কয়েক রাত আগে আরতি গিয়েছিল লেপের উদাম লাল টকটকে বুকে উষ্ণতা খুঁজতে। তারপরে দুঃস্বপ্ন দেখেই হোক কি লেপ আর ওয়াড়ের যৌথ আদরে দম আটকে গিয়ে হোক গোঁ গোঁ শব্দ করে বিকাশের ঘুম চটকে দিয়েছিল। বিকাশ ফায়ার ব্রিগেডের কায়দায় একটানে ঘুলঘুলি মুলঘুলি ফর্দাফাঁই করে গোঁ গোঁ—আরতিকে লেপের গভীরে জগৎ থেকে উদ্ধার করে এনে ভেবেছিল—খোলের মধ্যে মানুষের ঢোকার মতো লেপ ঢোকানোটা যদি সহজ হত। মুক্ত আরতির ব্যাপারটা ছিল অন্য। আলো দেখতে না পেলে তার দাম আটকে বোবা লেগে যায়। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি নীল আলো নেই, কেউ নেই; কেউ নেই, গোঁ গোঁ। কালই তুমি ওয়াড়ের কাপড় কিনে আনবে। কি রাক্ষুসে ওয়াড়-রে বাবা, কোন দিন দেখবো দু'জনেই ওর মধ্যে মরে কাঠ হয়ে আছি। ভাগ্যিস তুমি বাইরে ছিলে, লর্ডল্যানসেলেট। তোমাকে উদ্ধার করার জন্য লেডি অফ দি শ্যালট। সদ্য উদ্ধারপ্রাপ্ত রাজকন্যা আরতি এরপর যা করেছিল আরো সুন্দর। ওয়াড়ের একটা ঘুলঘুলির মধ্যে দুটো পা ঢুকিয়ে দোলায় শুয়ে সেয়ানা শিশু যেভাবে খলখল করে পা ছোঁড়ে, বিছানায় আধ শোয়া হয়ে সেইভাবে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লেপের খোলটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, দাও এক গেলাস জল গড়িয়ে দাও। এতবড় একটা কাজের পর যে কোনো স্বামীরই উচিত স্ত্রীকে এক গেলাস জল কেন, এই শীতের রাতে লেমনেড মিশিয়ে কি লাইম জুস দিয়ে জিন কলনিস ঠোঁটের ডগায় তুলে ধরা। জলের গেলাসটা ঠক করে কোণের টেবিলে রেখে আরতি আদেশের সুরে বলেছিল, কালই ছ'মিটার পুরু লংক্লথ কিনে আনবে। স্ত্রীর এঁটো গেলাস কে আর এই শীতে ধুতে যায়! সেই গেলাসেই জল ঢেলে স্ত্রীর না চুমুক দেওয়া অংশটা আন্দাজ করে জল খেতে

খেতে বিকাশ বলেছিল—মাসের শেষ, তলানি গোটা দশেক টাকা পড়ে আছে, মাসটা কাবার করে ওয়াড়ের কাপড় আনা যাবে।

আহা শুধু লেপ গায়ে দেওয়া যায় নাকি, খারাপ হয়ে যাবে না! দিনচারেকে কি আর উনিশ-বিশ হবে। খোলে ঢোকালেই কি যৌবন ফিরে আসবে!

এমন লেপ পাচ্ছ কোথা, বাবা একটা সেরা জিনিস দিয়ে গেছেন। যেমন গরম, তেমনি নরম, তেমনি বিশাল। ছেলে, মেয়ে, স্বামী প্লাস একটা পাশবালিশ তোফা তলিয়ে যাবে।

আলো নিভিয়ে সে রাতের মতো সেরা লেপের ধূসর লাল জগতে তলিয়ে যেতে যেতে বিকাশ যে কথাটা ভেবেই ছিল সোচ্চারে বলতে পারেনি তা হল শ্বশুরমশাই সেরা দুটি বাঁশ তাঁর ঝাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, একটি লেপ আর সেই লেপের তলায় ঢোকার সঙ্গী লেপাক্ষি আরতি। লেপটা অবশ্যই বড়, আশাতীত বড়, লেপ যিনি দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয় তাঁরই মেয়ের হৃদয়ের চেয়ে বড়। প্রথম বিয়ের হুটোপাটির তিন মাসে বিকাশ মনে মনে লেপটার প্রশংসা না করে পারেনি। বেড়ে ফ্যামিলি সাইজ। নতুন বিছানায় ঔরাঙ্গবাদের রেশমী চাদরে দুটো পিচ্ছিল প্রাণী যখন মাছের মতো কিলবিল করত, গড়ের মাঠের মতো বিশাল লেপ তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বাইরের শীতলতায় কোনোদিন তাদের ফাঁস করে দেয়নি। একটি সন্তানের আগমন এবং তার বোধবুদ্ধি হবার পরও লেপ তার অন্তরালে মাঝে মাঝে একটু বেশি কাছাকাছি একটু বেশি সাহসী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন এই মধ্য বয়েসে সংসার যখন সব নির্যাস নিংড়ে নিয়েছে, শরীর যখন সব বাষ্প মোচন করে বাতিল বয়লার হয়ে গেছে, তখন এ লেপ বাঁশ ছাড়া আর কি। মনে তো এখন গুনগুন গান, কম্বলবস্ত, কৌপিনমন্ত; খলু ভাগ্যবন্ত। এই লেপ রোজ সকালে তাকেই তো পাট করে ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে হয়। সেই সময় নড়া ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। ঘাড়ে করে ছাদে রোদ খাওয়াতে তোলার সময় মালুম হয় সংসারের ভার একটি স্ত্রীলোককে বহনের ভার। গ্রীষ্মে সিলিং থেকে দোলানো জাফরি কাঠের পাটাতনে ঝোলাতে গিয়ে টাল খেতে হয়। তারপর বৎসরান্তে শীত যখন জানলার কাঁচে নাক রেখে ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন আবার চেয়ারের ওপর টুল রেখে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে সেই লেপ নামাতে হয়। প্রথমে নামে লেপ, সঙ্গে সঙ্গে নামে ধুলো, মানে বড় মাকড়সা, নেংটি ইঁদুর, তেলাপোকা।

নতুন ওয়াড়ের গন্ধ শুঁকোতে সেই লেপের তলায় প্রথমে ঢুকছে বিকাশ, পাশে এসে কুকুরকুণ্ডলি হয়ে শুয়েছে আরতি। সারা বছর একটাই তার শোবার ধরন। বিকাশ চিরকালই বুকে হাত দুটো ভাঁজ করে রেখে চিৎ হয়ে শোয়। জাগ্রত অবস্থায় ঠোঁট দুটো বোজানো থাকে। ঘুমোলে শরীর যেই আলগা হয়, নিচের ঠোঁটটা বাজে কাঠের জানলার মতো অল্প একটু বেঁকে ফাঁক-দাঁত হয়ে যায়। তারপর যতই সে ঘুমের ঘোরে পায়ে

PATHAGAR.NET

পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে ততই সেই ছুঁচো ফাঁক মুখ দিয়ে শিসের মতো এক ধরনের হিস হিস শব্দ বেরোতে থাকে। দু'জনের এই দু' ধরনের শোয়া নিয়ে মাঝে দিনকতক দু'জনের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ হয়েছে। আরতির ঘুম পাতলা। ভাঙা বাটির ফাটলে হাওয়ার শব্দের মতো বিকাশের ঘুমন্ত সাইরেনে ঘুমোতে না পেরে আরতি বিকাশকে ঠ্যালা মেরে জাগিয়ে দিয়ে প্রথম প্রথম অনুরোধ করেছে—পাশ ফিরে শোও। অনুরোধ যখন বিফল হয়েছে তখন বালিশ নিয়ে মেঝেতে নেমে শোবার ভয় দেখিয়েছে। অবশ্য নেমে শোয়নি কখনো। মেঝেতে বড় রিপু ভয়—ইঁদুর, আরশোলা, বিছে। বিকাশ আবার 'দ' হয়ে শোয়া পছন্দ করে না। এইভাবে যারা শোয় তাদের চরিত্র ভয়প্রবণ। মনে মনে তারা অসহায়, অবলম্বন খুঁজছে। অবলম্বন হিসেবে বিকাশ তো পাশেই রয়েছে। তবে কেন 'দ' হয়ে শোয়া। তার মনে বিকাশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয় সে। তাছাড়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সোজা হয়ে শোও। আরতি আদেশ মান্য করার চেষ্টা করেছে। চিৎ হয়ে শুয়েছে। তারপর ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুয়ে আবার যে কে সেই। ঘুমন্ত আরতির দুটো পা টেনে সোজা করতে গিয়ে বিকাশ অবাক হয়ে গেছে—দারা সিং-এর কাঁকড়া প্যাঁচ। টেনে খোলা যায় না। হিস্টিরিয়া রোগীও দাঁতি লাগা চোয়ালে। অবশেষে দু'জনেই দু'জনকে মেনে নিয়েছে। জাগরণের ইস্টিশান না পৌঁছনো পর্যন্ত বিকাশের ইঞ্জিন স্টিম ছাড়বে। কটাস করে আরতির পায়ের খিল খুলবে না।

দূরে রাস্তার বাঁকে শীতের রাতের কুকুর ঝাপসা কুয়াশার ভূত দেখে কাঁদছে। দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম ঘরের বাইরের প্যাসেজ হাইহিল জুতো পরে পায়চারি করছে। বিকাশের মুখ দিয়ে হাওয়া শিসের শব্দে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড আদান প্রদান করছে। আরতি হাঁটু দিয়ে নিজের হজম যন্ত্র চেপে বদহজমের সাধনা করছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। ছেলে আর মেয়ে আলাদা ঘরে বেহুঁশ। খাবার ঘরের মিটসেফে ইঁদুর পাঁপড় চিবোচ্ছে। বাথরুমের কলে টিনের বালতিতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির উত্তরের জানলার ভাঙা কাঁচ দিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে আলো আর সাদা কোয়াশার মিশেল তৈরি হচ্ছে।

বিকাশের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। এক ঘুমে রাত কাবার করার মতো পরিশ্রম সে এখনো করে। কোথায় যেন একটা বেড়াল ডাকছে ম্যাও ম্যাও করে। না, পাশাপাশি কোনো বাড়িতে নবজাতক শীতে ওঁয়া ওঁয়া করছে। না, দূরে নয়তো ঘরে! ঘরে বেড়াল! ঢুকলো কি করে? জানলা-দরজা সবই তো বন্ধ! মনে হচ্ছে বিছানায়! লেপের তলায়! কে রে! বিকাশ কান খাড়া করে শুনলো। তার ডান পাশে লেপের মাথাটা জড়িয়ে গোল আর সেই গোল বস্তুটির তলা থেকে শব্দটা আসছে—উঁরে বাবারে! উঁরে উঁরে উঁ উঁ। বিকাশ গোটানো লেপটাকে আরতির মাথার তলা থেকে টেনে সোজা করল। লেপের সঙ্গে কিছু উস্কো চুল লেপের বাইরে বেরিয়ে এলো।

বিকাশ এইবার লেপটা উল্টে আরতির মুখটা বের করল। শব্দটা বেশ স্পষ্ট আর

সুরেলা হল—উঁরে, উঁরে। দু'হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে 'দ'-আরতি আর্তনাদ করছে। বিকাশ হাত দিয়ে বস্তুটিকে সোজা করল। নীল আলোয় মুখে যন্ত্রণা স্পষ্ট, চোখে জল। কি হল কি? অ্যাঁ কি হল? বলবে তো কি হল?

দাঁত, উরে বাবারে দাঁত।

দাঁত আবার কি হল?

ভীষণ যন্ত্রণা।

পাশ ফিরে শোও। কিছুক্ষণ দমবন্ধ করে রাখো, কমে যাবে। মাঝরাতে দাঁতের যন্ত্রণায় এর চেয়ে ভালো দাওয়াই বিকাশের জানা ছিল না।

পাশ ফিরে শুলে কি হবে গোঁ!—কি গোঁ গোঁ করছ তখন থেকে। ভূতে ধরল নাকি! বিকাশ বিরক্তিটা ঠিক চেপে রাখতে পারল না, বেশ নরম গরম বিছানায় দিব্যি ঘুম দিচ্ছিল, কোন ভালো স্বপ্নও হয়তো দেখছিল। আরতির আবার রাগ আর অভিমান দুটোই বেশি, প্রকাশ চোখের জলে। অস্বাভাবিক মুখের ধরনে। বেশ তোলো হাঁড়ির মতো মুখ হলেই বুঝতে পারে বিকাশ—খেপী খেপেছে। ছেলেবেলায় আরতির আদরে ডাক নাম ছিল খেপী। বিয়ের পর বিকাশ অন্যান্য লুক্কায়িত তথ্যের সঙ্গে এটা জেনেছে। বিকাশের খোঁচা খেয়ে, আরতি ঘুরে বিকাশের দিক পিছন ফিরে শুলো। চোখ দাঁতের যন্ত্রণায় জলের সঙ্গে অভিমানের ডোজ যুক্ত হল। বিকাশ বুঝতে পারে না বিপদে পড়েও মানুষ কি করে রাগতে পারে। বিপদের প্লাটফর্ম হল বন্ধুত্বের, সমর্পণের হাত মেলাবার। বিকাশ বালিশে আধশোয়া হয়ে বললে, একেই তুমি রাগপ্রধান, এখন দাঁতের ব্যথায় একেবারে কালোয়াতী। যখন সাবধান করেছিলুম তখন শোনোনি কেন? এখন মরো? লেপের ভিতর থেকে উত্তর এল, কি সাবধান করেছিলে? উঁ হুঁ হুঁ। সরি।

প্রথম হল চিনি, চায়ে সাধারণ মানুষ ক' চামচ চিনি খায়? ম্যাকসিমাম দু' চামচে। তুমি! তিনে গিয়েও তোমার থামতে আপত্তি, চার হলেই ভালো হয়। ভাবছো আমাকে বাঁশ দিচ্ছো, আজ্ঞে না, নিজেকেই নিজে দিচ্ছো বাঁশ। আমার কি হবে। কাঁচকলা! খাও না মাসে বিশ কিলো চিনি খাও। যতদিন চাকরি আছে দিয়ে যাবো, সেভিংস নীল! চোখ বুজলেই হাতে হারিকেন। চিনি, চকোলেট, রসগোল্লা, সন্দেশ দাঁতের যম। এখন সামলাও ঠ্যালা।

বিকাশ দম নেবার জন্যে থামলো। যদিও ভীষণ যন্ত্রণা তবু আরতি চিনির খোঁটার উত্তর না দিয়ে পারল না।

—বিশ কিলো করছো। গতমাসে ওঁরে বাবারে, রেশন ছাড়া দশ কিলো বাড়তি এসেছে, তাও এক কিলো মনুর মার কার্ড থেকে ম্যানেজ করেছি। উঁ হুঁ হুঁ।

—দশ কিলো চিনির দাম জানো? দু' কিলো তার দাম জানো! একটা বড় কফির দাম জানো? শালা গৌরী সেনরে? ভেবে ভেবে চুল পেকে গেল। জানার মধ্যে জানো, ড্রেস সার্কেল, ব্যালকনি, স্টল?

—ঠিক আছে দিনে দু'বার চা খেতুম, কাল থেকে তাও খাব না। পারি নিজে রোজগার করে খাব।

—মাসে পকেট মেরে রোজগার তো কম হয় না?

—শেষে মাসে তো সবই হাতিয়ে নাও। চিনি, চিনি, চিনি, নিজে তো দিনে বারদশেক চায়েতে কফিতে খাও। তাও একে রামে রক্ষে নেই দোসর লক্ষ্মণ। বন্ধু-বান্ধবের তো অভাব নেই। তারপর রোজ চাটনি।

—চাটনির জন্যে বড়বাজার থেকে ভেলি এনে দি পাঁচ কিলো, চাটনিতে চিনি ঢোকাচ্ছ কি? আর নিজের বন্ধুদের কথা ভুলছো কি করে? রামের মা, রমাদি, ভুলো, কল্যাণী, বাপের বাড়ি।—তারা ন' মাসে ছ'মাসে আসে, এর উপর চুরি আছে।

—চুরি! বিকাশ শুয়ে পড়েছিল, আবার আধশোয়া হল। চুরি-টুরি, মিথ্যে কথা, ধাপ্পাবাজী এসব সহ্য করতে পারে না। পৈতৃক গুণ। বিকাশ বললে, মনুর কাল সকালেই ডিসচার্জ। শেষ মাস হাতে টাকা নেই। যেখানে থেকে পারি ধারধোর করে এক মাসের মাইনে নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে গেট আউট, তোমার অসুবিধে হয় যতদিন না লোক পাচ্ছি নিজে বাসন মাজবো।

—উঁরে বাবারে? পুরোটা না শুনেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। মনুর মা তোমার মার আমলের লোক, সে সব থাকতে চিনি চুরি করতে যাবে কোন আক্কেলে? চোর তোমার ছেলে আর মেয়ে। সারাদিন মুঠো মুঠো চিনি ধ্বংস করে।

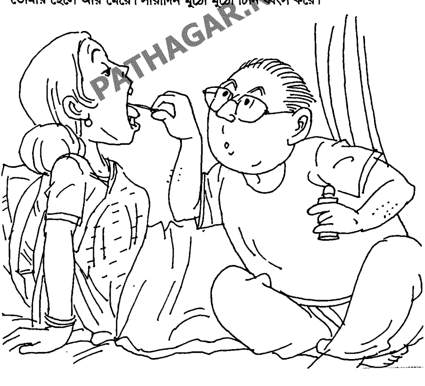

PATHAGAR.NET

বিকাশ সোজা উঠে বসল গ্যাঁট হয়ে। বড় বড় মাথার চুল খামচে ধরে কিছুক্ষণ এমনভাবে বসে রইলো যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। মুখে ছি-ছি শব্দ। ছি-ছি ছি, ছি, তুমি তো আগে কখন বলনি। চোর, চুরি! এত খাচ্ছে, তবু চুরি, ইস্ ইস্! এই নীচতার তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ইমিডিয়েটলি একটা ব্যবস্থা করতে হয়। বিকাশ কোল থেকে লেপটা ফেলে দিল।

কি ব্যবস্থা তুমি করবে! এই রাত আড়াইটের সময়? ধরে ঠ্যাঙাবে?

ঠ্যাঙাঠেঙি আমার কোষ্ঠীতে নেই, বুঝলে? ওসব মধ্যযুগের জিনিস, আধুনিক কালে অচল, আমার হল অন্য টেকনিক। সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। একমাস আর কিছু না স্রেফ চিনি খাইয়ে যাব মুঠো মুঠো কিলো কিলো।

আরতি যন্ত্রণায় আর একবার কুঁই কুঁই করে উঠে বললো—দাও না। যদি তোমার কাছে কোনো বড়ি-মড়ি থাকে।

—থাকলেও দেবো না। কথায় কথায় তোমার বাড়। আট প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের মতো, তোমার মাথা ধরা, না হয় বুক ধড়পড়, না হয় পেটে ব্যথা, এখন গোদের ওপর বিষফোঁড়া, দাঁতের যন্ত্রণা! শরীর নিয়ে ইয়ারকি! গোটা গোটা সুপুরি খাবার সময়ে মনে ছিল না, কাঠ খেলেই আঙরা দাস্ত হয়।

বাগানে এতগুলো সুপুরি গাছ, আমি না খেলে খাবেটা কে?

—গাছগুলো বেড়া দেবার পারপাসে পূর্বপুরুষেরা করেছিলেন। তোমার সুপুরি বিলাসের জন্য করা হয়নি। বেশি সুপুরি খেলে কি হয় জানা আছে? দাঁত যায়, কিডনিতে স্টোন হয়, ক্যানসার হয়। ইমপোটেন্ট হয়ে যায়।

—সে আবার কি?

—সে বোঝার ক্ষমতা থাকলে রোজ রাত্তিরে পাশে শুয়ে শুয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে বাঘিনীর হাড় চিবোবার মতো কটাস কটাস করে আস্ত আস্ত সুপুরি চিবিয়ে নিজের বারোটা বাজাতে না। স্লেভ অব হ্যাবিটস। তোমার জন্য আমার এতটুকু করুণা নেই? তোমার বার মাসে তের পার্বণ। আইবুড়ো-বেলায় দাঁত মাজতে?

আরতি কোনো উত্তর দিল না। দাঁত চেপে পড়ে রইল। বিকাশ মশারীর একটা পাশ তুলে তেড়ে ফুঁড়ে নেমে পড়ল। ভেবেছিল মেঝেতে পা দিয়েই অভ্যস্ত জায়গায় চটিজোড়া পেয়ে যাবে। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা মেঝেতে ছ্যাঁক করে উঠল। কি হল? মাথা নিচু করে দেখলো একপাটি জুতো উল্টে আছে আর একপাটি চলে গেছে খাটের তলায়। বাঃ বাঃ! লাথি মেরে জুতোটাকে খাটের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছো? কোনো একটা সেনস্ অফ ডিসেন্সি নেই? মরো শালা এখন হামাগুড়ি দিয়ে। দাঁতের যন্ত্রণা? বিকাশ বিকৃত গলা করল, দাঁতের যন্ত্রণা তো সাত খুন মাপ।

খাটের তলাটা যেন আরো ঠাণ্ডা। পাশ থেকে আলো গড়িয়ে এসে যেটুকু দেখা যায়। এটা আবার কী? ও উলের গোলা? সোয়েটার হচ্ছে, না গুষ্টীর পিণ্ডি হচ্ছে?

PATHAGAR.NET

জুতো উদ্ধার করে বিকাশ ফিরে এল। চটি পায়ে দিয়ে ফটাস ফটাস করে খানিক ঘরময় ঘুরলো। তোমার আর কি? কাল সকালে ছটার মধ্যে বেরোতে হবে, কে এক শালা আসছে এয়ারপোর্টে। এদিকে সারারাত ঘুম নেই।

—তুমি ঘুমোও না! আমার জন্যে তোমায় জাগতে হবে না। আমার জন্যে যম জাগবে।

—তুমি যমের অরুচি। চোদ্দ বছর দেখছি তো? এইটুকুতেই কাতর। মনে আছে সেবার? ভীষণ ব্যাপার, ভীষণ ব্যাপার, চালাও স্পেশালিস্ট। বত্রিশ টাকা চোট? কি ব্যাপার! না একটু কোলাইটিস মতো হয়েছে। দাও জোলাপ, অল ক্লিয়ার। তোমাকে জানি না, আদরের ননী!

—তুমি শুয়ে পড় না, আমি মরছি মরতে দাও।

—দাঁতের ব্যথায় কেউ মরে না। অন্যকে মারে। অত চিৎকার করার কি আছে! মনে আছে আমার একবার কার্বাঙ্কাল হয়েছিল?

আরতি চুপ করে রইল।

তার মধ্যেই তোমার সিনেমা চলছে, যাত্রা চলছে, বোনের বাড়ি চলছে। ছ-ছটা মুখ! যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। মুখে টুঁ টুঁ শব্দটি নেই। মনে মনে বলছি, কা তব কান্তা! পিসিমা এসে ড্রেস করে দিয়ে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দ টেকনিক চালাচ্ছি। ব্যথার জায়গা থেকে মনটা উইথড্র করার চেষ্টা করছি।

আরতি চুপ করে থাকতে পারল না।—না, তোমার জন্যে তো আমি কিছুই করি না, সব করেন তোমার পিসিমা?

—যাক তোমার সঙ্গে আমি মাঝরাতে তর্ক করতে চাই না। তুমি করছো, কি করোনি সে বিচার ওপরে গিয়ে হবে। এখন তোমার জন্য আমাকে কিছু করতেই হয়? বিয়ে যখন করেছি।

বিকাশ দরজা খুলে বাইরে বেরুলো। দরজার ডান পাশে সুইচ বোর্ড। আগের মতো চোখ চলে না। ঠাণ্ডা, থৈ থৈ অন্ধকারে কোমর ভাঙা জলে যে ভাবে হাঁটে সেই ভাবে বিকাশ এগিয়ে আলোর সুইচ টিপল। খিরকি খিড়িং শব্দ করে বসার জায়গায় মাথার ওপর ফ্লুরেসেন্ট বাতি জ্বলে উঠলো। মাঝরাতে আলোর যেন চোখ ফোটে। চারিদিক ঝলসে গেল। এখন! এখন আমাকে কি করতে হবে? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বসার জায়গায় সোফাটোফার দিকে বিকাশ এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন অশরীরী কোনো ডেন্টিস্ট এখানে বসে আছে। বিকাশের গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গরম বিছানা লেপের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে বেশ শীত করছে। এই গরম ঠাণ্ডায় হঠাৎ জ্বর হয়ে গেল বেশ কিছু টাকার ধাক্কা। সোফার ওপর দলা পাকানো আরতির চাদর। শোবার আগে গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চাদরটা তুলে বার দুয়েক ঝেড়ে বিকাশ চাদরটা গায়ে ছড়ালো। উ, হিঙের গন্ধ বেড়চ্ছে। ভদ্রমহিলার কি যে অভ্যেস! পর্দা,

PATHAGAR.NET

চাদর, বিছানার উদ্বৃত্ত বেড কভারের অংশ, বালিসের ঝালর, শাড়ির পশ্চাদ্দেশে সুযোগ পেলেই খুচুং করে হাত মুছে দেব। কড়াইশুঁটি হিং দিয়ে আলুর দম খাওয়া হয়েছে রাতে। হাত ধোবার পর স্মৃতিটুকু রেখে গেছে চাদরে।

না, একটু ভাবা দরকার? বারণ করা সত্ত্বেও চামচে চামচে চিনি আর কটর মটর সুপারি খাওয়া! ঠিক সাজাই হয়েছে! মবুক যন্ত্রণায়! কিন্তু সারারাত ঘুমোতে দেবে না যে? অনবরত উঁ আঁ করবে। যখন হাঁচি হয় তখন ননস্টপ পঞ্চাশটার কম থামে না। ডেঙ্গুজ্বর হলে চিৎকারে লোক জড় করে ফেলে। এর উপর একাদশী অমাবস্যায় পায়ের গোছে বাতে কামড় আছে। তুমি আর কি বুঝবে বল। গদামগুম থেকে থেকে খাটে পা ছুঁড়বে—ওপর একটু দাঁড়াবে গো? দাঁড়ালে পায়ের কিছু থাকবে। পাঁকাটির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। গদামগুম কি হচ্ছে কি? ওঃ চিবোচ্ছে? অগত্যা? দাও একটু হাত দিয়ে টিপে দাও? চোদ্দ বছরে পুরনো বৌ মাতৃসমা? ভুজঙ্গ ডাক্তারের কম্পাউন্ডারকে ধরে ইনঞ্জাকশান দেওয়াটা শিখতেই হবে দেখছি। তারপর গোটকতক মরফিয়ার অ্যাম্পুয়াল যোগাড় করে রাখতে হবে। বিয়ের ছ'মাস বড় জোড় এক বছর পর্যন্ত বৌয়ের ভিরকুটি সহ্য করা যায়, মন্দ লাগে না। তারপর যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই শান্তি। দাঁতের এখন কি করা যায়? মারো এক ঘুষি। ঝরঝর করে যে কটা ঝরে যায়? চুল ঝরে টাক হয়ে গেছল, পাতা ঝরে গাছ কঙ্কাল হয়ে গেল, বয়েস ঝরে বুড়ো মেরে গেল, মেদ ঝরে মেরুদাঁড়া বেরিয়ে গেল, গোটাকতক দাঁত ঝরে যেতে কি হয়? ঝরলে যে গেরস্তর কল্যাণ হয়। দাঁড়াও দিচ্ছি তোমার দাওয়াই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু না জানলে সংসার করা উচিত নয়। শুধু ডাক্তার রক্ষে নেই, থেরাপি, সার্জারি, গাইনি, ই এন টি, দারা সিং, ক্যাসিয়াস ক্লে, পি সি সরকার, রক ফেলার সব গলিয়ে অ্যালয়ে করে স্বামী ঢালাই করলে তবে যদি এ যুগে বাঁচা যায়।

দোতলায় বিকাশের বাবা থাকেন। বিকাশের ছেলে আর মেয়ে তাঁর কাছেই শোয়। মৃতদার বৃদ্ধ একটু সঙ্গ পান। সারা রাত ঘুমোতে পারেন না। যতক্ষণ নাতি, নাতনি জেগে থাকে সমানে বকর বকর করেন। যেন সমবয়সী তিন বন্ধু। বিকাশ জানে বৃদ্ধ জেগেই আছেন। মৃদু আলো দরজার তলা দিয়ে একটু আভার মতো লাল মেঝের ওপর ঠিকরে এসেছে। দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে ছিটিকানি টানা নেই। বারে বারে বাথরুমে যেতে হয়! শীতকালে একটু বেশিই। বিকাশ দরজা খুলতেই মশারির ভেতর থেকে আপাদমস্তক লেপমুড়ি একটি বসা মূর্তি প্রশ্ন করলেন, কি চাই? সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সব ঠিক আছে। ভেবেছেন ছেলে-মেয়ের খবর নিতে এসেছে। বিকাশ মশারির কাছাকাছি আসতেই লেপের ওপর দিকে একটি দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা মুখ বেরোলো। সুদূর অতীত থেকে বৃদ্ধ নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনন্দে মাথার ওপর লেপ টেনে চারিদিকে বেশ একটা গরম অন্ধকার তৈরি করে অনিদ্রার রুগী সারারাত অতীতের মানুষদের কাছে টেনে আনেন। সেই কলেজের দিন? কেমিস্ট্রির প্রফেসার।

PATHAGAR.NET

ফিজিকসের প্রফেসার দে। হাওড়ার ভাসমান সেতু। ইডেন গার্ডেনের গোরা ব্যান্ড। শিল ভাদুড়ির ফুটবল। আমার দিন তো চলে যায় মা, চলে যায় মা।

কথা না বাড়িয়ে বিকাশ কাজের কথাটা পেড়ে ফেলল—আপনার কার্বলিক অ্যাসিডের শিশিটা একবার দেবেন?

দাঁত কনকন করে? তোমার?

আজ্ঞে না, আপনার বৌমার।

আরতির হাঁটুর ওপর আয়না, পাশে একটা বড় দইয়ের ভাঁড়। অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে তুলো জড়ানো কাঠিটা বিকাশ সাবধানে আরতির হাতে দিয়ে বলল, কুমিরের মতো একখানি হাঁ করে যে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই গোড়ায় টুকটুক করে দু'বার ঠেকিয়ে দাও। সাবধান জিভে বা অন্য কোথাও যেন না লাগে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তারপর ওই ভাঁড়ে বারে বারে থুতু ফেলো।

প্রথমে আরতি বেশ বড় করে হাঁ করল। দেখার মতো হাঁ, অনেকটা তারকা রাক্ষসীর মতো। হাতে ধরা তুলো জড়ানো কাঠিটা মুখের সামনে নিয়েও এলো। বিকাশ ফিলম্ ডিরেকটার মতো নির্দেশ দিল, ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, লাগাও লাগাও। হাঁ বন্ধ হয়ে গেল।—না আমার ভয় করছে।

—ভয়ের কি আছে? বাবা দিনে বার সাতেক করে দেন। যে রোগের যে দাওয়াই। পুড়িয়ে না দিলে কমবে না।

—না বাবা দরকার নেই, তুমি অন্য কিছু দাও।

—অন্য কিছু দাও! বিকাশ ভেংচি কাটলো। অন্য কিছু কি দেবো! যেমন কুকুর তেমন মুগুর। তুমি হাঁ কর, আমি বরং একদা এক বাপের গলায় হাড় ফুটিয়ে ছিল কায়দায় লাগিয়ে দি।

—তা কখনো হয় নাকি! বত্রিশটা দাঁতের কোন দাঁতটায় হচ্ছে তুমি বুঝবে কি করে? নিজের চুলকানি অপরকে দিয়ে চুলকানো। ঠিক হয়? হচ্ছে ওপর পাটির কশের দাঁতে।

—তাহলে এক কাজ করি, ডিশে খানিকটা গ্লিসারিন ঢেলে আনি। মধুর মতো আগে খানিকটা চেটে নাও। জিভে একটা কোটিং পড়ে যাবে। অ্যাসিড লাগলেও পুড়বে না।

—কি যে তোমার অদ্ভুত পরামর্শ! মরছি আমি দাঁতের জ্বালায়, তার ওপর গ্লিসারিন চেটে পেট খারাপ হয়ে মরি আর কি!

—তোমার মতো ভীতু মেয়েমানুষের সংসার করা উচিত হয়নি বুঝলে। ভাল ভাল পুষ্টিকর ওষুধে গ্লিসারিন থাকে জানো। বিয়ারে [illegible] গ্লিসারিন থাকে। বোতল খেয়ে সব ইয়া ভুঁড়ি বাগাচ্ছে।

—কি দরকার বাবা অত অশান্তিতে! তোমার একটা বড়ি দাও না। কোনোরকমে রাতটা কাটাই। তারপর দেখা যাবে কাল সকালে।

—বড়ি থাকলে তো দেবো। সব সময় কি স্টকে থাকে নাকি। একি আলু-পেঁয়াজ

PATHAGAR.NET

চাল-ডাল! অ্যাসিডই এ রোগের একমাত্র দাওয়াই। না পোড়ালে তোমার ঘুমের বারোটা আমারও ঘুমের বারোটা। আরতি আবার হাঁ করে লেপটা মাথা থেকে ঘাড়ের ওপর নেমে এল। একটা হাতও বেরলো। হাতটা তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের টেবিলের দিকে প্রসারিত করে বললো, সোজা চলে যাও, ড্রয়ারটা খোলো, একটা সাদা চাবি পাবে। বিকাশ নির্দেশ পালনের জন্যে এগিয়ে গেল। প্রথমে বাঁ দিকের ড্রয়ারটা খুললো। খুলতেই একগাদা গোল করা ফুলো শিরিষ কাগজ মেঝেতে পড়ে গেল।

উঁহু, উঁহু, ওটা নয়, ও ড্রয়ারটা নয়, ডান দিকেরটা খোল।

বিকাশ নিচু হয়ে শিরিষ কাগজগুলো আবার গোল করে যথাস্থানে ঢোকালো। মাঝে মাঝে সারারাত বৃদ্ধ শিরিষ কাগজ দিয়ে দরজা ঘষেন। চার বছর ধরে চলেছে। ঘুমোতে যখন পারি না তখন ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে বিছানায় না পড়ে থেকে সংসারের খরচ বাঁচাই। চার বছরেও কাঠের গ্রেন তেমন মসৃণ হয়নি। রং লাগবে কি? লাগালেই হল? রঙ তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। ঘষাটাই আসল। আজ্ঞে কয়েক টিং রং সব শুকিয়ে যাবে কোথায়? স৺টভেন্ট দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ডান দিকের ড্রয়ারে ছুরি, কাঁচি, গজাল, পেরেক, বাটালি, প্লায়ার।

—পেয়েছিস না যাবো? আরে সামনেই তো আছে, একেবারে ওপরে, না পেলে বল।

এই ড্রয়ারেই আছে যখন পাবো নিশ্চয়ই। আশাবাদী বিকাশ হতাশ না হয়ে হাতের আঙুল বাঁচিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল। বাবার রাখা তো সহজে কি পাবো?

—পেলি না? কি আশ্চর্য! যে জায়গায় আছে অন্ধও খুঁজে পাবে। চোখ বুঁজিয়ে হাত দে তো। বিকাশ গুনগুন করে গান গাওয়ার সুরে বললে, পাচ্ছি না তো, পাচ্ছি না, গেল কোথায়, কোথায় গেল?

বিকাশের বাবা নেমে এলেন, সর দেখি। হাতড়ালেন কিছুক্ষণ। আশ্চর্য! গেল কোথায়? এদের জন্যে আর কিছু রাখা যায় না, গেছে। দূর করে কোথায় ফেলে দিয়েছে। এই গুচোচ্ছি, এই সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। বিকাশের ছেলে আর মেয়ের উদ্দেশ্যে চোখা চোখা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে বৃদ্ধের হঠাৎ কি খেয়াল হল, দাঁড়া দেখি? বিছানায় চলে গেলেন। মাথার বালিশ উল্টে বললেন, হিয়ার ইউ আর, আই অ্যাম সরি। মশারির ভেতর থেকে চাবিটা বের করতে করতে নাতিকে আদর হল—হুনোটা। একটু আগের গালাগালিটা আদর দিয়ে পাল্লা সমান করলেন।

বিকাশকে চাবিটা দিলো। বাক্সোটা খোলা, উত্তরের দেয়ালে টুলের উপর রংচটা লোহার ক্যাশ বাক্স। খুলেছিস?—আজ্ঞে হ্যাঁ। ডানদিকের খোপের খামটা তোল। নীল ফিতে বাঁধা আর একটা চাবি পাবি। পেয়েছিস্! আজ্ঞে হ্যাঁ,—নিয়ে আয়।

বিকাশ চাবি হাতে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইল। উত্তরের ঘরের তালা খুলে

আলমারির মাথায় আর একটা সাদা চাবি পাবে। আলমারিটা খুললেই একেবারে নিচের তাকের বাঁদিকে কাঁচের স্টপার লাগানো একটা শিশি পাবে।

আলমারির মাথায় একসার বই দাঁড় করানো। একটা দাড়ি কামাবার টাকপড়া বুরুশ, গোটাকতক ওষুধ আর সাবানের বাক্সো, হরলিকসের শিশিতে চিনি, একটা দূরবীন। যাক চাবিটা পেয়েছে। শিশিটাও সহজে পেল। শোনো, জাস্ট একটু টাচ করে দেবো। জিভে যেন না লাগে, সঙ্গে সঙ্গে ফোসকা হয়ে যাবে। থুতু ফেলে দিতে বলবে। ওঃ। দাঁতের ব্যথা সাংঘাতিক ব্যথা...দন্তশূল পিত্তশূল। সব শূলের ক্যাটিগরি।

বিকাশ শিশি হাতে নেমে এল। বেশ সুন্দর শিশিটা। মেট্রো প্যার্টানের ছিপি। প্রায় আধশিশির মতো অ্যাসিড। আরতি লেপ মুড়ি দিয়ে ডানপাশে কাত হয়ে বাবারে মারে করছে।

—ওঠো। দাঁতের যন্ত্রণার যম এনেছি। ওঠো লাগিয়ে দি।

—কি জিনিস?

—ওঠোই না। সরু কাঠিতে একটু তুলো জড়াও।

—তুলো এনেছো?

নিচে নেই।

—নীচে তুলো কোথায়? তুলো তো ওনার কাছে।

—আবার যেতে হবে? বেশ মানুষকে বারে বারে বিরক্ত করা।

আরতি উঠে বসেছে। বিকাশ জোর আলোটা জ্বালল। দাঁড়াও তুলো নিচেই আছে। আমার মাথার বালিশে একটা ফুটো আছে। আঙুল ঢোকালেই তুলো আসবে।

—কি যে বল। শিমুল তুলোয় হয় না কি? আর ফুটো তোমাকে বড় করতে দিচ্ছে কে?

বিকাশ আবার ওপরে উঠলো, একটু তুলো।

আবার সেই এক প্রক্রিয়া। ডানের ড্রয়ারে চাবি। সেই চাবি দিয়ে, উত্তরের ঘরের চাবি, আলমারির মাথা। সব্বার ওপরের তাকে একসার বইয়ের পেছনে একটা ছোট বাক্সো। সেই বাক্সে তুলো।

হাতটা জিভের কাছাকাছি নিয়ে গেল। রেডি ওয়ান টু থ্রি লাগাও।

—ভয় করছে। আরতি প্রায় জলভরা চোখে বিকাশের দিকে অসহায়ের মতো তাকালো।

—দাঁড়াও। তবে একটা বুদ্ধি এসেছে। আমার কাছে লম্বা একটা খাম আছে প্রায় তোমার জিভের মাপে। মা কালীর মতো জিভটা বার কর, পরিয়ে দি, খানিকটা প্রোটেকশান হবে।

বিকাশ সত্যি একটা সরু লম্বা খাম নিয়ে এল। ছেলের জন্যে ছবি আঁকার তুলি কিনেছে; সেই সময় খামটা এসেছিল। ডগার দিকটা সহজে ঢুকলো। আগে গেল

জিহ্বামূলে। তা যাকগে। মানুষের অবাধ্য অবোধ জিভ সাধারণত ডগা খেলিয়েই সব কিছুর স্বাদ-বিস্বাদ পেতে চায়। ডগা দিয়েই ছোবল মারতে চায়। সেইটাকেই যখন খাপে পোরা গেছে, আর ভাবনা কি!—নাও লাগাও। টুকটুক করে বারকতক ঠেকিয়ে দাও। ওঁ শান্তি।

আরতি যতটা ভীষণ কাণ্ড ভেবেছিল, ততটা হল না। খুব খানিকটা লালা বেরোলো। সারা মুখে অদ্ভুত একটা লাইফবয় লাইফবয় গন্ধ। সেই চিড়িক ধরানো মাথা ঝন ঝন করা অদ্ভুত মিনমিনে ব্যথাটা সত্যিই যেন একটু কমে গেল।

ঘরে আবার নীল আলো জ্বলে উঠলো।

পুবের জানালায় কাঁচের মাথায় শুকতারা দেখা দিয়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মতো রাত একটু করে দিনের দিকে ঘুরে চলেছে। একটু পরেই আলমবাজারের চটকলের গম্ভীর ভোঁ বেজে উঠবে। পাশের চায়ের দোকানে কেটলি, চামচে নাড়ার শব্দ উঠবে। সামনের রাস্তায় মানসবাবার ব্রংকাইটিসের ভীষণ কাশি শোনা যাবে। লেপের তলায় বিকাশের পায়ে নিজের পা কাঁচি করে আরতি বললে, ভোরে আর আমায় ডেকো না, চাটা তুমিই করে খেয়ে ফেলো।

বিকাশ কোনো উত্তর দিল না, সে তখন অন্য জগতে। ফড়ুত ফড়ুত করে তার নাক ডাকছে।

PATHAGAR.NET

অ্যালার্মের শব্দে বিকাশ ধড়মড় করে উঠে বসল। সেকেন্ড খানেকের মধ্যেই ঘুমের ঘোর কেটে গিয়ে মনে পড়ল গতরাতের ঘটনা। ভাগ্যিস অ্যালার্মটা দিয়ে রেখেছিলাম! তাই তো ঘুম ভাঙলো। উনি তো পরে পরে আটটা অব্দি ঘুমোবেন। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, দাঁতের যন্ত্রণায়। চায়ের জলটা তুমিও চাপাও প্লিজ। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনই যদি চা করে খেতে হয় তাহলে বিয়ে করেছিলাম কি কারণে! এই তো আমি বিকাশ চন্দ্র—ঝড় হোক, জল হোক, অসুখ হোক, যাই হোক অফিস তো বাবা যেতেই হয়। ফোর্টিন ডেজ ক্যাজয়োল লিভ, চোদ্দ দিনে একদিন অনার্ড লিভ। আর বাজার! শীত একদিন অন্তর। গ্রীষ্ম বর্ষা রোজ? আর রোজ মাছ খেতে চাইলে এভরি-ডে। তখন তো নাকি সুরে বলা যাবে না, আমি আঁজ বাঁজার যেতে পারছি না। অ্যাই ওঠো, উঠো। সরে শুচ্ছো কি! ছটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেড়িয়েও পড়তে হবে। অফিসের গাড়ি আসবে। আরতির সাড়াশব্দ না পেয়ে লেপের একটা কোণ ধরে জলছবির মতো ওঠালো। যাঃ তেরিকা। এটা তো সেই ম্যাগনাম বালিসটা। বাঃ বেড়ে কায়দা! ছেলে ঠকানো কারবারে? শিশুকে স্তন্যপান করাতে করাতে একটু ঘুম এলেই মায়েরা এই ভেবে পাশে, পাশবালিস শুইয়ে কেটে পড়ে। গেল কোথায় সাত সকালে? দাঁতের যন্ত্রণায় সুইসাইড করেনি তো। চটি গলিয়ে লটর ফটর করতে করতে বিকাশ ঘরের বাইরে গেল।

দেখেছো এই শীতে শুধু একটা চাদর জড়িয়ে বাইরের সোফায় জড়োসড়ো হয়ে

বসে আছে। সামনে খালি কাপ। চা করে একলা একলা খাওয়া হয়েছে। হায় প্রেম! এইভাবে ড্রাই হয়ে গেলে! বিকাশ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পা দুটো গাড়ু করে আরতি বদনার মতো বসে আছে! ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা স্নো-বল চন্দ্রমল্লিকার মতো ভাঙচুর হয়ে আছে। কি গো! এখানে এইভাবে বসে! অ্যাই! চিৎকার করেই বিকাশের মনে হল সকালেই দু' ছেলের মার সঙ্গে এতটা জোর গলায় সোহাগ করা চলে না। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, অ্যাই।

দুটো হাঁটুর মাঝখান থেকে আরতির মুখটা উঠে এল। ওরে বাবারে! এ কার মুখ! বিকাশের স্ত্রীর! না রাবণের! তেবাঁকা শাঁকালু। ডানপাশটা ফুলে ডিমের মতো মুরগি বা হাঁস নয়, একেবারে রাজহাঁসের ডিম যে গো! কি করে করলে? একরাতেই এতটা বড়। যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আরতির চোখের কোল বেয়ে বেশ বড় সাইজের মুক্তোর দানার মতো এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল! এখন কি হবে? উত্তরে আরতি একটা হাত ওপরে তুললো। ঈশ্বর জানেন কি হবে? মুখ দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। সমগ্র মুখগহ্বরে বিশাল একটি আব্ভা।

এ বস্তুকে সামলানো বিকাশের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে, সেলফ্ মেডিকেশান আর চলবে না। চা করতে করতে বিকাশের মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল, জামগাছের ছাল পুড়িয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগালে উপকার হয়। এও পড়েছিল, একবার ঠাণ্ডা জল একবার গরম জলে পালা করে কুলি করলে, কিছু একটা হয়। কিন্তু যেরকম ফুলেছে তাতে তো কোনো টোটকাই চলবে না। সারাদিন বেচারা খাবেই বা কি! মহা মুশকিল। ওই শরীর নিয়ে রাঁধবেই বা কি করে! অদ্য হরিবাসর। আমাদের তো এখুনি বেরোতে হবে।

PATHAGAR.NET

আরতির সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, রান্নাবান্নার কি হবে? আড়চোখে চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে আরতি ঠোঁট ফাঁক না করে যা বলল তা অনেকটা এইরকম শোনালো, 'উমা ববে। বো বকমে। বো বকমে।'

বাবা! এ আবার কি ভাষা! বিকাশ তাড়াতাড়ি একটা স্লিপপ্যাড আর পেনসিল এগিয়ে দিল। প্লিজ বাংলা অথবা ইংরাজিতে লিখে দাও।

আরতি খুব বিরক্ত মুখে লিখলো, 'কোনো রকমে হবে।'

তুমি কি খাবে?

আরতি লিখলে, জল পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না, গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়। অতএব উপোস।

যাঃ তা কখনো হয়! কিছু একটা খেতেই হবে। সারাদিন উপবাস করে থাকবে কি?

আরতি একটু হাসল। বিকাশ অবাক হয়ে দেখল, মুখটা ঠিক যেন ন্যাকড়ায় জড়ানো একতাল ডালভাতে।

আচ্ছা! বেশ পাতলা করে খিচুড়ি খেলে কেমন হয়?

উত্তরে আরতি এমনভাবে মাথা নাড়ল বিকাশ যেন বিষ খেতে বলছে।

তাহলে দুধ দিয়ে সুজি ফুটিয়ে খেলে কেমন হয়?

বিকাশ বেশ বুঝলো আরতি মুখ বাঁকালো! তবে মুখটা এমনিই তেড়াবেঁকা হয়ে আছে বলে বোঝা গেল না। না, বিকাশের আর কথা বলার সময় নেই। অন্যদিনের চেয়ে অন্তত দু' ঘণ্টা আগে বেরোতে হবে। আজ আবার লোডশেডিং-এর নির্ঘণ্ট। অমনি ফচাত্ করে পাওয়ার চলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কলের মোটা জলের ধারা মূত্রধারা হয়ে অশ্রুধারা হয়ে যাবে। দৌড়ে একবার দোকানে যেতে হবে সুজি, রতনের দুধ, দুটো বড় নরমপাক ব্যবস্থা করে দিয়ে না গেলে, পরে ঝগড়াঝাটির সময় খোঁটা খেতে হবে। বৌদের ওপর তো বিশ্বাস কি নির্ভরতা কোনোটাই রাখা চলে না। কুকুরের বদমেজাজের মতো। মাথায় হাত বুলোচ্ছে, পটাপট লেজ নাড়ছে। পরক্ষণেই কি হল খ্যাঁক করে কামড়ে দিল। এই গলায় গলায় এই আদায় কাঁচকলায়।

রতনের দোকানে দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে বিকাশের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে রতনের মার কাছে অব্যর্থ দাঁতের মাদুলি আছে বলে শুনেছি। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না। মোষের মতো মুসমুসে রতন বড় হাতা উঁচু গলা উলিকট গেঞ্জি পরে বিশাল একটা ব্যারেল থেকে অ্যালুমনিয়ামের মগ ডুবিয়ে ডুবিয়ে ক্রেতাদের ঘটিতে বাটিতে গেলাসে ক্যানে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ ঢালায় ভীষণ ব্যস্ত। দুধ আবার দু'রকমের, গরু, মোষ; এখন কি আর মাদুলির কথা জিজ্ঞেস করা যাবে? বিকেল! বিকেলেও দুধ। গভীর রাতে; তখন আবার ছানায় জাঁক। দুপুরে! দুপুরে নাক ডাকিয়ে মোষের মতো ঘুম। রতনের গায়ে গতরে সোনা মোড়া আহ্লাদী বৌয়ের নিশ্চয়ই দাঁতের যন্ত্রণা হয় না। কি করে হবে! দেবতা হাতের মুঠোয়। কি সুখের জীবন! লেখাপড়া শিখলেই মানুষের মতো অশান্তি যত দুঃখ। লেখাপড়া করিবে মরিবে দুঃখে।

বিকাশের পাত্রে দুধ ঢালছে রতন। রতনের মুখে বিকাশ কখনও হাসি দেখেনি। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের মতো। বিকাশ একগাল হাসল। যদি রতন হাসে, তাহলে মাদুলির কথাটা পাড়বে। সেই মুখই নয়! সব সময় একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব। পয়সা হলে যা হয়। জল বেচে পাঁচতলা বাড়ি-গাড়ি। দোকানে ফোন, টি.ভি! ফ্রিজ। তবু বিকাশ তাক করে কথাটা ছুঁড়লো—শুনেছি আপনার মার কাছে দাঁতের মাদুলি পাওয়া যায়।

হ্যাঁ যায়! বিকাশকে হাতের ঝটকায় লাইনচ্যুত করে, পরবর্তী খদ্দেরকে পোজিশন এনে রতন বলল, এখন পাওয়া যাবে না।

কেন স্যার! বিকাশ স্যার বলে সম্বোধন করে ফেলে নিজেকেই নিজে গালাগাল দিল। ব্যক্তিত্বর অভাব। তেমন ব্যক্তিত্ব থাকলে এক ধমকে বৌয়ের দাঁত ব্যথা ভাল করে দেওয়া যায়। আগের যুগের মেয়েদের অসুখ করলে টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল কি? রতন দুধ দিতে দিতেই বললে, মা তীর্থে করতে গেছেন। একমাস পরে ফিরবেন।

PATHAGAR.NET

হয়ে গেল! এক মাস তো ওই ফোলা মুখ ঝুলিয়ে রাখা যায় না। নিজের দাঁত হলে কথা ছিল না। এ বাবা বৌয়ের মুখ। ফোলা মুখ যেই চুপসে যাবে অমনি ছুটবে বাক্যবাণ। কোরামিনের বাবা। মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করে হরিমুদির লাটে ওঠা দোকানের রকে গিয়ে বসবে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বিচিত্র জগৎ সংসারের দিকে। কি হয়েছে দাদা! দাদা বোবা! গৃহিণী ঝেঁটিয়ে শুধু কর্তাকেই বের করেননি, মগজটিকেও ধোলাই করে দিয়েছেন। একেবারে ভ্যাকুয়াম।

এক হাতে সুজি অন্য হাতে দুধ নিয়ে বিকাশ ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ঢুকলো। এখুনি দৌড়তে হবে এয়ারপোর্টে। তাহলে তুমি একটু সুজির পায়েস করে ঠোঁট দুটোকে তর্কচঞ্চুর মতো করে স্টেনলেস স্টিলের চামচে দিয়ে আস্তে আস্তে টাগরায় ফেলে স্টমাকের দিকে ম্যানেজ করে নিও। মুখ বাঁকালে কেন? তোমার মুখের ওই ছিরি দেখলে গা হিম হয়ে যায়। কি করবে বল। কটা দিন একটু কষ্ট কর। তারপর আবার গরগরে মাছের ঝাল, ঝরঝরে ভাত, ডাঁটা—কটাস-কটাস সুপুরি। আপাতত দাঁতের হলিডে।

বিকাশ বেরোতে গিয়ে ফিরে এল। সুজির পায়েস করতে জানো তো! তুমি তো এই চৌদ্দ বছরে তিনটে জিনিসই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে গেলে, ভাত, চেয়ে থাকা আর মাছের তেল গড়ানো সরষে ঝাল; সেই এক কনসার্ট। শুকনো কড়ায় সুজিটাকে একটু নেড়ে লাল লাল করে দুধে ফেলে ফোটাবে, পাতলা থাকতেই নামাবে, ঈষদুষ্ণ পেটে চালান করবে। ফিরে আসি তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

একটু সেঁক দিয়ে দেখতে পারো। মুখে মাফলার জড়াও। ও হ্যাঁ। বিকাশ আবার ফিরে এল। একটা ছোট এলাচ, গোটা দুই তেজপাতা দিও।

বিকাশ একটু বেলাবেলি ফিরে এল। হাতে কাগজে মোড়া ছোটো একটা কৌটা। দরজার সামনে এটা আবার কার চটি! গোড়ালিটা খয়ে খয়ে গেছে। স্ট্র্যাপে সোনালি রঙ লাগানো ছিল যৌবন বয়সে। প্রৌঢ়ত্বে দাঁত বেরিয়ে গেছে। কোন মাল আবার এলেন? বিকাশ ভাবতে ভাবতে দরজা ঠেলল। ঠেলতেই খুলে গেল। ওরে বাবা! শোবার ঘরে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন সেই জাঁদরেল মহিলা। ঘটিহাতা উলিকট ব্লাউজ। ধবধবে সাদা ফিতে পাড় শাড়ি। ঘিয়ে রঙের শাল সূঁচের কাজ করা। শাশুড়ি খুব একটা দূরে থাকেন না। মাঝে মাঝেই মেয়ের খবরাদারি করতে আসেন। জামাই কেমন রেখেছে মেয়েকে দেখতে হবে না! প্রায়ই ভদ্রমহিলা বলেন, তুই যদি না পারিস বল, আমি বলছি জামাইকে। বিকাশের কেল্লা একা কুম্ভ নয়, কুম্ভ আর কুম্ভি দু'জনে রক্ষা করছেন।

বিকাশকে দেখে মহিলা মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিলেন। ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপায় কাপড়টা আটকে রইল। একটু আগেই বোধহয় মুখে জর্দা পান ঠুসেছিলেন। রোমন্থন চলেছে। ইদানীং একটু মোটা হয়েছেন। বিকাশ লক্ষ্য করেছে, বিধবারা যেন

PATHAGAR.NET

একটু মোটাই হন। স্বামীদের খপ্পর থেকে বেরোতে পারলেই মুক্তির আনন্দে স্বাস্থ্য ফিরে যায়।

কেমন আছেন? বিকাশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

ওই এক রকম আছি, কে আর আমার খবর রাখছে বল! উত্তরে বিকাশ হে হে করে একটু হাসল। সব অভিযোগের উত্তর বিকাশ এইভাবেই সহজ সরল করে নিয়েছে। খাটের বাহুতে পিঠ রেখে আরতি বসে আছে। নীল গরম চাদরের ঘোমটা। মুখটা রূপকথার ডাইনির মতো। ঘটের ওপর ওলটানো ডাব। তলার দিকটা ফুলো। মাথার দিকটা সরু। কেমন আছে? আছো না বলে বিকাশ আছে বলল। স্বাভাবিক আরতির হাজার ল্যাঠা। এখন একমাত্র খবর দাঁত। দাঁত কেমন আছেন?

মা যখন রয়েছেন, গর্ভধারিণী, তখন মেয়ে কেন জবাব দেবে! আরতির মা বললেন, তোমার বাবা দোষ আছে। সংসারে কোনো ব্যাপারে তোমার তেমন গা নেই। এসব কি ফেলে রাখার জিনিস? সেপটিক হয়ে গেছে! গত বছর নন্দা এইভাবেই গেছে। ডাক্তার-বদ্যি কেউ কিছু করতে পারল না। মুখ ফুলছে, ক্রমশ ফুলচে, এই এতখানি, বাতাবি লেবু। ব্যাস্ সেই ফোলাই কাল-ফোলা।

কে নন্দা, কোথাকার নন্দা, গড নোজ। ওনার স্টকে এইরকম বহু মাল আছে। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। বিকাশ কেবল অনুমান করার চেষ্টা করল নন্দার মুখটা ফুলে তার স্ত্রীর মার মতো হয়ে উঠেছিল, না আরো বেশি। বিকাশ বললো, চলো তাহলে, ডাক্তার মিত্রের কাছে। নাও, রেডি হয়ে নাও। আমি রেডি, জামা-কাপড় আর ছাড়বো না।

বিকাশ হাতের মোড়কটা আয়নার তলায় ছোট ব্র্যাকেটে রাখতে রাখতে বললে, এনেছি মোক্ষম জিনিস। দাঁতের যম। দেহ যাবে তবু দাঁত যাবে না। শিকড় পর্যন্ত শক্ত বটের ঝুড়ি নামিয়ে দেবে।

কি জিনিস! আরতির মার কৌতূহল।

গুড়াখু। অভ্যেস করতে পারলে এর চেয়ে ভাল মাজন অর কিছু নেই। আমাদের পঞ্চার প্রেসক্রিপসান। আরতির মা নন্দাকে ছেড়েছিলেন, বিকাশ পঞ্চুকে ঝেড়ে কিস্তি মাত করে দিলে।

ওঃ বাবা সাংঘাতিক জিনিস। খবরদার তুই যেন ভুলেও ব্যবহার করিসনি! মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়বি আর মরবি; তোর আবার লো-প্রেসার। মা মেয়েকে এমনভাবে শাসন করলেন, জামাই যেন মারবার প্ল্যান করছে।

নিত্য বিষ খেয়ে লোকে বেঁচে আছে, বংশ বৃদ্ধি করছে। কৌটা কৌটা জর্দা ফাঁক করে নিজে তোফা আছেন। সামান্য দোক্তার মাজনে ওনার মেয়ে উল্টে পড়বেন! নিজের গর্ভ সম্পর্কে কি ধারণা! কথা না বাড়িয়ে আরতিকে তাড়া লাগালো।

খানকতক গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভেজে দি, সুজির পায়েস দিয়ে খাও। এতটা রাস্তা

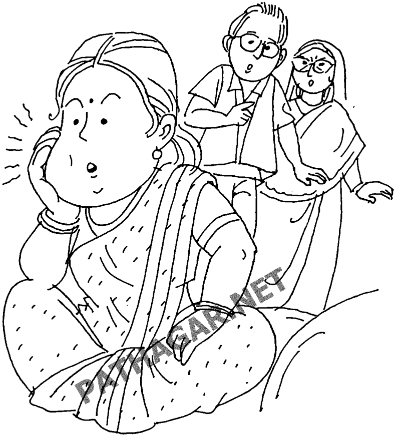
PATHAGAR.NET

যাবে। আরতি মার তোয়াজের জন্য খাট থেকে নেমে এল। তুমি বরং একটু ময়দা ঠেসে দাও। আমি ঠাসতে গেলে শিরে চাপ পড়ে দাঁতটা হু হু করে উঠবে।

ওসব করতে গেলে ডাক্তারকে আর ধরতে পারবো না। বিকাশ লুচির হাত থেকে বাঁচতে চাইল। না না, আগে ডাক্তার। আরতির মা খুঁত খুঁত করে বললেন, তাহলে একটু সুজি আর চা খাও না।

তাই দে! কিছু না খেলেও চলে। বেলায় খেয়েচি। শরীরটা টিস টিস করছে। মহিলা বিশাল একটা হাই তুললেন। বিকাশের বিশ্বরূপ দর্শন হল! গজালের মতো সারি সারি দাঁত। পান-দোক্তার রসে পাকা বাঁশের মতো চেহারা।

আমি চা করি তুমি বরং মাকে সুজিটা দাও। তুমিও একটু নাও! আজ রাতে অন্য কিছু নেই। সব সুজি। হোল ফ্যামিলি সুজি।

ভালই হয়েছে সুজি নাইট। সকলেরই দাঁতের গোঁড়া ফুলেছে বলে ধরে নেওয়া যাক।

বিশাল ডেকচিতে সুজির পায়েস। রতনের খাঁটি দুধ ওপরে লোভনীয় সরের আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। একটি তেজপাতা মুখ থুবড়ে পেছন উল্টে পড়ে আছে। 'আরকটিক' সাগরে পেঙ্গুইন যেন মাছ খুঁজছে গিয়ে সেই ডুব মারতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে জল জমে বরফ! পাশ থেকে এক চামচ কেটে তুলে নিয়ে বিকাশ আলগোছে মুখে ফেলল। বাপ্‌স কি মিষ্টি! মহিলা গত জন্মে বোধহয় ডেও পিঁপড়ে ছিলেন, এ জন্মে কাঠপিঁপড়ে? আরতির মা চা খেতে খেতে মেয়েকে বললেন, আমিও যাব নাকি তোর সঙ্গে?

জামাইকে যেন বিশ্বাস নেই। কোথায় কোন হাতুড়ে-টাতুড়ের কাছে নিয়ে যাবে। নিজের চোখে চেম্বার আর 'ফির' অঙ্কটা দেখতে পেলে তবু একটু স্বস্তি। না জামাইয়ের বেশ কিছু খসল। মেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, না আর তার দরকার নেই! এতটা রাস্তা তোমাকে আবার যেতে হবে।

সাধে তোমাকে বলি বিকাশ, চায়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রমহিলা বিকাশকে বললেন, সাধে তোমাকে বলি, মেয়ের আমার অনেক ফাঁড়া। সেই ছেলেবেলায় কি করেছিল জানো। লুকোচুরি খেলছে মেয়ে। ভীষণ আদুরে ছিল তো! ওই মেয়ে আসতেই তো কত্তার বরাত ফিরলো। বাড়িতেই খেলছে। অত বড় বাড়ি! কে আর খেয়ালে রেখেছে। রাতে খেতে বসে কত্তার খেয়াল হয়েছে। মেয়ে কোথায়? মাছের ডিম খাবে। পার্শে মাছের এক জোড়া ডিম পাতের পাশে আলাদা করা আছে। খোঁজ খোঁজ। কোথায় মেয়ে, কোথায় মেয়ে? কোথাও নেই। ওমা সে কি রে! কি সব্বনেশে ব্যাপার! দেখ কোথা গেল। কত্তার খাওয়া মাথায় উঠলো। তুমি থাম তো বাপু। আরতি বোধ হয় মার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালো। মেয়েকে ধমক দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার শুরু করলেন।

বাড়ি তোলপাড়। কত্তা বললেন, পুলিশ ডাক। জেলে এনে সবকটা পুকুরে জাল ফেল। এদিকে ন-গিন্নীর প্যানপ্যান মেয়েটা সন্ধ্যে থেকে কচ্ছে কি, দেখে যাও মা এই সিন্দুকে কি আছে। তুই থাম তো বাপু, খালি একটা কতকালের সিন্দুক তার মধ্যে আবার কি থাকবে। গুচ্ছের আরশোলা। কেবলই বলে, দেখো না খুলে, দিদি আছে। শেষে কত্তা বিরক্ত হয়ে বললেন, খুলে একবার দেখিয়ে দে তো মেয়েটাকে। একটা অন্তত শান্তি হোক। ঠাকুরপো সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললে, দ্যাখ। দেখে যাও কি আছে। ডালাটা খুলেই চিৎকার। ওমা! এই তো মেয়ে। কত্তা সাবধান করছেন, হাত দিও না, আর এগিও না। এ মার্ডার কেস। আঙুলের ছাপ পড়বে। অজ্ঞাত শত্রুর কাজ। আগে পুলিশ আসুক। রাখো তোমার পুলিশ। আমার কম সাহস! সোজা গিয়ে মেয়ের নাকের কাছে হাত। দিব্যি নিঃশ্বাস পড়ছে। আরতি, এই আরতি। মেয়ে ঘুমোচ্ছে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। শেষে কি ব্যাপার! না মেয়ে লুকিয়েছে, আমাদের পিলে চমকে যায়।

PATHAGAR.NET

কত্তা বললেন, এ মুদিনীর ওপর যায়।

মুদিনীটা কে? বিকাশ প্রশ্ন না করে পারল না।

ওই যে, সেই সময় এক যাদুকর বেরিয়েছিল। সিন্দুকের খেলা দেখাতো।

ও হুর্ডুনী।

—ওই হোল, হুডিনী না মুদিনী।

বিকাশ আড়চোখে বৌকে একবার দেখে নিল। এমন মূল্যবান বস্তু চিরকাল সিন্দুকে থাকলেই তো ভাল হোত। কি দরকার ছিল, ধূলার এ ধরণীতে সংসারের পাদানীতে।

ডেন্টিস্ট বললেন, সাংঘাতিক করে এনেছেন। এ তো শুধু দাঁত নয়, সেপটিক হয়ে গেছে। কি করেছিলেন? পিন, সেপটিপিন দিয়ে খোঁচাখুঁচি? আরতি একটু ভেবে বললে, সেপটিপিন।

সর্বনাশ! সবার আগে টিটেনাস টক্সয়েড তারপর চড়া ডোজে অ্যান্টিবায়োটিকস্। ফুলো সাবসাইড করুক, তারপর একসট্র্যাকশনের কথা ভাবা যাবে।

আপনি মশাই বাড়ি থেকে আলপিন, সেপটিপিন, মাথার কাঁটা সব বিদেয় করুন। মেয়েদের খোঁচা মারা রোগ জীবনে যাবে না।

ষোল টাকা ডাক্তারের হাতে ঝেড়ে দিয়ে আরো গোটা ষোল টাকা ওষুধে গচ্চা দিয়ে, খোঁচামারা বৌ নিয়ে বিকাশ বাড়ি ফিরে এল। রাতে দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হল না, এই বয়েসে স্ত্রীবিয়োগ হলে, দ্বিতীয়বার তো আর পিঁড়িতে বসতে পারবে না। তখন একটা ছেলে, একটা মেয়ে নিয়ে করবে কি! মাঝরাতে লেপটা সরিয়ে আরতির মুখটা আবছা আলোয় একবার দেখল। ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস। ফুলোটা একটু কমছে কি? দুটো ট্যাবলেট তো পড়েছে। বিকাশ আবার শুয়ে পড়ল। যেমন করেই হোক টাকার জোগাড় করে দাঁতগুলো ঠিক করে দিতে হবে। বাবা তবু সকাল-সন্ধে ব্রাশ করে, কার্বলিক দিয়ে, ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন। রক্ত হাই সুগার। সহজে ছানি সারানো কি দাঁত নড়ানো চলবে না। বৌয়েরটাই প্রায়রিটি। দাঁত তোলার আগে ব্লাড, ইউরিন, দাঁতের এক্সরে সবকিছু করাতে হবে। একগাদা খরচ, তা হোক তারপর তোলালেই তো হবে না। ফোকলা করে ফেলে রাখা যায় না। বাঁধাতে হবে। সেও এক ঝামেলা।

সকালে মনে হল, ফোলাটা একটু কমেছে। যাক বাবা। এ যাত্রা রক্ষে পেল।

বিকাশ মনে মনে হিসেবটা ঝালিয়ে নিল—এক একটা দাঁতের পেছনে বত্রিশ টাকা করে, বত্রিশ ইনটু বত্রিশ। তারপর বাঁধানো, আরো হাজার। দু' হাজার টাকার ধাক্কা! কে জানতো বৌয়ের দাঁত এত মূল্যবান? সামনের বার বিয়ে করতে হলে টুথলেস মহিলা বিয়ে করবে। কাবুলের সিডলসে খেজুর কি দক্ষিণের স্টেনলস্ আঙুরের মতো দন্তহীন স্ত্রী। একমাত্র দেঁতো হাতির কথা চিন্তা করা যায়। শ্বশুর মহাশয়ের দেঁতো মেয়ে মহা জ্বালা। প্রথম জীবনে দাঁত খিচিয়ে। শেষ জীবনে প্রভিডেন্ট ফান্ড ধরে টানাটানি করে।

তিন মাসের মধ্যেই আরতির সব দাঁত একটা দুটো করে উৎপাটিত হয়ে গেল।

PATHAGAR.NET

ভাটপাড়ায় ভাস্বতী বলেছিল, থার্টিটু অল আউট। দাঁত বের করে আর হাসতে হচ্ছে না! সব গেটআউট। মুখটা তেবড়ে গেল। বয়েস এক লাফে বেড়ে গেল কুড়ি। মাড়ির ওপর পরম যত্নে ডেন্টিস্ট সাজিয়ে দিলেন নকল দাঁত, সবচেয়ে দামী দাঁত। আরতির মা আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, দাঁত হল মুখের শোভা। কৃপণতা কোরো না বাবা! ঘুরবে ফিরবে ফিক্ করে হাসবে।

বিকাশ বলল, দেখি মুখটা একেবারে তোলো। ঘরে আর কেউ নেই তাই সাহস করে বলতে পারল।

বহু সাধ্যসাধনায় আরতি লাজুক মুখে এমন চোখে তাকাল, বিকাশের মনে হল নতুন করে শুভদৃষ্টি হচ্ছে। চোখে সেই রাতের ধারালো দৃষ্টি না থাকলেও একটা স্বচ্ছ গভীরতা আছে। দু' সন্তানের জননীর চোখে সেই দুষ্টুমি নেই, বৌয়ের চোখে মার চোখ। শোবার আগে আরতি দাঁত দু'পাটি খুলে জলের বাটিতে ডোবাতে যাচ্ছিল। বিকাশ বললে, রাতের এই তো সবে ভরা যৌবনে, এরমধ্যে ফোকলা হবে! তোমার মুখটা মাইরি এরকম পালটে গেছে! আগের চেয়ে ভাল হয়ে গেছে। চল কাল একটা ছবি তুলে আসি। আবার ছবি। আরতি হাসতে গিয়ে সামলে নিল। নতুন দাঁত। এখনো অভ্যাস হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে। মনে নেই ওই ছবিটা তোলার সময় কি কাণ্ড হয়েছিল।

তা হয়েছিল। তখন প্রেমের ভাঁটা চলছিল। এখন দাঁতের ঝিলিকে আবার জোয়ার এসেছে। তোমাকে ভালবাসতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। মাইরি। তোমার হাসিতে আমার টাকার চেকনাই লেগেছে।

বিকাশ আরতির কোমরটা ধরে কাছে টেনে নিল। একমুঠো কোমর আর নেই, একটু চর্বি জমেছে। তাহলেও চোদ্দ বছর পেছিয়ে যেতে খারাপ লাগল না। কানের কাছটা তোমার হাজার টাকার দাঁত দিয়ে সেই, সেই প্রথম রাতের মতো একটু কুটকুট ইঁদুর কামড় দাও না।

আহা কি আব্দার। তারপর যাক আর কি ভেঙে। মনে নেই ডাক্তারবাবু কি বলেছেন! ডেলা ভেলিগুড়, আমের আঁটি, ছোলা ভাজা, চকোলেট বার, শাঁক আলু এসব নকল দাঁতে চলবে না।

আমার কানটা তোমার লিস্টে নেই। একটা রিকোয়েস্ট রাখো না গো। তোমার জন্যে এত করলুম। দংশনে বিকাশ সে আনন্দ পেল না। তেমন ধার নেই। ভসকা পেঁপের মতো স্বাদ। নকল দাঁতে আর যেই হোক, লাভবাইট তেমন জমে না। দাঁত ওষুধ মেশানো জলে গা ধুতে গেল। দাঁতহীন আরতি বিকাশের পাশে লেপের তলায় এসে ঢুকলো। বিকাশ হু করে একটা শব্দ করল। হাই তুলে বলল, ঘুমিয়ে আছে এক দিদিমা সব যুবতীর যৌবনে। তাই না!

PATHAGAR.NET

চেয়ার

বুদ্ধদেব গুহ

ইসস্ চেয়ারটা এত আন-কমফোরটেবল্ যে বলার নয়।

রাজেন সেন সাইড-টেবল থেকে পোরসিলিনের সুদৃশ্য ডাবর তুলে পানের পিক ফেলে জর্দার গন্ধ ছড়ালেন।

তাঁর সামনে তখন গজেন আর রাধু বসেছিল। তারা সমস্বরে বলে উঠল, আরাম পান না বুঝি? বসে?

রাজেন সেন মিচকি হাসলেন একটু।

বললেন, সব কিছুতে বসেই কি আরাম হয়? না সব কুছুতে চড়ে? কি হে?

কথাটার মধ্যে অশালীনতা ছিল। কিন্তু রাজেন সেন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। এমনই একটা পদে তাঁর অধিষ্ঠান যে তিনি যে ভুল বা অন্যায় বা অশালীন কিছু করতে বা বলতে আদৌ পারেন এ ধারণাটা তাঁর মোসাহেবরাই তাঁর মস্তিষ্ক থেকে মুছে দিয়েছে। তাঁর নিজের মনেও এমনই ধারণা জন্মে গেছে অনবধানে যে তাঁর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। যে কোনো ব্যাপারেই তাঁর বিচারটাই শেষ বিচার। তাঁর মতটাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মতো। তাঁর মত সৎ, মহৎ, পক্ষপাতিত্বহীন ভদ্র ব্যক্তি আর নেই; তাঁর নিজের মতে। টেলিভিশানের দৌলতে, যে-বিষয়ে চর্চা করে তাঁর রুজিরোজগার, সে বিষয়ে ছাড়াও দুনিয়ার তাবত বিষয়েই তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য জন্মে গেছে, তাঁর নিজের মতে। সঙ্গীত, সাহিত্য, ফুটবল, ক্রিকেট, শিল্পকলা, কুস্তি এমনকি জুডোও এখন তাঁর 'পাণ্ডিত্যের' বিষয়। কিং ক্যানুটের মতো তিনি যাইই মনে করেন তাইই ধ্রুব ও অভ্রান্ত বলে মনে করেন তাঁর টেবিলের সামনে তাঁকে ঘিরে বসে-থাকা স্তবকারী কৃপাপ্রার্থী স্তাবকের দল। তাদের দল বদলায়, বয়স বদলায়; রঙ বদলায় কিন্তু উঁচু চেয়ারে আসীম সেন সাহেব একটুও বদলান না। বদলাননি গত কুড়ি বছরে তাঁর নিজের মতে।

সূর্যও ইদানীং রাজেন সেনের কথাতেই ওঠে এবং ডোবে। রাজেন সেনের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবহিত না থেকেও।

বেচারী সূর্য!

রামু একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—কি এটা?

—বাজেট।

—রেখে যাও। বিরক্ত গলায় বললেন সেনসাহেব। অফিসের কাজ ছাড়া সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ। অফিসের কাজ তিনি দয়া করেই করেন।

স্যার! বড়সাহেব বলেছেন এটা আজই দেখে, বিকেলে ওঁকে ফেরত দিতে। খুব জরুরি। রামু চলে যেতেই ইন্টারকম্ পিঁ-পিঁ করে উঠল।

পূর্ববাংলার সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কহীন রাজেন সেন ঠাট্টা করে বললেন, হালায় কয় কি?

টেবিলের উল্টোদিকে বসা গজেন আর রাধু সেনসাহেবের গভীর ও বিস্ময়কর সেন্স অফ হিউমার অ্যাপ্রিশিয়েট করে হো হো করে হেসে উঠল। মোসাহেবের অ্যাপ্রিশিয়েশনের কোনো ডিপ্রিসিয়েশান নেই।

সেনসাহেব ইন্টারকাম-এর সুইচ টিপে রিসিভার তুলে নিলেন। এক মুহূর্ত শুনলেন। বললেন, আই সী! ঠিক আছে। বুঝেছি। বলেই, ফোন নামিয়ে রেখে বিরক্ত গলায় ওদের শুনিয়ে বললেন, ফুঃ! বাজেট!

গজেন ও রাধু আবার হাসল। ওদের মুখের ভাব, রামভক্ত হনুমানের মুখের ভাবের মতোই স্থির। উজ্জ্বল প্রশস্তির সুরে বাঁধা তাদের মুখচ্ছবি।

অ্যান্ একসারসাইজ্ ইন আটার ফিউটিলিটি!

সেনসাহেব বললেন।

কি? কেন?

কি আবার? গুজু হালদারের পি এ ফোন করেছিল। এই বাজেট-ফাজেট। প্রতি বছরই তো পরে ভ্যারিয়েশনের ঠেলায় অস্থির। তবে আর এত দামামা-ডংকা কেন? আসলে, বুঝলে, এই ডিক্টেটর কোম্পানিতে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। মালিকের মন যারা রাখতে পারে তারা রাখুক। আমার কোয়ালিফিকেশান আছে। আমি দয়া করে এই চেয়ারে বসে আছি তাই। আমার কিসের কেয়ার?

ইন্টারকাম্ আবার পিঁ পিঁ করল। রিসিভারটা তুলেই রাজেন সেনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। গলার স্বর চিলের বাচ্চার মতো সরু হয়ে গেল। চিঁচিঁ করে বললেন, না, না, কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, পেয়েছি। হ্যাঁ! হ্যাঁ! দরকার হলে রাত দশটা অবধিও থাকব। বাজেট তো আর রোজ পাস হবে না। না, না, আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান স্যার। আমরা তো আছিই। আমরা আছি কি করতে?

কথা বলতে বলতে সেনসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে।

ওঁর দিকে তাকিয়ে সাধু আর গজেনের মুখ মুহূর্তে ম্লান হয়ে এল, মোসাহেবিতে সেনসাহেব যে তাদের চেয়েও বড় তা দেখে। সেনসাহেব উঠে দাঁড়াতে তাঁরাও উঠে দাঁড়ালেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে, নিজেও বসে পড়ে উত্তেজিত মুখে সেনসাহেব বললেন, গুজু হালদার! বলেই বললেন, আরে, আমি তো দয়া করেই আছি এখানে। যেখানে

PATHAGAR.NET

স্বাধীন মতামতের দাম নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাম নেই, সেখানে আমার মতো বর্ন-ফ্রী মানুষ চাকরি করতে পারে না। ভাবছি, কোনো খবরের কাগজে জয়েন করব। সেখানে তো রিপোর্টার সম্পাদকরাই সব। মালিকেরা কোনো ব্যাপারেই ইন্টারফেয়ার করেন না। অবাধ, পূর্ণ স্বাধীনতা! এখানে আমি একেবারেই মিস্‌ফিট। আরে এই তো সেদিনই, এস. পি. আই কোম্পানির বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা...

কোথায় স্যার? ক্যালকাটা ক্লাবে?

দুস্‌স্‌-স্‌সস্‌। ক্লাবে-ফ্ল্যাবে আমি যাই না। ল্যান্সডাউন মার্কেট গেছি, দেখি উনি কুচোট্যাংরা কিনেছেন। আমিও যা ভালোবাসি; উনিও তাই-ই। একেই বলে র‍্যাঁপো, বুয়েচো! না বাবাঃ। বলব না তোমাদের। শেষে পাঁচকান হয়ে যাবে! আমার শত্রুর তো আর অভাব নেই।

আমরা কাউকে বলব না স্যার।

প্রমিস্‌?

কিন্ডারগার্টেনের ছেলের মতো মুখ করে বললেন।

প্রমিস্‌।

এই গুজু হালদারের কোম্পানিতে যা পাচ্ছি তার তিন গুণ। প্লাস পার্কস। বুয়েচো? কি বুজলে?

তাইই বলে সত্যিই চলে যাবেন না কি স্যার? আমরা সকলে যে তাহলে রেফ্যুজি হয়ে যাব।

ন্‌-না-না। তোমাদের ভয় নেই। ডান হাত তুলে অভয় দিলেন। যাবো না। কিন্তু আর কখনও আমার সামনে ঐ রেফ্যুজি কথাটা উচ্চারণ করবে না। সোনার শহরটার কী হাল করে দিল্যেরা শালারা! মরতে আসার আর জায়গা পেলি না? আমার মামাশ্বশুরের পেনেটির বাগানবাড়িটা জবরদখল করে নিলে। সকলেরই নাকি জমিদারি ছেল সেখানে। জমিদারের পোইই বটে সব!

সেনসাহেবের এখনকার বাড়ি বর্ধমানে। অনেক পুরুষ আগে পূর্ব-বাংলা ছেড়ে, পাটনাতে প্রবাসী হন। তিনপুরুষ হল বর্ধমানেই। গজেন আর রাধু পশ্চিমবঙ্গীয় হয়েও হতভাগ্য রাজনীতি নিরুপায় উদ্বাস্তুদের জন্য যতখানি সহানুভূতি রাখে, সেনসাহেব সেটুকুও রাখেন না।

সেনসাহেব একটু নড়ে বসলেন চেয়ারে। উ হু হু। কি রে, এ যে কাঁটা বেরিয়ে গেছে। দেকেচো! গোরা বাগটা চুরি করে দিলে ফাঁক করে। কত টাকা ঝেড়েছে শুধু এই চেয়ার সাপ্লাইয়ের ডিলে তাইই বা কে জানে? চেয়ার তো আর অফিসে কম নেই। সবসুদ্ধ দেড়শো-দু'শো তো হবেই! তারপরেই বললেন, যা-ক্‌ এই চেয়ারটার আসল দামই বা কি? আমি যতদিন এই চেয়ারে আছি, রিটায়ার না করছি; ততদিনই দাম। তাছাড়া গুজু হালদাররের অফিসে রিটায়ার তো কেউ করে না। চেয়ারে একেবারে

জম্পেশ করে বসে পড়লেই হল! চেয়ার তো হয় কাঠের নয় লোহার, নয় ফাইবার গ্লাসেরই! গদীও হয় কতরকম। চেয়ারে কি এসে যায়! চেয়ারে যে বসে থাকে, সেইই আসল। চেয়ার তো স্রেফ জড়পদার্থ।

গজেন বলল, ঠিক বলেছেন স্যার। দ্যা পার্সন গ্লোরিফাইজ দ্যা চেয়ার, হু সীটস্ অন ইট। চেয়ারের নিজের দাম কি? ঠিকই বলেছেন।

রাজেন সেন চোখ দুটি ছোটো করে হেসে বললেন, আমি জেনারালি ঠিকই বলে থাকি।

রাধু বলল, ঠিক্ ঠিক্। টিক্‌টিকির মতো।

ঠিক সেই সময় বিমল ব্যানার্জী কাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওর পেছনে পেছনে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের শৈলেন। মাস কয়েক আগে একটি প্রেস কনফারেন্সে গুজু হালদারের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক কিছু মন্তব্য করাতে, গুজু হালদার বিমলকে একেবারেই পুতুল করে রেখেছেন। ও কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার। কিন্তু ওকে কোনোরকমে কাজই না করতে দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছেন ম্যানেজমেন্ট। মাইনে পাচ্ছে, গাড়ি পাচ্ছে, পার্কস পাচ্ছে, পাচ্ছে না কেবল কাজ। বাইরের কনসালটেনসি ফার্মাকে সেই কাজের ভার দিয়ে বিপুল অর্থহানি সত্ত্বেও গুজু হালদার বিমলকে বসিয়ে রেখেছেন। এ অফিসে বিমলের যারা বন্ধু, তারা ওর আড়ালে বলছে, কী হিউমিলিয়েটিং অবস্থা! ওর কি একটু সেল্ফ রেসপেক্ট নেই?

ওর শত্রুরা বলছে, খুব তেল হয়েছিল। এফ.এম একেবারে মাথায় করে রেখেছিলেন তো এতদিন। ভেবেছিল কী বুঝি হনু! চাকরিটা এখন ছাড়ছিস কেন? যার খাবি, যার পরবি, তারই মাথায় ডাণ্ডা মারবি এ কেমন সততা? টাইট হয়েছে এবারে।

কি খবর? বিমল? পান চলবে নাকি একটা?

পান ভদ্রলোক খায় না। ওটা নির্বুদ্ধি আর ব্রাউজারদের খাদ্য। অবশ্য তুমি দাদা এক্‌সেপশান। পান খাও অথচ সাহেব; তুমিই একা।

খুক্ খুক্ করে হাসলেন একটু রাজেন সেন। রাধুর সাদা টেরিলিনের জামায় পানের সূক্ষ্ম পিচকিরির পিক্ আল্‌পিনের মতো গিয়ে বিঁধল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। লাল হয়ে গেল জায়গাটা। রাধু দেখল।

ছরি। পান মুখেই বললেন সেনসাহেব।

না, না, ঠিক আছে স্যার। রাধু বলল, সবিনয়ে।

কি খবর বল বিমল?

বিমল বলল, খবর এখন নেই। তবে, তৈরি করব। আমরা দু'জনে। গুঁড়িয়ে ফেলব, ভেঙে ফেলব, এই এসটাব্লিশমেন্টের মনোপলেস্টিক অ্যাটিটিউড্‌স। অসহ্য!

বিমলের ইংরাজি উচ্চারণ ভালো। গভীরতা না থাকলেও বিদেশী বইয়ের জ্যাকেট-নির্ভর অল্প-জ্ঞানের জলে পুঁটি মাছের ছরছরিয়ে সাঁতার কাটার মতই তার চতুর্দিকে

PATHAGAR.NET

জ্ঞানের জল ছেটানোর অভ্যেস আছে। তাছাড়া, আর্টফিল্ম-টিল্মও দেখে। বিমল হচ্ছে, যাকে বলে, 'লা আঁতেল।'

শৈলেন নস্যির কৌটো বের করে, সবে নস্যি নেবার তোড়জোড় করছিল। বিমলের বক্তৃতা শুনে হঠাৎ বলে উঠল, আপনার জায়গায় আমি হলে অনেকদিন আগেই রেজিগ্‌নেশান দিতাম। আমার আত্মসম্মানে লাগত। ও বালাই বোধহয় আপনার নেই। আমার কেন, অনেকেরই নেই। আপনি মানুষ হলে অনেকদিন আগেই চাকরি ছেড়ে দিতেন।

বিমল একটু লজ্জা পেল। যদিও লজ্জা ব্যাপারটা ওর চরিত্রে নেই। শৈলেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আরে ছাড়ব যখন তখন গুজু হালদারের গদী টলিয়ে দিয়েই ছেড়ে চলে যাব।' 'আই উইল গো উইথ আ ব্যাঙ্গ, নট উইথ আ হুইমপার।' মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাবার লোক আমি নাই। অপমান আমি কখনই সহ্য করব না। গুজু হালদার অপমান করবে বিমল ব্যানার্জীকে, তা চলবে না। আরে তার পয়সা থাকতে পারে, তাকে চেনেটা কে? আমার মতো তার পরিচয়? সভা-সমিতি, চেম্বার অফ কমার্সে কাকে লোকে চেনে? তাকে? না আমাকে?

হ্যাঁচ্ছ! করে হাঁচল শৈলেন।

নস্যির গন্ধে ঘর ভরে গেল। বলল, অপমানের আপনার আর বাকিই বা কি আছে? তাছাড়া এত যে তড়পাচ্ছেন সবই ফালতু। আপনাকে সবাই-ই গুজু হালদারের চাকর বলেই জানে। আপনি যাইই ভাবুন। এয়ারকন্ডিশানড্ ঘরে উঁচু চেয়ারে বসে আপনার মতো যারা কাজ করে তারাও চাকর আর যে বাসন মাজে, খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ায় সেও-ও একইরকম চাকর। মিথ্যে বড়াই কেন করেন? মানুষ হলে চাকরি ছাড়তেন। আপনি মানুষই নন। সেনসাহেবের ঘর বলে বেশি কিছু বললাম না। স্যার রাগ করবেন। নইলে...

বিমল, সুর নরম করে বলল, তুমি বুঝবে কি? ব্যাচেলার, কোন দায়িত্ব কর্তব্যটা আছে তোমার? গড়িয়াতে বাড়িটা সবে আরম্ভ করেছি। ছেলেপুলে থাকলে বুঝতে সংগ্রাম করা কি কঠিন। আমাদের মতো নামী, যশস্বী কাজের লোকদেরই তো অ্যাস্‌ট্যাব্লিশমেন্ট অপাদর্থ তোষামুদে চাকর বানিয়ে দেয়। কাজটাজ তো প্রায় ভুলেই গেছি বাঁদর নেচে নেচে। এখন ঝপ করে হঠাৎ এতগুলো টাকা মাসে মাসে বন্ধ হয়ে গেলে যে বউ-বাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া গাড়িটা! গাড়িটা ছাড়া ব্যারাকপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে গড়িয়াতে গিয়ে বাড়ি শেষ করা অসম্ভব। বাড়িটা শেষ করে তারপর শেখাব গুজু হালদারকে। ঝপ্ করে টাকা বন্ধ হলে...

শৈলেন বলল, তাহলে ঝপ্ করে মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নাও। নিমকহারামী মহাপাপ। হয় ঝপ্ করে চাকরি ছাড়ো নয় ঝপ করে ক্ষমা চাও। যারা

বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বুকুনি ঝাড়ে, তাদের বউবাচ্চা গড়িয়ার বাড়ির চিন্তা মানায় না।

রাজেন সেন ইন্টারপট্ করে বললেন, শৈলেন, তুমি চুপ করো। বড় বাড়াবাড়ি করছ। কিছুই না বুঝে কথা বলাটা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি মনে করো তুমি একাই সব বোঝো।

সঙ্গে সঙ্গে গজেন আর রাধু সেনসাহেবকে সাপোর্ট করে, শৈলেনের দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক হাসি হাসল। হুঁ! হুঁ! হিঁ! হিঁ!

বিমল ব্যানার্জী এবারে জোর পেয়ে বলল, আরে ভারি তো কাজ তোমার! লেখো তো তুমি খতিয়ান আর করো তো মালিকের দালালি। 'মনোপলি' কথাটার মানে বোঝো?

বি-কম-এ পড়েছিলাম।

নস্যির কৌটোটা নাড়াচাড়া করতে করতে শৈলেন বলল।

'রানেশাঁ'? 'অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাকটিভিটি'? বোঝো?

শৈলেন দমবার পাত্র নয়। নাক থেকে নস্যি ঝেড়ে নোংরা রুমালে তাড়াতাড়ি মুড়ে সে বলল, রাখুন তো মশাই! হাবজাই-খাতে কথাটার মানে জানেন আপনি? নাজাই-খাতে কাকে বলে জানেন? ব্রেক-ইভিন্ পয়েন্ট? বেশি জার্গন ঝাড়বেন না। জার্গনস সব লাইনেই থাকে। আমিও ঝাড়তে পারি।

সেনসাহেব এবারে ভেটো প্রয়োগ করলেন। বললেন, শৈলেন, বিহেভ ইওরসেল্ফ! সিনিয়ার লোকেদের দাদা বলে ডাকো বলেই মনে করো না যে, যা খুশি তাই-ই বলতে পারো। রেসপেক্ট দেবে। অফিসে একটা ডিসিপ্লিন, ডেকোরাম রাখবে। এটা কাজের জায়গা। 'স্যার' বলে অ্যাড্রেস করবে সিনিয়ারদের।

PATHAGAR.NET

২

তাঁর চেয়ারে সেনসাহেব একা ঘরে। এয়ারকন্ডিশানটা মৃদু ফিসফিস শব্দ করছে। এই জড়পদার্থ চেয়ারটার জন্যে মাঝে মাঝেই দুঃখ হয় ওঁর। উনি যখন থাকবেন না, একজন গবেট, আনস্মার্ট, ইডিয়ট মার্কা লোকে এসে বসবে এই চেয়ারে। অধীর রায়।

কাজকর্মের কিস্সুই বোঝে না। ড্যাশ নেই, পুশ নেই, পার্সোনালিটি নেই। অন্য কোনো বিষয়েও কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা ফাইল-ওয়ার্ম। এই চেয়ারটাকে উনি বিশেষ ইজ্জত দান করেছিলেন। লোকটা একেবারে বেইজ্জত করবে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। অপারেটার বলল, গুড আফটারনুন স্যার।

মর্নিং-এ কখনও অফিস আসেননি সেনসাহেব। তিনি যে দয়া করে অফিসে আসেন এই-ই গুজু হালদারের সৌভাগ্য। ওঁর যে কী এলেম, কত গভীর প্রতিভা, তার কীই বা বোঝে ঐসব ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা। তিনি যখনই আসুন আর দয়া করে

যতটুকু কাজই করুন তাতেই তো মালিকপক্ষ কৃতার্থ। তা নইলে তো কবেই বলতে পারতেন তাঁরা, 'এবারে আসুন।' উনি তো আর লেবারার নন যে, ইউনিয়ন ওঁকে বাঁচাবে। উনিই কারোর দয়া কোনোদিনই চাননি। নিজের যোগ্যতা, মেধা, গভীর অন্তরদৃষ্টির জোরেই আইসকাটারের মতো এসটাব্লিশমেন্টের বরফ কেটে একাই চলেছেন সাফল্যের উত্তরমেরুর দিকে। তাঁর নিঃশব্দ নীরব গতির একমাত্র সাক্ষী বিমল ব্যানার্জী। ও একটা গ্রেট ইনটেলকচুয়াল। স্বাধীনচেতা মানুষ। এসব ব্যাপার বোঝে এমন মানসিকতার মানুষ এই কোম্পানিতে বেশি নেই।

গুড আফটারনুন। ডাঃ সাধুখানকে দিন তো।

কে?

ডাঃ সাধুখান। হ্যালো। কথা বলছি।

এই যে পিকু। তোমার বৌদির একটু জ্বরভাব হয়েছে। একবার আসবে?

এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার। বৌদি বাড়িতে আছেন তো?

আছেন। তবে এই ভর দুপুরে তোমার মতো সুপুরুষের আমার সুন্দরী স্ত্রীর কাছে একা না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সন্ধেবেলা এসো। আমি থাকব।

আচ্ছা স্যার। হেসে বললেন ডাঃ সাধুখান।

তারপর বললেন, স্যার, আপনার অন্তর আর মেধার যে গভীর সৌন্দর্য দিয়ে বৌদিকে মোহিত করে রেখেছেন সেই সৌন্দর্যের মোকাবিলা কি আমার শারীরিক সৌন্দর্য কখনও করতে পারে? যাব। নিশ্চয়ই যাব।

আবার ফোন তুললেন। মিহির ঘোষকে দিন।

অ্যাই যে! তুমি যে খবরই নাও না কোনো। ব্যাপার কি?

বড় ব্যস্ত ছিলাম স্যার।

আরে, আমি এই চেয়ারে আছি বলেই না তোমার ব্যস্ততা! ব্যস্ততা দেখাচ্ছো কার কাছে? তোমার সব ব্যস্ততা নিবিয়ে দিতে পারি আমার হাতের পাঁচ।

আপনি খুব রেগে গেছেন মনে হচ্ছে।

ভয়-পাওয়া গলায় মিহির ঘোষ বললেন। বলুন স্যার, কী করতে পারি আপনার জন্যে?

শোনো। উনিশে আমার ছোট শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন।

বুঝেছি। মাছ তো? কি মাছ এবং কোয়ান্টিটি বলুন। সময়মতো পৌঁছে যাবে।

রুই। পাকা। তিরিশ কে-জি।

ওক্কে।

পাবদা। টাটকা। মাঝারি। তিরিশ কে-জি।

ওক্কে! মাত্র তিরিশ কেজি?

ওতেই হবে।

PATHAGAR.NET

একটা কথা বলি স্যার? কিছু তপ্‌সে পাঠাই। ফ্রাই জমবে ভালো। আফটার্ অল্ আপনার শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন! ভি আই পি-রা আসবেন। আপনার ইজ্জত তো রাখা চাই।

আমার ইজ্জত-এর ভার তোমার হাতে নেই। আমার ইজ্জত আমাকে অর্জন করতে হয়েছে মিহির। জীবনে সবকিছুই লড়ে নিতে হয়েছে। আমার জন্মদিন শনিবার। 'স্যাটারডেজ চাইল্ড হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড ফর আ লিভিং'। গল্‌দা চিংড়ি হবে?

এ কি বলছেন স্যার? আপনার জন্যে তিমি মাছও যোগাড় করে দেব। চিংড়ি তো পোকা মাত্র। একেবারে ড্রেস-ট্রেস করে পাঠাব। কি হবে? মেয়োনিজ না কালিয়া।

কালিয়া।

কত পাঠাব?

তিরিশ কেজি।

সবই যাবে! তবে একটা প্রার্থনা আছে স্যার। দাম কিন্তু নিতে পারব না।

ঠিক আছে। প্রেয়ার গ্রান্টেড। কখন পাঠাবে?

সকাল সাতটার মধ্যে।

শোনো, কিছু মিষ্টির বন্দোবস্ত করতে পারো?

স্যার, আপনি বললে বাঘের দুধেরও বন্দোবস্ত করতে পারি।

বাঘের দুধ আমি বিনা পয়সাতে পেলেও খাই না। মিষ্টি হলেই চলবে।

জলযোগ? গাঙ্গুরাম? তিওয়ারী? না গুপ্ত ব্রাদার্স? কার মিষ্টি?

যার সেটা ভালো হয়।

আইটেম বলুন।

তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। এমন পাঠাবে যে, লোকে যেন আহা! আহা! করে। চারশো লোকের মতো। ঠিক আছে? ছাড়লাম।

ফোন নামিয়ে নিরুচ্চারে বললেন, ন্যাকা! পয়সা নিতে পারব না স্যার! পয়সাই দেব তো তোকে বলব কেন?

ডাইরেক্টরি বার করে দেখলেন। এখন ডেকরেটর, ফুল আর পানের বন্দোবস্ত করতে হবে। এবং গাড়িরও। কাজের বাড়ি। গোটা তিনেক গাড়ি দু'দিনের জন্য লাগবে। নেমন্তন্ন করার জন্য। আবার কাজের দিনও।

গজেন ঘরে ঢুকল উল্লাসিত হয়ে।

বলল, হয়ে গেল স্যার।

কি?

বিরক্ত গলায় সেনসহেব বললেন।

এখনও অনেক ফোন করা বাকি। এই শালী তাঁর বিশেষ প্রিয়। শালীর বিয়ের আগে

PATHAGAR.NET

একদিন বৃষ্টির দিনে সিনেমা দেখে ফেরবার সময় গাড়িতে চুমু খেয়েছিলেন। পরশটা এখনও ঠোঁটে লেগে আছে যেন!

গাভাস্কারের টুয়েন্টিনাইনথ্ সেঞ্চুরি হয়ে গেল স্যার।

মুখোজ্জ্বল হল সেনসাহেবের। গাভাস্কারের কথা না তুলতেই বললেন, এই একটা খেলা, আমার বিশেষ প্রিয়। দ্যাখো, তোমরা বলেছিলে যে, হবে না। ছোকরাটাকে তোমরা কম অপমান করছ?

জীবনে সেনসাহেব চোর-চোর আর ডাংগুলি ছাড়া কিছুই খেলেননি। বটতলের বই এবং কোকশাস্ত্র ছাড়া কিছুই পড়েননি। কিন্তু তিনি আজ যে পজিশানে আছেন সে পজিশানে তাঁর সর্বজ্ঞ না হয়ে কোনোই উপায় নেই। উনি না হতে চাইলেও ওঁর কৃপাপ্রার্থীরা করিয়েই ছাড়বে। বিনা চেষ্টাতেই তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছেন। এবং সকলেই তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে নির্বিবাদে মেনেও নিয়েছে।

রাধু ঢুকল। হাতে পুজো সংখ্যা নবকল্লোল। পড়েছেন? উপন্যাস? সমরেশ বসুর? জুতো, স্যার জুতো!

বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে সেনসাহেব বললেন, রাম্বা-সম্বার লেখক তো?

অলমোস্ট! তবে; সাম্বা নয়, শাম্ব। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড উইনার।

ঐ হল। যে লেখার কথা বললে, তাও পড়ে দেখেছি। তবে, এক্ষুনি অ্যানালিটিক্যাল ক্রিটিজিম্ করতে ইচ্ছে করছে না। গাটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে হে।

স্যার, আমার বাড়িতে আগামী শনিবার ঝুনঝুন সেন আসবেন। রেডিওর সোনালী চ্যাটার্জী, এমন কি দুর্যোধন দাঁ ও গুগগুল গাঙ্গুলি। সাহিত্য-সঙ্গীত-আবৃত্তির সন্ধ্যা। আপনাকে কিছু বলতেই হবে। এবং সভাপতিত্বও করতে হবে।

বলছ?

বলছি কি স্যার? আপনার নাম করেই তো সকলকে একসঙ্গে করা, নইলে এই অধমের বাড়িতে কি ওঁরা কেউ আসতেন! সেলিব্রেটিজ সব।

তাহলে আমার ছোট মেয়ের একটা নাচের আইটেমও জুড়ে দাও। দারুণ নাচে। অসম্ভব ট্যালেন্টেড্।

নো ওয়ান্ডার স্যার। লাইক ফাদার লাইক ডটার। দারুণ হবে। তা কি নাচ নাচেন আপনার ছোট মেয়ে? কত্থক না ওড়িশী না ভরতনাট্যম না রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্যর নাচ? কি? তবলচি, সরেঙ্গীওয়ালার যোগাড় রাখব তো?

না, না, ওসব গর্জাস ব্যাপারের মধ্যে ও নেই। পপ্-সংগ্স্-এর সঙ্গেই ও নাচে! অনেক সুবিধে। হাটে-মাঠেও নাচা যায়। গান রেকর্ড করা আছে টেপ্-এ। টেপ্ বাজিয়েই ও নাচবে। একটু শুধু সাইকেডেলিক আলোর বন্দোবস্ত রেখো। তা ওঁরা কিছু মনে করবেন না তো?

কী যে বলেন স্যার! ভালো মাল খাওয়ালে ওঁরা নরকেও যেতে রাজী।

কোনো চিন্তা নেই। দারুণ লোককে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসব। দেখবেন, কী এফেক্ট হবে। পপ্‌-ডান্সের পরিবেশের জন্যে আইডিয়াল!

কটার সময় যেতে হবে? তোমার বাড়ি তো আমি চিনি না।

আপনি স্যার কি করে চিনবেন? অলি-গলিতে তো আপনার যাওয়ার কথা নয়। আমিই গাড়ির বন্দোবস্ত করে আপনাকে নিয়ে আসব। বৌদি, থুড়ি, মেমসাহেব কি আসবেন? এলে, আমরা সকলেই ধন্য হই। রাতে আমার ওখানেই দুটি ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন।

উনি, মানে, আমার মিসেস, আমার মতো অতটা সোস্যাল নন। তাছাড়া, সেদিন ওঁর নীলের উপোসও আছে। আসতে পারলে ভালোই হত। মেয়ের নাচের সঙ্গে উনি তালি বাজান।

কি বাজান?

তালি।

অ। তাহলে আর কি করা যাবে। কিন্তু তালি বাজাবার লোকের অভাব হবে না স্যার। তালি বাজাবার লোক অনেক আছে।

৩

প্রায় মাসখানেক হল রাজেন সেন রিটায়ার করে গেছেন। ভেবেছিলেন, এক্সটেন্‌শান পাবেনই। সেলস্‌-এর সান্যাল, মেনটেন্যান্সের ঘোষাল তো এক্সটেনশানের পর এক্সটেনশান পেয়ে ষাট পার করে দিল। এই কোম্পানিতে সিনিয়র পোস্ট এক্সটেন্‌শানটা একটা 'ম্যাটার অফ্‌ কোর্স' হয়ে গেছিল। এবং একটা ম্যাটার অফ রাইটও বটে। এক্সটেন্‌শান পাবার পরই একবার ফরেন যাবেন যাবেন ভেবেছিলেন। নইলে আজকাল 'স্ট্যাটাস' হয় না। সবই ভেস্তে গেল। এ একেবারে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু! হালদার যে অপ্রস্তুত তাঁকে এমন নিঃশব্দে ল্যাং মারবেন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেননি। উনি ছাড়া ওঁর ডিপার্টমেন্ট কি করে চলে দেখতে খুব ইচ্ছা করে ওঁর। উনি ভেবেছিলেন, ওঁকে এক্সটেন্‌শান না-দেওয়াতে ওঁর সাবর্ডিনেট স্টাফ গজেন, রাধু এবং অন্যান্য অনেকেই পেন-ডাউন স্ট্রাইক করবে প্রতিবাদে। সাপ্লায়াররাও রিপ্রেজেনটেশন দেবে।

ভেবেছিলেন।

আশ্চর্য।

কেউই ট্যাঁ-ফোঁ করল না!

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেয়েছিলেন ডাকে। নিচে লেখা, 'আপনার অনুগত অধস্তন কর্মচারিবৃন্দ।' হাতের লেখাটা চেনেন না। কাউকে দিয়ে লিখিয়ে থাকবে। এই এরাই তাঁকে অনেক ভাল ভাল কথা আর্টিস্টকে দিয়ে লিখিয়ে বাঁধিয়ে ফেয়ারওয়েল

অফিসে ঢোকবার সময়ই প্রথম ধাক্কাটা খেলেন। দারোয়ান মিশির হাতে খৈনি মারছিল। ওঁকে দেখে সেলাম করল না। দাঁড়িয়ে উঠলো না পর্যন্ত। কিছু বললও না! খৈনি টিপে ঠোঁটের নিচে দিল। ওঁর দিকে নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকিয়ে।

উনি ভাবলেন, বাড়িই ফিরে যাবেন। তারপর ভাবলেন, এসব অশিক্ষিত আনকালচারড লোকেদের কাছে কীইবা প্রত্যাশার?

করিডোরে ঢুকেই গজেনের সঙ্গে দেখা। তার গ্রেটেস্ট চামচে ছিল একসময়! ওঁকে দেখেই গজেন ভূত দেখার মতো চম্‌কে উঠে তুত্‌লে বলল, ভালো?

ব্যাস্‌স্‌। ঐটুকুই বলেই, ডিপার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজেন সেন। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। পা টেনে টেনে। খোঁড়া গরুর মতো। একদিন ওয়েলার ঘোড়ার মতই টগবগিয়ে যেতেন। হঠাৎ শৈলেনের সঙ্গে দেখা করিডোরে। শৈলেন বসু। বলল, আরে! সেনসাহেব যে! কেমন আছেন? অন্য কিছু কি করছেন? কোথাও জয়েন করলেন? চলুন, চলুন, চা খাবেন, আমার টেবল-এ চলুন।

গেলেন। শৈলেনের ছোট্ট টেবলে বসলেনও। ওঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অফিসের এ দিকটাতে উনি একদিনও আসেননি। ভাব দেখে মনে হল অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য টেবলের কেউ ওঁকে বোধহয় চেনেই না। কে একজন তাঁর পেছন থেকে বলে উঠলো, 'মাল।'

ওঁর বুকের ভিতরটাতে ধড়ফড় করতে লাগল। উঠে পড়ে বললেন, চা নাইই বা খেলাম। শরীরটা ভালো লাগছে না। অধীর আছে নাকি?

কে অধীর? ও রায়সাহেব? ডি-পি-এম্ কি আছেন ঘরে? মনি?

মনি বলে একটি ছেলে বলল, আছেন। তবে খুবই ব্যস্ত। আজ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে মীটিং আছে। এফ-ডি নিজে যাবেন ব্যাঙ্কে। তাই কাগজপত্র দেখেছেন ডি-পি-এম।

তবু সেনসাহেব উঠলেন। আবার পা টেনে টেনে তাঁর নিজের পুরনো ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। ইডিয়ট অধীর রায়, চেয়ারে ছেড়ে উঠে এসে দরজা খুলে ওঁকে নিয়ে গেল ভিতরে। নিজের পাশের ছোট সোফায় বসে বলল, দাদা, আপনি আপনার চেয়ারেই বসুন। যতক্ষণ আপনি এই ঘরে, এই চেয়ারে আপনারই।

দুঃখে হাসি পেল রাজেন সেনের। ভাবলেন, 'আয়না তুমি কার?'

মুখে বললেন, না না, তুমি বোসো। আমি এইখানেই বসি।

চা খাবেন দাদা?

না।

ঠাণ্ডা কিছু।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে পার্স বের করে কোল-ড্রিঙ্কস্ আনতে দিল অধীর।

PATHAGAR.NET

একটা এনো। আমি খাবো না। এফ-ডির সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে এক্ষুনি। ইন্টারকমে ডেকেছেন উনি। আপনি বসুন, ঠাণ্ডা খান, আমি না আসা অবধি রিল্যাক্স করুন। যাবেন না কিন্তু। ব্যাঙ্ক তো পাশেই। যাবো আর আসবো।

বুকটা আবার ধড়ফড় করে উঠল রাজেন সেনের। বললেন, না অধীর। ওটা খেয়েই চলে যাব। শরীরটা ভালো নেই।

অধীর বলল, সো-ফার আই অ্যাম কনসার্নড ইউ আর মাই বস্। ইয়েস্। ফর দ্যা রেস্ট অফ মাই লাইফ। আপনার কোনো প্রয়োজন বা অসুবিধা হলে একটা ফোন করবেন শুধু। আমি আপনার ছোট ভাইয়েরই মতো। আপনার তো নিজের ভাই নেই। ফোন নাম্বার মনে আছে নিশ্চয়ই।

এ জীবনে কী আর ভুলব!

রাজেনবাবু বললেন, অবশ্য বদলে যদি না যায়।

আর এই রইল আমার বাড়ির নাম্বার। কার্ড বের করে দিল অধীর। হেসে বলল, আসলে, আপনার টেলিফোনটাই আপনার বাড়ি থেকে খুলে আমার বাড়িতে লাগিয়েছে। কোম্পানির ফোন তো। পাড়া এক বলে, নাম্বারটা পর্যন্ত বদলায়নি। সে নাম্বারও আপনার তো মুখস্থই। চলি দাদা! ব্যাঙ্কে যাব এফ ডির সঙ্গে।

যেতে যেতেও দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে অধীর বলল, দাদা, আমার আর আপনার দাম আসলে কিছুমাত্র নেই। দামী যা, তা হচ্ছে ঐ চেয়ারটাই।

অধীর চলে যেতেই বেয়ারা একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এনে দিল। ওর নাম যদু। আগে লম্বা লম্বা সেলাম করত। আজ কোনো কথাই বলল না।

উনি, মানুষটা কি খুবই খারাপ ছিলেন? কারো উপর কি উনি অন্যায় করেছিলেন? সবাইকে কি যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি? আশ্চর্য! একবারও সে কথা ওঁর মনে হয়নি কেন যতদিন চেয়ারে ছিলেন?

কোথায় যে কী গোলমাল হয়ে গেছে! বড় গোলমাল।

কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর বোতলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজেন সেন। সেই কাঁটাটা এখনও উঠে আছে চেয়ারের ফ্রেম থেকে। তাঁর ট্রাউজার একবার ফুটোও হয়ে গেছিল। অধীরকে বলেও গেছিলেন কাঁটাটার কথা।

আশ্চর্য।

তবুও অধীর... ... ...।

PATHAGAR.NET

গয়াপতির বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দারোগা গয়াপতির ভারী ফ্যাসাদ। কিছুতেই তিনি ডাকাত ঝালুরামকে ধরতে পারছেন না। ধরা দূরে থাকুক, ঝালুরামের চেহারাটা কেমন, সে কালো না ফর্সা, লম্বা না বেঁটে, হাসিখুশি না গোমড়ামুখো, তাও তিনি জানেন না। অথচ সরকার জোর তাগাদা দিচ্ছেন, ঝালুরামকে ধরতে না পারলে গয়াপতির বদলি অবধারিত।

তা ঝালুরামকে ধরাও সোজা কথা নয়। তার বন্দুক-পিস্তল আছে, হাতি-ঘোড়া মোটরগাড়ি আছে, ছদ্মবেশে ধরতেও সে খুব ওস্তাদ লোক। যাদের বাড়িতে ঝালুরাম ডাকাতি করেছে, তারা কেউ সঠিকভাবে ঝালুরামের চেহারার বর্ণনা দিতে পারে না। কেউ বলে লম্বা, কারো মতে বেঁটে, কেউ বলে ফর্সা, কারো দাবি কালো। এ পর্যন্ত পনেরোজন ঝালুরামের বিবরণ পাওয়া গেছে। কিন্তু গয়াপতি জানেন, ঝালুরাম এক এবং অদ্বিতীয়। গত দু'বছর ধরে এই শান্তির এলাকাকে ঝালুরাম ভারী সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। বাড়ি লুটছে, দোকান লুটছে, আড়ত সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায়-ঘাটে লোকের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। এখন ঝালুরামের নাম শুনলে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কেউ চোখ বুজে ফেলে, কেউ ঘামতে থাকে, কেউ বা ঠাণ্ডা মেরে যায়।

PATHAGAR.NET

ঝালুরামের আবির্ভাব হওয়ায় আগে গয়াপতি সুখেই ছিলেন। মাছ-দুধ-ফল-সবজি-মাংস ডিমের অভাব হত না। খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হত। রাতে ঘুমোতেন, দিনে ঘুমোতেন, প্রায় সারাক্ষণই একটা ঘুম ঘুম ভাব লেগে থাকত তাঁর। মনটা খুব প্রশান্ত থাকত, চারদিকটা ভারী শান্তিময় ও সুন্দর ছিল। গয়াপতির বেশ একটা ভুঁড়ি হয়েছে, গায়ে-গতরে থলথল করছে চর্বি। ওঠা, হাঁটা কাজকর্ম করা বা খাটা-খাটুনির অভ্যাসটাই মরে গেছে। ঠিক এই সময় একদিন দুম করে দুর্দান্ত ঝালুরাম তাঁর এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তছনছ করে দিল। প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও ঝালুরাম কিছু-না-কিছু করছেই। দু'বছরে মোট সাতশ ত্রিশ দিনে সে এগারো শো বাহান্ন রকমের লুটপাট, ছিনতাই জখম ইত্যাদি করেছে।

গয়াপতির খিদে ক্রমশ কমে আসছে। রাতে একটু-আধটু ঘুম এখনো হয় বটে, কিন্তু দিনের ঘুমটা আর আসতে চায় না আজকাল। ঘুম-ঘুম ভাবটাও আর নেই। গয়াপতির বুড়ি মা আজকাল দুঃখ করে বলেন, 'বড্ড রোগা হয়ে গেছিস গয়া। চোখের তলায় কালি পড়েছে, হাঁটার সময় তোর পেটটা আর আগের মতো দোল খায় না। জুতোর শব্দটাও তেমন দুমদাম করে হয় না।'

গয়াপতির গিন্নি আগে মোটা-মোটা সোনার বালা, চুড়ি, এগারো ভরির বিছে হার পরে থাকতেন সবসময়। একদিন গয়াপতি দেখলেন, তাঁর গিন্নি সব খুলে রেখে শুধু দু'গাছি করে সরু চুড়ি আর সুতোর মতো সরু হার পরে আছেন। গয়াপতি হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গয়না খুলে ফেলেছ যে?'

গিন্নি আমতা-আমতা করে বললেন, 'সবাই বলছে চারদিকে খুব চোর-ডাকাতের উপদ্রব, গয়না দেখানোটা নাকি ঠিক নয়।'

শুনে গয়াপতি গুম মেরে গেলেন। দারোগার বউ চোর-ডাকাতের ভয় খাচ্ছে! তার মানে, গয়াপতির যোগ্যতায় তাঁর নিজের বউয়েরও বিশ্বাস নেই!

সেইদিন থেকে গয়াপতি মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঝালুরামের যে-কোনো খবর পেলেই ছুটে যান। কিন্তু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত হদিশ করে উঠতে পারেন না। সবাই আড়ালে দুয়ো দেয়।

সেবার সোনাগড়ের হাটের কাছে ঝালুরাম তার স্যাঙাতদের নিয়ে জড়ো হয়েছে বলে এক আড়কাঠির কাছে খবর পেয়ে গয়াপতি সদলবলে ছুটলেন। গিয়ে দেখেন নির্দিষ্ট জায়গায় এক খুনখুনে বুড়ি ঘরের মাটির দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। আড়কাঠি মাথা চুলকে বলল, 'এই বুড়িটাই ঝালুরাম। ছদ্মবেশে রয়েছে বোধহয়।'

গয়াপতি সন্দেহের শেষ রাখলেন না। বুড়িকে ধরে তুলে নিয়ে এলেন থানায়। বুড়ি পরিত্রাহি শাপশাপান্ত করতে থাকে। খবর পেয়ে শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে কাণ্ড দেখে হাসির ছররায় গয়াপতিকে ঘায়েল করে চলে গেলেন।

আবার আর-এক চরের খবর পেয়ে গয়াপতি চুপিসাড়ে কলসিপোঁতা গাঁয়ের চাকলাদারদের নারকেলবাগানে হাজির হলেন! খবর ছিল, মরা নারকেল গাছের নীচে ঝালুরাম সাধু সেজে বসে আছে। গয়াপতি সাধুর লেংটিরও সন্ধান পেলেন না, তবে সেখানে ধুনির ছাই খানিকটা ছিল বটে। যে লোকটা খবর এনেছিল, সে বলল, 'এই নারকেল গাছটাই আজ্ঞে ঝালুরাম। এটাকে গ্রেফতার করুন।'

শুনে গয়াপতির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। লোকটাকে কান ধরে কয়েকটা চড়-চাপড় দিলেন। পরে কিন্তু খবর পেয়েছিলেন যে, লোকটা মিথ্যে বলেনি। মরা নারকেল গাছের ফাঁপা খোলের মধ্যেই নাকি ঝালুরাম গা ঢাকা দিয়েছিল। ক'দিন বাদে গিয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই নারকেল গাছের গায়ে একটা চৌকো দরজা। সেটা খুললে ভিতরে দিব্যি একজন সেঁধতে পারে। ফলে গয়াপতির এক গাল মাছি।

হরগঞ্জের শ্রীপতি হাজরা এসে একদিন বলল, 'হুজুর, আমার কেলে গরুটা পাচ্ছি না। তার জায়গায় গোয়ালে একটা রাঙা গাই কে বেঁধে গেছে। বড় সন্দেহ হয়, রাঙা গাইটার ভাবগতিক দেখে। গরুর মতো ডাকে না, খোল ভুষি ঘাস এসব খেতে চায় না। ভাত দিলে খায়। মনে হচ্ছে গরুর ছদ্মবেশেই না আবার ঝালুরাম এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।'

ছুটলেন গয়াপতি। গরুটার ওপর অনেক খোঁচাখুঁচি চলল। শেষে পাশের গাঁ হরবল্লভপুরের রহমত খবর পেয়ে ধেয়ে এসে গয়াপতির পায়ে পড়ে বলল, 'হুজুর, ওটা ঝালুরাম নয়, নির্যস গরুই বটে। ও হল আমার দুলালি। শ্রীপতিদার কেলে গাই আমার গোয়ালে বাঁধা রয়েছে।'

গয়াপতি দমে গিয়ে বললেন, 'হুম্!'

ঝালুরামের পিছনে দৌড়ঝাঁপ করতে-করতে গয়াপতি বাস্তবিকই টসকে গেছেন। জীপগাড়িতে চড়ে তাঁর গায়ে-গতরে প্রচণ্ড ব্যথা। ইদানীং দুর্গম জায়গায় যেতে হয় বলে ঘোড়াতেও চড়তে হচ্ছে। তার ফলে মাজায় বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝালুরামের কথা ভাবতে ভাবতে সবসময়ে এমন দাঁত কিড়মিড় করেন যে, দুটো বুড়ো দাঁত নড়ে গেল। আজকাল এমন সন্দেহবাই হয়েছে যে, থানার সেপাই, বাড়ির চাকর, এমন কি নিজের মা-বউকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না। এরা যে-কেউই ঝালুরাম হতে পারে বলে আজকাল তাঁর সন্দেহ হয়। হাতে সব-সময়ে রিভালবার। খেতে শুতে স্নান করতে বা বাথরুমে যেতেও হাতে সেটা থাকে। ফলে কেউ ভয়ে তাঁর কাছে ঘেঁষে না।

কাণ্ড দেখে গয়াপতির মা ঝালুরামকে উদ্দেশ করে শাপশাপান্ত করতে লাগলেন, 'কেন রে খ্যাংরাগুফো, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস? তোকে সাপে বাঘে খায় না রে? না খায় তো আমার সমুখে একবার আয় দেখি বুক চিতিয়ে, ঝাঁটা দিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিই। বদমাশ কোথাকার, আমার বাছা খুঁজে খুঁজে হেদিয়ে পড়ল, আর কোন আক্কেলে তুই তার চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিস? বাছা আমার যেমন না খেয়ে না ঘুমিয়ে রোগা হয়ে গেল, তোরও তাই হোক। শুকিয়ে আমসি হয়ে যা না খেয়ে উপোস থেকে তোর পেট-পিঠের চামড়ায় ঘষাঘষি হোক।'

গয়াপতির গিন্নি গিয়ে হেকমতপুরের জাগ্রত কালীবাড়িতে জোড়া পাঁঠা মানত করে এলেন। শুনে গয়াপতির মা বললেন, 'জোড়া পাঁঠা কি গো, ঝালুরাম ধরা পড়লে আমি জোড়া মোষ দেব। তাতেও না হলে জোড়া হাতি দেব, এই বলে রাখলাম।'

গয়াপতি সবই শুনেছেন এবং বুঝেছেন। তিনি যে ঝালুরামকে ধরতে পারবেন এ বিশ্বাস কারো নেই। সেটা বুঝতে পেরে তিনি আরও গুম হয়ে যান। রিভালবারটা বাগিয়ে ধরে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

একদিন সকালে থানায় নিজের অফিসঘরে বসে যখন এমনি ভাবেই ভাবছিলেন, তখন হঠাৎ একটা লম্বা-চওড়া লোক ঘরে ঢুকেই তাঁর বুকের দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বলল, 'হাত তুলুন।'

গয়াপতি রিভালবার সুদ্ধু হাত ওপরে তুলে সভয়ে বললেন, 'মেরো না বাবা ঝালুরাম!'

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি ঝালুরাম নই, আর আপনাকে মারার ইচ্ছেও নেই। তবে আমি শুনেছি যে আজকাল আপনি সবসময় রিভালবার বাগিয়ে থাকেন

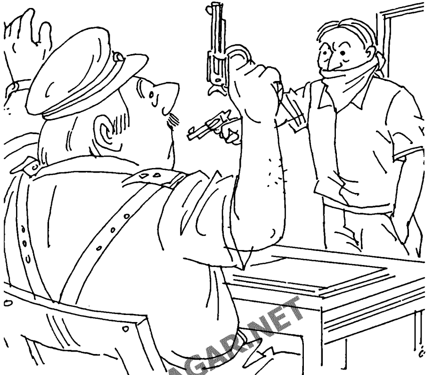

PATHAGAR.NET

আর সবাইকে সন্দেহ করেন। তাই প্রাণের ভয়ে একটু ভয় দেখাতে হল। এখন আপনি যদি আপনার রিভলবারটা খাপে ভরেন, আমিও আমারটা পকেটে পুরব।'

গয়াপতি হাঁফ ছেড়ে রিভলবার খাপে ঢোকালেন। লোকটাও কথামতো কাজ করল। তারপর বসে এক গাল হেসে বলল, 'আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ। নরনাথ চাটুজ্যে আমাকে ভাড়া করে এনেছেন তাঁদের বাড়িতে সোনার হংসেশ্বরীর মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য। তাঁদের ভয়, ডাকাত ঝালুরাম মূর্তিটা লুট করবে।'

গয়াপতি নাক সিঁটকোল। প্রাইভেট গোয়েন্দা বরদাচরণের নাম তিনি শুনেছেন। লোকটা লাউচুরি, গরুচুরি বা বড় জোর ছেলেচুরি কেস করে। তাই গয়াপতি খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ঝালুরামের ব্যবস্থা আমিই করব। আর কারো এখানে নাক গলাতে হবে না।' বরদাচরণ মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি আজকাল লাউচুরি, গরুচুরির মতো ছোটোখাটো কেস নিই না। মাত্র দু' মাস আগে আমি একটা পুকুরচুরি ধরেছি।'

গয়াপতি চমকে গিয়ে বললেন, 'বটে?'

'তবে আর বলছি কী? গয়েরকাটার রাম সিংয়ের বাড়ির ঈশান কোণের মস্ত পুকুর রাতারাতি চুরি হয়ে গেল। রাতেও টলটলে জল ছিল তাতে, সকালে দেখা গেল বিশাল

নিশুত রাতে ঝালুরামের দল চাটুজ্যে-বাড়ি ঘিরে ফেলল। 'রে রে' করে চেঁচাচ্ছে ডাকাতরা। আর সে চেঁচানি এমন সাঙ্ঘাতিক যে, মাটি সুদ্ধু কাঁপতে থাকে। চাটুজ্যে-বাড়ির ভিতরে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। ঝালুরাম নাক সিঁটকে বলল, 'এ বড় ছোট ডাকাতি। ছোটলোকদের কাজ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। নতুন দুটোকে ডাক তো।'

নতুন দু'জন এগিয়ে এলে ঝালুরাম বলল, 'আজ আর আমরা হাত লাগাচ্ছি না। আমার দলবল বাড়ি ঘিরে রইল। আমি ওদিকের বটগাছের তলায় মাদুর পেতে ঘুমোতে যাচ্ছি। তোরা দু'জনে বাড়িতে ঢুকে সব চেঁছে-পুছে নিয়ে আয় গে যা। মান রাখিস, হংসেশ্বরীর মূর্তিটা আনতে যেন ভুল না হয়। আধঘণ্টার বেশি সময় দেব না কিন্তু। চটপট যা।'

হুকুম পেয়ে দু'জনে গিয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই গয়াপতি বললেন, 'বরদাবাবু! এখন উপায়?'

বরদাচরণ ভ্রূ কুঁচকে ভাবিত মুখে বললেন, 'হুকুম-মতো কাজ করে যান। অন্য উপায় তো দেখছি না।'

'কিন্তু আমি যে কখনো সত্যিকারের ডাকাতি করিনি! বাধো-বাধো ঠেকছে যে!'

বরদাচরণ দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'আর আমিই বুঝি করেছি!'

গয়াপতি বিরসমুখে বলেন, 'তা সত্যি কথা বলতে কী, ডাকাতির ট্রেনিং নেওয়ার সময় আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল এ ব্যাপারে আপনার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আমার চেয়ে সব বিষয়েই আপনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার ওপর এখন আবার ডাকাতিতেও বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।'

PATHAGAR.NET

বরাদচরণ শ্লেষের হাসি হেসে বলেন, 'গয়াবাবু, ডাকাতরা তো রাতে ডাকাতি করে, কিন্তু এখানকার লোক জানে যে, আপনি এখানে দিনে ডাকাতি করতেন। রোজ মাছ দুধ পাঁঠা মুর্গি ভেট নিতেন, প্রতি মাসে নগদ টাকায় নিয়মিত ঘুষ খেয়েছেন। কাজেই এই ছোটখাটো একটা ডাকাতিতে আপনার লজ্জার কারণ দেখছি না।'

গয়াপতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেন, 'একটা প্রাইভেট গুলবাজ টিকটিকির এত বড় আস্পদ্দা! কালই তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই এলাকা থেকে বের করে দেব!'

বরদাচরণ সমান তেজে বলেন, 'বেশি চালাকি করো না হে গয়াপতি, বাইরে ঝালুরাম মোতায়েন আছে। যদি বলে দিই যে, তুমি আসলে অপদার্থ দারোগা গয়াপতি, তবে সে হেসো দিয়ে তোমার পেট ফাঁসাবে।'

ঝালুরামের উল্লেখে গয়াপতি কিছু মিইয়ে গেলেন। সত্যি বটে, ঝালুরামের দল এখন ঘিরে আছে চারদিকে। গড়বড় করলে বিপদ হতে পারে।

গয়াপতি শ্বাস ছেড়ে বলেন, 'ঝালুরামকে আমিও বলে দেব যে তুমি প্রাইভেট গোয়েন্দা বাদাচরণ। তোমারও গর্দান যাবে।'

এইভাবে দু'জনের মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল। হঠাৎ চাটুজ্যে-বাড়ির বড় ঘড়িতে একটা বাজার ঢং শব্দ হতেই দু'জনে সচেতন হলেন। সময় বেশি নেই। ঝালুরাম মোটে আধঘণ্টা সময় দিয়েছে।

বরাদচরণ বললেন, 'ঝগড়াটা এখন মুলতুবি থাক গয়াবাবু। হাতে কাজ রয়েছে, বাইরে ঝালুরাম।'

গয়াপতিও মাথা নেড়ে বলেন, 'থাকল। কিন্তু আপনাকে এই বলে রাখলাম, এসব ঝামেলা মিটে গেলে একদিন আপনার সঙ্গে আমার কুস্তি হবে। দেখব তখন কার কত ক্ষমতা!'

'আমি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট।'

'বেল্ট আমারও আছে।'

বরদাচরণ হেসে বললেন, 'সে বেল্ট তো ঝোলা ভুঁড়ি বাঁধার জন্যে। জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট তো নয়। অনেক প্যাঁচ-পয়জার শেখার পর ব্ল্যাক বেল্ট দেওয়া হয়। ওটা একটা মস্ত সম্মান।'

'রাখো রাখো। সম্মান দেখিও না। এলাকায় আমি রাস্তায় বেরোলে লোকে পথ ছেড়ে দেয় জানো?'

'জানি। পাছে তোমার ছায়া মাড়াতে হয় সেই ঘেন্নায় লোকে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।' বরদাচরণ বলেন।

ঝগড়াটা ফের পাকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু বাইরে ঝালুরামের একটা হুংকার শোনা গেল এই সময়ে, 'কই রে! হল তোদের?' কেঁপে উঠে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন।

গয়াপতি বলেন, 'বরদাবাবু! আর দেরি নয়।'

বরদাবাবু বলেন, 'না। আর দেরি করা মোটেই ঠিক নয়।' কাঁপতে কাঁপতে গয়াপতি চলেন, তাঁর দু'পা আগে বরদাচরণ। বরদাচরণ কাঁপছেন না বটে, কিন্তু একটু ঘামছেন। বাগান পার হয়ে সদর দরজায় পৌঁছে দু'জনে মুশকিলে পড়েন। সদর দরজা বন্ধ। কী করে বন্ধ দরজা বাইরে থেকে খুলতে হয় তা ঝালুরাম তাদের শিখিয়ে দেয়নি।

'এখন উপায়!' গয়াপতি বলেন।

'তাই তো!' বরাদাচরণ ভাবিত হলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'আরে দূর! খুব সোজা ব্যাপার। আমি তো গোয়েন্দা বরদাচরণ। চাটুজ্যে-বাড়ির সবাই আমাকে জানে।

'আমাকেও।' গয়াপতি হার মানেন না।

'তাহলে আর মুস্কিল কিসের? পরিচয় দিলেই দরজা খুলে দেবে।'

তাই হল। ধুতির খুঁটে মুখের কালি মুছে, ছদ্মবেশের পরচুলা, নকল গোঁফ, লম্বা জুলপি খুলে ফেললেন দু'জনে। গয়াপতি একটা নকল আঁচিল গালে লাগিয়েছিলেন,

সেটা খুঁটে তুলে ফেললেন। বরদাচরণ খানিক প্লাস্টার দিয়ে নিজের নাকটাকে বড় বানিয়েছিলেন, প্লাস্টারটুকু তিনিও টান মেরে খুলে ফেললেন। তারপর দু'জনে দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁদের গলার স্বর কারো অচেনা নয়। খানিক বাদে নরনাথ চাটুজ্যে দরজা খুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'যাক, আপনারা এসে গেছেন তাহলে?'

গয়াপতি সঙ্গে-সঙ্গে চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেন। আর বরদাচরণ চাটুজ্যেকে বেঁধে ফেলেন চটপট। চাটুজ্যে শুধু করুণ চোখে চেয়ে বললেন, 'কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আমার ঠাকুর্দা কথাটা বলতেন।'

এরপর লুটতরাজ খুবই সহজ হয়ে গেল। বাধা দেওয়ার কেউই ছিল না। যে যার প্রাণভয়ে ব্যস্ত। আধঘণ্টার মাথায় বমাল সমেত গয়াপতি আর বরদাচরণ হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন। বেরোবার আগে দু'জনেই অবশ্য তাঁদের ছদ্মবেশে পরে নিয়েছেন।

বরদাচরণের হাতে সোনার মূর্তিটা দেখে ঝালুরাম তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে, 'সাবাস!'

গয়াপতি একটু তেতো গলায় বলেন, 'হুঁঃ। ও ওটা আনতে পারত নাকি? মূর্তিটা শানের ভিতে গাঁথা ছিল। আমি টেনে হিঁচড়ে না নাড়লে ওর একার সাধ্য ছিল না।'

ঝালুরাম গয়াপতিরও পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'তোরও এলেম কম নয়। কতগুলো সোনার গয়না এনেছিস!'

শুনে বরদাচরণ বললেন, 'গয়না খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি যদি ওর পেটে থাকত! ডাকাত পড়ার খবর পেয়েই মেয়েরা সব কচুবনে গয়না ফেলে দিয়েছিল। আমিই বুদ্ধি করে বের করি।'

ঝালুরাম তখন আবার বরদাচরণের পিঠ চাপড়ায়। তাতে গয়াপতি ফুঁসে উঠে বলেন, 'চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেছিল কে শুনি? তোমার সাহস হত?'

বরদাচরণ বলেন, 'আর চাটুজ্যেকে বাঁধল কে? সেটাও জোর গলায় বলো।'

এইভাবেই দু'জনে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লেগে পড়েন। ডাকাতরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনের ঝগড়া দেখে। ঝালুরাম দু'জনেরই পিঠ চাপড়ে একবার একে আর একবার ওকে সাবাস দিতে থাকে। কিন্তু ঝগড়া তাতে বাড়ে বই কমে না। একে সাবাস দিলে ও চটে ওঠে, ওকে দিলে এ ফুঁসে ওঠে। চেঁচানির চোটে সারা গঞ্জের ঘুম ছুটে যায়। আর কখন যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশ নিয়ে এসে গোটা দলটাকে ঘিরে ফেলেছেন তাও ডাকাতরা ভালমতো টের পায় না।

গয়াপতির মা দু'-দুটো মানত করেছিলেন। ঝালুরাম ধরা পড়লে জোড়া হাতি দেবেন, আর নিরুদ্দেশ গয়াপতি ফিরে এলে জোড়া উট।

কিন্তু সস্তায় হাতি বা উট পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

PATHAGAR.NET

গেঞ্জি

তারাপদ রায়

॥ ভূমিকা ॥

আমার ছেলে কিছুতেই বাচামাছ খেতে চায় না। যাঁরা খান, জানেন বাচামাছ জাবদা বা ট্যাংরার মতোই কিম্বা তার চেয়েও সুস্বাদু জাতের মাছ। একবার কয়েকদিন পরপর বাজারে বাচামাছ উঠলো, দামও খুব চড়া নয়। আমি নিজেই বাজার করি, ইচ্ছে করে এবং ছেলেকে জোর করে বাচামাছের স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্যে পরপর তিনদিন বাচামাছ কিনে আনলাম বাজার থেকে। হয়তো এর পরেও আরো কয়েকদিন আনতাম যদি না আমার স্ত্রী মারমুখী হতেন।

সে যাহোক, বাড়িতে বাচামাছের প্লাবনেও আমার ছেলে কিন্তু বাচামাছ স্পর্শ করলো না, বাচামাছের একটা টুকরোও খাওয়ার পাতে ছুঁলো না। তৃতীয় দিনে তার এই মৎস্য সত্যাগ্রহের পর যখন তাকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি?' সে বিনীতভাবে জানালো, 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই।'

ভূমিকাতেই বলে রাখা ভালো আমার এই সামান্য গল্পটি মাছ বা মাছ খাওয়া নিয়ে নয়, তার চেয়ে অনেক গুরুতর বিষয়ে, একালের ঐ শ্লোগান 'বাঁচার লড়াই' নিয়ে।

সম্ভবত এই গল্পটির নাম পাঠ করে কোনো কোনো কৃতবিদ্য পণ্ডিত তৎসহ সাহিত্যের পাঠকের এই নামে একটি বিখ্যাত উপন্যাসের কথা মনে পড়তে পারে। আমার স্বীকার করা উচিত, ঐ কালজয়ী গেঞ্জি উপন্যাসটির কাহিনীর সঙ্গে মিল না থাকলেও এবং এটি একটি ক্ষুদ্র গল্প হলেও, ঐ একই জাতের জীবনসংগ্রাম, যাকে অধুনা বাঁচার লড়াই বলে, আমার অক্ষম লেখনীতে এক্ষণে আমি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি।

॥ কাহিনী ॥

পৈলান বাস স্ট্যান্ডে নেমে একটু এগিয়ে মোড় ঘুরে হাঁটাপথে মাত্র তিন মাইল। জীবনে এই আমার দীর্ঘতম পদযাত্রা। কোনো উপায় নেই, প্রাণের দায়ে হাঁটতে হল। পথে রেলিংহীন একটি পঞ্চাশ হাত বাঁশের সাঁকো, যার শেষ প্রান্ত এবং খালধারের মধ্যে দূরত্ব দীর্ঘ লম্ফে অতিক্রম করতে হয়, সেও প্রায় ছয়-সাত হাত। প্রাণের দায়ে সেটুকুও লাফাতে হল। কাদামাটিতে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে একটা গড়াগড়ি দিতেই হল। সকালবেলা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে বেরিয়েছিলাম। এখন যা চেহারা হল বলার নয়।

PATHAGAR.NET

লাফের পর মিনিট দশেক দম নিয়ে আবার হাঁটতে হল। এমনিই সারাক্ষণ আমার দমবন্ধ ভাব, তার উপরে এই হুজ্জোত আমাকে পোহাতেই হচ্ছে।

ব্যাপারটা আরেকটু আগের থেকে খুলে বলা উচিত। বছর দুয়েক হল আমার কেমন একটা গলাচাপা, দম বন্ধ ভাব। বাসায় বা বিছানায় ভালোই থাকি। সকালবেলা খোলামেলা খালি গায়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে বেশ আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি। বিকেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে স্নানটান করে স্বস্তি ফিরে পাই। কিন্তু যখনই রাস্তায় বেরোই বা কাজে যাই, কেমন যেন কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে, নাকের ডগা লাল হয়ে ওঠে, চোখ টনটন করে, মাথা ঘুরতে থাকে, রীতিমত দমবন্ধ অবস্থা দাঁড়িয়ে যায়।

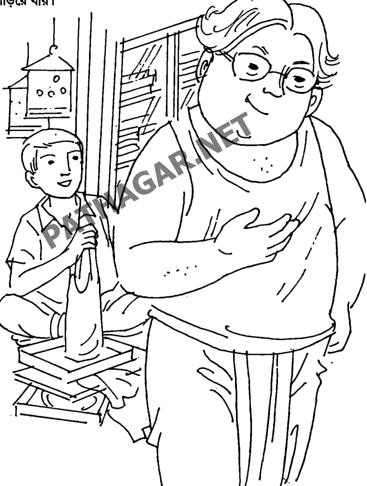

PATHAGAR.NET

একদিনে এরকম হয়নি। আস্তে আস্তে হয়েছে। যখন কষ্ট বাড়লো অফিসের এক বন্ধুকে বললাম। তিনি একবাক্যে রায় দিলেন, 'তোমার প্রেশার হয়েছে।'

প্রেশার হয়েছে কথাটা এমনিতে নিরর্থক। নিচু হোক, উঁচু হোক প্রেশার তো জীবিত মানুষের থাকবেই। শুধু যখন সে মরে যাবে তখন প্রেশার থাকবে না।

প্রেশার ব্যাপারটা আমি অবশ্য ভালো বুঝি না। আমার দাদাকে একবার ডাক্তার বলেছিলেন, 'আপনারই হাই-লো-প্রেশার।' দাদা ধরে নিয়েছিলেন হাই এবং লো যখন একসঙ্গে, সুতরাং মাঝারি, সুতরাং নর্মাল; তাই কোনোও চিকিৎসা করাননি। শেষে এক গোধূলি লগ্নে আমাদের এক আত্মীয়কন্যার বিবাহমণ্ডপে কনের পিঁড়ি ধরে সাতপাক ঘোরানোর সময় প্রথম পাকের মাথায় দাদা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সেই ঘূর্ণমান অথচ ভূপতিত মস্তকে প্রথমে পড়লো শতাব্দী প্রাচীন আধমণি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি এবং তারপরে পড়লো সিকিশতাব্দী প্রাচীন দেড়মণি নাদুসীনুদুসী কনেটি।

পরে জানা গিয়েছিলো ঐ হাই-লো প্রেশারের ব্যাপারটা। হাই-লো অর্থাৎ উচ্চনিচ রক্তচাপ অর্থাৎ খুব বেশি নিচু। ব্যাপারটা না বোঝার জন্যে আমার অগ্রজের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল, ঐ ঘটনার পরে জ্ঞান ফিরে আসার থেকে তাঁর বিবাহ, রমণী এবং কাঠের উপর সম্পূর্ণ অনীহা জন্মায়।

আমার অশ্রুগ্রন্থি দুর্বল। অগ্রজের কথা লিখতে গেলে আমার চোখে জল আসে। তার চেয়ে নিজের কথা লিখি।

আমার রক্তচাপ বারবার বহু ডাক্তারের কাছে মাপিয়ে দেখেছি, মোটামুটি স্বাভাবিক। নানা রকম ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েও দেখলাম, আমার তেমন খারাপ কিছু ধরা পড়লো না। ঘুম, খিদে, হজম ইত্যাদিও চমৎকার। কিন্তু বাড়ির মধ্যেও কেমন একটা দমবন্ধ ভাব, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে, গলা শুকিয়ে যায়, মাথা ঘোরে।

কোনো ডাক্তারই যখন চিকিৎসা করে সুরাহা করতে পারলেন না, তখন কোবরেজি, হোমিওপ্যাথি সবই চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হল না, সেই পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কটের মতো অবস্থা প্রায়। তবু অবশেষে মুষ্টিযোগ, তারপরে যোগব্যায়ামের পথে এগোলাম। বিশেষ সুবিধা হল না। মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ব্যথা হল। শীর্ষাসন করার সময় হঠাৎ বাড়ির বহু পুরনো বুড়ো হুলো বেড়ালটা কেমন চমকে গিয়ে আমার নাকটা আঁচড়ে দিলো। নাকের মাংস বড় নরম, দরদর করে কপাল বেয়ে রক্ত পড়ে মাথার চুল আঠা হয়ে গেলো।

সবচেয়ে বেকায়দা হয়েছিলো জল চিকিৎসা করতে গিয়ে। শায়িত অবস্থায় কাঁচা মাটির হাঁড়িতে চুমুক দিয়ে সাত সকালে পর পর সাত হাঁড়ি জল শুয়ে শুয়ে খেতে হবে বিছানা পরিত্যাগ না করে। যে সময়ে জলত্যাগ করার জন্যে মানুষ বিছানা পরিত্যাগ

PATHAGAR.NET

করতে বাধ্য হয় ঠিক সেই সময়ে সাত হাঁড়ি জলপান করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এদিকে সেই মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ, দমবন্ধ ভাব সেটা কিন্তু লেগেই রয়েছে।

অগত্যা পৈলান, পৈলানের পথে আসি। অবশ্য ঠিক পৈলান নয়। পৈলান থেকে তিন মাইল অর্থাৎ পাঁচ কিলোমিটার দূরে বড় মহাদেবপুর। বড় মহাদেবপুরের শেষ সীমানায় গ্রামের কুমোরপাড়া, সেখানে খোকা পালের বাড়িতে সাদা আমড়া রোদ্দুরে শুকিয়ে যখন ঝরঝরে হয়ে যাবে, হামানদিস্তায় ছেঁচে একরকম হাল্কা তেল বেরোবে, সেই তেল নাকে দিয়ে ঘুমোতে হবে। এই রকম সাত রাত চালাতে পারলেই চোখ টনটন, কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ ডাক, নাকের ডগা লাল হওয়া সব সেরে যাবে।

পরামর্শটা দিয়েছিলেন আমার এক সহকর্মী। মহেশবাবু। মহেশবাবুর মামাশ্বশুরের এই সাদা আমড়ার তেল নাকে দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। মহেশবাবু আরো বলেছিলেন, কলকাতার যত বড় বড় ডাক্তার তাঁরা রোগীকে যতসব উল্টোপাল্টা ওষুধ খাওয়ান কিন্তু নিজেরা গোপনে এই সাদা আমড়ার তেল নাকে দেন, কোনো ওষুধ স্পর্শ করেন না।

আজ বড় মহাদেবপুরে বড় আশা নিয়ে এসেছি। কিন্তু আশা পূর্ণ হল না। কুমোরপাড়ার খোকা পালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমড়া গাছে আর সাদা আমড়া হচ্ছে না, অন্য গাছে যেমন হয়, তেমনিই স্বাভাবিক সবুজ রঙের আমড়া হচ্ছে।

খোকা পাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। যদিও সে আমাকে কখনো দেখেনি, আমি তাদের উঠোনে পা দিতেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বোঝা গেল সাদা আমড়ার ব্যবসায় তার বিলক্ষণ দু' পয়সা হচ্ছিলো, এখন আমড়ার শুভ্রতা চলে যাওয়ায় সে পথে বসে পড়েছে। সাদা আমড়ার উপর নির্ভর করে সে জাতব্যবসার সম্বল কুমোরের চাকটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছে।

আমি আর কি করবো, নিজের ভাগ্যকে মনে মনে বলিহারি দিয়ে দম বন্ধ, কান ভোঁ ভোঁ, নাক লাল, চোখ টনটন চিরস্থায়ী ধরে নিয়ে পৈলানের হাঁটা পথে কলকাতার মুখে রওনা হলাম।

এখন রোদ আরো চড়া। তবে এবার আর সেই খালধার থেকে বাঁশের সাঁকোয় লাফিয়ে উঠতে গেলাম না। খালের মধ্য দিয়ে হেঁটে পার হলাম। জামাকাপড় তো আগের বারেই কাদা মাখামাখি হয়ে গেছে। আরো একটু কাদজল লাগলো।

বাসস্ট্যান্ডে যখন এসেছি, রোদ্দুরে শুকিয়ে সারা গায়ে কাদা চটচট করছে। শরীরের অস্বস্তির জন্যে কষ্ট হচ্ছে, এমন সময়ে চোখে পড়লো পাশে একটা হোসিয়ারির দোকান। মনে মনে ভাবলাম, এখান থেকে গেঞ্জি কিনে নিই। তারপর গায়ের কাদামাখা জামা আর গেঞ্জি ছেড়ে নতুনটা পরে নেবো, একটু আরাম হবে।

PATHAGAR.NET

দোকানটার ভেতরে গেলাম। অল্পবয়েসি একটি ছেলে, বড় জোর কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে, কাউন্টারে বসে রয়েছে। আমি তাকে গিয়ে বললাম, 'ভাই, একটা চৌত্রিশ সাইজ হাতাওয়ালা গেঞ্জি হবে?'

ছেলেটি এতক্ষণ আমার কর্দমাক্ত পোশাক পর্যবেক্ষণ করছিল। আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর প্রশ্ন করলো, 'কত সাইজ? চৌত্রিশ? কার জন্যে?'

আমি বললাম, 'আমার জন্যে। আমার চৌত্রিশই লাগে।'

ছেলেটি বললো, 'আপনি নিশ্চয় রোগা ছিলেন তখন চৌত্রিশ লাগতো।'

আমি ভেবে দেখলাম, ছেলেটি ঠিকই বলেছে। বহুকাল ধরে চৌত্রিশ নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আসছি, এর মধ্যে আমার ওজন অন্তত সোয়াগুণ বেড়েছে।

ছেলেটি এরপরে বললো, 'আর তাছাড়া আজকাল গেঞ্জির সাইজগুলোও ঠিক নয়। চৌত্রিশ সাইজের গেঞ্জির সাইজগুলোও ঠিক নয়। চৌত্রিশ সাইজের গেঞ্জি দরকার হলে কিনতে হবে ছত্রিশ। আর আপনার এখন দরকার ছত্রিশ আপনাকে কিনতে হবে আটত্রিশ।'

আমি অবাক হয়ে ছেলেটির কথা শুনছি, এবার ছেলেটি মোক্ষম কথা বললো, 'আটত্রিশের জায়গায় এখন যদি আপনি চৌত্রিশ গেঞ্জি গায়ে দেন তাহলে আপনার কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করবে, নাকের ডগা লাল হয়ে উঠবে, চোখ টনটন করবে, মাথা ঘুরবে, দম বন্ধ হয়ে আসবে।'

আমি অবাক হয়ে দোকানি ছেলেটির কথা শুনছি। সমস্ত লক্ষণ মিলে যাচ্ছে, কান ভোঁ ভোঁ, নাক লাল, চোখ টনটন, দম বন্ধ, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার কর্দমাক্ত জামাসুদ্ধ চৌত্রিশ নম্বর গেঞ্জি থেকে মুক্ত হলাম।

আঃ কি আরাম! সঙ্গে সঙ্গে সব উপসর্গ দূর হয়েছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে না, চোখ টনটন করছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে না, নাক-মাথা সব ঠিক। আমি ছেলেটির কাছ থেকে একটা আটত্রিশ নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিলাম।

এরপর থেকে আটত্রিশ নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিচ্ছি, আর ডাক্তার-বৈদ্য, ওষুধ-টোটকা লাগে না। আর কান ভোঁ ভোঁ করে না, নাক লাল হয় না, চোখ টনটন করে না, মাথা ঘোরে না, আর দম বন্ধ হয়ে আসে না।

PATHAGAR.NET

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

নবনীতা দেব সেন

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—'তুইল্যা ফ্যালাও, তুইল্যা ফ্যালাও।' পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন রুইমাছের পেটি ত্রিশঙ্কু—

—'ওনারে জিগাইসিলা?'

—'না তো।'

—'ওই তো দোষ। পরিবেশনের একটা রুল্‌স আছে না? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—আপনি কি মাছ নিবেন?' মহিলা এই সময়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

মেসোমশায় সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন, 'বল? রুন্টু বল? আপনি কি মাছ নেবেন?' মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশায় যারপরনাই হতাশ মুখে বললেন, 'আইজকাইলকর ইয়ংম্যানদের মেইন ডিফেক্ট তো এই! ঠিক যেইটা কইলাম তার অপজিটটা করলা তো? না জিগাইয়াই দিলা। এই ভেবেই ওয়েস্টজ হয়। সরকার তো এইটাই মানা করে। যেমন সৌম্য ডিসওবিডিয়েন্ট, তেমনই বন্ধু!' আমি এবারে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে বসি—

'আপনি কি মাছ নেবেন?' মহিলা আবার বললেন, 'হ্যাঁ'। মেসোমশাই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন।

—'রাইট। জাস্ট লাইক দিস্। জিগাইয়া লইয়া তবে সেনা পাতে দিতে হয়। দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুই খান মাছ দ্যাও দেহি—মনে হয় মাছটা উনি ভালোই খান। মাছটা যারা ভালো খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভালো খায় না।'

মহিলা বলেন, 'আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালবাসি'। এবার জিবে একটা অধৈর্য শব্দ করে মেসোমশাই উভয় হস্ত উত্তোলন করেন—'আহা, আপনের কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশন হইতাসে। আপনের লাইগ্যা মাছ-মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড়ো কইর‍্যা লাভ কি? অল ইন গুড টাইম, মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন। অরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এই ধারে আনস্ নাই?' হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ফুটন্ত কেটলির মতো মাসিমা বললেন—

PATHAGAR.NET

'কি বলছিলে তুমি? কি উচ্চারণ করলে এইমাত্র?'

—'কইতাসি যে চিংড়ি মাছটা'—

—'চিংড়ি মাছ? চিংড়ি মাছ হয়নি, তা জানো না?'

মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রিজ ভেঙে পড়ে।

—'হয় নাই? স্ট্রেইনজ; সেইদিনই যে মেনু হইল?'

—'মেনু হল, খাওয়াও তো হল। খেলে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদা চিংড়ি? চিনুর পাকা দেখার দিনে? বিয়েতে চিংড়ি মাছের কথা কবে হল?'

—'আলবাৎ কথা হইসিল।'

—'কক্ষনো হয়নি।'

—'সার্টেনলি হইছিল।'

—কক্ষনো হয়নি। হয়নি। হয়নি।'

—'ইউ শাট্ আপ।'

—'কেন, কিসের জন্য আমি শাট্ আপ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে। ছি ছি গুলিখোর-গাঁজাখোরের মতো কি বলতে কি যে বলছো! কি লজ্জা লজ্জা!'

—'ক্যান? লজ্জার হইলটা কি? শুনি? চিংড়ি মাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা? এইয়্যার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী?'

—'লজ্জার এই যে, তোমার বাক্যি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে, ছিঃ ছিঃ'—

'অত ছি-ছি-য়ের কি আছে? মোটেই কেউ তা ভাবে নাই। সকলেই জানে আমি সার্ভিস করি, সার্ভিস। বোঝলা? আমি কি বিজনেস করি, যে হোর্ডিং করুম? হোর্ডিং করা আমার নেচার না।' বোধহয় এই, 'হোর্ডিং করা' শব্দটিতে মাসিমার ইংরিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন, 'ওসব জানি না বাপু, লোক যা ভাবার তাই ভাবলো। ব্যস্। সে তোমার নেচার যেমনিই হোক।'

—'আরে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আর যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া আগে কইয়া দিতাসি, যে মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়ি মাছ হয় নাই।'

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবার মধ্যস্থলে দাঁড়ান, বাফারস্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বছর দুই বাদে এই প্রথম ঘরে ফেরা। মাত্র তিন হপ্তার ছুটিতে, বোনের বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুর সাড়া জেগেছে, আত্মীয়মহলে (বুড়োর ঘড়িটা দেখস্স? বুড়ো কোন দিকে?) রম্রমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশায় কিছুতেই ঠিক মতো বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনো দিনই বাইরে যায়নি ছেলে, ভাবখানা এমনি। বুড়োদার সেটা সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবার

PATHAGAR.NET

কাছে জোর করে ইম্পর্ট্যান্ট আদায় করছেন। বাবা-মায়ের মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন, 'যাক বাবা, লেট ইট এনড হিয়ার। ডোন্ট ক্রিয়েট আননেসেসরি কমপ্লিকেশান্স্।' অবশ্য বুড়োদা বিন্দুবিসর্গও জানেন না বর্তমান সমস্যাটা কি। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—'বুড়া তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশনস কি আমি করি? নেভার, হেইডা যে করার সে করসে। তোমার গর্ভধারিণী।' মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ করতেই বুড়োদা তাঁর কাঁধটা খামচে ধরে সাদরে একটি গুল্ সার্ভ করেন—'চলো মা, ওঘরে চলো, চিনু তোমায় খুঁজছিল।' সাপের ফণায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনের কাছে চলে যান।

সৌম্যের বাবা, আমাদের পড়শী এই মেসোমশায়ের দেশ পূর্ববঙ্গে, আর মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছর একটানা কলকাতায় বাস করার ফলে মেসোমশাই এখন নির্বিকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙালা ভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমার মুখের মিঠে শান্তিপুরী বুলির নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটি-বাঙালের ঝগড়া হত, চিনুদি আর মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ, ওরা মামার বাড়ির আঁচলধরা, মোহনবাগান সাপোর্টার—কিন্তু বুড়োদা আর সৌম্য বাপ-ঠাকুর্দার বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, ফরএভার ইস্টবেঙ্গল। সেই চিনুদির বিয়ে আজ। সৌম্য বলল—'রন্টু তুই বাবাকে আজ একটু চোখে চোখে রাখিস রে, আমি তো নানদিকে ব্যস্ত থাকব, বাবা ওদিকে ফিল্ড খালি পেলে হেভি কেলেংকারি করবেন।' এ কাজটা পাড়াসুদ্ধ সবারই অভ্যাস আছে। পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়। মেসোমশাই কি করতে কি করে বসেন? আর আজ তো এক্কেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়ের কন্যাদায়। অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশায় নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা, নিমন্ত্রণ পত্রেও তাঁরই নাম।

রান্নাবান্নার, 'খাওনদাওনের' চার্জে আছেন কনের করিৎকর্মা সেজ কাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসিরা। বাড়িভাড়া, বাড়ি সাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোট কাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশনের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসব বাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পারটিশিপেশানে নারাজ—তা এক্কেবারেই না। অতএব চর্কিবাজির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি 'কন্যাকর্তার যোগ্য' কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন। এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে খুব ভাঙা চেয়ার, এবং ফরাস পাতানো ইন্সপেকশান করছেন। একটা ঘরের ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপন

মনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন, 'তোমরা মনু অই ঘরটায় বস গিয়া। এ ঘরে কিন্বা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

'অ্যাতগুলা কাস্‌সা-বাস্‌সা—দুই-চারটা প্রসসাব কইর‍্যা দিলেই হইল—? ব্যস; সাধের বিয়েবাড়ি ফিনিশ।' এত্ত অপমান? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা উঠে অন্যত্র পালায়। বছর বারো-তেরোর ধুতি পানজাবি চন্দনের বোতাম পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন, 'তোমরাও মনু, উইঠ্যা ঐ ঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস ওনলি।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে 'পোলাপানগো কথা। কওন তো যায় না। প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ?' গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেগুলো এবারও উঠে দাঁড়াল না। একটা সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই-মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই। 'বাবু, মিষ্টি কোথায় রাখবো?' মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সো—ও—জা উপরে তিনতলায় লইয়া যাও, স—ব অ্যারেন্‌জমেন্ট করাই আছে। রন্টু তুমিও সাথে সাথে যাও।'

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যান্ডেল বাঁধা, ছাঁদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা—ছাঁদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে।

মিষ্টির ঝুড়িওয়ালাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম—মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের ডাঁইয়ের পাশে একটা আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন, 'জায়গাটা পাইলা না বুঝি? যাও তবে ভাঁড়ারে লইয়া যাও।'

'ভাঁড়ারটা কোন দিকে?'

'সেটাও আমারেই কইয়া দিতে লাগবো? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা বানাইসি? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুই জনেই আউটসাইডার। একটু কমনসেন্স ইউজ করবা তো রন্টু? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও তোমার মাসিমারে জিগাও গিয়া।'

মাসিমা যেন এখানে আউটসাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এই বাড়িতে পদক্ষেপ করেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশাই আর একজনকে ডাকলেন।—

'এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।' গণেশ সৌম্যের আরেক বন্ধু। 'তুমিও যাও, গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাওগা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই স্যুট করবো। ভাঁড়ার ঘরের সামনেটায় খাড়াইয়া থাকবা হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও য্যান চুরি কইরা খায় না, মেকুর-বিরাল কি পোলাপান—বি কেয়ার-ফুল, বোঝলা? খুব সাবধান। যাও।'

PATHAGAR.NET

খানিক পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল—'রন্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগির ডাকছে।' গিয়ে দেখি ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি দই-মিষ্টির হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ণ গণেশ ছড়ি হাতে দণ্ডায়মান, যেন জ্বলন্ত কাসাবিয়াঙ্কা। একবার বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে, একবার ডান পায়ে। আমাকে দেখেই বলল—'যা তো রন্টু, সেজ কাকার কাছে। শিগগির একটা তালা নিয়ে আয়। এটা কি মানুষের কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টির সামনে এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টরচার।'

গণেশের নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেতে-টেতে একটু বেশি ভালবাসে। এই বয়সেই দিব্যি একটি ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মেসোমশাই ওকে আদর করে ডাকেন 'গণেশ'। সেটাই পাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে। সেজ কাকা তো শুনে অবাক। 'মিষ্টির সামনে ছড়ি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত না খামার?' তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজ কাকা নিজে যখন তালা মারার তোড়জোর করছেন অর্থাৎ টেকনিকেল গণেশের ডিউটি অফ্ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কয়েকটি মাত্র সেকেন্ডের মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চারেক সন্দেশ সটাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত ফাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কার সচরাচর দেখা যায় না, এবং গণেশের মতে, এতে নীতিগত কোনো বিরোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম।

—'আহা—কলাগাছ আনে নাই তো হইসেটা কি?' মেসোমশায়ের গলা।—'চাইর চাইরখানা কলাগাছ দিয়া হইবোটা কি? জানাবোটা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাদনাতলায় কলাগাছ লাগে না। নেভার, আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছের লাইগ্যা বাজারে গিয়া কাম নাই। সিধা ছাদে চইল্যা যাও, চাইর কর্নারে চাইরখানা ইটা লাগাইয়া দ্যাও। বাস? ফার্স্ট ক্লাশ'। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায় কন্‌ভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যের ছোট কাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, দুই বগলে চারটে কলাগাছ। 'এই যে, খোকন, হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আন্‌ছস? যেইটার দরকার নাই ঠিক সেইটাই। টোটালি আননেসেসারি ওয়েইস্টেজ।' বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমার 'মঞ্চে প্রবেশ' ঘটেছে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন, 'কই? শুনছো?'

আর না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

—'তুমি নাকি বলেছো ছাদানতলায় কলাগাছ লাগে না? তোমাদের গুরুর বারণ?'

—'আরে ধুর। কে কইল? আমি তো কইলাম ক্যান্—কলাগাছে কামড়া কি? এইডা কি মা দুর্গার পুত্রের বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং ক্যানসেল? জামাইবাবাজী কি গণেশ ঠাকুর? না কি এইডা বৈষ্ণবের কালীপূজা? অরা পাঠার

PATHAGAR.NET

বদলি কলাগাছ বলি দেয় থোড় দিয়া ভোগ রান্না করে কইবা শুনসিলাম। অগো লেইগা কলাগাছ ইনডিস্‌পেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘরে তো চিনুই আছে।'

মাসিমা এবার বললেন, 'হ্যাঁগা তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেবো?' লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বলেন, 'তুমি আর ফাঁস দিবা ক্যামনে? তুমি নিজেই তো ফাঁস। আমি তো তোমারেই গলায় পইরা ফাঁসি লাগাইসি। দড়ির কি গলায় দড়ি হয়? হয় না।' এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইরে ডাকলেন। মেসোমশায়ের মুখটি মলিন হয়ে গেল।—'অহনই আউতাসি'—বলে উপরে উঠে গেলেন হন্তদন্ত ভাবে। যাবার আগে মাসিমার কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন, 'দ্যাখলা তো? মেজো ভায়রা। গাড়ি ড্রাইভার ধার দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ না কাম নাই আমারে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। য্যান সেই আইজ কন্যাকর্তা। কত বড় ভি আই পি লোক। হুঃ আমি আর যামুই না নিচে।' বলে, সোজা ছাদে পালালেন, যেখানে কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। খানিক বাদে আমিই ওপরে গেলাম মেসোমশায়কে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে সৌম্যের বড় মামার সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'খাওন-দাওন ঠিকমত হইসে তো?'

সৌম্যের মামা ঢেঁকুর তুলে বললেন, 'ব্যবস্থা তো চমৎকার, কেবল ডালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে।'

'তাহলে আপনি এট্টু ঠাকুরগো লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারই। তাহলে লবণটা আপনারে স্বহস্তে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো।' হতবাক্ শ্যালকের মুখটি কালো করে দিয়ে, বীরদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতার বনেদী বড় ঘর সৌম্যের মামার বাড়ি। উদ্বাস্তু মেসোমশাই ভালো ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যের দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একেই ধনী, তায় ঘটি।

—'কইলকাতার কায়েত তো' প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—'তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ। জিলাবীর প্যাঁচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয়না, কয় কুটিলতা।' চান্স পেলেই তিনি শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দেন। নিচে আসা মাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দু'জনে। সাক্ষাৎ মাত্রেই প্রেমালাপ। মেসোমশাই একেবারে ট্যাক্‌টিক্‌স বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

'এই যে আইলেন। তোমাগো লাইগাই যত গোলমাল, খালি হই হই, খালি হই হই।'

—'আমি আবার হই হইটা কী করলুম শুনি? গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই...কী বলেছ তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?'

PATHAGAR.NET

—'কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?'

—'জানো না? জানো না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি—ছি—ছি। কি লজ্জা! কি লজ্জা! ঘরে বসেছিল তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ আবার বলেছ কিনা ফরাসে সে নাকি হিসি করে দেবে।'

—'কে কইল? আরেঃ সমস্ত বাজে কথা। কি কইতে কি কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাসসা-বাসসাগুলো গিশ গিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কিনা, তুমিই কও? এ্যাকসিডেন্টালি পোলাবানগো কথা, বলাতো যায় না?'

—'এ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে এ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হল? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে—তার ভাই তো আর জানে না তুমি কি বস্তু? নতুন কুটুম—ছি—ছি—' কৃষ্ণা সৌম্যের ছোট কাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হল।

—'আমি কি কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুম বাড়ির পোলা? সব কয়ডা এগুাগাগুাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই।'—

—'ও আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলেন? এবারে বোঝা গেল।'

—'না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি সইত্য বলতে কি'—

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে। দু'জনের চাইতেই এক মাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন, 'এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত আমি স্পষ্ট শুনেছি, যে তুমি বলেছিলে', অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন।

'দেখলি তো বুড়ো, দেখলি তো, তোর বাবা কি করেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল।' মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, 'যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে...।'

খেয়ে-দেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন, 'শোনো রন্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও'—কোনো জরুরি কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গিয়েছি মেসোমশাই আমার কানে কানে ফিসফিস করলেন, 'যে যার বউরে। বোঝলা রন্টু? যে যার বউরে।' আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবেশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন—'মেজ ভায়রাও তার গাড়িটা দিসে, আরও একটা গাড়ি আমি রেইন্ট করসি। চিনুর মামাগুলো, সব শালারা ওর গাড়ি কইরা যে যার বউরে আনাইতেসে।

এভরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য্যান ওই জন্যই দ্যাশে কার রেন্টাল-সিস্টমটা চালু আছে। যত সব সেলফ্সেন্টারড ঘটি।'

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদী গলায় বললেন, 'উঃ, বড্ড চা তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু জামাইবাবু।' সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠাকুর লিরে আর অহন আপসেট কইরা কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও'—বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন ছেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশি দূরে না। বার হইলেই দ্যাখবা ফুটপাতে সার সার চায়ের স্টল। সার সার, সার সার।' মহিলার মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই। 'রন্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লিগা দিসি।' আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি। পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না? ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই, উনি কি করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রিমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 'খাড়াও, ইউ আর আ গুড বয় রন্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ পয়সা লইয়া যাও, দুই খুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লিগাও একটা আইন্যা দিও।' এবার মলিনা হেসে ফেলেন।

—'আপনার আর আমার কি একটা খুরি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?' লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন, 'ওঃ হো, তিনজনার তিন খুরি চা, থ্রি কাপস।' বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, 'কী চা আনা হচ্ছে নাকি,' বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুররাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে। মেসোমশাই যারপর নাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন, 'রাইখ্যা দ্যাও রাইখ্যা দাও। কাজে লাগবোই পরে গরম কইরা খাইলেই হইব, কি কও, মলিনা?' মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়েবাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাতের কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চা বিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এই সঙ্গে রাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে?) এঁর আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বলল—'আমাগো টাইমে তো মা-মাসিমারা চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবো না। অলস। তাই ফাইব

PATHAGAR.NET

—'কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?'

—'জানো না? জানো না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি—ছি—ছি। কি লজ্জা! কি লজ্জা! ঘরে বসেছিল তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ আবার বলেছ কিনা ফরাসে সে নাকি হিসি করে দেবে।'

—'কে কইল? আরেঃ সমস্ত বাজে কথা। কি কইতে কি কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাসসা-বাসসাগুলো গিশ গিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শ্যাষ কইরা দিত কিনা, তুমিই কও? এ্যাকসিডেন্টালি পোলাবানগো কথা, বলাতো যায় না?'

—'এ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে। সে এ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হল? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে—তার ভাই তো আর জানে না তুমি কি বস্তু? নতুন কুটুম—ছি—ছি—' কৃষ্ণা সৌম্যের ছোট কাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হল।

—'আমি কি কইরা জানুম সে ছ্যামরা কুটুম বাড়ির পোলা? সব কয়ডা এগুাগাগুাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই'—

—'ও আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলেন? এবারে বোঝা গেল।'

—'না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি সইত্য বলতে কি'—

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে। দু'জনের চাইতেই এক মাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন, 'এটা কিন্তু খুবই সেলফ কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা হচ্ছে বাবা। প্রথমত আমি স্পষ্ট শুনেছি, যে তুমি বলেছিলে', অমনি মাসিমা ফুঁপিয়ে ওঠেন।

'দেখলি তো বুড়ো, দেখলি তো, তোর বাবা কি করেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল।' মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, 'যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে...।'

খেয়ে-দেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ-ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন, 'শোনো রন্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও'—কোনো জরুরি কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গিয়েছি মেসোমশাই আমার কানে কানে ফিসফিস করলেন, 'যে যার বউরে। বোঝলা রন্টু? যে যার বউরে।' আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবেশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন—'মেজ ভায়রাও তার গাড়িটা দিসে, আরও একটা গাড়ি আমি রেইন্ট করসি। চিনুর মামাগুলো, সব শালারা ওর গাড়ি কইরা যে যার বউরে আনাইতেসে।

এভরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য্যান ওই জন্যই দ্যাশে কার রেন্টাল-সিস্টমটা চালু আছে। যত সব সেলফ্‌সেন্টারড ঘটি।'

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদী গলায় বললেন, 'উঃ, বড্ড চা তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু জামাইবাবু।' সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠাকুর লিরে আর অহন আপসেট কইরা কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও'—বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন ছেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশি দূরে না। বার হইলেই দ্যাখবা ফুটপাতে সার সার চায়ের স্টল। সার সার, সার সার।' মহিলার মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই। 'রন্টু, তুমি নিলা ক্যান? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লিগা দিসি।' আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি। পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না? ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই, উনি কি করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এক্সট্রিমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 'খাড়াও, ইউ আর আ গুড বয় রন্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ পয়সা লইয়া যাও, দুই খুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লিগাও একটা আইন্যা দিও।' এবার মলিনা হেসে ফেলেন।

—'আপনার আর আমার কি একটা খুরি থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?' লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন, 'ওঃ হো, তিনজনার তিন খুরি চা, থ্রি কাপস।' বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, 'কী চা আনা হচ্ছে নাকি,' বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুররাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে। মেসোমশাই যারপর নাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন, 'রাইখ্যা দ্যাও রাইখ্যা দাও। কাজে লাগবোই পরে গরম কইরা খাইলেই হইব, কি কও, মলিনা?' মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়েবাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাতের কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চা বিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন—(এই সঙ্গে রাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে?) এঁর আসাটা মেসোমশাই পছন্দ করেননি। তাই গলা তুলে বলল—'আমাগো টাইমে তো মা-মাসিমারা চুল বাঁইধ্যা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবো না। অলস। তাই ফাইব

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

হানড্রেড রুপিজ জলে ফ্যালাইল।' মাসিমা ধারে কাছেই ছিলেন। হৈ হৈ করে এসে পড়লেন, 'কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভায়েদের বৌভাতে কে বউ সাজিয়েছিল? আমার ননদের বিয়েতে কোন ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে শুনি? এটা আলাদা। এ হল চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এর খরচাও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা জ্বালা কিসের?'

—'আরে—যে হালায়ই দিক না কেন ওটা, কোনোও কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত দিয়া আমাগো দুইজনারই চন্দন কাঠের চিতা হইতে পারতো জান?' কোত্থেকে বুড়োদার উদয়। পুনরায় ব্যাফলওয়ালের মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খুবই ইললজিক্যাল কথা, বললে কিন্তু বাবা। যদিও

সাজসজ্জায় একরাতে পাঁচশো টাকা খরচ করাটা আমিও ম্যরালি সাপোর্ট করি না, তবুও আমি মনে করি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থহয়াইল এক মৃতদেহের পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় করার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেরো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা'—

—'পনেরো আর নাই রে বুড়ো, সেই দিন কাল নাই। এই বাপের পুড়াইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আর তোমার মায়ের বেলায় নির্ঘাৎ আরো বেশি বাই দেন অন্তত পঞ্চাশ—ষাট তো বটেই'। মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন।

—'ভালো! বাপ-ব্যাটায় মিলে তোমরা আমার চিতার হিসাবটাই করো তাহলে আজকের দিনে—' মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন—'তোমাগো লেইগ্যা তো এই কমপ্লিকেশান শুরু। ওই গোকুলচন্দরে আনলো কেডা? তোমাগো বড় লোক বাপের বাড়ি থিক্যাই তো।' বুড়োদা আবার শুধরে দেন—'গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।'

'ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো ডিফারেন্স নাই।'

'না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন? মুড়ি মিছরি তোমার কাছে একদাম যত যন্ত্রনা কেবল এই একটি জায়গায়।' বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা এ্যপ্লাই করি।

'মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।' কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবা মাত্র মাসিমা দৌড়ে ঘরে যান। এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। রণং দেহি মূর্তিতে।

'তোমাকে কে বলেছিল মেয়েটাকে শত্রুতা করে এক্ষুনি হরলিকস আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?'

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু' পকেটে দুই হাত গুঁজে মস্তান ভঙ্গিতে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

'করবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখেন, খা হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপে।' ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, সহসা স্নেহ প্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিকস আর দই খাইয়ে এসেছেন নিজের হাতে। ফলে সেই সব সমুদ্র-পরবর্তী অমূল্য কিসপ্রুফ লিপস্টিক, লিপগ্লস, লিপলাইনার ইত্যাদি স্রেফ লেহ্যপেয় হয়ে গিয়ে কনের সর্বস্বান্ত ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা-হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি এক ঘর কুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

PATHAGAR.NET

—'এই হরলিক্স আর দইটুকু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্যা, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না, আহা মাইয়াডার মুখনি শুকাইয়া এই এতোটুক যে!' এতে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুবই করুণ হয়ে গেল। কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়দের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে ফেলা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুলছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য, বুক ফাটলেও চোখ ফাটে না—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ার প্রুফ ব্লুশর পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে?

খাওয়াবার সময় এক চামচ দই, আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে ঢেলেছেন। ফলে এখন কনের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা অংশ রং পালটে ঘোরতর খয়েরি এবং জরিটরি ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইখানটা অনবরত ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়া ভালো মনে করি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সৌম্য আর আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত ফ্রি সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনের ভিড় যে না লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘরেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ, 'বন্টু, তুমি না ইলেকট্রিক্যাল ইনঞ্জিনিয়ার?' ভাগ্যিস আমার সিগারেটটা তৎক্ষণে শেষ। 'এখনও ফাইনাল পরীক্ষা হয়নি মেসোমশায়।'

—'ঐ হইল গিয়া একই কথা। বিয়া তো এখনও হয় নাই। তবুও তো চিনু অহনই কনে বউ। তুমি হইলা গিয়া কনে এঞ্জিনিয়ার। বোঝলা? ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স তো বুঝ? রেকর্ড প্লেয়ারে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেইনড লেম্যানগো হাতে পাইয়া মেশিনটা শ্যাষ হইয়া যায় আর কি। ঘটিরা মেসিন-টেসিনের সাবজেক্টটাই বুঝে না—ব্রেইনটা ভালো তো?' সৌম্যের মামাতো ভাই-বোনেরা যে সারাদিন রেকর্ডপ্লেয়ারে সানাই লাগাচ্ছে, এটা এই মাত্র মেসোমশায়ের খেয়াল হয়েছে। 'আর শোনো, বি কেয়ারফুল, রেকর্ড দুইখান অলটারনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা আর একবার ওইটা। বোঝলা তো?' সৌম্য তখন দরজার পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেবাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘরময় ফরাস পাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফরাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি সর্তকতা অবলম্বন করেছি এককোণে ঢুকে, একফালি ফাঁকা মেঝেয় ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশায়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে?—'ঐধারে ধোঁয়ার মতো দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌম্য নাকি?' সৌম্য কাশল। 'হুঃ। ঘরময় ছাই ঝরতাসে। অ্যাঁ? চাদরটা ময়লা করতাসে। অ্যাঁ?' বলতে বলতেই মেসোমশাইয়ের স্ববেগে নিষ্ক্রমণ এবং পরমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাঁটা হাতে পুনঃপ্রবেশ। 'ছিঃ ছিঃ যত্ত ছাইভস্ম খাইয়া পরিষ্কার ঘরটারে দিল শ্যাষ কইরা' গজরাতে গজরাতে তিনি ঝাঁটা

PATHAGAR.NET

বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফরসা থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়ের নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিল। ফরসা চাদরে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পরতে লাগলো, অম্লান বরফে ইয়েতির পদচিহ্নের মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাঁট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেসোমশাইকে নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। ফরাসটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হুলুধ্বনি হল। অমনি,—'দেয়ার দি বরযাত্র। দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভ!!!' বলে চিৎকার করে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে পেছনে আতংকিত সৌম্য আর আমি 'বাবা। ঝাঁটা ঝাঁটা।' 'মেসোমশাই, ঝাঁটা।' ঝাঁটা বলতে বলতে ছুটি— কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতর আকুতি ডুবে যায়। কে কার কথা শোনে। মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্লকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাঁটা হাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে রেডি। এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌম্যের ছোট বোন ছুটে এসে বাবার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁর মুখের হাজার পাওয়ারের হাসিটি দপ্ করে নিবে যায়, এবং মুড মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবার হাত জোড় করে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভার কর্মকর্তার মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে বরযাত্রী নামতে শুরু করে। মেসোমশাই গম্ভীর নির্বাক। জোড়হস্ত। শাড়িপরা, সুন্দরী মিতুন আর তার একটি কিশোর বান্ধবী বেলফুলের মালা আর একটি করে গোলাপ বরযাত্রীদের উপহার দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচু গলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়ের মুখ খুলে যায়।

—'দুইটা কইরা গোলাপফুল কারেও দিবা না, মিতুন। সব একটা একটা, ওয়ান ইচ। বোঝলা? মালা দ্যাও।'

সপ্রতিভ যুবকটি বলে, 'আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিতেই তো বলছিলাম। উনি কিন্তু দিলেন না।' এবার মেসোমশাই ছোকরাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সের পিবুয়েং করার ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত রক্ত জল করা চাউনি তারপর বললেন, 'আপনারে এট্টু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনারে মালা পস্তনের ডেইট না? আপনের ফ্রেইন্ডের।' তারপরে—'মিতুন অমন যারে তারে মালা দিবা না এই কইয়া দিলাম, হউক সে বরযাত্র। যত সব ফাজিল ছ্যামরা।' কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমরা উদ্বিগ্ন, সৌম্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাতৃত্বের হাত রাখে। এবং ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভিতরে নিয়ে যায় এবং অচিরেই অকুস্থলে বুড়োদার অভ্যুদয় ঘটে।

—'আবার তুমি কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও, মালা দাও, আবার এই বলছো মালা দিও না মালা দিও না, মিতুন তো এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে।'

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টের মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী পুত্রের মুখের দিকে তাকান। তারপর তার বুকের গোলাপটির দিকে। তারপর বলেন, 'মিতুন, তোমার দাদার বুকের থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।' ইতিমধ্যে বর বরণ করতে কুলোডালা সমেত মাসিমাও গেটে উপস্থিত। চওড়া জরির দাঁতওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে গরদের ঘোমটার নিচে তাঁর গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধো খুশিতে আধো কান্নাতে, উদ্বেগে, উত্তেজনায় আশ্চর্য রঙিন। মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন,

—'মিতুন, বুড়োর বুকের থিক্যা গোলাপ ফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়ের খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি।'

সেই মুহূর্তে বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশাইয়ের অফিসের ইনকাম ট্যাক্স অডিটর। চেনা মুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবার মতো পরম উল্লসিত মেসোমশাই বরের দিকে দিকপাত মাত্র না করে বরের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আরে?—আসেন স্যার আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন।' উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশাইয়ের মহৎ উচ্ছ্বাস চাপা পড়লো।

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী। মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলছে না। কেননা বাড়ির আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তারা লোক খারাপ নয়, একেবারে কিছু চায়নি। হ্যাঁ একটা বিয়ের মতো বিয়ে করছে বটে চিনু। প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিয়ে কজনে পায়?—অতএব, বালিগঞ্জে ভালো পাড়ায় বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে টুনি বালবের ঝরণাধারায় আর টাটকা ফুলের তৈরি রাজকীয় তোরণে বাজিমাৎ করে বাড়ি সাজানো হয়েছে। এই শখ এবং খরচ বুড়োদার। কিন্তু এই এলাহী ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ করছেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল গড়িয়ায় তাঁর নিজ বাসভবনে ছাদে প্যান্ডেল বেঁধে যেমন ভাবে সেদিন তাঁর ছোট ভাইয়ের বিয়ে হল, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। চিনুর বিয়ে বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না। আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁর যেন নেহাৎ অচেনা। এর মধ্যে তাঁর ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হয়নি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তারা একটি পয়সা, খাট বিছানা দান সামগ্রী কিছুই নেবে না। রাখবার জায়গা হবে না নাকি তাদের। সবই আছে কেবল নমস্কারি কাপড় তিপান্ন পিস, আর আশীর্বাদে বরের একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল—নইলে নেহাৎ আত্মীয়দের কাছে পাত্রের মুখ থাকে না। তাও সেই বোতামটা ছেঁটে

ফেলে একটা হীরের আংটিতে রফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডরেট ম্যাইয়া ওয়ার্ল্ডে কয়জনার হয়?) কিন্তু এতেই মেসোমশাইয়ের গচ্ছিত প্রভিডেন্ড ফান্ড উঠে গেছে, বন্ধুদের কাছে ধার হয়েছে। এখন মিতুনের বিয়ে বাকি, সৌম্যর ডাক্তারি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চার হাজারের ফুল এবং আলো (সে যে হালায়ই দিউক না ক্যান্) মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সুতরাং বরযাত্রীরা যেই সভা সাজানোর প্রশংসা করেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন, 'তাহলে শোনেন স্যার, অই যে টুনি বালব আর ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াডা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড উঠাইতে হয় না। হ্যাঁ মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার লাইট ফ্লাওয়ার এ সকল তো ভালোই। ঐ যে বাইবেলে কয়না 'লেট হানড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম' লেট দেয়ার বি লাইট?—সকল সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? মাও সে-তুং যে কইসেন না চাইনিজ পিপলদের লগে—'কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর ক্লথ?' আমিও তাই কই খাঁটি কথা।' বরযাত্রীরা মেসোমশাইয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়েন। আমি কি করে ওকে যে সরিয়ে নেব, ভেবে পাই না। এরপর মেসোমশাই উদাস দার্শনিক কণ্ঠে বলেন, 'এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন সর্বদা সমানে সমানে কাজ করা উচিত। পূর্ববাংলা আমাগো এক প্রবচন আছে—'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে!' আমরা হইতাসি গিয়া সেই মধ্যম বোঝলেন?' বরযাত্রীরা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। তাঁরা ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁদের উত্তম বলা হচ্ছে না অধম হলা হচ্ছে! কিন্তু মেসোমশাই তাতে কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এবার তিনি 'এক্সকিউজমি, একটু রিফ্রেশমেন্টের দিকটা দেইখ্যা আসি' বলে উঠে গেলেন।

আসলে 'বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাকর্তার বাক্যলাপ' ব্যাপারটার তখন সামাজিক গাম্ভীর্য বিষয়ে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন, এবং সেই কারণেই নার্ভাস। আর নার্ভাস হয়ে পড়লে কেউ কেউ যেমন তোতলা হয়ে যায়, মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবল কোট করতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনের উৎসগুলো সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনটা মাও সে তুং, কোনটা বাইবেল, কোনটা রবীন্দ্রনাথ সে সমস্ত তখন ইমমেটিরিয়াল হয়ে যায় ওঁর কাছে। এই যেমন বিয়ের আগের দিনের দুপুর বেলা গড়িয়ার বাড়িতে। বিয়েবাড়ির হট্টগোলে বাড়ির কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এনতার তাড়া করছিল লোকজনকে। তাড়া খেয়ে বাচ্চাগুলো কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—'কি হইসেটা কী?'

—'কুকুর কামড়াইথিলা।'

—'একচুয়াল কামড় দিসে কি?'

—'না, কিন্তু!'

—'না? তবে কানসিলা ক্যান?'

—'মোর নতুন নুগা ছিড়ে দিলা।'

—'ঈশ্‌শ'—দু'মিনিট লুঙ্গির জন্য মৌন শোক। তারপর—

—'তুই অরে উল্টাইয়া মারলি না ক্যান?'

—'বাবু আপন মতে মনা করসিলে, কহিথিলে কুকুরকু মারিলে মোর গোড়ালি ভাঙ্গি দিবে—'

—'আরে থো—! আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই?'

—'ফোঁস? ফোঁস কড় বাবু?'

'আরে হেইটাও শোনস নাই? লাঠির ঘায়ে মর মর সাপটার দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন আরে তোরে কামড় দিতে মানা করছিলাম কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়াল এ্যডভাইজ হইল এইটা। সর্বদা স্মরণ রাখবা। বোঝালা?'

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন, 'বাবা ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেনি, ওটা তো রামকৃষ্ণের কথা।' মেসোমশাই ত্বরিত জবাব দেন, 'আঃ কথাটা যে হালায়ই কউক না ক্যান, কইসে তো? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।'

বরযাত্রীর কাছে ছুটি নিয়ে মেসোমশাই বললেন, 'চলো, রন্টু, ঠাকুরগো কাম-কাজ একটু ইন্সপেক্ট কইরা আসি।' হালুইকরদের কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তার উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্বরে গলা খাঁকারি দিয়ে 'মাছ ভাজাটা হইল কেমন? দ্যাখাও তো দেহি'—বলা,

অমনি বামুনের সাফ জবাব, 'এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা করবেন না। হ্যাঁ, শুনলে বাবু কিন্তু রাগ করবেন।' রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যের সেজ কাকা, মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোয়ালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সব চুল সাদা। মেসোমশাইয়ের একটি চুলেও পাক ধরেনি, নেহাৎ ছোকরা-চেহারা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মের মতো হাতপুরো সাদা শার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে। ধুতি-পাঞ্জাবি কন্যাকর্তাকে কিছুতেই পরানো যায়নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলঙ্কারি হবার ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষ মানুষের পোশাকই নয় মোটে। হালুইকর ঠাকুর জানে সব বিয়েবাড়িতে ঢের ঢের ফালতু মস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই, সে তো আর মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি রেগে গেলেন। 'দুলু! দুলু!' সেই কণ্ঠস্বরে সেজ কাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন।

—'কি? হইল কী মেজদা?'

—'এই রাস্কেলটারে ক্যান বসাইছিস? এ রাস্কেল আমারে বাবু দ্যাখাইতিসে, আবার

PATHAGAR.NET

কয় কিনা ফালতু ঝামেলা করবেন না। আমাগো মাইয়ার বিয়া আর আমারেই কয় কিনা ফালতু? গেট আউট। গেট আউট। অহনই আমি অন্য ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। আমাগো গড়িয়ায় শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুরতাসে।' ঠাকুরটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটার তাৎপর্য—বিশাল এক লুচি ভাজার ঝাঁঝরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু' হাতের অঞ্জলিতে কলাপাতায় মুড়ে এক ডজন মাছভাজার গরম গরম নৈবদ্য দিয়ে।—'এবারের মতো মাপ করে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই মাছের পিস রক্ষা করছিলাম আমি। বিয়েবাড়িতে কত ফালতু লোকেও তো থাকে।' আবার সেই শব্দ—ফালতু, মেসোমশাইয়ের রাগ কমল না। মাছ ছুঁলেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলু ঠাকুরদের প্রমপট্ করলেন, 'আরেকবার।' এবার দুই ঠাকুর গলা মিলিয়ে কোরাসে বারবার আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছ ভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া করে খান ছয়েক খেলেন, আমাকেও গুণে গুণে ছ'খানাই খাওয়ালেন এবং—'দুলুরে, অ—দুলু। শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লও খানকয় মাছভাজা, ভাল পিস করে কিন্তু পরে পাইবা না।' বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, 'হাঃ আমার মাছের পিস রক্ষা করে কে? না হালুইকর ঠাকুর। যেই না Poacher, সেই হইয়া গিয়া Game-keeper হাঃ।' তারপরেই মনে পড়ে গেল—'আহা, চিনুর মাডারে দুইখানা গরম গরম মাছ ভাজা খাওয়াইলে হইতো।' যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—'রন্টু শোনো, রান্নাঘরে আমি আর যামু না, তুমিই যাও। দুলুর থিক্যা দুখান মাছভাজা চাইয়া লও। নিয়া তোমার মাসিমারে খাওয়াও গা যাও। কইবা আমি পাঠাইসি। বোঝলা? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইডা আমি দেখি না, হেই দিকেই টোটাল কনফিউশান। আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাছভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও যাও'—বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক খাওয়ানোর দিকটাই চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ ভাজার ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছ ভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যের পরে পুনরায় মেসোমশায়ের খোঁজে খাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন, 'বড়দের দুইটা কইর‍্যা, ছোটদের একটা। না চাইলে একদম রিপিট কইরো না। ওয়েইস্ট য্যান হয় না। বোঝলা?' এসব সৎশিক্ষা রান্নাঘর থেকেই পই-পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ করানোর প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ('এটা কিন্তু বরযাত্রীদের ব্যাচ মেসোমশাই') বলে দিতেও তিনি ঘাবড়ালেন না।

'অরে ভয় হইসেডো কী? হউক না বরযাত্র, ওনারা তো আর পর না? আমার চিনুরই ঘরের মানুষজন—ওনারা শোনালেই বা দোষটা কোথায়? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ

ক্রাইম ইন ইনডিয়া, কি কন বেহাইমশাই?' বলে যে শুক্লকেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগার চাদর ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ করেন মেসোমশাই তাঁকে দৃশ্যত যে কোনো বিবাহের বরকর্তার ভূমিকায় মানাতো বটে কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটে বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর। 'বেহাই' এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হ্যাঁ-না দুইই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে যথেষ্ট কুটম্ব কর্তব্য হয়েছে মনে করে হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই বরযাত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসার এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি 'খুলিল হৃদয়দ্বার খুলিল।'

'বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে। আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেশ পৌসাইলা? যাক। তারপর? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো এক্কেরে প্রিজনার হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ হেইটা কি ্যামন ত্যামন ব্যাপার?' ওহ্ বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা সোফায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন—'কই, পানসিগ্রেটের ট্রেটা গেল কই?'

ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার—'কোকোকোলার চাবিটা কার কাছে?' এবার চাবিসহ সবিনয় আর কজন উপস্থিত হয়। একটার বেশি কারেও দিবা না, আর তাও ক্যাবল বরযাত্র। ভেরি এক্সপেনশিভ হইয়া গেসে। ঔনলি ওয়ান ইচ। তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা বেশ, বেশ, এইবার এই দিকে দুইটা বোতল আনাতো দেহি?' ঠাণ্ডা দেইখ্যা বন্ধুকে কোকোকোলা দিয়ে বললেন, 'আইজ লনডন নোটবুকে পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেখি? কোথায় ছিলে জেমস কাউলি, আর কোত্থিকা আইসে এই।'

'চান্দে আর ঈতে হেঃ।' তারপর নিজের বোতলে এক চমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন, তাঁর নিমন্ত্রিতকে 'বোঝলা সুধীর, ইংলন্ডের প্রেজেন্ট পলিট্যাক্যাল সিচুয়েশান সত্যই ভেরি ক্রিটিক্যাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগো চিন্তার ঢের কারণ আছে—থাউজ্যান্ডস অব কলার্ড পিপলসের ফিউচার'—

সেই মুহূর্তে ছাদের ওপর চিনুদির ফিউচার হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

PATHAGAR.NET

মর্নিংওয়াক

উজ্জ্বলকুমার দাস

'মর্নিংওয়াক'! আজকাল অনেকেরই জীবনের অভিধানে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। কিন্তু আমার জীবনের সঙ্গে এই শব্দটা একেবারেই বেমানান।

ছোটবেলায় যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন একবার 'মর্নিংওয়াক' দিয়ে ইংরেজিতে একটা বাক্যরচনা লিখতে দিয়েছিল। আমি লিখেছিলাম—মহান ব্যক্তিরাই মর্নিংওয়াক করে থাকেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এটসেটরা।

আমাকে এধরনের বাক্যরচনা লিখতে দেখে, সেদিন ইংরেজি মাস্টারমশাই খুব হেসেছিলেন। ইস্কুলের পড়া শেষ করে, কলেজের পড়াও কোনোরকমে সেরে ভাগ্যগুণে একটা সরকারি চাকরিও জুটিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই মহান ব্যক্তিদের দীর্ঘ তালিকায় নিজের নামটা লেখাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার হয়নি।

সরকারি চাকরি পাওয়ার পর বেশ কয়েকবছর বেলা নটা পর্যন্ত বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকবার একটা নৈতিক অধিকার আমার ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে আমি স্ত্রীজীবী ব্যক্তি হয়েছি, সেইদিন থেকেই আমার সে অধিকারটুকুও ক্ষুণ্ণ হল।

আমি এখন থেকে আমার প্রাণেশ্বরীর হাতের পুতুল। ওনার হাতেই আমার জীবন লাটাইয়ের সুতো। উনি যেভাবে আমাকে ওড়াবেন, আমি সেইভাবে জীবন আকাশে উড়ি। আর যখন সুতো গুটিয়ে নেয়, তখন গোত্তা মেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।

আমার স্ত্রী সুদেষ্ণার একে স্টাউট ফিগার, তার ওপর ওর সঙ্গে আমার বয়সের ফারাক মাত্র কয়েক মাসের। তাই স্বামী হয়েও সুদেষ্ণার কাছে খুব একটা পাত্তা পাই না আমি।

আমি আমার ছোট শালি ইন্দ্রাণীর কাছে শুনেছি সুদেষ্ণা নাকি ছোটবেলা থেকেই সেইসব মহান ব্যক্তিদের দীর্ঘ তালিকায় নিজের নামটি যুক্ত করবার জন্য পাগল। তাই বিয়ের পরও সেই ছোটবেলার অভ্যেস 'মর্নিংওয়াক' করা ছাড়তে পারেনি। আর সেইসঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক জগিং ও শরীরের নানারকম কসরত।

আর তার ফলে আমার প্রাণেশ্বরীর শরীরটা যা স্টাউট হয়েছে, তাতে আমার মতো হ্যাংলাপানা চেহারাটা একেবারেই বেমানান। সুদেষ্ণা যদি ঠিকমতো আমাকে জাপটে ধরে একটা সোহাগ করে, তাহলে আমার ল্যাংপ্যাং শরীরের সমস্ত হাড়গুলো বিকট শব্দ করে একসঙ্গে মট-মট করে ভেঙে উঠবে।

যেদিন থেকে সুদেষ্ণা আমার জীবনে এসে হাজির হয়েছে, সেইদিন থেকেই আমার

জীবনের দুর্দিনের সূত্রপাত। সুদেষ্ণার জীবনের স্পিডবোটের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে, আমার একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। এরকম চেহারা নিয়ে সুদেষ্ণার সঙ্গে আর পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

তাই আমাকেও আজকাল স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটাকে মানানসই করবার জন্য রোজ ভোরবেলায় 'মর্নিংওয়াক' করতে বের হতে হচ্ছে। পৃথিবীতে কোন হৃদয়হীন মানুষ যে 'মর্নিংওয়াক' আবিষ্কার করেছিলেন? সাত সকালে মানুষকে ঘুরিয়ে মারার কী যে প্রয়োজন ছিল কে জানে!

যাইহোক যখন স্ত্রীজীবী হয়েই পড়েছি, তখন স্ত্রীর কথাই বেদবাক্য। তাই সকালবেলায় কাকভোরে উঠে সুখনিদ্রা ত্যাগ করে স্ত্রীর সঙ্গে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়তে হয়। শুধু মর্নিংওয়াক নয়। তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে জগিং ও শারীরিক নানারকম কসরত তো আছেই।

কয়েকদিন এরকম শারীরিক কসরত করবার পর শরীর ভাল হওয়া দূরে থাকুক। আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল। সারা শরীর জুড়ে বিষ ব্যথা।

একদিন আমার শরীর খুবই খারাপ। সুদেষ্ণা একাই মর্নিংওয়াকে বের হয়েছে। আমি বিছানা আকড়ে পড়ে আছি। হঠাৎ এইসময় আমার সেলফোনটা মিষ্টি সুরে বেজে উঠল। দেখি সুদেষ্ণার ফোন।

'হ্যালো!' বেজায় মুখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম। সুদেষ্ণা ওপ্রান্ত থেকে বলল, 'আজ এক ইভটিজারকে এমন শিক্ষা দিয়েছি না! তোমাকে এক্ষুনি একবার এখানে আসতে হবে।'

একথা শুনে আমি পড়িমরি করে দৌড়লাম। গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। একজন লোক মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে!

তারপর শুনলাম এই ইভটিজারই নাকি সুদেষ্ণার পিছু নিয়েছিল। তাই সুদেষ্ণা তাকে অ্যায়সা এক ঘুসি হাঁকিয়েছে যে, বেচারা দাঁত-মুখ ছেঁচড়ে একেবারে অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান হওয়ার পর আমরা দেখলাম যে, সেই ইভটিজারের মুখখানার ভৌগলিক পরিবর্তন এতটাই হয়েছে যে, কোনো প্লাসটিক সার্জেনও তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুদেষ্ণার এই ইভটিজারে পেটানোর খবর, খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ির কাছেই ছিল মিডিয়ার একজন লোক। তার কল্যাণে মিডিয়ার লোকেরা আমার বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেলিভিশনের নিউজ চ্যানেলগুলো লাইভ টেলিকাস্ট করল।

আমার বউয়ের ইন্টারভিউ! বউও গর্বে বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল কী করে ইভটিজারকে পেঁদিয়ে একেবারে তক্তা বানাল।

বউয়ের ইন্টারভিউ নিয়েই তারা ক্ষান্ত হলেন না। সঙ্গে আমারও ইন্টারভিউ। তার সঙ্গে বেশ কিছু বোকা বোকা সব প্রশ্ন।

আমার বউ যে ইভটিজারকে পিটিয়ে তক্তা করেছে তাতে আমার কী রকম লাগছে?

আমি এর উত্তর কী দেব? বলব, গর্বে আমার বুক ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে।

এরকম নানা প্রশ্ন! যার না আছে কোনো মাথা, না আছে কোনো মুণ্ডু।

তার পরদিন সকালবেলায় খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আমার স্ত্রীর ছবি সহ ইভটিজার পেটানোর খবরটা বড় বড় করে ছাপা হল।

দেখতে দেখতে আমার বউ সুদেষ্ণা বেশ ছোটোখাটো একজন সেলিব্রেটি হয়ে উঠল। নানা সংস্থা ওকে সংবর্দ্ধনা জানাতে লাগল।

আজকাল বেশিরভাগ দিনই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি সুদেষ্ণা বাড়িতে নেই। কোথায় গেল? সেলফোনের ম্যাসেজ খুলে জানতে পারলাম আমার প্রাণেশ্বরী উলুবেড়িয়া থেকে সংবর্দ্ধনা আনতে গেছে। আজ উলুবেড়িয়া তো কাল ব্যারাকপুরে, পরশু বরানগরে। এরকম লেগেই রইল।

সেলিব্রেটি স্ত্রী-এর স্বামীদের অবশ্য এইটুকু স্যাকরিফাইজ করতেই হবে। অফিসের বড়বাবু থেকে পিওন সবাই আজকাল আমাকে একটু অন্যচোখে দ্যাখে। সেলিব্রেটি বউয়ের স্বামী বলে কথা!

সেলিব্রেটি হওয়ার পর থেকে সুদেষ্ণার মাথাটাও ধীরে ধীরে তেতে উঠতে লাগল। সুদেষ্ণা যে একজন সামান্য কেরানির বউ সেই কথাটাই ওর মাথার কোষগুলো থেকে একেবারে বেমালুম উবে গেল।

সুদেষ্ণা এখন তার লাইফ-স্টাইল রাতারাতি একেবারে বদলে ফেলতে চায়। কিন্তু আমার পকেট? সে তো একদম তাতে সায় দেয় না।

তাই আমাদের দু'জনের মন কষাকষি শুরু হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল আমাদের কর্তা-গিন্নির কড়চা।

প্রায়ই নানারকম ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি। তারপর খিটিমিটি থেকে গলা ছেড়ে জীবন নাটকের সংলাপ। যে সংলাপ অবশ্য বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়ে থাকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়।

আমার সঙ্গে রাগ করে প্রায়ই সুদেষ্ণা বাপের বাড়ি চলে যেত। তারপর আমি তোয়াজ করে আবার ফিরিয়ে আনতাম।

এই ক'দিন আগে আমার উপর রাগ করে সুদেষ্ণা বাপের বাড়ি চলে গেল। আমিও অভিমান করে এবার আর তোয়াজ করতে যাইনি। প্রায় সাড়ে তেরোদিন দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা একদম বন্ধ! এমনকি সেলফোনের ম্যাসেজ পর্যন্ত খুলিনি।

তারপর হঠাৎ সুদেষ্ণার ফোন এল। আমি হুমড়ি খেয়ে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম।

সুদেষ্ণার জীবনের ডিকসনারিতে ভূমিকা বলে কিছু নেই। আমার গলা পেতেই

PATHAGAR.NET

একেবারে সরাসরি টেক্সটে চলে গেল—বলল, 'শোনো, তোমাকে বেশ জবরদস্ত একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

বাঁচলাম! মর্নিংওয়াক নয়। তারপর হালকা চালে বললাম, 'আবার কেন শিক্ষা? এই সাড়ে তেরোদিন ধরে তো তোমার দেওয়া শিক্ষার একটা শর্ট কোর্স করে চলেছি ম্যাডাম!'

'কী এত বড় কথা! আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি?' সুদেষ্ণার এই কথার আর কোনো জবাব দিলাম না। নীরবতা পালন করলাম, তার কারণ বোবার কোনো শত্রু নেই!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুদেষ্ণা আরও এক ধাপ গলা চড়িয়ে বলল, 'ব্যাটা তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে।'

PATHAGAR.NET

আমি ওধরনের অপমান আর সহ্য করতে পারলাম না। তাই মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'স্বামীকে ব্যাটা বলে না সুদেষ্ণা!'

'বেশ করব, বলব। একশোবার বলব! হাজারবার বলব!'

'আমি না তোমার স্বামী!'

'স্বামী না হাতি। গত সাড়ে তেরোদিন ধরে আমাকে একটা ফোন না, না একটা ভিজিট। বদমাইশি করে সেলফোনের ব্যাটারি পর্যন্ত ডাউন করে রেখে দিয়েছ! আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?'

'কে বলল তুমি বানের জলে ভেসে এসেছ? তুমি ভেসে এসেছ সমুদ্রের জলে। প্রেমের সমুদ্র!' এসব কথা বলে আমি যথাসাধ্য সঙ্গত করে চললাম।

সুদেষ্ণা বলে চলল, 'কী কুক্ষনেই যে তোমার মতো ছেলের গলায় মালা দিয়েছিলাম। আর নয়, অনেক হয়েছে। সব সম্পর্ক এবার যে করেই হোক শেষ করতে হবে তোমার সঙ্গে।'

সুদেষ্ণার ডিসিশান শুনে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

সুদেষ্ণা বলল, 'আমার কথা শুনে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়া হচ্ছে? তোমাকে আমি এমন একটা লেটার পাঠাচ্ছি না, যা পেয়ে তুমি একেবারে শুয়ে পড়বে।'

আমি রসিকতা করে বললাম, 'কী লেটার? লাভ লেটার পাঠাচ্ছো বুঝি?'

সুদেষ্ণা আরও দ্বিগুণ তেতে উঠে বলল, 'লাভ লেটার তুমি আমার কাছ থেকে আর পাবে না। এবার পাবে রেজিগনেশন লেটার। আমি তোমাকে আমার প্রেম থেকে রেজিগনেশন দেব। এ আমার একেবারে ফাইনাল ডিসিশন।'

PATHAGAR.NET

আমি এবার একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, 'সেটা কি ঠিক হবে সুদেষ্ণা?'

'সেটা আমি বুঝবো।' তারপরই সুদেষ্ণার গলার স্বর জাম্প করে উঠল—'তুমি বলার কে হে?'

'আমি তোমার স্বামী!'

'স্বামী না কচু! আমাকে আর রাগিও না বলছি! আমি বেশি রেগে গেলে কিন্তু তোমাকে গুলি করে মারব।'

সুদেষ্ণার মুখে একথা শুনে আমার হৃদপিণ্ডটা একটু চলকে উঠল। তারপর তোয়াজের সুরে বললাম, 'স্বামীকে গুলি করতে নেই সুদেষ্ণা।'

আমার কথা শুনে আমাকে ভেঙিয়ে বলল, 'স্বামীকে গুলি করতে নেই সুদেষ্ণা! ন্যাকা। আমি তোমাকে গুলি করবই। একশোবার করব। তা তুমি বলার কে হে?'

'স্বামী!' বলতে গিয়েও গলায় কোথায় যেন আটকে গেল।

তারপর সুদেষ্ণা হুকুম ছাড়ল—'তুমি আজ ঠিক রাত আটটায় আমাদের বাড়িতে চলে এসো।'

আমি বললাম, 'তোমার রেজিগনেশন লেটার কি আমার হাতে হাতেই দিয়ে দেবে?'

'এসব চিঠি ফিটির ব্যাপার নয়। একেবারে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। তোমাকে আজ রাতে এমন শিক্ষা দেব না, যে জিন্দেগি ভর ইয়াদ থাকবে।'

সুদেষ্ণার মুখে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন', তারপর হিন্দি ডায়লগ শুনে ভয়ে কেমন যেন সিটিয়ে গেলাম। তারপর মিউমিউ করে বললাম, 'তোমার এই শিক্ষাদান নিশ্চয়ই কনভেন্ট কোর্স নয়, সম্ভবত মাস্টার ডিগ্রি।

সুদেষ্ণা বলল, 'মাস্টার ডিগ্রি নয়, একেবারে ডক্টরেট।'

রাত আটটা বাজবার দু'-পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম সুদেষ্ণাদের বাড়িতে। কেননা সুদেষ্ণাকে কোনো বিশ্বাস নেই। ও যদি রেগে গিয়ে আমায় আবার রোজ মর্নিংওয়াকে নিয়ে বের হয়, তাই কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম।

সুদেষ্ণার বাবা তখনও অফিস থেকে বাড়ি ফেরেননি, আর মা ধর্মচক্রে পাঠ শুনতে গেছেন। সুদেষ্ণা বাইরের ঘরে একা বসে আছে। হয়তো আমার অপেক্ষায়।

আমাকে দেখেই ঘড়িটা একবার দেখে নিল। আমার আসার সময়টা ঠিক আছে কিনা!

তারপর বলল, 'এসেছো?' বলে সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'বসো ওখানে।'

আমি গুটি গুটি পায়ে বাধ্য স্বামীর মতো সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম।

ওই পচা-ভ্যাপসা গরমেও যত্ন করে নিজের হাতে আমার জন্য আলুর পরোটা তৈরি করে আমাকে জলখাবার দিল। আলুর পরোটার পরে গুছিয়ে এক কাপ গরম চা দিতেও ভুল করল না সুদেষ্ণা।

তারপর আমি ধীরে ধীরে একটু তোয়াজের সুরে বললাম, 'আচ্ছা সুদেষ্ণা একবার ভেবে দেখলে হত না! কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই আমাদের এতদিনকার সম্পর্কটা একেবারে কাট-আপ করে দেবে?' এই কথা বলে আমি সুদেষ্ণার দিকে শুধু চেয়ে রইলাম। কেননা, মাঝে মাঝে শুধু চেয়ে থাকলেও এ জগৎসংসারে অনেক কাজ হয়।

সিনেমার নায়িকারা চোখে হুট করে জল আনতে গিয়ে অনেকেই গ্লিসারিনের সাহায্য নেন। কিন্তু সুদেষ্ণার ওসব লাগে না। সুদেষ্ণার দু'চোখ বেয়ে মুক্তো ঝড়তে লাগল।

আমি মনে মনে বললাম, 'হয়েছে হয়েছে। আমার ডায়লগ প্রাণেশ্বরীর মনে বৃষ্টি ঝড়াতে পেরেছে।'

এর পরের সিনেই আমি প্রেমিক-প্রেমিক ভাব করে সুদেষ্ণার হাতটা চেপে ধরলাম।

তীব্র প্রতিবাদ করার বদলে সুদেষ্ণার মুখে হাসি। মিষ্টি মিষ্টি ভারী অন্তরঙ্গ নরম হাসিতে ভরে গেল সুদেষ্ণার সারা মুখ। তাতে লজ্জার হালকা লাইনিং।

আমার সুদেষ্ণা হাসছে। আর আমি সুদেষ্ণার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিতে আছি। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম দৃশ্য বোধহয় এটাই।

PATHAGAR.NET

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : জন্ম ১৮২০। মৃত্যু ১৮৯১। ১৮৫৪-৫৫ সালে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেন ও ১৮৫৬ সালে আইন হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বেতাল পঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, ঋজু পাঠ, ব্যাকরণ কৌমুদি, শকুন্তলা, বর্ণপরিচয়, কথামালা, মহাভারত, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জন্ম ১৮২৪। মৃত্যু ১৮৭৩। জন্ম যশোহর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে। সাহিত্যচর্চা কবিতা লেখা থেকে আরম্ভ করে সকল বিষয়েই মধুসূদন ছিলেন সকলের উপরে। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখাতে তার জুড়ি মেলা ভার। ১৮৪৩ সালে তিনি তখনকার রেওয়াজ অনুসারে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। খ্রিস্টান হওয়ার পর তিনি শিবপুরের বিশপ কলেজে পড়াশোন করেন। এখানে লাতিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তমা প্রভৃতি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৩৪। মৃত্যু ১৮৮৯। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—রামেশ্বরের অদৃষ্ট, বাল্যবিবাহ, পালামৌ প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৩৮। মৃত্যু ১৮৯৪। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' গানের লেখক। মোট ১৪টি উপন্যাস ও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরানি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : জন্ম ১৮৪০। মৃত্যু ১৮৭০। তিনি প্রথম 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সমাজচিত্র লেখেন। তাঁর সম্পাদনায় 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মূল সংস্কৃত 'মহাভারত' তিনিই প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন। উল্লেখযোগ্য নাটক—বাবু, বিক্রমোর্বশী, সাবিত্রী-সত্যবান ও মালতীমাধব।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৪৭। মৃত্যু ১৯১৯। তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও মৃদু ও নিরুত্তাপ, কোথাও বা একটু শাণিত ও প্রখর। উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস—বাঙ্গাল নিধিরাম, কঙ্কাবতী, লুল্লু, ফোকলা দিগম্বর, ডমরুচরিত ও মুক্তামালা।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৪৯। মৃত্যু ১৯১১। বাংলায় প্রথম ব্যঙ্গ উপন্যাসের লেখক। 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা 'পাঁচু ঠাকুর' নামে বই আকারে প্রকাশ হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—উৎকৃষ্ট কাব্যম, ভারত উদ্ধার, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম।

PATHAGAR.NET

অমৃতলাল বসু : জন্ম ১৮৫৩। মৃত্যু ১৯২৯। হাসির ও ব্যঙ্গের নাটক লেখার জন্য 'রসরাজ' উপাধি পান। উল্লেখযোগ্য নাটক—ব্যাপিকা-বিদায়, তিলদর্পণ, বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা, খাসদখল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্ম ১৮৬১। মৃত্যু ১৯৪১। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সোনার তরী, বলাকা, পূরবী, লিপিকা, শেষের কবিতা, সঞ্চয়িতা, ডাকঘর, মুক্তধারা।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৬৩। মৃত্যু ১৯৪৯। প্রথম জীবনে 'সংসার দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—রত্নাকর, কাশী সঙ্গীতাঞ্জলী, শেষ খেয়া প্রভৃতি।

প্রথম চৌধুরী : জন্ম ১৮৬৮। মৃত্যু ১৯৪৬। প্রবন্ধকার, কথা সাহিত্যিক, কবি। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' পদক পান। মৃত্যুর আগে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'বীরবল' ছদ্মনামে লিখতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ, তেল নুন লকড়ি, বীরবলের হালখাতা, ঘরে বাইরে, নীললোহিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৭৩। মৃত্যু ১৯৩২। শ্রীমতি রাধারাণী দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—রত্নদীপ, অভিশাপ, গল্পবীথি, সিন্দুর কৌটা, রমাসুন্দরী।

রাজশেখর বসু : জন্ম ১৮৮০। মৃত্যু ১৯৬০। পরশুরাম নামের আড়ালে রচনা করেছেন অসাধারণ সব গল্প-উপন্যাস। হাস্যরসে ভরপুর, গোমড়া মুখেও তা হাসি ফোটায়। পেয়েছেন একাদামী ও রবীন্দ্র পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গড্ডলিকা, কজ্জলী ও কৃষ্ণকলি, হনুমানের স্বপ্ন। 'চলন্তিকা' তাঁর অমর কীর্তি।

সুকুমার রায় : জন্ম ১৮৮৭। মৃত্যু ১৯২৩। মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টিকার্য। ছবি আঁকা, গান করা ও অভিনয়ে পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন সন্দেশ পত্রিকা। উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ—আবোল তাবোল, খাই খাই, পাগলা দাশু।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৯৪। মৃত্যু ১৯৫০। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পথের পাঁচালী। শেষোক্ত গ্রন্থটির জন্য মৃত্যুর পর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়, অপরাজিত, আদর্শ হিন্দু হোটেল।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৯৪। মৃত্যু ১৯৮৭। পেয়েছেন দেশিকোত্তম ও রবীন্দ্র পুরস্কার। হাস্যরস পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পোনুর চিঠি, বরযাত্রী ও বাসর, হেসে যাও।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৯৮। মৃত্যু ১৯৭১। উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের অন্যতম কথাশিল্পী। পেয়েছেন রবীন্দ্র, জ্ঞানপীঠ ও একাডেমী পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গণদেবতা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, সন্দীপন পাঠশালা, কবি প্রভৃতি।

পরিমল গোস্বামী : জন্ম ১৮৯৯। মৃত্যু ১৯৭৬। কৃতী বেতার ভাষ্যকার ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে যুগান্তর পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'এক-কলমী' ছদ্মনামেও লিখতেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পুরুষের ভাগ্য, স্মৃতি চিত্রণ, দ্বিতীয় স্মৃতি, পথে পথে, ঘুঘু, ম্যাজিক লন্ঠন ও সপ্তপঞ্চ ইত্যাদি।

PATHAGAR.NET

বনফুল : জন্ম ১৮৯৯। মৃত্যু ১৯৭৯। আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। হাটে বাজারে উপন্যাসটির জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—জঙ্গম, স্থাবর, সে ও আমি, অগ্নি, কিছুক্ষণ ও তৃণখণ্ড।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৮৯৯। মৃত্যু ১৯৭৬। গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। ব্যোমকেশ বক্সী তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—জাতিস্মর, পঞ্চভূত, সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড, ভূমিকম্পের পটভূমি ও সজারুর কাঁটা।

সজনীকান্ত দাস : জন্ম ১৯০০। মৃত্যু ১৯৭২। তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকত্ব করেছে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে।

মনোজ বসু : জন্ম ১৯০১। মৃত্যু ১৯৯১। বহু গল্প-উপন্যাসই এক সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বনমর্মর, নরবাঁধ, জলমঙ্গল, মানুষ গড়ার কারিগর, আমার ফাঁসি হল, বৃপবতী, বন কেটে বসত, রক্তের বদলে রক্ত প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশী : জন্ম ১৯০১। মৃত্যু ১৯৮৫। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক সবই লিখেছেন। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার ও জগত্তারিণী পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—দেশের শত্রু, জোড়াদিঘির চৌধুরি পরিবার, সিন্ধুদেশের প্রহরী, শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, মৌচাকে ঢিল।

শিবরাম চক্রবর্তী : জন্ম ১৯০২। মৃত্যু ১৯৮০। হাস্যরসে ভরপুর প্রতিটি গল্প-উপন্যাসই সমান আকর্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বাড়ি থেকে পালিয়ে, হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি, মালাই বরফ, বাজার করার হাজার ঠ্যালা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : জন্ম ১৯০৩। মৃত্যু ১৯৭৬। কল্লোলযুগের লেখক। উত্তরায়ণ গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। গল্প-উপন্যাস কবিতা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলি : জন্ম ১৯০৪। মৃত্যু ১৯৭৪। কলেজে অধ্যাপনা করতেন। উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, রস রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—দেশে বিদেশে, চাচা কাহিনী, ময়ূর কণ্ঠী ও ধুপছায়া প্রভৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : জন্ম ১৯০৪। মৃত্যু ১৯৮৯। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন একাদেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কার। এছাড়াও ছোটদের জন্য তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস পিঁপড়ে পুরাণ-এর জন্য বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—ড্রাগনের নিঃশ্বাস, কুমির কুমির, ঘনাদার গল্প, অদ্বিতীয় ঘনাদা, আবার ঘনাদা, ঘনাদাকে তেল দিন, ছড়া যায় ছড়িয়ে প্রভৃতি।

অন্নদাশঙ্কর রায় : জন্ম ১৯০৪। মৃত্যু ২০০২। ১৯২৯ সালে ভারতের প্রশাসনিক পদে চাকরি শুরু করেন। ১৯৬২ সালে জাপান ভ্রমণ কাহিনী লেখার জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য, রত্ন ও শ্রীমতী, ক্রান্তদর্শী, উড়কি ধানের মুড়কি, ডালিম গাছে মৌ ইত্যাদি।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : জন্ম ১৯০৫। মৃত্যু ১৯৯১। মহালয়ার ভোরে রেডিওতে প্রচারিত তাঁর

PATHAGAR.NET

উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ বাঙালি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নাট্য-পরিচালক হিসাবেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য রস-সাহিত্য—ঝঞ্ঝা, ব্ল্যাক আউট, বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ, বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ ও বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী : জন্ম ১৯০৬। মৃত্যু ১৯৬৫। ১৯৪৬ সালে তাঁর লেখা 'জাগরী' উপন্যাস প্রকাশিত হলে সাহিত্যজগতে আলোড়ন পড়ে যায়। ১৯৫০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তিত হলে 'জাগরী' উপন্যাসটি প্রথমেই এই পুরস্কার পায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—ঢোঁড়াই চরিত মানস প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব বসু : জন্ম ১৯০৮। মৃত্যু ১৯৭৪। লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্যনাটক। ১৯৬৭ সালে তপস্বী ও তরঙ্গিনী কাব্যনাটকের জন্য পেয়েছেন আকাদেমী পুরস্কার। ১৯৭৪ সালে পেয়েছেন মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার, স্বাগত-বিদায় কাব্যগ্রন্থের জন্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অপরূপ বৃপকথা, কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড, শনিবারের বিকেল, হাউই প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৯০৮। মৃত্যু ১৯৫৬। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে হঠাৎই লিখে ফেলেন জীবনের প্রথম গল্প। লেখাই ছিল জীবিকা। উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়—দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, জননী, স্বাধীনতার স্বাদ প্রভৃতি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র : জন্ম ১৯০৮। মৃত্যু ১৯৯৪। পেয়েছেন একাডেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—পাঞ্চজন্য, রাই জাগো রাই জাগো, কান্তাপ্রেম, তিনে একে চার, কলকাতার কাছেই প্রভৃতি।

লীলা মজুমদার : জন্ম ১৯০৮। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমদারঞ্জনের কন্যা। ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্রী। প্রথম প্রকাশিত বই বদ্যিনাথের বাড়ি। বিশ্বভারতী দিয়েছেন দেশিকোত্তম। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পদীপিসির বর্মী বাক্স, হলদে পাখির পালক, বাতাস বাড়ি ও দিনদুপুরে।

আশাপূর্ণা দেবী : জন্ম ১৯০৯। মৃত্যু ১৯৯৫। প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসটির জন্য পেয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সুবর্ণলতা, বকুলকথা, ভুতুড়ে কুকুর, রাজকুমারের পোশাক, নেপথ্য নায়িকা প্রভৃতি।

সুমথনাথ ঘোষ : জন্ম ১৯১০। মৃত্যু ১৯৮৫। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—কিশোর গ্রন্থাবলী, ছোটদের বিশ্বসাহিত্য, পূর্ববাংলার উপকথা, কিশোর অমনিবাস।

বিমল মিত্র : জন্ম ১৯১২। মৃত্যু ১৯৯১। জনপ্রিয় উপন্যাসিক। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনূদিত হয়েছেন। সাহেব বিবি গোলাম, আসামী হাজির, কড়ি দিয়ে কিনলাম, পতি পরম গুবুর মতো অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন। ছোটদের জন্য লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রাজা হওয়ার ঝকমারি, কে?

প্রতিভা বসু : জন্ম ১৯১৫। বুদ্ধদেব বসুর পত্নী। একদা গায়িকা হিসাবেও খ্যাতি পেয়েছিলেন। গল্প, উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—মনোলীনা, মেঘের পরে মেঘ, সমুদ্র পেরিয়ে ও স্মৃতি সতত সুখের।

PATHAGAR.NET

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জন্ম ১৯১৭। মৃত্যু ১৯৭৫। সম্পাদনার সূত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—দ্বীপপুঞ্জ, অক্ষরে অক্ষরে, দেহমন, চেনামহল, হলদে বাড়ি, অসমতল, উল্টোরথ প্রভৃতি।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৯১৭। মৃত্যু ১৯৮১। ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরী করতেন। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যে আত্মনিয়োগ। পেয়েছেন তারাশঙ্কর ও মতিলাল পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—ইরাবতী, নারী ও নগরী, উপকূল ও আরাকান।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : জন্ম ১৯১৮। মৃত্যু ১৯৭০। বাংলায় এম-এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। কথাসাহিত্যে তাঁর বিপুল অবদান। টেনিদার গল্পগুলি ছোটদের অত্যন্ত প্রিয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—উপনিবেশ, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রমুখর, মহানন্দা, স্বর্ণসীতা, লালমাটি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৯২০। মৃত্যু ১৯৮৯। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাল তুমি আলেয়া, সোনার হরিণ, পঞ্চতপা, জীবনতৃষ্ণা, রাগিনী, অচল মানুষ, কালচক্র, প্রাসাদপুরী কলকাতা প্রভৃতি।

বিমল কর : জন্ম ১৯২১। ১৯৫২ সালে দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নাটক লিখেছেন। অসময় উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন একাদেমী পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাচঘর, আঙুরলতা, প্রেমশশী প্রভৃতি।

রমাপদ চৌধুরী : জন্ম ১৯২২। ১৯৫৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে 'এখনই' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার ও জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক। 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—প্রথম প্রহর, লালবাঈ, বাহিরি, অন্বেষণ প্রভৃতি।

গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) : জন্ম ১৯২৩। মৃত্যু ২০০০। পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। বহুদিন 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সম্পাদনা কাজে যুক্ত ছিলেন। রূপদর্শী, গৌড়ানন্দ কবি, বেতালভট্ট প্রভৃতি ছদ্মনামে বহু লেখালেখি করেছেন। কিছুকাল 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—রূপদর্শীর নক্সা, সার্কাস, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রেম নেই, সাগিনা মাহাতো প্রভৃতি।

সমরেশ বসু : জন্ম ১৯২৪। মৃত্যু ১৯৮৮। কালকূট ছদ্মনামেও অনেক স্মরণীয় লেখা লিখেছেন। যেমন, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে ও শাম্ব। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—গঙ্গা, বি.টি. রোডের ধারে, যুগ যুগ জিয়ো, শ্রীমতী কাফে ও নয়নপুরের মাটি।

মহাশ্বেতা দেবী : জন্ম ১৯২৬। ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ, অধ্যাপনা করতেন। সুসাহিত্যিক মণীশ ঘটকের কন্যা। একাদেমীসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, নটী, প্রেমতারা, ইঁটের পরে ইঁট, বীরসামুণ্ডা, সিধু কানুর ডাকে।

হিমানীশ গোস্বামী : জন্ম ১৯২৬। ব্যঙ্গ সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আমার রামায়ণ, এক যে ছিল ভোঁদড়, তেঁতুলমামার কাণ্ডকারখানা, বুনো হাঁসের সন্ধানে ও হাসতে হাসতে।

PATHAGAR.NET

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : জন্ম ১৯৩০। বড়দের জন্যই শুধু নয়, নিয়মিত ছোটদের জন্যও লেখেন। পেয়েছেন একাদেমী পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অলীক মানুষ, অনুসন্ধান, আগুনের চারপাশে, কালো মানুষ নীল চোখ। ছোটদের জন্য—কিশোর গোয়েন্দা অমনিবাস, কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস, ভয় ভুতুড়ে, ভূত নয় অদ্ভুত।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৩৪। প্রথম জীবনে কাজ করেছেন জাহাজে, কিছুকাল শিক্ষকতা, পরে যোগ দেন সাংবাদিকতায়। একাধিক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অলৌকিক জলযান, ঈশ্বরের বাগান, ঝিনুকের নৌকা, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা, ফেলতুর সাদা ঘোড়া।

প্রফুল্ল রায় : জন্ম ১৯৩৪। পেশায় সাংবাদিক। পেয়েছেন বঙ্কিম ও ভুয়ালকা পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আকাশের নীচে মানুষ, আমাকে দেখুন, কেয়াপাতার নৌকা, ধর্মান্তর, পূর্ব পার্বতী, সেনাপতি নিরুদ্দেশ, পাগলা মামার ছেলে, তিনমূর্তির কীর্তি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৩৪। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু, পরে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ। কৃত্তিবাস পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য ছোটদের গ্রন্থ—পাহাড় চুড়োর আতঙ্ক, সবুজ দ্বীপের রাজা, তিন নম্বর চোখ, কাকাবাবু সমগ্র প্রভৃতি। পেয়েছেন একাদেমী, আনন্দ ও বঙ্কিম পুরস্কার।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৩৪। একসময় সরকারি চাকরি করতেন। পরে সাংবাদিকতা। নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। হাস্যরস ও রম্যরচনা পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আমার ভূত, গুপ্তধনের সন্ধানে, ছাগল, ডোরাকাটা জামা, বড়মামার সঙ্গে, লোটা-কম্বল, রুকু সুকু প্রভৃতি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৩৫। স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। পরে যোগ দেন সাংবাদিকতায়। আনন্দ ও বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাপুরুষ, গল্পের মানুষ, দূরবীন, নয়নশ্যামা, আধ ছটাক ভূত, আশ্চর্য সব ভূত, পটাশগড়ের জঙ্গলে, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি।

তারাপদ রায় : জন্ম ১৯৩৫। মূলত কবি। রস-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু, ভালোবাসার কবিতা।

বুদ্ধদেব গুহ : জন্ম ১৯৩৮। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। প্রথম উপন্যাস 'হলুদবসন্ত'। আনন্দ পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার ও শিরোমণি পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বাবলি, একটু উষ্ণতার জন্য, কোয়েলের কাছে, মাধুকরী প্রভৃতি।

নবনীতা দেবসেন : জন্ম ১৯৩৮। পেশা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। গল্প-কবিতা-ভ্রমণকাহিনী-প্রবন্ধ— সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অন্য দ্বীপ, গল্পগুজব, প্রবাসে দৈবের বশে, নবনীতা, তিন ভুবনের পারে প্রভৃতি।

উজ্জ্বলকুমার দাস : জন্ম ১৯৬৩। মূলত লিটল ম্যাগাজিনে গল্প, কবিতা প্রবন্ধ লেখেন। প্রায় ২০০টির বেশি বই সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—জুঁইফুলের দোলনা, কর্তাগিন্নির করচা, ঘরে বসেই বিজ্ঞানী।

PATHAGAR.NET

PATHAGAR.NET

একশো বছরের

সেরা রম্য রচনা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা

সাহিত্য
তীর্থ